ঘাটালের কথা

(মহকুমার ইতিহাস ও সমাজচিত্র)

পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ

'দাসপুরের ইতিহাস', 'বাংলার মন্দির' প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা

ও

প্রণব রায়

অধ্যাপক, হুগলী মহসীন কলেজ, চুঁচুড়া

প্রাপ্তিস্থান

বাণী সংসদ

১৪-এ টেমার লেন

কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রকাশক :
ডাঃ স্বদেশভূষণ চৌধুরী এম্. বি.
ঘাটাল, মেদিনীপুর

মানচিত্র-পরিকল্পনা :
শ্রীপ্রণব রায়

প্রচ্ছদপটশিল্পী :
শ্রীজিতেন দাসগুপ্ত

স্থানীয় প্রাপ্তিস্থান :
ডাঃ স্বদেশভূষণ চৌধুরী এম বি
পোঃ ঘাটাল,
জেলা—মেদিনীপুর

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা, শ্রাবণ ১৩৮৪
(জুলাই, ১৯৭৭)

মুদ্রাকর :
শ্রীধরণীকান্ত ঘোষ
নিউ লক্ষ্মীশ্রী প্রেস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৬

'সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মা গো
তোমায় ভালোবেসে।'

"দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্যপার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে······স্বদেশপ্রেমকে সন্ধান করিবার জন্য দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

বিদেশী হইয়াও যিনি ছিলেন বঙ্গসংস্কৃতিপ্রেমিক,
যিনি পল্লী-বাংলার হাটে, মাঠে ঘুরিয়া বাংলার
ক্ষীয়মাণ প্রাচীন শিল্প ও সংস্কৃতিকে সাধারণের
সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে উদ্যোগী ছিলেন,
গ্রন্থকারদ্বয়ের সহযোগী ও সুহৃৎ
অকালপ্রয়াত

ডেভিড্ ম্যাক্‌কাচ্চনের

স্মৃতির উদ্দেশ্যে
এই গ্রন্থ অর্পিত হইল।

গ্রন্থকারদ্বয়

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের আশীর্বাণী

আমি যখন বাংলা দেশের ইতিহাস লিখি তখন বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম যে বাংলা দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস রচিত না হইলে পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব নহে।। 'ঘাটালের কথা' গ্রন্থখানি পড়িয়া আমার এই ধারণা আরও দৃঢ হইয়াছে। ইহাতে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার যে বিবরণী দেওয়া হইয়াছে তাহা বাংলা দেশেব ইতিহাসের একটি অমূল্য উপাদান। গ্রন্থকারদ্বয়—পিতা ও পুত্র—যেরূপ শ্রম ও অধ্যবসায়সহকারে এই মহকুমার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, শিল্প প্রভৃতির বিববণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক উপকরণের অমূল্য সংগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। ইহাতে ঘাটাল মহকুমার ভৌগোলিক বিবরণ, রাজনীতিক ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, পুরাকীর্তি, মন্দির, ধর্মস্থান প্রভৃতির বিষয় যেভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। গ্রন্থকারদ্বয় কেবলমাত্র এই বিষয়ের প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি পাঠ কবেন নাই, নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। বাংলাদেশের কোন ক্ষুদ্র অঞ্চলের এরূপ বিবরণ নিতান্ত দুর্লভ—নাই বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না। বাংলা সাহিত্যে ইহা একটি উচ্চস্থান অধিকার করিবে ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে অনেক দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান দলিলপত্র প্রভৃতির নকল দেওয়া হইয়াছে—ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহা বিশেষ মূল্যবান।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

৪, বিপিন পাল রোড্
কলিকাতা—৭০০০২৬

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই গ্রন্থের জন্য আশীর্বাণী দিয়াছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এবং ভূমিকাটি লিখিয়া দিয়াছেন বিশ্বভারতীর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডঃ সুধীর রঞ্জন দাস মহাশয়। ইঁহাদিগের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়ে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'মূলসঙ্গীতাদর্শ' হইতে গানদুটি সংকলন করিয়া দিয়াছেন জয়ন্তীপুর-নিবাসী বন্ধুবর শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী, ভুযুগানদুটির সংগ্রাহক রাধানগরের শ্রীমান্ অশোকমিশ্র; কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের অপ্রকাশিত পুথি হইতে অংশবিশেষ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন দাসপুর বিবেকানন্দ হাইস্কুলের শিক্ষক অনুজপ্রতিম শ্রীত্রিপুরা বসু। 'নির্ঘণ্ট' প্রস্তুত বিষয়েও তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের পুথির একটি পৃষ্ঠার আলোকচিত্রও গ্রন্থে সন্নিবেশের জন্য দিয়াছেন। চন্দ্রকোণার গোঁসাইবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধারমণ সিংহ চন্দ্রকোণার কয়েকজন গীতিকারের অপ্রকাশিত কয়েকটি গান সংকলন করিয়া আমাকে এই গ্রন্থে প্রকাশ করিবার জন্য দিয়াছেন।

গ্রন্থে ব্যবহৃত কয়েকটি আলোকচিত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে :

(১) চন্দ্রকোণার রাধারসিক রায়ের রাসমঞ্চ, শ্যামচাঁদের পঞ্চরত্ন, রসিক নাগরের 'চারচালা', রসিকরায়ের নহবৎখানা, রাধাবল্লভের 'চারচালা', লালজীর 'আটচালা', 'শিলালিপি', জহরাপুষ্করিণী ও ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তির ছবিগুলি শ্রীকানাই লাল দীর্ঘাঙ্গীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

(২) সিংহবাহিনীর 'চারচালা' মন্দির, কালু রায়ের দোচালা, বঙ্গরাম চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত অধুনালুপ্ত একরত্ন, বৃন্দাবন চন্দ্রের নবরত্ন, রঘুনাথজীর নবরত্ন, মনসার 'চারচালা', গম্বুজাকৃতি দেউল, বৈকুণ্ঠপুরের শিবের দেউল, ব্রজকিশোর জীউর মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ, গেঁড়িবুড়ির একরত্ন, দাসেদের একরত্ন ও ঐ মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ, বৈকুণ্ঠপুর নিম্বার্ক মঠ, মন্দির লিপির উদ্ধারকার্য ও দ্বিতল 'চাঁদনী' ছবিগুলি ডেভিড্ ম্যাক্কাচ্চনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

(৩) ডাঃ স্বদেশভূষণ চৌধুরী মহাশয় নিম্নবর্ণিত ছবিগুলি গ্রন্থে সন্নিবেশের জন্য দিয়াছেন : মল্লেশ্বরের পঞ্চরত্ন, লালজীর মন্দিরের সম্মুখভাগ, চাঁদখাঁ পীরের আস্তানা, বীরসিংহের ভগবতী বিদ্যালয়, বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান, রামানুজ-সম্প্রদায়ের অস্থল, খড়ারের কাঁসার কাজ, রাণীর বাজার ছোট অস্থলের বিগ্রহ, শ্যামপুরের কিশোরীমোহন ও গোপীমোহনের বিগ্রহ, বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির (বীরসিংহ), লালগড়ের নবাবিষ্কৃত কামান, গোবিন্দপুরের শিবমন্দির, লালগড়, মানবেন্দ্রনাথ রায়, শিলাইনদীর উপর ভাসাপুল ও নূতন পুল, শিলাই নদী, পার্বতীনাথ শিবমন্দির, মহিষাসুরমর্দিনী ; চাঁদখাঁ পীরের সমাধি, গাজনের সময় জিবফোঁড় ও ঘাটাল বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়। এই ফটোগুলির জন্য ঘাটালের শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীসুশীল মাইতি ও শ্রীসমীরণ চৌধুরীর সহায়তাও স্মরণীয়।

(৪) কোন্নগরের শ্রীগৌরীশঙ্কর গোস্বামী শিবায়ন গানের দুটি ছবি দিয়াছেন।

(৫) ঘাটালের প্রসিদ্ধ কোজাগরী লক্ষ্মীমূর্তি ও আধুনিক দুর্গাপ্রতিমার দুটি ছবি ঘাটালের শ্রীশৈলেশ্বর দোবেকর্তৃক প্রদত্ত।

(৬) ঘাটাল মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামীর তালিকাটি গোয়ালতোড় থানার ফতেসিংপুরের অধিবাসী শ্রীতারাশংকর ভট্টাচার্য প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

ইঁহাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

***উল্লেখ্য :**

উপরিউল্লিখিত ছবিগুলি ছাড়া অবশিষ্ট ছবিগুলির স্বত্ব মৎকর্তৃক সংগৃহীত। **পরিশিষ্টে** উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে শ্রীত্রিপুরা বসু ও শ্রীরাধারমণ সিংহপ্রদত্ত পদ্যাংশগুলি ছাড়া অবশিষ্ট উদ্ধৃতিগুলির স্বত্ব আমার থাকিবে।

প্রণব রায়



গবেষক পঞ্চানন রায়ের

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

একাধারে কবি, নিবন্ধকার, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক—অন্যদিকে সমাজসেবী ও দেশপ্রেমী, সদ্য প্রয়াত পরিব্রাজক পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ বাংলা ১৩০৯ সালের ২৮শে ভাদ্র (ইং ১৯০২ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর) মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার চেতুয়া-বাসুদেবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মহাকবি কৃত্তিবাস ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীরায়ের মধ্যে সাহিত্যচর্চা যেন জন্মগত ছিল। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর সাহিত্যচর্চা সুরু। গ্রামের বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত মিড্‌ল স্কুল থেকে পাশ করে কলকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে তিনি ভর্তি হন প্রবেশিকা পাঠের জন্যে এবং সেখান থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেন। জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের সংস্পর্শে তিনি আসেন প্রবেশিকার গণ্ডী অতিক্রম করার আগে থেকেই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য ও প্রেরণায় তাঁর সাহিত্যে হাতেখড়ি হয়। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় সেকালের বিখ্যাত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় সন ১৩২৫ সালের ১লা অগ্রহায়ণে। এরপর ঐ পত্রিকায় তাঁর বহু গান, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। সেসময় 'আদি ব্রাহ্ম সমাজে'র সঙ্গেও তিনি বিশেষভাবে যুক্ত হন। ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ পত্রিকায় তাঁর বহু গবেষণাধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। গতানুগতিক কলেজী শিক্ষার মোহ ত্যাগ করে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হন এবং

সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে টোলে পড়তে সুরু করেন। এর পর সংস্কৃত 'কাব্যতীর্থ' উপাধি লাভ করে কাশী থেকে জ্যোতিষশাস্ত্রে 'জ্যোতির্বিনোদ' উপাধিও লাভ করেন। কিন্তু তাঁর মন ছিল প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস-সংস্কৃতি, মন্দির-মসজিদ, পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট। শিক্ষকের উপজীবিকা মাত্র অবলম্বন করে তিনি অবসরকালে সারা পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘুরেছেন। বহু জ্ঞানী-গুণীর সংস্পর্শে এসেছেন এবং খ্যাত ও অখ্যাত নানান্ পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ, কবিতা ও গান রচনা করেছেন। তাঁর বিশেষ গবেষণা ছিল বাংলার মন্দির ও তার শিল্পকলা নিয়ে। একসময় এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবাংলার নানা স্থানে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং মূল্যবান তথ্যাদি আহরণ করেছেন। বিখ্যাত "প্রবাসী" পত্রিকায় ও সাপ্তাহিক "অমৃতে" তিনি "বাংলার মন্দির" নামে ধারাবাহিক সচিত্র রচনা প্রকাশ করেছিলেন যা সুধীমহলে দারুণ কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। বিখ্যাত পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে সেকালের 'বিচিত্রা', 'বর্তমান', 'শ্রীভারতী' 'প্রবর্তক' প্রভৃতিতে তাঁর অনেকগুলি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

মেদিনীপুর জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বসম্পর্কে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা ছিল। তিনি ঐতিহাসিক চেতুয়া পরগণা ও দাসপুর থানার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। শেষোক্তটি "দাসপুরের ইতিহাস" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত চেতুয়ার ইতিহাস "চেতুয়া ও বাসুদেবপুর-কাহিনী" নামে "মেদিনীবাণী" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মেদিনীপুর জেলার মন্দিরসম্পর্কে তাঁর বিরাট অভিজ্ঞতা ছিল। সুপ্রাচীন ও জীর্ণ মন্দিরের শিলালিপির পাঠোদ্ধারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি সমগ্র ঘাটাল মহকুমা ও মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন এবং বহু দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন নথিপত্র, পুথি প্রভৃতির সন্ধান পেয়েছিলেন। "বাংলার মন্দির" নামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শেষ জীবনে বিদেশী পণ্ডিত ও বঙ্গ সংস্কৃতির অপর একজন নিরলস গবেষক অধ্যাপক ডেভিড্ ম্যাক্‌কাচ্চন শ্রীরায়ের গভীর অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। কলকাতার এশিয়াটিক সোস্থাইটি থেকে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ Late Medieval Temples of Bengal এ তিনি শ্রীরায়ের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। ঐ গ্রন্থের গোড়ায় তিনি লিখেছেন :

"I feel an unforgettable debt of gratitude not only for assisting my research, but for the unstinting friendliness which made that research a pleasure. Of these I must single out for special

gratitude two local scholars who have done much to preserve and create understanding of the culture of their home areas : Sri Panchanan Ray Kavyatirtha, of Basudevpur in the Daspur P. S. of Midnapore and Sri Maniklal Sinha, Secretary of the Bangiya Sahitya Parishad at Bishnupur (Bankura)."

আধুনিককালের প্রখ্যাত কবি বিষ্ণু দে সংস্কৃত কলেজে শ্রীরায়ের বন্ধু ছিলেন এবং সে সময় দুজনে পত্রিকা সম্পাদনাও করতেন। শ্রীরায়ের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি যে কবিতাটি লিখেছেন সেটি এখানে মুদ্রিত করা হল:

পঞ্চানন রায় স্মরণে

অসামান্য মানুষ ছিলেন—আমরা যা দেখেছি
কৈশোর-যৌবন থেকে আশ্চর্য চারিত্র্যে
নানা জ্ঞানের সন্ধানে, নানারকম পরিশ্রমে—
কৃত্তিবাস ওঝার এবং অন্য পক্ষে রায়গুণাকর
ভারতচন্দ্রের বংশধর !
স্বচ্ছ ঋজু, কঠিন জীবনে সবল অথচ সরল !
যেমন হতেন জ্ঞানের কোনো কোনো সাধক
বাল্য-কৈশোর—যৌবন থেকেই
যেন কোনো কষ্ট নেই, গ্লানি নেই, নির্বিকার চারিত্র্য।
আশ্চর্য সহিষ্ণু। খাটো ধুতি আর ফতুয়া আর খালি পায়ে
আদি ব্রাহ্ম সমাজে বাস, মাসে পাঁচ টাকা বৃত্তিতে।
নিত্যপদযাত্রা সংস্কৃত কলেজে, বিদ্যালয়ে টোলে
অসাধারণ তরুণ প্রতিদিন যাওয়া-আসা।

মনে আছে, দারোয়ানের কাছ থেকে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে
এক সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের চত্বরে
জয়দেবের গীতগোবিন্দ শোনান।
তখন থেকেই তিনি অসামান্য মানুষ।
তারপরে বই, পুঁথি, শিল্পকার্য সংগ্রহ
—প্রচুর ও বিচিত্র।

মধ্যে মধ্যে দেখা হয়েছিল।
তারপরে আবার দেখা হল,
ডেভিড্ ম্যাক্‌কাচিঅনের কল্যাণে।
পঞ্চানন রায়-কে বেশ কবছর পরে দেখলুম
চুলে দাঁতে বয়সের ছাপ।
কিন্তু ক্লান্তিহীন উৎসাহ বই পুঁথি পাটা মূর্তি
সংগ্রহে—কষ্ট করে, ঘুরে ঘুরে সময় ও অর্থ
ব্যয় করে।
এ রকম মানুষ আমরা আর দেখি নি॥

বিষ্ণু দে

একজন গীতিকার ও কবিতা-রচয়িতারূপেও শ্রীরায় পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত বহু গান ও কবিতা এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। 'আকাশবাণী', কলকাতাকেন্দ্র থেকে তাঁর রচিত কিছু গান প্রচারিত হয়েছে।

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ (ইং ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭৬) এই প্রবীণ সাহিত্যসেবী ও গবেষকের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে তাঁর স্বগ্রাম চেতুয়া বাসুদেবপুর গ্রামে।

উল্লেখ্য :

স্কেচ্‌টি এঁকেছেন 'শান্তিনিকেতন কলাভবন মিউজিয়মে'র কিউরেটার শ্রীযুক্ত রবি পাল।

সূচীপত্র

Dr. SUDHIR RANJAN DAS M.A., PH.D., F.A.S.
Professor and Head of the Department of Ancient Indian History, culture, and Archaeology, Viswa Bharati,
Formerly University Professor and Head of the Department of Archaeology, Calcutta University.

ভূমিকা

বাংলা দেশের ইতিহাস নেই। বহুদিন পূর্বে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন যে, বাংলার ইতিহাস নেই : 'যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাংলার বিদেশী বিধর্মী পরপীড়কদিগের জীবনচরিত মাত্র'। বাংলা দেশের যথার্থ ইতিহাস নেই, লেখাও হয়নি। প্রাচীন ও মধ্য-যুগে গুণীজনের তো কোন অভাব ছিল না। ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতি নানা প্রকার ধর্মীয় গ্রন্থ লেখা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস কেন লেখা হয়নি? অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশের জ্ঞানী-গুণীবৃন্দ কোনদিনই ইতিহাস-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন নাই। তাঁদের ইতিহাস সম্পর্কে কোন বিশেষ ধারণাও ছিল না। তাঁরা পরলোকের তত্ত্ব ও ইহলোকের ধর্মীয় কাঠামো সৃষ্টি করতেই নিমগ্ন ছিলেন। আবার অনেকে বলেন, ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, কিন্তু কালের প্রবাহে তা' ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সব পুথিপত্রই যদি ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে তবে ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থ কি ক'রে রক্ষা পেল? তাই স্বীকার করতে হয় যথার্থই ইতিহাস লেখা হয়নি। যদিও বাংলা দেশেই সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত ও অনেক কুলজী-গ্রন্থ লেখা হয়েছে। সামাজিক ইতিহাসে অসংখ্য কুলজী-গ্রন্থের যে কোন মূল্য নেই তাও বলা যায় না। তবে এই সব গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা সর্বজনস্বীকৃত নয়। কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থও যে ছিল না তাও একেবারে বলা যায় না। মধ্যযুগ হতে এই অভাব কিয়দংশে দূরীভূত হয়েছে। যথার্থ ইতিহাস যে নেই, তা অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলার ইতিহাস লেখা না হলে বাঙালী কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। তাই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন : 'বাংলার ইতিহাস চাই, না হলে তার কোন ভরসা নাই'।

বঙ্কিমচন্দ্রের সতর্কবাণী বাঙালীকে জাগ্রত করেছে। তাই বঙ্কিমোত্তর যুগে বাংলার ইতিহাস রচনায় তৎপরতা দেখা যায়। কতিপয় ইতিহাস গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাদের যথার্থ ইতিহাস বলা যায় না। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বাংলার ইতিহাস লিখতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন, এই ইতিহাস

লেখার উপাদান বা রসদ কোথায়? রসদের কিন্তু অভাব নেই। রসদ আছে —গ্রাম-গ্রামান্তরে, ঘরে-বাইরে, পাহাড়-জঙ্গলে, নদ-নদীর গর্ভে, গোরস্থানে ও লোকমুখে বা শ্রুতিগাথায়। গ্রামের ঘরে আছে প্রাচীন পুঁথি ও গৃহস্থালী সামগ্রী; মাঠে-ঘাটে আছে মৃত্তিকাবৃত পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ; নদ-নদী সভ্যতার স্রষ্টা এবং তারাই আবার কীর্তিনাশা—কত গ্রাম, নগর ও মহানগরীকে গ্রাস করেছে—তাই কত সংস্কৃতির নিদর্শন নদীগর্ভে নিয়েছে আশ্রয়; পাহাড়-জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে কত সংস্কৃতির অভিজ্ঞান; কত আবাসক্ষেত্র চলে গিয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে; মৃত্তিকা করেছে তাদের আবৃত এবং রূপান্তরিত হয়েছে ঢিবিতে ও জঙ্গলে। এই ভাবে কত সভ্যতার কেন্দ্র হয়েছে হিংস্র পশুকুলের আবাসস্থল। লোকসংস্কৃতির অবিনশ্বর বাস্তব উপাদান রয়েছে মৃত্তিকাগর্ভে বা জলগর্ভে; ভূপৃষ্ঠেও অতীতের সাক্ষী ও সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে কত ভগ্ন ও জীর্ণ মন্দির। সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে রয়েছে কত সুপ্ত ইতিহাসের রসদ। জীবন্ত উপাদানও কম নয়। জনশ্রুতি ও লোকগাথা বহন করছে যুগ-যুগান্তরের ইতিহাসের ছিন্ন পত্রগুলির কথা···। লোকগাথায় অতীত আজও জীবন্ত। আরও যে কত সম্পদ রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তবুও কি বলবো যে ইতিহাসরচনার রসদ নাই? রসদ আছে বাজারে-বাজারে; নেই অনুসন্ধান, নেই বাজার, রন্ধন ও পরিবেশন করবার লোক। এই বুভুক্ষু দেশে আহার করবার লোক আছে; অভাব রন্ধন ও পরিবেশনের। অর্থাৎ, নেই ইতিহাস-রূপায়ণ :—

আছে ইতিহাস, আছে কুলমান
আছে মহত্ত্বের খনি।
পিতৃপিতামহোদয় গেয়েছে যে গান
শুন্‌রে তার প্রতিধ্বনি।

ইতিহাসের রসদ রয়েছে। চাই ঐতিহাসিক চেতনা। চাই অনুশীলন ও বিশ্লেষণ। 'ঐতিহাসিক চেতনা হচ্ছে জাগ্রত জাতির লক্ষণ। সুপ্ত জাতির যেমন ভাবীকালের ইতিহাস-সৌধ গড়ে তুলবার উদ্যম থাকেনা, তেমনি বিগত কালের ইতিবৃত্ত সন্ধানের আগ্রহও থাকে না'। আমরা সুপ্ত জাতি—ঘুম ভাঙালেন বঙ্কিমচন্দ্র। অতীত আছে,—ইতিহাসের রসদ আছে, নেই কেবল ইতিহাস। রসদ রয়েছে আমাদের পায়ের নীচে। অতীতের আত্মা স্বর্গে চলে গেছে। আর তার দেহ প্রবেশ করেছে পাতালে। তাই আমাদের দেশ একটি মহা কবরস্থান। উদ্ধার করতে হবে খনিত্রের সাহায্যে। খনিত্রজাত ঐশ্বর্যে

হতে হবে ধনী। মনকে চাষ করে আর ইতিহাস লিখতে হবে না। ইতিহাস-সৃষ্টি হবে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে।

এই ইতিহাস সৃষ্টির কথা বলতে গেলেই আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্বের কথা বলতে হয়। আঞ্চলিক ইতিহাস ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ—গ্রামের ইতিহাস, গ্রামাঞ্চলের ইতিহাস, মহকুমার ইতিহাস ও জেলার ইতিহাস। প্রতিটি গ্রামের এবং অঞ্চলের ইতিহাস আছে। কৈ সে ইতিহাস? অধিকাংশ গ্রাম সমসংস্কৃতি দ্বারা অধ্যুষিত নয়। বাংলাদেশের গ্রাম বিচিত্রময়। তথাপি গ্রামের সংস্কৃতির ধারার মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যবাহিত অতীতের কথা। ইতিহাসের রসদ তো গ্রামাঞ্চলেই রয়েছে। কোথায় তাদের সংগ্রহ? কোথায় তাদের অনুশীলন ও বিশ্লেষণ? আঞ্চলিক ইতিহাস সৃষ্টি হবে কি ক'রে? প্রতিটি জেলার কথাই অনুরূপ। কিন্তু ইতিহাসের ধারাকে তো কোন ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। তবে কোন অঞ্চলে যদি সম-সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত থাকে তা'হলে বলতে হবে যে, উক্ত অঞ্চলের স্বতন্ত্রতা রয়েছে। কিন্তু প্রায় সকল জেলাতেই একাধিক সংস্কৃতির ধারা প্রবাহমান। সম-সংস্কৃতির বিদ্যমানতা থাকলেই আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা বজায় থাকে। ইতিহাস কেবল সম-সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত নহে। ইতিহাস বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারার ইতিবৃত্ত, তাদের আদান-প্রদান এবং মিলনের চিত্র। ইতিহাস তাই একাধিক অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত। তা হলেও কোন লোকসান নেই। যত আঞ্চলিক ইতিহাস লেখা হবে ততই ইতিহাসের সম্পদ বাড়বে। সব থেকে গোলমাল, অঞ্চলের রাজবৃত্ত বা রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নিয়ে। রাজবৃত্তের ইতিহাসের সাথে একাধিক অঞ্চল জড়িত। তবে অনেক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজাও তো ছিল। তা' হয়ত এক-একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতি অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য আছে। এই বিশিষ্টতার তত্ত্ব জানতে হলে প্রয়োজন আঞ্চলিক ইতিহাস। সেই ইতিহাস কোথায়?

আমাদের দেশে আঞ্চলিক ইতিহাস চিরদিনই উপেক্ষিত। সকলেই বাংলা দেশের ইতিহাস রূপায়ণে ব্যস্ত। বর্তমান যুগেও বাংলার ইতিহাস, বাঙালীর ইতিহাস, বাংলার সংস্কৃতি ইত্যাদি অনেক ইতিহাস লেখা হয়েছে। কিন্তু কোন ইতিহাসই পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় নি। স্বদেশী আমল থেকেই বাংলার ইতিহাস নিয়ে মাতামাতি করে আসছি। কিন্তু আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় নি। আমরা ভুলে যাই যে, বাংলার আঞ্চলিক ইতিবৃত্তই সমগ্র দেশের ইতিহাসের সুদৃঢ় ভিত। আঞ্চলিক ইতিহাসের

পরিপূর্ণতা ছাড়া কোন দেশের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারে না। আঞ্চলিক ইতিহাস ভিন্ন দেশের জনতার সাথে সাধারণ ইতিবৃত্তের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, বাঙালীর ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ আঞ্চলিক ইতিহাস ছাড়া অসম্ভব। যদি আমরা দেশকে সম্পূর্ণরূপে জানতে চাই তা'হলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্গতির ও শান্তি-অশান্তির ইতিবৃত্তের মাধ্যমেই জানতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন সর্বাঙ্গীন আঞ্চলিক ইতিহাস। কেবলমাত্র মনের চাষ করে এই আঞ্চলিক ইতিহাস রূপায়ণ করা যায় না। ইতিহাসের সুদৃঢ় ভিত্তি হল বাস্তব উপাদান। এই উপাদান তো গ্রামেই লুকিয়ে আছে। তাদের খুঁজে বের করতে হবে, উদ্ধার করতে হবে। তবেই হবে অনুশীলন ও বিশ্লেষণ। যা অজ্ঞাতব্য তাকে অনুসন্ধান করতে হবে। তাদের মুখে দিতে হবে ভাষা। মৃতকে করতে হবে সঞ্জীবিত। তবেই হবে ইতিহাস-সৃষ্টি।

আমরা চাই অতীতকে জানতে। আমরা অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকেও জানতে চাই। অতীতকে না জানলে বর্তমানকে জানা যায় না। তা কিন্তু কোন ঘটনার দ্বারা নির্ণয় করা হয় না। 'ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতিতে বাস্তব ঘটনার সহিত মানবমন মিশ্রিত হইয়া যে পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহাই ঐতিহাসিক সত্য'। সেই সত্যের বিবরণ মানবের নিকট চিরন্তন কৌতুকাবহ এবং শিক্ষার বিষয়। আমাদের উন্নত সমাজের বহির্ভূত বৃহত্তর অনুন্নত জনসমাজও বর্তমান। তারা আছে গ্রামে-গ্রামান্তরে। এই গ্রাম্য সমাজ আজও নিরক্ষর। গ্রামাঞ্চলের জন-সমাজের উৎস বা সত্তা কোথায়? পল্লী অঞ্চলের ইতিহাস কোন লিপিবদ্ধ শাস্ত্রে বা গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই বৃহৎ নিরক্ষর জন-সমাজই তথাকথিত উন্নত ও সভ্য সমাজের সুদৃঢ় ভিত। উন্নত সমাজের লিখিত প্রমাণ-নির্ভরশীল ইতিহাস একটি ভিতহীন প্রকার মাত্র। যার ভিতস্তর অস্পষ্ট ও অদৃঢ় সেই ইতিহাস কখনই পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তব রূপ নিতে পারে না।

গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর জনসমাজই ইতিহাসের মূল গ্রন্থী। তার ইতিহাস শ্রমশিল্প-নিদর্শন, জনশ্রুতি বা লোকগাথা, আখ্যান ইত্যাদির অন্তরালে নিবদ্ধ। জনশ্রুতি পল্লী অঞ্চলের ইতিহাসের একটি প্রধান উৎস। নিরক্ষর গ্রামবাসীর নিকট হতে ঐতিহ্যবাহিত লোকগাথা সংগ্রহ করে রূপায়ণ করতে হবে মহাকাব্য ও পুরাণ, তা হলেই পাওয়া যাবে লোকবৃত্তের ইতিহাস। কিন্তু জনশ্রুতির ঐতিহাসিক সত্যতা উদ্ধার করতে হবে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও বিশ্লেষণের সাহায্যে। লোকবৃত্তের ইতিহাস রাজবৃত্তের ইতিহাস হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন

নয়। একে অপরের পরিপূরক। এই জনশ্রুতিমূলক তথ্য কেবলমাত্র আঞ্চলিক ইতিহাসই সরবরাহ করতে পারে। আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্ব অসীম। আমাদের দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যে রূপায়িত হয় নি, তার প্রধান কারণ আঞ্চলিক ইতিহাসের অভাব।

আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদের প্রসারের ফলে আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা হয়। আঞ্চলিক প্রেম ও ভক্তি প্রকটভাবে দেখা দেয়। গ্রাম, গ্রামাঞ্চল ও জেলার সহিত একাত্মবোধ জেগে ওঠে। এই ভাব ও প্রেমকে সংকীর্ণতার রূপক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইতিহাস-রূপায়ণের ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব অত্যধিক। সকলেই স্বীয় গ্রাম ও জেলার গুরুত্ব প্রতিপাদন করতে উন্মুখ। তার জন্য প্রয়োজন ইতিহাস লেখা। তাই সাড়া পড়ল গ্রাম ও জেলার ইতিহাস-রূপায়ণের রসদ সংগ্রহ করবার প্রচেষ্টা। লেখা হতে লাগল বিভিন্ন জেলার ইতিহাস। আধুনিক ইতিহাস-তত্ত্বে এই সকল ইতিহাস সমাদৃত নাও হতে পারে। কিন্তু তাদের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই কতিপয় আঞ্চলিক ইতিহাসই আমাদের দেশের ইতিহাসের বনিয়াদ তৈরী করে দিয়েছে। প্রথমতঃ, নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনীর কথা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন, 'এই প্রকার চিত্রগ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। নিখিলবাবুর এই সদ্দৃষ্টান্ত, তাহার এই গবেষণা ও অধ্যবসায়ের জন্য বঙ্গ সাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কতিপয় জেলার ইতিহাস লেখা রয়েছে। লেখা হয়নি গ্রামের ইতিবৃত্ত। ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি কাউন্টির ইতিহাস আছে। কিন্তু আমাদের গ্রামের বা গ্রামাঞ্চলের ইতিহাস বিরল; নেই বললেই চলে। তাই আশু প্রয়োজন গ্রাম-গ্রামাঞ্চলের ইতিহাস রূপায়ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন: 'বাংলার ইতিহাস চাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া বাংলার ইতিহাসের সন্ধান করি।' বঙ্কিমচন্দ্র সকলকেই আহ্বান জানিয়েছিলেন। এটা তো একার কাজ নয়। প্রয়োজনবোধে সমিতি করে, পাঁচজন মিলে কাজ করতে হবে। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ: 'সভা নামক শিব গড়তে গিয়ে আরো কি বড় প্রহসনের সম্ভাবনা নেই? যে দেশে অনেক লোকের সুদৃঢ় উৎসাহ আছে তারা একত্রিত হয়ে বৃহৎ কাজ করতে পারে। আর যে দেশে উৎসাহী লোকের সংখ্যা অল্প, সেখানে বিপরীত ফলের সম্ভাবনা আছে। কারণ, সে সভায়

বাজে লোক জুটিয়া উৎসাহী লোকের উদ্যম খর্ব করে দেয়।' তাই রবীন্দ্রনাথ আবার দুঃখ করে বলেছিলেন: 'বাংলাদেশের যারা কোন মহৎ কার্যের ভার লইবেন, লোকসঙ্গ বা লোকসাহায্যের সুখ তাদের অদৃষ্টে নেই।' একথা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। মনে হয়, স্বতন্ত্র প্রচেষ্টাই অধিক প্রবল ও ফলমুখী। তবে সভা করে যে একেবারে কোন কাজ হয় না, তাও বলা যায় না। বঙ্কিমের ডাকে সাড়া দিয়েই তো সাহিত্য-পরিষদ সৃষ্ট হয়েছিল। বাংলার সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধার করবার জন্য স্থাপিত হয়েছিল বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি। গড়ে উঠেছিল আরো অনেক সভা-সমিতি ও আজও হচ্ছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় একক প্রচেষ্টা। অধুনা অবশ্য সরকারও এগিয়ে এসেছেন ইতিহাস রূপায়ণের কাজে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, সরকারী অর্থে ও তাবেদারীতে পুষ্ট হয়ে ইতিহাস লেখা যায় না। সেই ইতিহাসের প্রাণ থাকে না। পুতুল গড়া যায়, কিন্তু প্রাণবন্ত দেবতার মূর্তি হয় না।

সবচেয়ে প্রথম দরকার উৎসাহী কর্মীর। আঞ্চলিক ইতিহাস রূপায়ণ করতে হলে প্রয়োজন গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান ও অনুশীলন। দৃঢ়বদ্ধ উৎসাহী কর্মীর অভাবের কথা তো আর অস্বীকার করা যায় না। আবার উৎসাহী কর্মী থাকলেই চলবে না। চাই স্থানীয় দরদী কর্মী। আঞ্চলিক ইতিহাসের রসদ উদ্ধার ও অনুশীলনের জন্য চাই প্রগাঢ় অনুভূতি ও দরদ। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীই আঞ্চলিক ইতিহাস রূপায়ণের প্রকৃত অধিকারী।

এই প্রসঙ্গে একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও স্বদেশপ্রেমিকের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়, যিনি বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম লেখক। মেদিনীপুরের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গগনে তিনি চিরদিন একটি উজ্জ্বল তারকা হয়ে থাকবেন। এই পণ্ডিতপ্রবর হলেন শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ। তাঁকে প্রথম জানবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধমালার মাধ্যমে। তিনি নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করে আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির উদ্ধারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর নিজের কথায়: 'শৈশব হইতেই উপাদান আহরণে আমার উৎসাহ সমবয়স্কগণের উপহাসের বিষয় হইয়াছিল। তবু নিরাশ না হইয়া উদ্যম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি।' কেবলমাত্র উপহাসের বিষয় কেন, পাগল বলতে কুণ্ঠা-বোধ করবে না। তিনি যে তাঁর উদ্যম সারাজীবন অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তার জন্য বাঙালীমাত্রই তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। বহু মূল্যবান্ নিবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর রচিত '**দাসপুরের ইতিহাস**' আঞ্চলিক ইতিহাস-রূপায়ণের

একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। সকলেই মুগ্ধ তাঁর অনুসন্ধানকার্যে। সকলেই অভিভূত তাঁর ইতিহাস-রচনার মাধুর্যে। শুধু তাই নয়, স্বীয় অঞ্চলের ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশের নানাবিধ প্রত্ননিদর্শন সংগ্রহ করে স্থাপন করেছেন নিজগৃহে একটি সংগ্রহশালা। তাতে রয়েছে নানা প্রকার সংস্কৃতির নিদর্শন। সংগ্রহশালায় রক্ষিত নিদর্শনের তালিকা ও বিবরণ দিয়ে প্রকাশ করেছেন পুস্তিকা। মেদিনীপুরের মন্দির নিয়ে গবেষণা করেছেন সারাজীবন। প্রকাশ করেছেন অসংখ্য নিবন্ধ ও একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারকে রেখেছিলেন সর্বদাই উন্মুক্ত। সকলকেই জ্ঞানতপস্থায় সাহায্য করতে তিনি ছিলেন মুক্ত-হস্ত। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ছিল তাঁর আমরণ ব্রত। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, নিবন্ধকার, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। চুয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে অসংখ্য ইতিহাস-সম্পদ সংগ্রহ করেছেন। তাদের অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করে সৃষ্টি করেছেন তাঁর অঞ্চলের ইতিহাস। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। তবে তিনি তাঁর কীর্তি রেখে গেছেন অসংখ্য প্রকাশনের মাধ্যমে। তাঁর লেখা আমাদের প্রেরণা দেবে আঞ্চলিক ইতিহাস-রূপায়ণে। এই বিদগ্ধ ইতিহাসবেত্তা ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে পেয়ে সমগ্র বাঙ্গালী আজ ধন্য। তাঁর পথ অনুসরণ করেই আমরা এগিয়ে যেতে পারব। তাঁকে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

শেষ বয়সে তিনি আরম্ভ করেছিলেন তাঁর অঞ্চলের সামগ্রিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি-সম্পর্কিত পুস্তক প্রণয়ন করতে—**'ঘাটালের কথা'**। কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবার ভার নিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক প্রণব রায়। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তিনি আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপাদান উদ্ধারকার্যে ব্রতী হয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিনি মেদিনীপুর জেলার মন্দির-সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গ্রাম-গ্রামান্তরে বাংলার সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে আজও কত মন্দির যে ছড়িয়ে রয়েছে, তা এখনও অজ্ঞাত। সরেজমিন তদন্ত করে তিনি এই মন্দিরের ইতিহাস-রূপায়ণের গুরুভার গ্রহণ করেছেন। তিনি যে নিষ্ঠাসহকারে একাজে এগিয়ে চলেছেন তার প্রমাণ রয়েছে এই গ্রন্থে।

বর্তমান গ্রন্থের নয়টি অধ্যায়; তন্মধ্যে চারটি অধ্যায় লিখে গিয়েছেন পণ্ডিত প্রবর পঞ্চানন রায় মহাশয়, আর বাকী পাঁচটি অধ্যায় লিখেছেন তাঁরই পুত্র অধ্যাপক প্রণব রায়। গ্রন্থটিতে লেখকদ্বয় ঘাটাল-অঞ্চলের অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করতে চেষ্টা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে

ঘাটাল মহকুমার সীমা, নদ-নদী, খাল-বিল, বনভূমি, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির সাধারণ পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যায়ে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে এই অঞ্চলের ভূভাগের কথা। কিন্তু ভূতাত্বিক আলোচনা বাদ পড়ে গিয়েছে। তাছাড়াও এই আলোচনায় কয়েকটি মন্তব্য স্থান পেয়েছে যা প্রমাণযোগ্য নয়। প্রত্নাশ্মীয় যুগে মানব-নিদর্শনের কথা বলতে গিয়ে লেখা হয়েছে: 'প্রস্তরীভূত একটি দন্ত এদেশে লক্ষ বৎসর আগের মানবকে জানাইয়া দেয়।' আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোথায়ও মানব-জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই মানব-দন্তের জীবাশ্ম কোথায় পাওয়া গিয়েছে? কে বা কারা ইহা চিহ্নিত করেছেন? তার কোন নজির উল্লেখিত হয়নি। আবার তেলাঙ্গার দুর্গকে দ্রাবিড়দের পরিত্যক্ত দুর্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়? এই প্রকার মন্তব্য প্রামাণিক নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ইতিহাস। ঘাটাল নামের উৎপত্তি ও প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সাধারণভাবে ইতিহাসের কালানুক্রমিক ঘটনাবলী সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে রাজবংশ, জমিদারবংশ ও তাঁদের সামাজিক পরিস্থিতির বর্ণনা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতা আন্দোলনে ঘাটালবাসীর অবদান-প্রসঙ্গও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে জনসাধারণ ও জনসমাজ। এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে মহকুমা, থানা, গ্রাম, জনবসতি প্রভৃতির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। গ্রামের নামোৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নানা জাতি, ভাষা, পথঘাট, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ও বিবৃত হয়েছে। পরিশেষে প্রদত্ত হয়েছে কতিপয় প্রধান প্রধান গ্রামের পরিচিতি।

প্রাচীনকাল থেকেই যে ঘাটাল মহকুমার অঞ্চল ছিল সংস্কৃতির ও শিক্ষা-দীক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র তার প্রমাণ পাওয়া যায় চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় থেকে। শিক্ষা ব্যবস্থা, 'বিদ্যাসমাজ', সংস্কৃত-অধ্যাপকদিগের ইতিকথার বিবরণ অতীব মূল্যবান্। পূর্বেকার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার কয়েকটি প্রশ্নপত্রের নমুনা প্রকাশ করে বর্তমান শিক্ষার মানের পরিপ্রেক্ষিতে আগেকার প্রাথমিক শিক্ষার মানের তুলনামূলক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ।

ঘাটাল মহকুমার অঞ্চলসমূহ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ছিল সমৃদ্ধিশালী। তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। এতদ্ব্যতীত প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান, পুজো-পার্বণ ও মেলার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন মেলার একটি সংক্ষিপ্ত

বিবরণীও বাদ পড়েনি। সাহিত্যক্ষেত্রেও ঘাটাল মহকুমার অবদান কম নয়। পরিচয় দেওয়া হয়েছে ঘাটালের প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও লেখকগণের। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও প্রবন্ধাদির লেখকগণের পরিচিতি। এরপরে আলোচিত হয়েছে ঘাটাল মহকুমার পুরাকীর্তি নিদর্শন, বিশেষ করে মঠ মন্দির ও মসজিদের। এই অধ্যায়ের লেখক অধ্যাপক প্রণব রায় সরেজমিন অনুসন্ধান করে অনেক অজ্ঞাত মন্দিরের সন্ধান দিয়েছেন। পুরা-নিদর্শনের কথা বলতে গিয়ে পান্না হতে আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনরাজির উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু এই নিদর্শনরাজির বিস্তৃত আলোচনার দরকার ছিল। অনেক প্রাচীন গড় ও দুর্গের কথাও বলা হয়েছে। এই সকল গড় বা দুর্গের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কাজ অতি সত্বর আরম্ভ করা প্রয়োজন। মন্দিরের তালিকা ও বিবরণ অতীব তথ্যপূর্ণ। এই তালিকা থেকে মনে হয় ঘাটাল সত্যিই একটি মন্দিরময় মহকুমা। এই আলোচনায় মন্দিরের বিভিন্নাংশের আঞ্চলিক নামের নির্দেশপদও রয়েছে। এই সকল নাম মন্দির-বর্ণনায় প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত।

নবম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কতিপয় অপ্রকাশিত নথিপত্র ও তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এই সকল নথিপত্রের কিছু অধ্যাপক রায়ের স্বর্গত পিতা সংগ্রহ করেছিলেন। অধ্যাপক রায় নিজেও অনেক মূল্যবান নথিপত্রের সন্ধান পেয়েছেন এবং তাদের কয়েকটির যথার্থ অনুলিপি এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এইসব নথিপত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অত্যধিক। অধিকাংশই বর্দ্ধমান রাজপরিবারকর্তৃক প্রদত্ত ভূদানপত্র, ফসল-ছাড়পত্র, বিচার সংক্রান্ত দলিল, আবেদন পত্র ও রায়, বণ্টননামা, দেবোত্তর ও মহাত্রাণ জমির ভোগদখল সংক্রান্ত খৎপত্র, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-পত্রও বাদ পড়েনি। আরো রয়েছে ঘাটাল মহকুমার কবিগণের বিরচিত কবিতা ও গান। এতদ্ব্যতীত প্রকাশিত হয়েছে ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের লিখিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবা-বিধাহ' নামক গ্রন্থের বক্তব্যের বিরুদ্ধ মতামত। নথিপত্রগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার মৌলিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে এই নথিপত্রে। নথিপত্রাদির বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সম্মত বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করলে আমাদের দেশের ইতিহাসের অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

ঘাটাল মহকুমা অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থে। বাংলাদেশের প্রতিটি মহকুমার এরূপ পরিচয় পেলে তবেই এক একটি জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস

রচিত হওয়া সম্ভব। মহকুমা ও জেলার ইতিবৃত্তের ভিতের ওপরই বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রূপায়ণ করতে হবে। অধুনা কতিপয় বিদ্যার্থী এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থের লেখকদ্বয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। স্বর্গীয় পণ্ডিত-প্রবর রায়-মহাশয় যে পথের সন্ধান দিয়েছেন, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই কাজে এগিয়ে যেতে হবে। তা হলেই রচিত হবে বাঙালীর প্রকৃত ইতিহাস, বঙ্কিমের বাণী হবে সার্থক।

বর্তমান গ্রন্থের ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু রয়েছে সন্দেহ নেই। বিষয়বস্তু যদিও সর্বত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে বিন্যস্ত হয়নি, তবুও এই কাজে যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া গেছে তা খুবই প্রশংসনীয়। প্রাচীন মানচিত্র, বহু আলোকচিত্র ও নানাবিধ তথ্যসম্বলিত এমন গ্রন্থ বিরল। ঘাটাল মহকুমার কথা বা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গত পঞ্চানন রায় ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক প্রণব রায়ের নিকট বাংলার বিদ্বজ্জন চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। এই গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করে অধ্যাপক রায় তাঁর পিতৃঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছেন। আশা করি, এই গ্রন্থ আমাদের দেশের জনসাধারণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হবে এবং বিদ্যার্থিগণ আঞ্চলিক সংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়ণে অনুপ্রাণিত হবে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

তাং ৯।৬।৭৭ সুধীররঞ্জন দাস

প্রাক্‌কথন

পশ্চিম বাঙলার দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত এই ঘাটাল মহকুমা। ইংরেজদের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এই জেলার অন্যান্য মহকুমার ন্যায় ঘাটাল মহকুমারও সৃষ্টি হইয়াছিল আজ হইতে একশ' বছর আগে। মহকুমার সদর কার্যালয় শিলাই-তীরবর্তী ঘাটাল শহরের পুরসভাটি ইং ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যখন শহরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন আগের গড়বেতা মহকুমা ঘাটাল মহকুমায় পর্যবসিত হইল। ইং ১৮৭৬ সালে ইহা পাকাপাকিভাবে ঘাটাল মহকুমা নামে পরিচিত হয় এবং গড়বেতা হইতে মহকুমা শাসকের কার্যালয় ও অন্যান্য কার্যালয় এই শহরে উঠিয়া আসে। ঘাটালের সর্বপ্রথম মহকুমা শাসক নিযুক্ত হন এক বাঙালী। নাম হরিমোহন সেন।

'ঘাটালের কথা' নামে এই প্রস্তুত গ্রন্থটি সমগ্র ঘাটাল মহকুমা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথা। ইতিহাসের গতানুগতিক পথ অনুসরণ করিয়া এই মহকুমার শুধুমাত্র ইতিহাস রচনা করাই আমাদের অভিপ্রায় নয়। বৃটিশ আমলে সৃষ্ট এই মহকুমার ভূমিখণ্ডের প্রাচীনকাল হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত নানা পর্যায়ের মোটামুটি সামগ্রিক রূপটি এই গ্রন্থে আমাদের অক্ষম লেখনীর সাহায্যে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

মেদিনীপুর জেলার এই উত্তর-পূর্বাংশের ভূমিখণ্ড সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্ত, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৌড়বঙ্গের ইহা ছিল অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ভূমিখণ্ডের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক হইতে কলিঙ্গ, উৎকল, উড্র প্রভৃতি দেশের অবস্থিতি ছিল। রাঢ়, গৌড় ও বঙ্গদেশের রাজাদের সঙ্গে এইসব দেশের রাজাদের সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহ একপ্রকার লাগিয়াই থাকিত। মহকুমা ঘাটালের ভূমিখণ্ড রাঢ়-বঙ্গ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী হওয়ায় এই দেশের উপর দিয়া প্রাচীনকালে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। একসময় উড়িষ্যার রাজারা এই অঞ্চলে আধিপত্যও বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়রাজের প্রবলপ্রতাপে তাহা আবার গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাম্রলিপ্তরাজ্যের সন্নিকটবর্তী এবং সংলগ্ন অংশরূপেও এই ভূমিখণ্ডে তাম্রলিপ্তের সাংস্কৃতিক প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম অংশ একদিকে উড়িষ্যা ও বিহারের সীমান্তবর্তী হওয়ায় এবং এইসব অঞ্চল দীর্ঘকাল উড়িষ্যারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের এলাকাভুক্ত থাকায় ঐসব স্থান উৎকলীয় ও আদিবাসীদের রীতি-নীতি এবং

সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। ঘাটাল মহকুমার ভূমিখণ্ড ঐসব এলাকার বাহিরে থাকায় এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ স্থানে এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য মহকুমার তুলনায় ঘাটাল মহকুমার এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বিশেষভাবে, ভাষা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-বিশ্বাস, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতিতে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য যেন সহজেই ধরা পড়ে। এইসব দিক হইতে মহকুমা ঘাটালের ভূমিখণ্ডের স্বাভাবিক বিচ্ছিন্নতাবোধ মনে হয় যুগে যুগে এই দেশকে উড়িষ্যার বাহিরে রাখিয়াছে। মোগলযুগে, নবাবী আমলে, এমনকি কোম্পানির রাজত্বকালের গোড়ার দিকেও শাসকবর্গ এই দেশকে কখনও বাঙলাদেশের অন্তর্ভুক্ত সরকার মান্দারণ, কখনও বা চাকলা বর্ধমানের মধ্যে রাখিয়াছেন। এমন কি, চাকলা মেদিনীপুর বলিয়া যখন একটি পৃথক্ 'চাকলা' গঠিত হইল তখন সেই চাকলার বেশির ভাগই ছিল উড়িষ্যার অংশ। ঘাটাল মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ভূমিখণ্ড তখনও বঙ্গদেশের অন্তর্বর্তী চাকলা বর্ধমানেই রহিয়া গেল।

আমাদের এই কথা বলার উদ্দেশ্য, সমগ্র মেদিনীপুর জেলা হইতে ঘাটালের একটি বৈশিষ্ট্য ধরিবার জন্য। এই অঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এই স্বাতন্ত্র্যকে অবলম্বন করিয়াই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত এই ভূখণ্ডের স্বতন্ত্ররূপটিকে ধরিবার জন্য 'ঘাটালের কথা'য় চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। ইহা ঘাটালের শুধুমাত্র ইতিহাস নহে, সামগ্রিক আঞ্চলিক রূপটির মোটামুটি পরিচয় ইহাতে দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই সামগ্রিক রূপটি আঁকিবার জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া মেদিনীপুর জেলা ও তদন্তর্ভুক্ত এই ভূখণ্ডের বিস্তীর্ণ স্থানে আমরা ছুটিয়া বেড়াইয়াছি, বহু প্রাচীন নথিপত্র, পুথি, মন্দির-মসজিদ প্রভৃতি সরেজমিন অনুসন্ধান করিয়াছি। নদীনালা-পরিবেষ্টিত বহু দুর্গম গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছি, চলমান লোকায়ত জীবনের পরিচয় লইবার চেষ্টা করিয়াছি। দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু পরিশ্রমে যে সব উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি মূলতঃ তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ক্ষুদ্র একটি পুস্তক রচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছিলাম। স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী সুধীবর্গের উৎসাহে 'ঘাটালের কথা'কে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার আগ্রহ হইতেছিল। এই সময় ঘাটালের প্রখ্যাত সমাজসেবী, ঘাটাল বিদ্যাসাগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান সম্পাদক ও ঘাটাল পুরসভার পৌরপতি ডাঃ স্বদেশভূষণ চৌধুরী মহাশয়ের গভীর উৎসাহ ও বিশেষ চেষ্টায় এই গ্রন্থপ্রকাশের সুযোগ হইল। পেশায় চিকিৎসক হইয়াও শ্রীযুক্ত চৌধুরীর ইতিহাস ও সংস্কৃতির

প্রতি আকর্ষণ অত্যধিক। নিজভবনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থসংগ্রহ হইতে তাঁহার এই বিষয়ে অত্যধিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ ও নিজ দায়িত্বে গ্রন্থপ্রকাশনার ব্যবস্থা না করিলে ইহা প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ। এই প্রসঙ্গে দাসপুরের ডাঃ ভঞ্জহরি সামন্তের আগ্রহ ও উৎসাহও এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্পর্কে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনিও পেশায় চিকিৎসক হইয়াও আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ঐ অঞ্চলের শিক্ষা ও নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন। 'ঘাটালের কথা'র পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য তিনিও গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এই গ্রন্থরচনার উপাদান সংগ্রহের জন্য স্থানীয় বহু ব্যক্তি সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, বিশেষভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমার সময় এমন অনেক উৎসাহী ব্যক্তির সহিত পরিচয় ঘটিয়াছে যাঁহাদের সহযোগিতার কথা বিস্মৃত হইবার নয়। ইঁহাদের অনেকে আমাদিগকে নানা স্থান আগ্রহের সহিত ঘুরাইয়া দেখাইয়াছেন। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতির প্রতি ইঁহাদের অপরিসীম কৌতূহল ও আকর্ষণ লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে জয়ন্তীপুরের (চন্দ্রকোণা) শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী, নিজ নাড়াজোলের সতীশচন্দ্র খাঁন, (সম্প্রতি পরলোকগত) বরদা শোভা সিংহ-গড়ের শ্রীগগনচন্দ্র বড়দোলুই, রাধানগরের শ্রীপ্রভাত মিশ্র এবং পান্নার শ্রীবসন্তকুমার পালের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থরচনায় বিশেষ প্রেরণা দান করিয়াছেন শ্রীমতী সাধনা রায়। বাহুল্যভয়ে অন্যান্য সকলের নাম উল্লেখ করা গেল না। গ্রন্থের নানা স্থানে আরও বহু বিষয় এবং বহু কৃতবিদ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে উল্লেখ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও গ্রন্থবিস্তারভয়ে তাহা অনিচ্ছার সঙ্গে বাদ দিতে হইয়াছে।

'ঘাটাল' এই নামটি সম্পর্কে আমরা একটি কথা বলিতে চাই। 'ঘাটাল' নামটি পূর্বে 'ঘাঁটাল' নামেই চলিত ছিল। ঘাটাল দেওয়ানি কোর্টের প্রাচীন সীলমোহরেও Ghantal বা 'ঘাঁটাল' এই নামেরই উল্লেখ আছে। 'ঘাটিয়াল' কথা হইতে 'ঘাটাল' কথাটির উদ্ভব, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। ইংরেজরা উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দটিকে 'ঘাটাল (Ghātal) নামে পরিচিত করিয়াছেন। সেই হইতে 'ঘাটাল' এই শব্দটিই চলিত রহিয়াছে। আমরা এই প্রচলিত নামটিই ব্যবহার করিলাম। দুইশত বৎসর পূর্বে রেনেল সাহেব-অঙ্কিত এই অঞ্চলের মানচিত্রে Ghātal বলিয়া কোন নাম পাওয়া যায় না, তৎপরিবর্তে 'Gottaul' এই নামটি পাওয়া যায়। ইহা 'ঘাটিয়ালে'রই বিকৃত উচ্চারণ মনে হয়।

প্রস্তুত গ্রন্থে যে মানচিত্রগুলি আছে তাহাদের মূলসমূহ নানা ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। গ্রন্থে যেসব পরিসংখ্যান দেওয়া হইয়াছে তাহা Directorate of Census Operations, WestBengal কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭১ সালের District Census Handbook, Midnapur, Part XA Series 22 হইতে গৃহীত। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যথাসাধ্য পরিশ্রমের দ্বারা প্রস্তুত করা হইলেও ভুল-ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে। তাছাড়া, প্রুফ সংশোধনবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মুদ্রণাশুদ্ধি ক্ষুদিরামের ফাঁসির তারিখ। গ্রন্থে ২১শে জুলাই মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ১১ই আগষ্ট ১৯০৮ হইবে। একটি সংশোধন শেষে দেওয়া হইয়াছে। সহৃদয় ও সুধী পাঠকবৃন্দ গ্রন্থের নানা দোষ ত্রুটি আশা করি মার্জনা করিবেন এবং কোন নূতন তথ্য ও সংশোধন অন্যতম গ্রন্থকার শ্রীপ্রণব রায়ের নিকট পাঠাইলে পরবর্তী সংস্করণে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। এই মহকুমাবাসী ও বাংলাদেশের অন্যান্য সুধীবৃন্দের নিকট গ্রন্থটি সমাদর লাভ করিলে আমাদের পরিশ্রম সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

কলিকাতার "বাণীসংসদ" ও ঘাটাল "নিউ বুক স্টলে"র স্বত্বাধিকারী ও ঘাটালের নাগরিক শ্রীসত্যকিঙ্কর অধিকারী মহাশয় যেরূপ উৎসাহের সঙ্গে কলিকাতার "নিউ লক্ষ্মীশ্রী"প্রেস হইতে গ্রন্থের মুদ্রণকার্য পরিচালনা করিতেছেন তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঘাটাল মহকুমার ইতিহাস বিষয়ে তাঁহার ঔৎসুক্য আমাদের আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি এবং মুদ্রণকার্যে তাঁহার অন্যান্য সহকারিগণ সকলেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

পরিশেষে, সমগ্র ঘাটাল মহকুমা ও মেদিনীপুর জেলাবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতিপ্রেমী সর্বসাধারণের নিকট গ্রন্থটি সমাদর লাভ করিলে আমাদের এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে। ইতি—

কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা, ২০শে আশ্বিন, ১৩৮৩

বাসুদেবপুর (ন্যায়ভূষণ পাড়া) **পঞ্চানন রায়**
পোঃ—শংকরপুর (থানা দাসপুর) ও
জেলা :—মেদিনীপুর **প্রণব রায়**

প্রকাশকের নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার ইতিহাস ইতিপূর্বে রচিত হইলেও কোন জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমাকে লইয়া ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা চোখে পড়ে না। মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম একটি বৃহত্তম জেলা। এই জেলার ইতিহাস বহুকাল আগে ত্রৈলোক্যনাথ পাল ও যোগেশচন্দ্র বসু রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অন্তর্ভুক্ত বর্তমানে পাঁচটি মহকুমার কোনটিরই ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। বর্তমান গ্রন্থটিকে সেই মহকুমাভিত্তিক ইতিহাসের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে।

গ্রন্থকারদ্বয় দীর্ঘদিন ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিয়া ঘাটাল মহকুমার একটি সুবিন্যস্ত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করিতেছে সুধীমণ্ডলীর বিচার-বিবেচনার উপর। বড়ই আনন্দের বিষয় এই গ্রন্থের জন্য আশীর্বাণী দিয়াছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ভূমিকাটি লিখিয়া দিয়াছেন 'বিশ্বভারতী'র প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সুধীররঞ্জন দাস মহাশয়। ইহার ফলে গ্রন্থটির গৌরব অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি আমাদের ঋণ অপরিসীম।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিমুদ্রণের কাজ আরম্ভ হইবার কিছু পরে তাঁহার মৃত্যু আমাদিগের নিকট বড়ই বেদনাদায়ক। তাঁহার ন্যায় আদর্শ শিক্ষক ও আজীবন গবেষক এখনকার দিনে খুবই বিরল। দিনের পর দিন নিঃস্বার্থভাবে তিনি বঙ্গভারতীর যে সেবা করিয়া গিয়াছেন, নানা পত্রপত্রিকায় কবিতা, গান ও প্রবন্ধ রচনা ও কয়েকটি মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহার নিরলস সংস্কৃতি-সাধনার যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, ভাবীকালের গবেষক ও সুধীব্যক্তিগণ তাহাদের মূল্যায়ন করিবেন। গ্রন্থটি মুদ্রিত দেখিয়া যাইবার খুব ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইতে পারে নাই।

তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক শ্রীপ্রণব রায় মহাশয় গ্রন্থটির চারটি অধ্যায় ও পরিশিষ্টটি রচনা করা ছাড়াও সমগ্র পাণ্ডুলিপিটিকে আগাগোড়া সুবিন্যস্ত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রস্তুত করার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীরায় বর্তমানে চুঁচুড়ার হুগলী মহসীন কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনিও তাঁহার পিতৃদেবের

স্থায় ঘাটাল মহকুমা তথা সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক পরিক্রমা করিয়াছেন এবং সরেজমিন পরিদর্শনে নানাস্থানে বহু ঐতিহাসিক নথিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, পুঁথি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পাইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলার, বিশেষভাবে, মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন অনাবিষ্কৃত ইতিহাসের উদ্ধার, মন্দির ও তার শিল্পকলা এবং পুরাকীর্তি সম্পর্কে তাঁহার বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া তিনি যেসব মূল্যবান্ নথিপত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, বর্তমান গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' তাহাদের কয়েকটির যথার্থ অনুলিপি তিনি দিয়াছেন।

এই গ্রন্থের বেশিরভাগ আলোকচিত্র তাঁহারই গৃহীত এবং মানচিত্রগুলির সব কটিই তিনি মূল হইতে অঙ্কন করিয়া গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বরদার ঐতিহাসিক গড়টির নকশা তিনি প্রস্তুত করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করায় ইহার মূল্য আশা করি অনেকটা বর্ধিত হইয়াছে। জনসাধারণ মানচিত্রগুলির সাহায্যে এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস অনেকটা অনুধাবন করিতে পারিবেন। শ্রীরায় এই গ্রন্থের যে চারটি অধ্যায় রচনা করিয়াছেন সেগুলি হইল: ইতিহাস (২য় অধ্যায়) জনসাধারণ ও জনসমাজ (৩য় অধ্যায়), সাহিত্য (৭ম অধ্যায়), পুরাকীর্তি ও ধর্মস্থান—মঠ-মন্দির-মসজিদ (৮ম অধ্যায়) এবং মূল্যবান্ 'পরিশিষ্ট'টি তাঁহারই রচিত।

পরিশেষে নিবেদন, ঘাটাল মহকুমার শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে গত ১৯৭৬ সালে। ঐ শুভলগ্নে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য প্রদত্ত হওয়ায় এবং বর্তমানে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেছি। শত বৎসর পূর্বের এই অঞ্চলের মানচিত্রের অনুলিপিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে পারিয়া আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দ অনুভব করিতেছি। ইহার প্রচার ও সমাদর সহৃদয় ও সুধীব্যক্তিদের উপর রহিল।

ঘাটাল, মেদিনীপুর
রথযাত্রা, ২রা শ্রাবণ, ১৩৮৪

ইতি—
স্বদেশ চৌধুরী

প্রথম অধ্যায়

ভূমি ও প্রকৃতি

ঘাটাল মহকুমা মেদিনীপুর জেলার উত্তরপূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। ইহার অক্ষাংশ ২২° ৪০′ ১০″ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৮৭° ৪৫′ ৫০″ পূর্ব। এই মহকুমার আয়তন বা পরিমাণ ফল ৩৭২ বর্গমাইল। ইহার পূর্বভাগের একটি স্থানে যেখানে শিলাই নদী উত্তর দিক হইতে আগত দারকেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেইস্থান হইতে রূপনারায়ণ নদ মহকুমার পূর্ব-সীমান্ত বরাবর দক্ষিণমুখী চলিয়াছে। এই মহকুমার উত্তর ও উত্তরপূর্বে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা, দক্ষিণপূর্বের কিছু অংশ রূপনারায়ণের পূর্বতীরবর্তী হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমা, দক্ষিণে তমলুক মহকুমা এবং পশ্চিমে মেদিনীপুর সদর উত্তর মহকুমা। ঘাটাল মহকুমার পূর্ব ও দক্ষিণের সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হইয়াছে যথাক্রমে রূপনারায়ণ নদ ও কাঁসাই বা পলাশপাই খালের সাহায্যে। পলাশপাই খালটি কাঁসাই-এর একটি শাখা। ইহা কেশপুর থানার কাপাসটিকুরি গ্রামের কাছাকাছি মূল কাঁসাই হইতে বাহির হইয়া প্রথমে উত্তরমুখী, পরে পূর্ব, দক্ষিণ এবং পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই মহকুমার একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত শ্রীবরা গ্রামের পাশ দিয়া রূপনারায়ণে পড়িয়াছে।

চতুঃসীমা

এই মহকুমার মধ্য দিয়া প্রবাহিত প্রধান নদী শিলাই। ইহা মহকুমার উত্তরপশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত চন্দ্রকোণা থানার মহেশপুর (মৌজা নং ৪৮) ও গড়বেতা থানার দেওয়ান (মৌজা নং ৯০১) নামক মৌজা দুটির মধ্য দিয়া এই মহকুমায় প্রথম প্রবেশ করিয়াছে এবং চন্দ্রকোণা থানার মাঝ বরাবর উত্তর পশ্চিম হইতে আঁকাবাঁকা পথে ক্রমশ দক্ষিণবাহিনী হইয়া পরে ঘাটাল থানার দক্ষিণ প্রান্তবর্তী দেওয়ানচক (মৌজা নং ১০৬) মৌজার দক্ষিণ পার্শ্ব ও দাসপুর থানার উত্তরপশ্চিম সীমানা বরাবর প্রবাহিত হইয়া ক্রমশ উত্তরমুখী হইয়া ঘাটাল শহরের মধ্য দিয়া পরে পূর্বমুখী হইয়া শ্রীরামপুর মৌজার (মৌজা নং ২৯, ঘাটাল থানা) দক্ষিণপূর্বকোণে রূপনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। প্রধানত বাঁকুড়া জেলা হইতে পুরন্দর ও গোপা নদী দুটি বগড়ির মধ্যে

নদনদী : শিলাই ও ইহার শাখা নদীসমূহ

শিলাইয়ের সহিত মিশিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে, পরে কেটিয়া বা কেটে নদী চন্দ্রকোণা থানার ৩৪ নম্বর মৌজা লাহিরগঞ্জের কাছে শিলাইয়ের সঙ্গে মিশিয়া পরে ঐ থানারই ৭৫ নম্বর মৌজা খুরসি হইতে বাহির হইয়া বরাবর দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বমুখী হইয়া প্রথমে ঘাটাল থানার নতুক জয়কৃষ্ণপুরের (মৌজা নং ৮৫) পশ্চিমপাশ দিয়া আসিয়া শিলাইয়ের সঙ্গে বাড়গোবিন্দ ও রাধাচকের কাছে মিশিয়াছে। অপরপক্ষে, জেলার উত্তরপশ্চিম দিক হইতে আগত বুড়িগাংনদী এই মহকুমার মধ্য দিয়া পূর্বদিকে বাহিত হইয়া পরে দাসপুর থানার নাড়াজোলের কাছে এই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কুবাই নদীটিই বুড়িগাংয়ের সঙ্গে দাসপুর থানার রাইকুণ্ডু (৬) ও চণ্ডীপুর (৭) মৌজার উত্তর পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়া পরে উভয়ে নাড়াজোলের কাছে এই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এইভাবে উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খালগুলি শিলাইয়ের সহিত মিলিত হইয়া ইহার কলেবর ও জলরাশির পরিপুষ্টি করিলেও

শিলাই ও ইহার নাব্যতা

মহকুমা শহর ঘাটালের মধ্য দিয়া ইহা অতিশয় সংকীর্ণ ও কতকটা খালে পরিণত হইয়াছে। সারা বছরের মধ্যে শুধুমাত্র বর্ষাকালেই ইহা নাব্য হইয়া থাকে। ইহার নিম্নাংশে অর্থাৎ রূপনারায়ণের কাছাকাছি অল্প স্থানই জোয়ারভাঁটার প্রভাবে সারা বছর নৌ-চলাচলের যোগ্য হয়। আজ হইতে একশ বছর আগে লিখিত হাণ্টার সাহেবের Statistical Account of Bengal (Vol III), Midnapur গ্রন্থেও শিলাইয়ের এই নাব্যতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে : "The Silai is only navigable throughout the year for a short distance in its lower reaches, which are within tidal influence." (Page—24)। অতএব ঘাটালের নিকটবর্তী শিলাইয়ের নাব্যতা যে অন্তত একশবছর বা তার আগেও এখনকার তুলনায় খুব একটা উন্নত ছিল না, তা বোঝা যায়।

এই মহকুমার তথা সমগ্র জেলার পূর্বসীমানা বরাবর প্রবাহিত রূপনারায়ণ নদ উত্তরদিকে প্রবাহিত দারকেশ্বরেরই অংশ। ঘাটাল থানার দক্ষিণপূর্ব

রূপনারায়ণ

প্রান্তে শ্রীরামপুর মৌজা বা বন্দরের নিকট যেস্থানে দারকেশ্বর শিলাইয়ের সহিত মিশিয়াছে, সেইস্থান হইতেই ইহা 'রূপনারায়ণ' নাম গ্রহণ করিয়াছে। শিলাই রূপনারায়ণেরই প্রধান শাখা নদী। রূপনারায়ণ বৃহৎ নদ এবং সারা বছরই ইহার নাব্যতা থাকে। তবে মহকুমার মধ্যের কোন স্থান দিয়া ইহা প্রবাহিত না হইয়া পূর্ব-সীমান্ত বরাবর দক্ষিণমুখী হইয়া তমলুকের দক্ষিণে হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

পর্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি প্রাচীন য়ুরোপীয় নাবিকগণ-অঙ্কিত মানচিত্রে রূপনারায়ণের নানা নাম পাওয়া যায়। রূপনারায়ণ নামটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ইং ১৭৬৭ হইতে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বেনেল সাহেব অঙ্কিত বাংলাদেশের মানচিত্রে। কিন্তু তার আগের মানচিত্র সমূহে এই নদী উক্ত নামে পরিচিত ছিল না। গাশতল্দির ইং ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রে ইহা গঙ্গা, ডিব্যারোর মানচিত্রেও (১৫৫৩—১৬১৩ খ্রীঃ) ইহা গঙ্গা, কিন্তু ফান ডেন ব্রোকের মানচিত্রে (১৬৬০ খ্রীঃ) ইহার কোন নাম নাই। ভ্যালেন্টিনের মানচিত্রে (১৬৭০ খ্রীঃ) ইহা 'পাথরঘাটা' বা 'পাত্রঘাট্টা' বাউরির চার্টে (১৬৮৭) ইহার নাম 'তমালী', পাইলটের চার্টে (১৭০৩) তাম্বরলী, তাম্বলীণ প্রভৃতি ইহার নাম পাওয়া যায়।

রূপনারায়ণের প্রাচীন নাম

প্রাচীন কাল হইতে এই দেশে প্রায় প্রতিগ্রামে দেশনালা, খাল-বিল ও বড় বড় দীঘির সাহায্যে চাষবাস ও জলনিকাশের সুব্যবস্থা ছিল। সেইসব খাল বিলের বেশ কয়েকটির অস্তিত্ব আজও মহকুমার নানাস্থানে লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে কয়েকটি প্রাচীন খাল ও নদীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ঐগুলি ছাড়া আরও দুয়েকটির নাম এখানে উল্লেখযোগ্য—যেমন, পারাং, দানাই, কাঁকি। পারাং দাসপুর থানার চণ্ডীপুর (মৌজা নং ৭) ও সঙ্গারঘাই মৌজার (৮ নং) দক্ষিণ পাশ দিয়া বাহিত হইয়া পূর্বোক্ত পলাশপাই খালে পড়িয়াছে এবং কাঁকি পলাশপাই খালের একস্থানে উপর-তেমুয়ানি হইতে উত্তরমুখী হইয়া গুড়লির কাছে শিলাইয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

প্রাচীন খাল-বিল ও বেষ্টনী

এই মহকুমার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ খালগুলির নাম নীচে উল্লেখ করা হইল। ইহাদের কোন কোনটি বর্তমানে একেবারে মজিয়া গিয়াছে বা অস্তিত্ব কোন রূপে বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু পূর্বে ইহারা নাব্য ও গ্রাম-গ্রামান্তরের জল নিকাশের যোগ্য ছিল। খাল ও নালাগুলির নাম—সলাটপা, চন্দ্রেশ্বর, গোমরাই, চিংড়িমারা, কুঁদুলেঘাই, দীল্লি, গয়লা, পলাশপাই, কংকাবতী, ঝুমি, আমদা, শ্রীকান্ত, মোহনখালি, কাকদাঁড়ি, ঝুমঝুমিনালা, বাঘনালা, রঘুনাথপুর-নালা, সুরনারায়ণপুর খাল, মামাখাল (হরিরামপুর, দাসপুর থানা), হরিরামপুর খাল, নালন্দামঠ খাল, কল্মিজোড় ও বাসুদেবপুর খাল, নলখাল, কাঁকড়াখালি খাল, নারায়ণচক খাল, গুমুকপোতা খাল, চাটাই খাল, জয়রামপুর খাল, কইজুড়ি খাল (১ ও ২ নং), কল্যাণপুর, রামদাসপুর ও নিজনাড়াজোল খাল,

সাগরপুর-বারাসাত, সাগরপুর-হাটপাড়া-পশ্চিমপাড়া, কাদিলপুর, গঙ্গাপ্রসাদ, সীতাপুর, বেলতলা, দক্ষিণবাড়, ভঁসড়া ও গোরার খাল, কাটানখাল এবং হুড়হুড়ে খাল। উল্লিখিত খালগুলি ছাড়া প্রাচীন যুগের অনেক মজা বা লুপ্ত খাল এবং নদীর কিছু কিছু লুপ্ত খাতও নানাস্থানে মজা জলাভূমির আকারে আছে।

বন্যানিরোধ ও জলরক্ষার জন্য মহকুমার প্রধান প্রধান বাঁধ ও বেষ্টনীগুলির নামও উল্লেখ করা হইল ঃ

বাঁধ ও বেষ্টনী

(১) চন্দ্রকোণা পরগণায় শিলাইয়ের পূর্ব তীর বরাবর বাগপাতো (চন্দ্রকোণা থানা, মৌজা ২১২) হইতে রাধাচক (ঘাটাল থানা) পর্যন্ত ২০ মাইল ৬৮০ ফিট্ দীর্ঘ বাঁধ।

(২) **মোহনখালী বেষ্টনী** ঃ দাসপুর থানার কুলটিকরির কাছে মোহনখালি খাল ও রূপনারায়ণের সংযোগস্থল হইতে আরম্ভ হইয়া মোহনখালি বাঁধের দক্ষিণদিক বরাবর জোতঘনশ্যাম, সীতাপুর, মানুয়া হইতে পশ্চিমে বসন্তপুরের কাছে পলাশপাই খালের (দূর্বাচটী নদী) বাম দিকের বাঁধ বরাবর সাহাপুর হইতে কাশীয়াড়া ও দুধকামরা গ্রামের মধ্য দিয়া উৎপত্তিস্থলে শেষ। আয়তন ২৮ মাইল ৩২৫৮ ফিট্।

(৩) **নাড়াজোল বাঁধ** ঃ দাসপুর থানার সামাটে স্থরু এবং রামদেবপুর হইয়া চণ্ডীখালিতে শেষ। আয়তন ৭ মাইল ১৭৩৫ ফিট্।

(৪) **দুঃশ্বাসপুর বেষ্টনী** ঃ দুঃশ্বাসপুরের নিকট স্থরু কৃত্তিবাসপুরে (দাসপুর থানা) শেষ। আয়তন ১৮ মাইল ২৩৫০ ফিট্। কাঁসাই বা পলাশ-পাই খালের দক্ষিণ বাঁধ বরাবর দুঃশ্বাসপুরে আরম্ভ হইয়া নবীনবাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, মহেশপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া, পরে পটুয়া বা কাঁকদাড়ি খালের বামদিকের বাঁধ দিয়া গদাইপুর, ধানখাল হইয়া কৃত্তিবাসপুরে শেষ হইয়াছে।

(৫) **চেতুয়া বেষ্টনী** ঃ ইহাকে মহকুমার সর্ববৃহৎ বেষ্টনী বলা যাইতে পারে। আয়তন৪৫ মাইল ১৪২০ ফিট্। দাসপুর থানার মহিষঘাটা মৌজায় (নং ২২৩) মোহনখালী খাল ও রূপনারায়ণের সংযোগস্থল হইতে আরম্ভ হইয়া মোহনখালী খালের বাম দিক বরাবর দক্ষিণবাড়, গৌরীচক, গোবিন্দনগর, বসন্তপুর প্রভৃতি গ্রামের পাশ দিয়া সেখান হইতে কাঁসাই বা পলাশপাই খালের বাম দিক বরাবর পশ্চিমে মহেশপুর, গোকুলনগর, স্থরতপুর, রঘুনাথপুর, ঘাটাল-কোন্নগর হইয়া প্রতাপপুরের নিকট শিলাই ও রূপনারায়ণের সংযোগস্থল

হইয়া দক্ষিণে রূপনারায়ণের পশ্চিম তীর ধরিয়া হরিশপুর, রাণীচক, গোপীগঞ্জ হইয়া উৎপত্তিস্থানে শেষ হইয়াছে।

(৬) পান্না বেষ্টনীঃ ইহা ঘাটাল থানায় অবস্থিত। আয়তন ৯ মাইল ৩৬৪০ ফিট্। এই থানায় শিলাই নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত বাড়গোবিন্দ গ্রামের (নং ১১৫) একটি মন্দিরের নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া বাড় আনন্দি, ভাঙ্গাদহ, গোপালনগর এবং পান্নার উত্তর পাশে কাঁটাখাল বা বুড়িগাং নদীর দক্ষিণতীর বরাবর কনকপুর, ধরমপুর হইয়া উৎপত্তিস্থলে শেষ হইয়াছে।

(৭) ঘাটাল বাঁধঃ আয়তন ৫ মাইল ৫২৪০ ফিট্। ঘাটাল শহরের পশ্চিমে যেখানে আড়গড়া খাল বাহির হইয়াছে সেইখান হইতে বাঁধটি আরম্ভ হইয়া শ্যামপুর, স্থকচন্দ্রপুর, চাউলি, চাউলি-সিংপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া শেষোক্ত গ্রামে শেষ হইয়াছে।

(৮) খাসবাড় বেষ্টনীঃ ঘাটাল থানার অন্তর্গত ১৫ নং মৌজা খাসবাড়। বেষ্টনীটির আয়তন ৫ মাইল ৫২৪০ ফিট্। লালচক গ্রামে ঝুমি ও আমদা খালের বিভাগের নিকট আরম্ভ হইয়া ঝুমিখালের দক্ষিণতীর বরাবর পার্বতীচক, প্রসাদচক এবং জয়বাগ এবং সেখান হইতে খাসবাড়, সাওয়াই এবং আমোদরকুলে আসিয়া শেষ হইয়াছে।

এইগুলি ছাড়া ঘাটাল থানায় বলরামকুণ্ড ভেড়ি ও বলরামপুর বাঁধ এবং কাঁকুড়বাঁধ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রকোণা থানায় কয়েকটি ছোট বড়ো বাঁধ আছে। এই থানায় শিলাইয়ের দক্ষিণ তীর বরাবর শ্রীরামপুর-গাংচা বাঁধটি ৭ মাইল ২৬৮৬ ফিট্ দীর্ঘ। তাছাড়া হীরাধরপুর (মৌজা নং ২৭৫)-কামারগেড়ে (মৌজা নং ২৭৭) বাঁধটি শিলাইয়ের দক্ষিণতীর হইয়া পরে কেটিয়া বা খেটে নদীর পশ্চিমতীর বরাবর ঘুরিয়া কামারগেড়েতে শেষ হইয়াছে। জনসাধারণের চেষ্টা ও পরিশ্রমে আরও ছিয়াশিটি বাঁধ এই মহকুমার নানাস্থানে আছে।

এই মহকুমায় পূর্বোক্ত নদনদী ও খাল ছাড়া আরও কতকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। আমোদর একটি প্রাচীন নদী। ইহা মহকুমার একেবারে উত্তরপূর্ব সীমান্তে ঘাটাল থানার স্থলতানপুর (মৌজা নং ৫) মৌজার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণপুর, ইড়পালা, শ্যামচক, কিস্মৎ দীর্ঘলগ্রাম পর্যন্ত গিয়া উত্তর দিক হইতে আগত সাঁকরী বা শঙ্করী নদীর সহিত মনস্থখা মৌজায় মিলিত হইয়াছে। পরে উভয় নদী মিলিত হইয়া সাঁকরী নদী নামে দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী হইয়া গঙ্গাপ্রসাদ (মৌজা নং ২৮) ও শ্রীরামপুরের (২৯) পাশ দিয়া রূপনারায়ণে পড়িয়াছে। ঘাটাল শহরের উত্তরপূর্বে অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ

অঞ্চলটি আমোদর ও সাঁক্‌রী এই দুইটি নদী হইতে জাত বহু খাল-বিলে পূর্ণ এবং বর্ষায় এইসব স্থান খুবই দুর্গম ও বন্যাপ্লাবিত হইয়া থাকে। খাসবাড় বেষ্টনী ছাড়া এইদিকে আর কোন বেষ্টনী বা উল্লেখযোগ্য বাঁধ না থাকায় বেষ্টনী বহির্ভূত বহু অঞ্চলই বর্ষায় প্লাবিত হয়। ইহা ছাড়া পূর্বোক্ত পান্না বেষ্টনীর কাছাকাছি রাধাকান্তপুর মৌজার নিকট শিলাইয়ের একটি খাল উত্তরবাহিনী হইয়া শিলারাজনগরের মধ্য দিয়া ঘাটাল শহরের কৃষ্ণনগর ও গম্ভীরনগর পল্লী দিয়া চাউলিকে বেষ্টন করিয়া পূর্বোক্ত শ্রীরামপুরের নিকট সাঁক্‌রী নদীতে মিলিত হইয়াছে। পান্না বেষ্টনীর দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ কেটিয়া বা খেটে নদীর শাখা-প্রশাখায় একটি আবর্তন চক্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন শিলাই নদীর দক্ষিণ ও উত্তরাংশে বেশ কয়েকটি খাল বাহিত থাকায় এই অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা নীচু ও বর্ষায় প্রায়ই বন্যাপ্লাবিত হইয়া থাকে।

অপরাপর নদ নদী ও খাল

চন্দ্রকোণা থানার পশ্চিমাংশে মোড়াখালি খাল এবং পশ্চিম সীমান্তের কিছু অংশে দনাই খাল কিছুদূর দক্ষিণমুখী প্রবাহিত হইয়া পরে নীচের দিকে শিলাইয়ের সহিত মিশিয়াছে। ইহা চান্দুব খাল নামেও পরিচিত হইয়াছে।

এই মহকুমায় এতগুলি নদনদী ও খাল বিদ্যমান থাকায় ভূমি স্বভাবতই ইহাদের পলিতে গঠিত হইয়া সমতল ও উর্বর হইয়াছে। প্রধানত এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মৃত্তিকাই দোঁয়াশ, স্থানে স্থানে এঁটেল ও বেলে মাটিও দেখা যায়। মহকুমার পূর্বসীমায় রূপনারায়ণ নদীর তীরবর্তী ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান খুবই উর্বর এবং পশ্চিমে চন্দ্রকোণা থানার মধ্য দিয়া বাহিত শিলাই নদীর সংলগ্ন ভূমিখণ্ড ও তৎপার্শ্ববর্তী বহু স্থানই এইরূপ। বছরের বহু সময় নানা ফসল এইসব অঞ্চলে ফলিয়া থাকে। শিলাই, কাঁসাই ও রূপনারায়ণের পলিমাটিতে গড়িয়া উঠা এই মহকুমার বেশির ভাগ অংশই উর্বরভূমিখণ্ডযুক্ত এবং ধান, পাট, আখ, গম, আলু ও অন্যান্য রবি ও খারিফ শস্য মহকুমার সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবশ্য, ঘাটাল ও দাসপুরের বন্যাপ্লাবিত কিছু কিছু এলাকার কথা বাদ দিলেও মহকুমার বেশিরভাগ ভূমিই সমতল ও উর্বরশক্তি সম্পন্ন। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের মতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাথরে ও কাঁকরে গঠিত নয়। মেদিনীপুর জেলার ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এই জেলার উত্তরে হুগলি জেলার সীমা হইতে চন্দ্রকোণা ও কেশপুর থানার ভিতর দিয়া বর্ধমান রোড্ নামে পরিচিত যে পথটি মেদিনীপুর সহর পর্যন্ত আসিয়া জগন্নাথ রোডের সহিত

ভূমি

মিলিত হইয়া বালেশ্বর জেলার মধ্যে ঢুকিয়া এই জেলাকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছে, সেই পথটি জেলার দুপ্রকার ভূপ্রকৃতি নির্দেশ করে। সাধারণত লক্ষ্য করা যায় এই বর্ধমান-জগন্নাথ রাস্তার পশ্চিমদিকের মৃত্তিকা প্রস্তরময় এবং পূর্বদিকের অংশ মৃত্তিকাময়। এই রাস্তার পূর্বদিকের অংশেও দুপ্রকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—উত্তরাংশ মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ অংশ নামাল বা নীচু।

ঘাটাল মহকুমার বেশিরভাগ অংশ উক্ত বর্ধমান রাস্তার পূর্বদিকে অবস্থিত। এই রাস্তাটি বর্ধমান হইতে আসিয়া পূরে আরামবাগ মহকুমার (প্রাচীন জাহানাবাদ) মধ্য দিয়া এই জেলায় প্রবেশ করিয়া ক্ষীরপাইয়ের পশ্চিম দিক দিয়া ঝাক্‌বা, কেশপুর প্রভৃতি হইয়া মেদিনীপুর শহরের উত্তরপূর্বে উপস্থিত হইয়াছে। মেদিনীপুর হইতে ক্ষীরপাই পর্যন্ত এই রাস্তাটির দূরত্ব ২১ মাইল। হান্টার সাহেব ঠিক একশ বছর আগে এই রাস্তাটিকে জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাস্তাটি সেই সময় পাকা হইতেছিল। এই রাস্তার পশ্চিমে কিছুদূর পর্যন্ত ভূমি মৃত্তিকাময়, কিন্তু চন্দ্রকোণা শহর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্রধানত মৃত্তিকাময় হইলেও এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে মাকড়া পাথর ভূমিনিম্নে লক্ষ্য করা যায়। এই মহকুমার নামাল বা নীচু অংশ মোটামুটিভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল ঘাটাল ও দাসপুর থানার দক্ষিণের কিছু কিছু অংশ লইয়া গঠিত। উত্তর পূর্বাঞ্চল মুখ্যত শিলাই, দামোদর, সাঁকৃরি প্রভৃতি নদীর মোহনাস্থল। এইসব স্থান বর্ষায় প্রায়ই প্লাবিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে কৃষিকার্যের খুবই ক্ষতি হয়।

বনভূমি ও বন্যজন্তু (Ferae Naturae)

এই দেশের বেশির ভাগ স্থানেই নিবিড় বনভূমি বলিতে বর্তমানে কিছুই নাই। পূর্বে যাহাও বা ছিল, তাহা এখন ক্রমশ পরিষ্কার করিয়া আবাদযোগ্য ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন বৃক্ষাদি দিন দিন লোপাট হইয়া যাইতেছে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বে যে সব জন্তু জানোয়ার বনে জঙ্গলে বাস করিত তাহারাও ক্রমশ নির্বংশ হইয়া সংখ্যালঘুতে পরিণত হইয়াছে। সেকালে এদেশের বনে অনেক ভালুক ও বন্যবরাহের বাস ছিল। আগন্তুক চিতাজাতীয় বাঘের কথা কখনও কখনও শোনা গিয়াছে। শিয়াল, খ্যাঁকশিয়াল, খরগোস, ভাম, গন্ধবোকুল, উদ্‌বিড়াল, বনবিড়াল, নেউল, বেঙরাল, কাঠবিড়াল, হনুমান প্রভৃতি বন্যজন্তু এইদেশের নানাস্থানে এখনও দেখা যায়। তবে হিংস্র বাঘ, ভালুক প্রভৃতি জন্তু এদেশের ক্ষুদ্রায়তন বনে জঙ্গলে এখন আর নাই।

এই মহকুমার প্রায় সকল প্রকার ভূমিতেই যে সকল গাছ জন্মায় তাহারা জনসাধারণের চারটি প্রয়োজন মিটায়। (১) বাড়ি তৈয়ারির উপাদান (২) আহার্য (৩) ইন্ধন ও (৪) ভেষজপ্রদান। এই দেশের উত্তর ও পশ্চিমের বনাঞ্চলেই প্রথম প্রয়োজন সাধিত হয়। এই বনাঞ্চলের গাছগুলি শাল, মহুল, কুসুম, চলা (এদেশে ইহার নাম অচিন), অর্জুন, বকুল, বহড়া, হরীতকী, কেঁমুদ, শিশু, জাম, মেহ্‌গিনী, সেগুন, নিম, খিরিশ, কদম, চাকন্দা, দেবদারু প্রভৃতি। হিঁজল, আঁকড়, তাল, কাঁটাবাঁশ, ভেলকো, জাওয়া, তল্লা ও বাঁশনী বাঁশও গৃহাদি নির্মাণের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কাল হইতে কাষ্ঠতক্ষণশিল্প, গৃহের সরঞ্জাম, নৌকা, পাল্‌কি, গাড়ি প্রভৃতি নির্মাণে ঐ সব গাছ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছও ঐ কার্যে ব্যবহৃত হয়। জ্বালানী কাঠের জন্য এদেশে শিরিস, তেঁতুল, কনকচাঁপা, করঞ্জা, অশ্বত্থ, বট, পাকুড় প্রভৃতি গাছ অল্পবিস্তর সব জায়গায়ই দেখা যায়। শালের পাতা, নিম, বাব্‌লা ও শিরিসের কাঠিও মানুষের প্রয়োজনে লাগে। ইহা ছাড়া বেড়া দেওয়ার জন্য ভেরেণ্ডা, রাংচিতা, ফণী-মনসা প্রভৃতি ছোট ছোট লতাজাতীয় গাছও এই অঞ্চলের নানা স্থানে জন্মিয়া থাকে।

ভেষজ বা ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয় এ ধরণের গাছ প্রধানত গুল্মজাতীয়। ইহাদের নাম অনন্তমূল, বাসক (এদেশে বাকস্‌), তুলসীর নানা শ্রেণী, নিষিন্দা বা বেগ্‌নে, চোল্‌পল্‌তে, সোঁদাল, গুলঞ্চলতা, গ্যাঁদাল, রক্তপীচ, আকন্দ, নানা প্রকার গদগাছ, মনসা, পাঁচনের জন্য ব্যবহার্য বহু গুল্ম ও রাস্না প্রভৃতি পরগাছা, ঘৃতকুমারী, নাগদমন, আয়াপান, কালমেঘ, মুসাকানি. থানকুনি, হিংচে প্রভৃতি। এইসব গুল্মের কোন না কোনটির ভেষজগুণ আছে। নানাজাতীয় ফুলও এই মহকুমার নানাস্থানে জন্মে। তাহাদের বিষয় কৃষিব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

জীবনধারণের উপযোগী খাদ্যের জন্য তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্‌, যেমন ধান, গম, আখ, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য এবং শাক-সব্‌জির মধ্যে আলু, পটল, বেগুন, কুমড়ো, লাউ, পুঁই প্রভৃতি মহকুমার প্রায় সব স্থানেই উৎপন্ন হয়। এদেশের কৃষি ব্যবস্থা প্রসঙ্গে ইহাদের আলোচনা করা যাইবে।

গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গোরু, ভেড়া, মহিষ, ছাগল, কুকুর ও বিড়াল। শীতকালের শেষে কোন কোন জঙ্গলাবৃত স্থানে জাল পাতিয়া ও বন পিটাইয়া খরগোস শিকার করা হয়। আদিবাসীরা প্রায়ই শিকার করেন।



ঘাটাল শহর ও শিলাই নদীর 'ভাসাপুল'



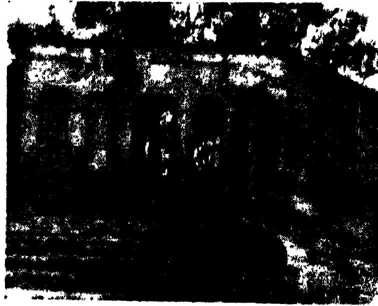
শিলাইয়ের পশ্চিম তীর হইতে ঘাটাল শহর ও 'ভাসাপুলে'র দৃশ্য



ঘাটাল পুরসভা, প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৬৯



ঘাটাল পুরসভার সামনের দিক



দেওয়ানীকোর্ট ঘাট ও চাঁদনী, ঘাটাল



শিলাই নদীর দৃশ্য



ঘাটালের একটি প্রাচীন ঘাট

এখন অবশ্য তাঁহারা অনেকে কৃষিকার্য ও দৈহিক শ্রম করিয়া থাকেন।

গৃহপালিত জন্তু

আজ হইতে প্রায় ৪০ বৎসর আগে সরকার হইতে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বহু স্থানের হনুমান ধ্বংস করা হইয়াছে।

আগে শিলাই ও রূপনারায়ণে বহু কুমীর ছিল। খালবিলেও নর ও মৎস্যভোজী দুই প্রকার কুমীর থাকিত। এখন উহারা লুপ্ত। উক্ত দুটি নদীতেই শুশুক এখনও আছে। অবশ্য তাহাদের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে।

জলজন্তু

গ্রামের জলাশয়ে দুই জাতের গোধিকা থাকে। উহারা এক পুকুর হইতে অন্য পুকুরে পানা বহন করিয়া লইয়া যায়। নেউল জাতীয় এক প্রকার গোধিকা বিষধর সর্পকুলকে খাইয়া ফেলে। কিন্তু শিকারীদের অত্যাচারে উহারা লুপ্তপ্রায়। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের দ্বারা ইহাদের রক্ষা করিলে অনেক উপকার পাওয়া যাইতে পারে। বিশেষভাবে পল্লীঅঞ্চলে সর্প দংশনের ভয় অনেকটা কমিতে পারে।

এদেশের নদীতে ভেট্‌কি, কালবুস, রুই, কাত্‌লা, মৃগেল, গাগর, বাচা, গ্রামকাটারী, তারুই, কইভোলা, বোয়াল, গল্‌দা ও নোনা চিংড়ি, গুলে, ট্যাংরা, চেঙো সারাবছরই পাওয়া যায়। নদীতে খুঁটি বসাইয়া কালবুস মাছ ধরা হয়। ইলিস ও তোপ্‌সে সাময়িক মাছ হিসাবে জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে এদেশের নদীতে

নানা জাতীয় মাছ

ধরা পড়ে। বড়ো টানা জালে বা বাচাড়ি ও কপিজালে উহাদিগকে ধরা হয়। তারুই মাছ কুঁড়াজালির মত একটি বড় জালি ডুবাইয়া তাহার উপর ঐ মাছ আসিলে হঠাৎ টানিয়া তুলিয়া ধরা হয়। ভেট্‌কি মাছ নোনা অঞ্চলে, নদী ও মাঠে হয়। রূপনারায়ণে একবার (ইং ১৯৫৪ সাল) জোয়ারের জল সরিয়া যাইবার পর চড়ায় আটক পঁচিশ সের ওজনের ভেট্‌কি ধরা হইয়াছিল। কোন পুকুর বা দীঘিতে ভেট্‌কির পোনা ছাড়িলে তাহাতে অন্য মাছ হইবার আশা থাকে না। ভেট্‌কি মাছ অন্য সব মাছ খাইয়া ফেলে এবং উহাকে ধরাও খুব শক্ত। কোনও পুকুরে বা বিলে ভেট্‌কি ছাড়িয়া উহাদের খাদ্যস্বরূপ চিংড়িপোনাও ছাড়িতে হয়। কাঁসাইয়ের কাত্‌লা পোনা ও শিলাইয়ের চিংড়ি এবং অন্যান্য হাব্‌জি পোনা পুকুর বা দীঘিতে ছাড়িয়া মহকুমার নানাস্থানে মাছের চাষ করা হয়। হাওড়ার আমতার পোনায় এদেশে মাছ ভালো হয় না। বর্ষাকালে নদীতে বান আসিলে সকল মাছেরই পোনা কাপড়ের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত জালে ধরা হয়। জোয়ারের জলে চিংড়ি পোনা পাওয়া যায়। চৈত্র হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে চিংড়ি

পোনা এবং ভাদ্রের মধ্যে অন্যান্য পোনা পুকুরে ছাড়ার নিয়ম। পোনার ডিমকে ফুটাইয়া একটু বড়ো করিলে উহার নাম হয় হাব্‌জি। উহা পুকুরে ছাড়িলে বাঁচিবার সম্ভাবনা বেশি। শাল, বোয়াল ও চিতল মাছ রুই, কাত্‌লা প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মাছ ও অন্যান্য মাছের শত্রু।

টানা গাঁতি, ঘাট গাঁতি, বাচাড়ি, ধোঁড়া, চট, চাটুনী, চাবী, মরুলা গাঁতি, কলি প্রভৃতি জালের নাম। জেলে ও অন্যান্যেরা মাছ ধরিবার জন্য এইসব জাল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঘুনি, মুগ্‌রি, ঝেঁপো, পাঙ্‌, হালুক, ঘঙা, চ্যাটাকল এবং হাঁড়িকলেও মাছ ধরা হয়। বাঁধ দিয়া জল সেচিয়া মাছ ধরার পদ্ধতিকে 'ডিঙাগাড়ী' বলে। ছিপ. হুইল, স্থতি, টাঙা, বঁড়সি এবং চারাকাঠিতেও মাছ ধরা হয়।

এই দেশের পুকুর খাল-বিলে মরুলা, পুঁটি, ট্যাংরা, চ্যালা, খয়রা, লেন্থুস, পাবদা, ল্যাঠা, শোল, শাল, চ্যাং, গুঁতে, পাঁকাল, বাণ, টেটেংরী, কই, খল্‌সে, মাগুর, সিঙ্গি, ভোলা, ঘুসো, গল্‌দা চিংড়ি, গাংদাড়া, ডানকুনে, তেচোখে, ধোবাচি প্রভৃতি ছোট মাছ জন্মে। কাঁকড়া, গেঁড়ি, শামুক ও ঝিনুক এবং রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবুস, বাটা, কুড়চিবাটা, সজনেপুঁটি প্রভৃতিও হয়। বড় বড় গুগ্‌লি বর্ষায় মাঠে-ঘাটে নানাস্থানে চরে। কচ্ছপ, কোলাব্যাঙ ও ছোট ব্যাঙ স্থলে ও জলে উভয়স্থানেই চরে। নদীর কচ্ছপ বেশ বড়ো হয়। এই দুই প্রকার কচ্ছপের মাংসই মানুষের খাদ্য। এদেশের নানান্‌ জাতীয় মাছের এক তালিকা বরদা পরগণার যদুপুর গ্রামের আঠার শতকের কবি রামেশ্বর চক্রবর্তীর প্রসিদ্ধ 'শিবায়ন' কাব্যে পাওয়া যায়।

জল ও স্থলের গর্তে নানাশ্রেণীর সাপের বাস। জলের সাপ ঢোঁড়া, জল-বোড়া ও গেঁড়িভাঙা কেলে। স্থলের সাপ শাঁখামুঠি, চন্দ্রবোড়া, বোড়া, বঙ্করাজ-বোড়া, লাউডগা, কালনাগিনী, গোখরো প্রভৃতি বিষধর। ঢ্যামনা, হেলে, মেটেলির বিষ নাই। ঢ্যামনা সাপের কামড়ে হাঁপানি রোগ সারিয়া যাইতে শোনা গিয়াছে। কেঁথো চিতি চাটিলে বিষাক্ত হয়। বিছার তিন জাতি—কালো, তেঁতুলে ও ক্যাঁকড়া। মধু লাগাইলে কিংবা বিছাতি ফল ঘসিলে বিছার বিষ নষ্ট হয়। শ্বেতকরবী ও ধন্বন্তরী গাছ ঘরে থাকিলে সাপ আসে না। গর্তবাসী ইঁদুরের বড় ও নেংটি দুটি জাতি। কালো ইঁদুরের নাম এদেশে ছুঁচুর। উহারা বিষাক্ত। ছুঁচোর চোখ নাই বলিয়া প্রবাদ। উহারা নিজ দেহের ওজনের চেয়ে বেশি খায়। আঞ্জনী, টিকটিকি ও গিরগিটি বা বহুরূপী সরীসৃপ শ্রেণীর।

সরীসৃপ ও অন্যান্য জন্তু

ক্ষেত-খামারে ইঁদুর ধানের খুব ক্ষতি করে। বহুস্থানে কঞ্চি পুঁতিয়া রাখা হয়। উহাতে রাত্রে পেঁচা আসিয়া বসে ও ইঁদুর ধরিয়া খাইয়া ফেলে।

এদেশে নানাশ্রেণীর পাখীও দেখা যায়। হল্‌দে গুঁড়ি দেখিতে খুব সুন্দর। মাছরাঙার তিনটি জাতি। সাদা মাছরাঙা পাখা নাড়িয়া শূন্যে বহুক্ষণ একস্থানে থাকিতে পারে। বর্ণালি মাছরাঙা রাত্রিশেষে সর্বপ্রথম জাগিয়া গান ধরে। ঘুঘু, সারো, রাশালিক, গুয়েশালিক, সাত ভাই, হরিয়াল, টিয়া, ঢেঁকিল্যাজা, নীলকণ্ঠ, পাতকুয়া, লক্ষ্মীপেঁচা, কালপেঁচা, বুলবুলি, ফিঙ্গে, রঙীন বনপায়রা, সবুজ বুলবুলি, কাঠঠোক্‌রা, দোয়েল, শঙ্খচিল, ডোমচিল, মাছময়ুর, বাজ বা শিকারে, গাংশালিক, কাদাখোঁচা, তিতির, শকুন, সামখোল, দুই শ্রেণীর বক ও সারস প্রভৃতি পাখীগুলি বড় এবং মাঝারি। বাবুই, চড়ুই, চাতক, টুনটুনী ও চুনচুনী ছোট পাখী। দাঁড়কাক, ছাঁচিকাক, দুই প্রকার কোকিল, বাদুড়, কলাবাদুড়, চামচিকে প্রভৃতি পরিচিত খেচর। কিন্তু এরূপ বহু খেচরের নাম অজ্ঞাত। পানকৌটি, জল, স্থল ও আকাশে সমান বিচরণপটু, ডুব সাঁতারেও দক্ষ। ডাকপাখীরা দৌড়ে নিপুণ। পায়রা, হাঁস ও মুরগী গৃহপালিত পাখী। হাঁস ও মুরগী অল্প উড়িতে পারে। পায়রার বিভিন্ন শ্রেণী আছে। পাতকুয়া পাখী কাকের মতো। পিঠের পালক লালরঙের। ইহার মাংসে প্লীহা রোগ সারে বলিয়া শোনা যায়।

পক্ষী কীট-পতঙ্গ

হল্‌দেগুঁড়ি, চুনচুনী ও বাবুই পাখীরা বাসা নির্মাণে নিপুণ। গর্তে, গাছের কোটরে ও গাছে পাখীরা বাসা করে। গর্তবাসী মাছরাঙার বাসা খুব নোংরা। কিন্তু পাখীটি সুন্দর ও সুস্বর। গরমকালে বাচ্চা জন্মানোর সময়ই পাখীরা সাধারণত বাসা করে। বাবুইয়ের বাসায় বয়নশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাদের লম্বা ও গোল দুই জাতের বাসা হয়। হলদে গুঁড়ির বাসা গদিযুক্ত ঝুড়ির মতো। টুনটুনী ও চুনচুনীর বাসা ঈষৎ লম্বা ও গোল বেগুনের মতো, ভেতরে তুলার গদি।

পতঙ্গজাতীয় কালো ভোমরা ও তাহাদেরই এক জাতি লাল গোলাকার বড় বা লম্বা টিপি বা বাসা তৈয়ারি করিয়া ডিম পাড়ে। সাধারণত বোল্‌তার বাসার নামই টিপি। উহা তাহাদের ডিমের আধার। মৌমাছি দুই শ্রেণীর—বড় জাত বৃহৎ চাক করিয়া মধু ও ডিম রাখে। ইহাদের মধু পাতলা। ছোট জাতের চাক ছোট, মধু গাঢ়। পদ্ম পুকুরের ধারের মৌচাকের মধু চোখের পক্ষে উপকারী। রাণী মৌমাছির খাদ্যরূপে মৌমাছি যে জিনিসটি তৈয়ারি করে তাহা পক্ষাঘাতনাশক ও ঔষধরূপে মানুষের

হিতকারী। বাজারে উহার দামও খুব বেশি। কেঁচোর মতো বোল্‌তা টিপিতেও মাছ ধরার টোপ হয়।

পিঁপড়ার কয়েকটি শ্রেণী এই দেশের নানাস্থানে লক্ষ্য করা যায়। গাছের পাতা জোড়া দিয়া যাহারা বাসা করে তাহাদের নাম কুরকুট। উহাদের রং লাল। ডিমে হুপিং কাসি ভালো হয়। ডিঁয়ে পিঁপড়ে দুই জাতের। এক জাতি হিংস্র, অপর জাতি অহিংস। ক্ষুদি লাল পিঁপড়ে হিংস্র। কালো অহিংস। উই ছোট ও বড়ো ঢিবি গড়িয়া উহার ভিতরে বাস করে। উহাদের চোখ নাই। উইচিংড়ে, ঘুরঘুরে, নানাজাতের পোকা ও কৃমি পাখীর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। উহারা শস্যের ক্ষতি করে। প্রজাপতির শ্রেণী অনেক। উহাদের চিত্রল শরীর আকর্ষণীয়। রেশমকীটের নাম গুটিপোকা। তুঁতপাতা উহাদের খাদ্য। এই দেশে আরও কয়েক শ্রেণীর পিঁপড়া ও পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহকুমার ভুতাত্ত্বিক ক্রম অনুসারে অঞ্চল বিভাগ:

প্রধানত শিলাই ও কাঁসাইয়ের পলিমৃত্তিকায় এই মহকুমা গঠিত হইয়াছে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেইজন্য এই অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত। বনভূমি হ্রাস পাইলেও নদনদী মণ্ডিত মহকুমার নানা স্থান ও শস্যশ্যামল ক্ষেত্র প্রকৃতির লীলানিকেতন। ভূতাত্ত্বিক ক্রম অনুসারে ইহাকে ছয়টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়: (১) অশ্মাঞ্চল (২) বনাঞ্চল (৩) বাল্বাঞ্চল (৪) নিম্নাঞ্চল (৫) সমাঞ্চল ও (৬) মিশ্রাঞ্চল। বিস্মৃত অতীতে এই স্থানের সমগ্র এলাকা জুড়িয়া যে মহারণ্য ছিল তাহার চিহ্ন মৃত্তিকার নিম্নে প্রচ্ছন্ন। উত্তরাংশের অশ্মাঞ্চল সদর মহকুমার (উত্তর) গড়বেতা পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ অঞ্চলের মৃত্তিকার নীচে স্থানে স্থানে প্রস্তরীভূত বৃক্ষকাণ্ডের অংশ দেখা যায়, আবার নিম্নাঞ্চলের গোছাতি গ্রামের (দাসপুর থানা, মৌজা নং ১৬১) ভূগর্ভে প্রায় অঙ্গারীভূত বৃক্ষরাজির সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। অশ্মাঞ্চলের সহিত মিশ্রিতভাবে উত্তর পশ্চিমে মহাকান্তার বা বনাঞ্চল শাল, মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষে পরিপূর্ণ। দাসপুর থানায় শিলাইয়ের দক্ষিণতীরবর্তী কালসাপা নামক বিস্তৃত মাঠসমেত পশ্চিমের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া বাল্বাঞ্চল। দক্ষিণপূর্বদিকে প্রায়শ নিম্নাঞ্চল, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মধ্যভাগে সমাঞ্চল শস্য ও শিল্প সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ। সমাঞ্চলের পরে বৃত্তাকারে মিশ্রাঞ্চল অবস্থিত। বিক্ষিপ্তভাবেও এই অঞ্চলের স্থিতি আছে।

অশ্মাঞ্চল, বনাঞ্চল, বাল্বাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলের কিছু অংশে কৃষি ও শিল্পাদির অসুবিধার কারণে দূর অতীত হইতে বৃত্তিহীন জাতিদের কতকজনের পেশা

ছিল শিকার, মাছধরা ও দস্যুতা প্রভৃতি। সমাঞ্চলে মানবসংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশ দেখা যায়—কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়াদির সুবিধায় এই অঞ্চলে সভ্যতা সুষমভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রস্তরীভূত একটি দন্ত এদেশে লক্ষ বৎসর আগের মানবকে জানাইয়া দেয়। কাঁসাইয়ের সন্নিহিত স্থানে প্রস্তরযুগের মানবগণ তাঁহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রাদির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের পরবর্তী বংশধর দ্রাবিড় ও অষ্ট্রীকগণ গ্রামের নাম ও ভাষায় চলিত শব্দসমূহের ভিতর দিয়া জীবন্ত। নাড়াজোল, ডানিকলা, লাওদা, ইড়পালা প্রভৃতি গ্রাম এবং কঁ্যাদাল, বাখুল, গেড়ে, ঠ্যাকা, একাশি, তাঙ্গুড়ে, রাকাড়া, ভাউলে, খেঁদাড়া, খালুই, পেথে ইত্যাদি আমাদের ভাষার প্রচলিত শব্দও দুই জাতির স্মারক। দ্রাবিড়দের পরিত্যক্ত একটি দুর্গও এই মহকুমার প্রান্তবর্তী মলিঘাটীর নিকট আছে। উহার নাম তেলঙার গড়। প্রাচীন দ্রাবিড় ও অষ্ট্রীকগণের সহিত এই দেশের সহিত সম্পর্ক ঐতিহাসিকদের বিস্ময়ের বিষয়।

ভূমি ও প্রকৃতি সকল সম্পদের আধাররূপে জীবজগতে লক্ষ্মীস্থানীয়া। ইহার মালিকানার জন্য সংগ্রামই যুগে যুগে ইতিহাসের গতি নির্ণয় করিয়াছে। ভূমি হইতে রস আহরণ করিয়া ও ইহাকে অবলম্বন করিয়া গাছপালা বাঁচিয়া থাকে। তাই উদ্ভিদ্ ভূমির প্রথম মালিক। জীবজন্তুর অনেকে উদ্ভিদ্‌ভোজী। বাসের জন্য ইহাদের অরণ্য আবশ্যক। হিংস্রজন্তুগণ প্রধানত উদ্ভিদ্‌ভোজী জন্তুগণের উপর নির্ভর করে। এই দুই শ্রেণীর জীব ভূমির দ্বিতীয় মালিক। জনসাধারণ ও রাষ্ট্র ইহার তৃতীয় মালিক। জনসাধারণ প্রধানত চারভাগে বিভক্ত :—কৃষক, শিল্পী, বণিক ও জনতন্ত্রনিয়ামক বা রাষ্ট্রপ্রধান বা জনপ্রতিনিধি। ভূমি ও প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া ইঁহারা স্ব স্ব কার্য ও সমাজের সেবা করিয়া থাকেন। তাই এই দেশের ভূমি ও প্রকৃতি সর্বাগ্রে আলোচিত হইল।

গ্রন্থপঞ্জী :

এই পরিচ্ছেদ রচনায় নিম্নোক্ত গ্রন্থের কোন কোন স্থান হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে :

(১) W. W. Hunter : A Statistical Account of Bengal, Volume III Districts of Midnapur and Hugli (1876).

(২) যোগেশচন্দ্র বসু : মেদিনীপুরের ইতিহাস, প্রথমভাগ (১৩২৮ সং)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস

'ঘাটাল' নামের উৎপত্তি :

ঘাটাল মহকুমার সদর কার্যালয় ঘাটাল শহরের নামেই মহকুমার নামকরণ হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই স্থানের নাম কি ছিল তাহা বলা কঠিন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে আবুল ফজল রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উল্লিখিত সরকার মান্দারণের অধীন এই জেলায় যে চারটি মহাল অবস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে ঘাটাল বলিয়া কোন মহালের নাম নাই। এই চারটি মহাল হইল—চিতুয়া, হাভেলি মান্দারুণ, সাহাপুর ও মহিষাদল। হাভেলি মান্দারুণের অন্তর্গত ছিল পরবর্তী কালে গঠিত চন্দ্রকোণা ও বরদা পরগণা। ঘাটাল এই বরদা পরগণার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তখনও সম্ভবত এই নামটির উৎপত্তি হয় নাই বা হইলেও আসল নামটি কি ছিল জানা যায় না। আইন-ই-আকবরী ষোল শতকের শেষাশেষি রচিত হয়।

ইহার বেশ কিছুকাল পরে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সুজার ব্যবস্থায় যখন পূর্বতন 'সরকার' বিভাগগুলির নূতন গঠন হয় তখন সরকার মান্দারণের মহাল হাভেলি মান্দারুণের অন্তর্ভুক্ত বরদা ও চন্দ্রকোণা অঞ্চল সরকার পেস্কোসের অন্তর্গত হয়। ঘাটাল নামের উল্লেখ তখনও পাওয়া যায় না। ইহার পর বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁনের সময় ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্বের নূতন হিসাব প্রস্তুত হইলে বাংলার পূর্বতন 'সরকার'গুলির পুনর্বিন্যাস হয় এবং 'চাকলা' বিভাগের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন মহালগুলি তখন 'পরগণা' নামে পরিচিত হইতে থাকে। ঘাটাল মহকুমার বর্তমান ভূভাগের বেশির ভাগ তখন চাকলা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময় সম্ভবত এই মহকুমা তিনটি প্রধান পরগণার সমষ্টি ছিল—চিতুয়া, বরদা ও চন্দ্রকোণা।

'ঘাটাল' এই নামটির সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৬৭—১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত মেজর রেনেলের মেদিনীপুর জেলার এই অঞ্চলের মানচিত্রে। কিন্তু ইহার উচ্চারণ তখন ছিল 'Gottaul' বা গট্টাল। মানচিত্রে শিলাই তীরবর্তী এই স্থানে একটি পতাকা চিহ্নিত আছে দেখা যায়। এই মানচিত্রে পরবর্তী কালের ঘাটাল মহকুমার প্রায় সমগ্র ভূভাগে চিতুয়া, বরদা ও চন্দ্রকোণা—এই তিনটি

পরগণার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। চন্দ্রকোণা পরগণার দক্ষিণপশ্চিমে বামিনভূম (Baminboom) বা ব্রাহ্মণভূম এবং পূর্বে বরদা পরগণা (Burdah) এবং তাহার উত্তরে জাহানাবাদ (Jahanabad) এবং রূপনারায়ণ নদের পূর্বে ভূরশুট (Bursuit) পরগণার নাম আছে। চিতুয়ার দক্ষিণে কুতুবপুর (Cuttupour) ও তাহার দক্ষিণে সাহাপুর (Shawpour) পরগণারও নাম আছে। রেনেলের মানচিত্র-অঙ্কনের সময়ে ঘাটাল বরদা পরগণার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ স্থান রূপে পরিগণিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়, তবে তখন ইহা ঠিক 'ঘাটাল' নামে পরিচিত ছিল না। ইহারও প্রায় একশ বছর পরে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত তদানীন্তন সার্ভেয়র জেনারেলের কার্যালয় হইতে প্রকাশিত মানচিত্রে 'ঘাটাল' (Ghatal) এই নামের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিন্তু 'ঘাটাল' শব্দটি ঠিক কোন শব্দ হইতে আসিয়াছে বা ইহার নামকরণের তাৎপর্যই বা কি সে সম্পর্কে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রায় প্রতিটি ঐতিহাসিক স্থান বা প্রসিদ্ধ নগরের নামকরণের ভিতর কিছু না কিছু অর্থ থাকে। এবং সেই অর্থ অনেক সময় স্থানীয় প্রাচীন ইতিহাস বা ঘটনার ইঙ্গিত করে। ঘাটাল শব্দটি ঠিক গোড়ার দিকে কি ছিল সে সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাইতে পারে :

বর্তমান ঘাটাল শহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত শিলাইয়ের দুইতীরে অনেকগুলি প্রাচীন ঘাট লক্ষ্য করা যায়। সেকালে এই স্থান ব্যবসায়-বাণিজ্যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল এবং শিলাইযের উপর দিয়া নৌচলাচলের বেশ সুবিধা থাকায় এইসব ঘাটে বহু বাণিজ্যতরী আসিয়া পৌঁছিত। তখন এই অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট তেমন না থাকায় শিলাই-তীরবর্তী এইসব ঘাটগুলিই লোক চলাচলের প্রধান উপায় ছিল। অতএব সহজেই মনে হইতে পারে বহু ঘাট থাকায় এই স্থান 'ঘাটাল' নামে পরিচিত হইয়াছে। ঘাট+আল (বহু অর্থে)= ঘাটাল। ইংরেজরাও ইহাকে 'Ghatal' এই নামে পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন।

কিন্তু ইংরেজদের এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের বহু আগে এই স্থানের অবশ্যই একটি নাম ছিল। এবং সেই নামটি সম্ভবত ঘাঁটিয়াল>ঘাঁটিআল> ঘাঁট্যাল>ঘাঁট্টাল (ইংরেজি উচ্চারণে ইহা Gottaul বা গট্টাল)>ঘাঁটাল এইভাবে রূপান্তর হইয়াছে। পরবর্তীকালে উচ্চারণ বা লেখার সুবিধার জন্য চন্দ্রবিন্দুটি তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ঘাঁটাল এই শব্দটিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, এখানকার দেওয়ানি আদালতের সীলমোহরে

নামটি ছিল 'Ghantal'। এই দেওয়ানী কোর্টের পার্শ্ববর্তী কাছারি ঘাটেও 'Ghantal' শব্দটি ক্ষোদিত আছে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘাটের উপর ইংরাজিতে ক্ষোদিত একটি লিপিযুক্ত মার্বেলফলক স্থাপিত হইয়াছিল। এই ফলকে H. M. Sen এবং R.. Chatterjeeর নাম ক্ষোদিত আছে। সম্ভবত ইঁহারা হরিমোহন সেন এবং রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, এখানকার পূর্বতন দুই মহকুমা শাসক। দেওয়ানি আদালতের নিকট সরবেড়িয়ার চৌধুরীঘাটে সংস্কৃতে রচিত যে শ্লোকটি একটি ফলকে ক্ষোদিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাতেও সংস্কৃতে 'ঘণ্টাল' এই শব্দের উল্লেখ আছে।

"ঘণ্টালে সকলান্ সুখেন তটিনীস্নানাম্বুপানাদিকম্
নিত্যং কারয়িতুং চতুর্ধুরিকুলোদ্ভূতেন পূতাত্মনা।
সার্দ্ধং শ্রীলশিবপ্রসাদসুধিয়া সরবেড়িয়াবাসিনা
শ্রীযুক্তেন মহেন্দ্রনাথকৃতিনা সত্তীর্থমেতৎ কৃতম্॥"

—অর্থাৎ 'সকলে যাহাতে ঘণ্টালে সুখে নদীতে স্নান ও জলপানাদি করিতে পারেন সেইজন্য সরবেড়িয়ার শ্রীমহেন্দ্রনাথ ও শিবপ্রসাদ চৌধুরী দুইজনে মিলিয়া এই ঘাট করাইয়া দিলেন।' এই ঘাটটি ১৮১৪ শকাব্দ বা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অন্যান্য আরও স্থানে ঘণ্টাল বা ঘাঁটাল শব্দের প্রয়োগ আছে কিনা তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

অতএব মনে হয় শব্দটি আগে ঘণ্টাল বা ঘাঁটালই ছিল। ঘাঁটিআল হইতেই 'ঘাঁটাল' শব্দের উৎপত্তি। পরে ঘাঁটির ই-কার লুপ্ত হইয়া পরবর্তী আ-কার পূর্ববর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া 'ঘাঁটাল' বা 'ঘাণ্টালে' পরিণত হইয়াছে। উচ্চারণের সুবিধার জন্য ঘাঁটি শব্দটি 'ঘাটি' এইরূপেও ব্যবহৃত হইত। তাহার পর 'আল' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া ঘাট্যাল বা ঘাট্টাল। রেনেলের উল্লিখিত গট্টাল বা গট্টাউল ঘাঁটিয়াল>ঘাটিয়াল হইতেই আসিয়াছে মনে হয়। অতএব বোঝা যাইতেছে আঠার শতকের শেষের দিকেও 'ঘাটিয়াল' কথাটি প্রচলিত ছিল। ঘাটালের কিছু পশ্চিমে বরদায় শোভা সিংহের বিরাট গড় ছিল এবং সম্ভবত বর্তমান ঘাটালে তাঁহার একটি সেনানিবাস বা সৈন্যদের ঘাঁটি ছিল। এই স্থান হইতেই সৈন্যসামন্ত লইয়া ১৬৯৫-১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বরদারাজ শোভাসিংহ বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। শোভাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাই হিম্মৎ সিংহ (ঘাটালের কিছু দক্ষিণে নিমতলায় তাঁহার রাজধানী ছিল) এবং চন্দ্রকোণার রাজার সম্মিলিত বাহিনীকে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বর্ধমানরাজ এই ঘাটালেই পরাজিত করিয়া এই অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য

বিস্তার করেন। Midnapore District Gazetteerএ (1911) ও'ম্যালি সাহেবও ইহা বলিয়াছেন :

"The name is said to be derived from Ghāti (meaning an outpost), Ghatal being a frontier post with a garrison, that lay between the principalities of Bāgri and Chitwa. Local tradition states that the Rājā of Burdwan defeated the allied forces of the Rajās of Chandrakona and Bardā at Ghatal in 1702. Nimtalā Ghatal, as it is used to be called, was for a long time the seat of the Zamindar of Bardā, until absorved by the Burdwan Raj".

(P. 181)

অতএব মোটামুটি সিদ্ধান্তে আসা যায়, বর্তমানে প্রচলিত 'ঘাটাল' শব্দটি গোড়ায় ঘাঁটিয়াল শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। শোভা সিংহের সময়ে সতেরো শতকের শেষ দিক হইতেই সম্ভবত এই স্থানের অভ্যুদয় হয় এবং সেই সময় হইতেই বোধ হয় 'ঘাঁটিয়াল' নামটির উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে ইংরেজি রীতিতে ইহার 'ঘাটাল' শব্দে পরিণতি ঘটিয়াছে এবং চন্দ্রবিন্দুটি অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বহু ঘাট এই স্থানে থাকার জন্য 'ঘাটাল' শব্দ হয় নাই, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত।

প্রাচীন ইতিহাস :

ঘাটাল মহকুমা খুবই ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং ইহার প্রাচীন ইতিহাস অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মেদিনীপুর জেলার উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত এই মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রাচীনকালে রাঢ়দেশের সুহ্ম বিভাগের অন্তর্ভূক্ত ছিল। জৈনগ্রন্থ 'আয়ারাঙ্গ সুত্ত' বা আচারাঙ্গ সূত্রে রাঢ়দেশের বা রাঢ়ার যে দুটি বিভাগের উল্লেখ আছে তাহা বজ্‌জ বা বজ্রভূমি এবং সুব্‌ভ বা সুহ্মভূমি। বজ্রভূমি বা ব্রহ্মভূমি উত্তর রাঢ় এবং সুহ্মভূমি মোটামুটি দক্ষিণ-রাঢ়। সে সময় দক্ষিণ-রাঢ় বলিতে বর্তমানের হাওড়া ও হুগলি জেলা এবং বর্ধমানের অধিকাংশ স্থান বোঝাইত। সুপ্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত রাজ্যও এই সুহ্মভূমির অন্তর্ভূক্ত ছিল। মহারাজ রঘু এই সুহ্মভূমির মধ্য দিয়া দক্ষিণ সাগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং যাত্রাপথে 'কপিশা' (বর্তমান কাঁসাই নদী) অতিক্রম করিয়াছিলেন। গঙ্গাভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী একেবারে দক্ষিণদিকের এই বিশাল ভূখণ্ড যে খুবই প্রাচীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জেলার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরী বা বর্তমান তমলুক একসময় এই সুহ্মরাজ্যের রাজধানী ছিল

এবং তাম্রলিপ্ত যখন একটি পৃথক রাজ্য ছিল তখন এই জেলার সমগ্র পূর্ব ও উত্তরাংশের কিছু অংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

ঘাটাল মহকুমার প্রায় সমগ্র অংশই প্রাচীন সুহ্মভূমি বা দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্বর্তী থাকায় এবং একসময় তাম্রলিপ্তরাজ্যেরও অঙ্গীভূত হওয়ায় এই অঞ্চলের সুপ্রাচীনত্ব সহজেই অনুমিত হয়। ইহা সমুদ্র উপকূলভাগ হইতে বহুদূরে অবস্থিত এবং মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনতম পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম ল্যাটেরাইট্ অঞ্চলের সংলগ্ন এলাকা। মহাভারতের যুগেও তাম্রলিপ্ত এক প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল এবং বৌদ্ধ ও মৌর্য্যযুগেও তাম্রলিপ্ত যে সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সময় এই স্থান তাম্রলিপ্ত রাজ্যের এলাকাভুক্ত থাকায় এই অঞ্চল তাম্রলিপ্ত সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবে। বৌদ্ধ ধর্মের এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্ররূপে তাম্রলিপ্ত সে যুগে পরিগণিত ছিল এবং সমগ্র তাম্রলিপ্ত রাজ্যেও এই ধর্মের ব্যাপক প্রচার হইয়াছিল। তাম্রলিপ্ত রাজ্যের নানাস্থানে অনেক ছোট বড় নগর গড়িয়া উঠে এবং সে সব স্থানে বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরও নির্মিত হয়। বহু নদনদী অধ্যুষিত তাম্রলিপ্ত রাজ্যে সে যুগে নৌচলাচল ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার যেমন একদিকে হয়, তেমনি বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে বহু বিদেশী পর্যটক ও বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণ এই অঞ্চলে পদার্পণ করিতেন। এই মহকুমার পান্না গ্রামে বহু প্রাচীন যেসব পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে ঐ স্থানে সমৃদ্ধিশালী এক প্রাচীন নগরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। পান্না গ্রামটি ঘাটাল শহরের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে শিলাই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। বিভিন্ন পুরাবস্তু ও দেবদেবীর বহু মূর্তির মধ্যে এখানে কয়েকটি বুদ্ধমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। অতএব অনুমান করা যায় বৌদ্ধ বা তৎপরবর্তী যুগে এখানের সেই বিস্মৃত নগরটিতে একদা একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং এই গ্রামের পাশ দিয়া 'দারির জাঙ্গাল' নামে বিলুপ্তপ্রায় একটি প্রাচীন রাস্তার অস্তিত্ব হইতে মনে হয় এই স্থানের সঙ্গে তাম্রলিপ্ত নগরীর যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া প্রাচীন শহর চন্দ্রকোণায় এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বৌদ্ধধর্মের যে ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। চন্দ্রকোণায় বেশ কিছু প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি ও বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের অবস্থিতি হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়। এই মহকুমার আরও অনেক স্থানে বেশ কিছু বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে সুনিশ্চিত হওয়া যায় বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী প্রভাবে এই অঞ্চলে ঐ মূর্তিগুলি নির্মিত হইয়াছিল এবং বৃহত্তর

তাম্রলিপ্তের অংশরূপে এই স্থান যে প্রাচীন কাল হইতেই সুসমৃদ্ধ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই মহকুমার প্রায় সমস্ত অঞ্চল একসময় পরাক্রান্ত গঙ্গারিডি রাজ্যের অংশ ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় সেই সময় আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্তে গঙ্গারিডই বা গঙ্গারিডি নামে এক স্বাধীন পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল এবং এখানকার বড় বড় দুর্জয় রণহস্তী শত্রুদের ভীতির কারণ ছিল। বিজয়ী গ্রীকরাজ আলেকজাণ্ডারও ইহাদের ভয়ে এই রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ঐতিহাসিকগণের মতে রাঢ়, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তিরাজ্যগুলি এই গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাঢ়ী রাজ্যের অংশ ছিল। এই গঙ্গারিডি রাজ্য তখন এক প্রবল প্রতাপশালী রাজার অধীনে শাসিত হইত।

কালক্রমে এই গঙ্গারিডি, তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম রাজ্যগুলির পতন হয় এবং এইসব অঞ্চলে উড়িষ্যার রাজাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে উড়িষ্যার চোড়গঙ্গরাজাদের আধিপত্য 'মিধুনপুর' অর্থাৎ বর্তমান মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ গঙ্গাতীরে মন্দাররাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার দুর্গনগর 'আরম্য' ধ্বংস করিয়াছিলেন। মন্দার নিশ্চিতভাবে বর্তমান মন্দারণ বা মদারণ, মধ্যযুগের সরকার মন্দারণ বা গড মন্দারণ এবং 'আরম্য' বর্তমান আরামবাগ। এই স্থানগুলি সবই ঘাটাল মহকুমার উত্তরে এবং বর্তমান হুগলি জেলায় অবস্থিত এবং সে সময় এই মহকুমার সমস্ত অঞ্চলও নিঃসন্দেহে উড়িষ্যার অধীনে আসিয়াছিল। ইহার আগে চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল একাদশ শতাব্দীতে দণ্ডভুক্তি (বর্তমান দাঁতন) রাজ্য প্রথমে জয় করিয়া পরে উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া জনপদরাষ্ট্র দক্ষিণরাঢ় বা 'তক্কনলাঢ়' জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার তিরুমলয় লিপিতে জানিতে পারা যায়। দশম শতকের শেষদিকে (৯৯১—৯২ খ্রীষ্টাব্দে) বৈশেষিক দর্শনের টীকাকার শ্রীধরাচার্যের 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থে দক্ষিণরাঢ়ের একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ভূরিসৃষ্টির উল্লেখ আছে। ইহা বর্তমানে হাওড়া জেলার একটি গ্রাম রূপনারায়ণ ও দামোদরের মধ্যবর্তী। কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকেও (১১শ—১২শ শতক) এই সমৃদ্ধিশালী গ্রামটির উল্লেখ আছে। ভূরিসৃষ্টি বর্তমানে ভূরসুট বা ভূরসিট এবং ইহা ঘাটাল মহকুমা হইতে খুব দূরবর্তী নয়।

অতএব এই সব হইতে অনুমান করা সহজ এই মহকুমা দক্ষিণ রাঢ়ের

অন্তর্বর্তী ভূভাগ রূপে প্রাচীনকাল হইতেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং মন্দার বা গড় মান্দারণ অঞ্চল নামেই পরিচিত ছিল। সেই প্রাচীনকালে ঘাটাল, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি নামগুলির যে উদ্ভব হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য। এই অঞ্চলে অবস্থিত কোন নগর বা গ্রামের উল্লেখও প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। নদ-নদী অধ্যুষিত বর্তমান ঘাটাল, দাসপুর প্রভৃতি স্থানে প্রাচীনকালে জনবসতি খুব একটা গড়িয়া না উঠিলেও দুচারটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বা ছোটখাটো শহর-বন্দর যে এইস্থানে ছিল না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। শিলাই তীরবর্তী স্থানে, বিশেষভাবে, পান্না হইতে আবিষ্কৃত গুপ্ত, পাল বা তৎপূর্ববর্তী যুগের অনেক পুরাবস্তু হইতে প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী কোন কোন গ্রাম বা নগরের অস্তিত্বের কথা সহজেই অনুমেয়।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক হইতে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এই অঞ্চলের কোন সুনির্দিষ্ট ইতিহাস উদ্ধার করা যায় না। এই সময় মুসলমান রাজত্বকালে সম্ভবত এই স্থানও গৌড়ের সুলতানদের অধীন ছিল এবং গৌড়ের স্বাধীন সুলতানদের রাজ্য দক্ষিণে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের সময়ে (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ) চাঁদ খাঁ নামে এক প্রসিদ্ধ পীর চেতুয়ায় আসিয়া বসবাস করেন বলিয়া জানা যায়। কিংবদন্তী, হোসেন শাহও নাকি তাঁহার অনুসন্ধানে চেতুয়ায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিসূচক দাসপুর থানার অন্তর্গত হোসেনপুর মৌজাটি (জে. এল. নং ২৪) নাড়াজোলের কিঞ্চিৎ পূর্বে অবস্থিত। এই থানার ডিহিচেতুয়া গ্রামে (জে. এল. নং ৪৮) চাঁদ খাঁ পীরের একটি আস্তানা এখনও বিদ্যমান। এই আস্তানার সন্নিহিত উত্তরাংশে জঙ্গলাবৃত একটি উচ্চ ভূমিখণ্ডে পুরানো বহু ইঁট ও পাথরের অংশ লক্ষ্য করা যায়। এই স্থান খনন করিলে হয়তো প্রাচীন কোন অট্টালিকা বা মসজিদের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই থানার চাঁদপুর গ্রামটিও উক্ত চাঁদ খাঁ পীরের নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল মনে হয়। ঐ গ্রামের লুপ্ত চাঁদ দীঘিও এই পীর সাহেবের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঘাটাল শহরের কোন্নগর পল্লীতে অবস্থিত কামারদের সিংহবাহিনী মন্দিরটি পনেরো শতকের শেষের দিকে (১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

উপরিউক্ত দুয়েকটি ছোট খাটো ঘটনা হইতে ঘাটাল অঞ্চলের ঐ সময়ের প্রকৃত ইতিহাস তেমন উদ্ধার করা যায় না। এই অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট ইতিহাস জানা যায় প্রধানত মোগলযুগ হইতেই। অবশ্য তার আগে পাঠান আমলে এই অঞ্চল মোটামুটিভাবে মান্দারণ সরকারের অধীন ছিল এবং গড় মান্দারণ

হইতে উড়িষ্যায় যাইবার জন্য একটি দীর্ঘ সড়ক এই মহকুমার মধ্য দিয়া গিয়াছিল। মোগল-পাঠানের আমলে এই সড়ক 'বাদশাহী রাস্তা' বা 'সাহী সড়ক' নামে পরিচিত ছিল এবং জাহানাবাদ (বর্তমানে হুগলি জেলার আরামবাগ) হইতে গোয়ালপাড়া (বর্তমান পাঁশকুড়ার কাছাকাছি) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐ রাস্তাটি দারকেশ্বর নদের তীরে তীরে চেতুয়া পর্যন্ত এবং পরে দক্ষিণপশ্চিম দিকে পাঁশকুড়া পর্যন্ত গিয়াছিল এবং সেখান হইতে মেদিনীপুর হইয়া সুবর্ণরেখার তীরে পুরী রাস্তার সহিত যুক্ত হইয়াছিল। উত্তর দিক হইতে মেদিনীপুর তথা পুরীধাম যাইবার ইহাই প্রশস্ত রাস্তা ছিল। মোগল-পাঠান যুদ্ধের সময় বাদসাহী ফৌজ বহুবার এই রাস্তায় যাতায়াত করিয়াছে। ঘাটাল শহরের প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে বরদা-চৌকান হইতে ঐ রাস্তাটি উত্তর দিকে সুলতানপুর পর্যন্ত বরাবর গিয়াছে এবং ঐ গ্রামের জলার মধ্যে রাস্তাটি শেষ হইলেও ঐ জলার স্থানে স্থানে রাস্তার কিছু কিছু অংশ পূর্বে লক্ষ্য করা যাইত। ইহা 'নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল' নামে পরিচিত। রাস্তাটি সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবাদ এই যে নন্দ কাপাসিয়া নামক উত্তরাঞ্চলের জনৈক বস্ত্র ব্যবসায়ী এই জাঙ্গালটি (বাঁধ) তৈয়ারি করাইয়া দেন। ইহাই মোগল-পাঠান আমলে এই অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ রাজপথ ছিল। বর্তমানে ইহা একপ্রকার পরিত্যক্ত ও অচল হইয়া গিয়াছে।

বর্তমান আরামবাগের সন্নিহিত গড় মান্দারণ দুর্গ হইতে আকবরের রাজস্বসচিব রাজা তোডরমল এই রাস্তা ধরিয়াই বিদ্রোহী পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁনের অনুসরণ করেন। চিতুয়া-বরদার মধ্য দিয়া দক্ষিণে দাঁতন পর্যন্ত গিয়া দাঁতনের কাছাকাছি মোগলমাড়ীর নিকট তাঁহার সহিত দায়ুদ ও পাঠান সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল এবং তাহাতে দায়ুদ পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। আবার মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও বর্ধমানের দামোদর-তীরবর্তী দামিন্যা হইতে ঘাটাল শহরের উত্তরে প্রবাহিত আমোদর নদী অতিক্রম করিয়া সম্ভবত এই রাস্তায় কিছুদূর আসিয়া শিলাই বাহিয়া ব্রাহ্মণভূম পরগণার আড়রাগড়ের রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারও পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রযাত্রাকালে সম্ভবত এই পথ তাঁহার পূত চরণস্পর্শে ধন্য হইয়া থাকিবে। সতেরো শতকের গোড়ার দিকে নববৈষ্ণবধর্মের তিন প্রবক্তা শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তমদাস ও শ্যামানন্দের মধ্যে শ্রীনিবাসাচার্য ও শ্যামানন্দ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য এই অঞ্চল পরিক্রমা করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের

গ্রামগ্রামান্তরে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য ও অনেকগুলি বৈষ্ণব মঠ মন্দির লক্ষ্য করিয়া এই কথাই মনে হয়।

ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে সুপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড় উড়িষ্যা-বিজয় করিতে যাইবার সময় সম্ভবত এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের সহিত এই দেশের কিছু কিছু পরিচয়ও হইয়াছিল। কিছু কিছু মঠ মন্দির তিনি সেই সময় এই অঞ্চলে ধ্বংস করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। চন্দ্রকোণা শহরের প্রায় দুই মাইল উত্তর পূর্বে শিলাই তীরবর্তী কালাকড়ির ঘাটটি ঐ স্থানে তাঁহার পদার্পণের স্মারক। প্রবাদ, ঐ স্থানে নদী পার হইবার সময় গঙ্গাদেবী স্বয়ং প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলে তিনি ঝাড়খণ্ডের পথে অগ্রসর হন। চন্দ্রকোণা শহরের বিখ্যাত মল্লেশ্বর শিবকে ধ্বংস করিবার পবিকল্পনাও নাকি কালাপাহাড় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেবতাকে তাঁহার ক্রূরহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুরোহিতেরা শিবলিঙ্গের উপর প্রস্তর আচ্ছাদন নির্মাণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। বেশ কিছুকাল আগে ঐ কালাকড়ির ঘাটে প্রাচীন পাকা ঘাট ও সিঁড়ি ছিল। জাড়ার দক্ষিণ দিকে কেটে খাল হইতে চন্দ্রকোণার নিকট পর্যন্ত এক সময় শিলাই নদীর বিস্তার ছিল মনে হয়। কারণ এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অংশে মাঝে মাঝে নদীমজা জলা লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত এইগুলি পূর্বেকার শিলাইয়ের খাত। ঐ জলার পার্শ্ববর্তী যে সব গ্রাম আছে সেই গ্রামগুলির কোন কোনটির মাটি খুঁড়িয়া পুকুর কাটিবার সময় নোঙর ভাঙ্গা, নৌকার তক্তা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছিল। কোন কোন স্থানে জাহাজের মাস্তুলও ছিল বলিয়া জানা যায়। চন্দ্রকোণার উত্তরে ও শিলাইয়ের দক্ষিণে বাচ্কারডাঙ্গা নামক গ্রামে একটি বিশেষ ধরণের কূপের মধ্যে প্রোথিত এক মাস্তুলকে লোকে চাঁদ-সদাগরের মাস্তুল বলিত। এইরূপ আরও বহু প্রাচীন নিদর্শনের মধ্য দিয়া এই মহকুমার প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষীণযোগসূত্রটুকু ধরিতে পারা যায়। বহু প্রাচীন রাজবংশ ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত রাজা এবং এই সব রাজবংশের সঙ্গে জড়িত নানা কাহিনী ও উপকথা এই মহকুমার নানাস্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে প্রাচীন রাজা ও জমিদারদের সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করা হইবে।

এই মহকুমার প্রাচীন ইতিহাসের গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয় সম্ভবত ভানরাজাদের রাজত্বকালে সতেরো শতকের সুরুতে। ভানরাজ্য সম্পর্কে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহন পণ্ডিতরচিত 'দেশাবলীবিবৃতি'তে আছে :

"কংসাবত্যা হি সরিতঃ শিলাবত্যা হি ভূমিপ।
উভয়ো র্মধ্যবর্তী চ ভানকো বিশ্রুতো ভুবি ॥
বকদ্বীপাৎ পূর্বভাগে মণ্ডলঘট্টস্থ পশ্চিমে।
ত্রয়োদশযোজনৈশ্চ মিতো হি ভানদেশকঃ ॥"

অর্থাৎ 'কংসাবতী ও শিলাবতী এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ ভানদেশ নামে পরিচিত। ইহার পশ্চিমে বকদ্বীপ এবং পূর্বে মণ্ডলঘাট ও ইহার বিস্তার ত্রয়োদশ যোজন পরিমিত।' বকদ্বীপ অর্থাৎ বর্তমানের বগ্‌ড়ি পরগণা ও পূর্বে মণ্ডলঘাট পরগণা ইহার সীমা ছিল। ভানদেশ 'ক্ষৌমভূমি' অর্থাৎ এই দেশে প্রচুর পট্টবস্ত্র বা রেশমবস্ত্র উৎপন্ন হইত, বিশেষভাবে পাটজাত সূত্র হইতে ক্ষৌমবস্ত্র এই দেশে প্রচুর হইত। কুলীন, অকুলীন ও মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ এই দেশে রাজা আদিশূর ও বল্লালসেন কর্তৃক আনীত হইয়া বসতি করিয়াছিলেন। এই ভানদেশে তিনটি প্রধান নগর ছিল—চন্দ্রকোণা, ভূরিশ্রেষ্ঠ ও বলিয়ার। ভূরিশ্রেষ্ঠ নগরের কথা আগেই বলা হইয়াছে। বলিয়ার নগর সম্ভবত দাসপুর থানার বর্তমান বলিহারপুর গ্রামে ছিল মনে হয়। ইহা মৌজা পুরুষোত্তমপুরের অন্তর্গত। ভানদেশে ধীবরেরাও বহু সংখ্যায় বাস করিতেন।

ভানরাজ্য

অতএব দেখা যাইতেছে, ভানদেশ সমগ্র ঘাটাল মহকুমা ছাড়াইয়া পূর্বে রূপনারায়ণ অতিক্রম করিয়া হাওড়া জেলার ভুরসিট পর্যন্ত এবং দক্ষিণে কাঁসাই নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা, ঘাটাল ও দাসপুর থানা তো বটেই, ডেবরা থানার কিছু অংশ ও রূপনারায়ণের পূর্বতীরে হাওড়া জেলার কিছু অংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য কংসাবতী বা কাঁসাই বলিতে যদি ডেবরা থানার কাপাসটিকরি হইতে মূল কাঁসাই নদীর যে শাখা উত্তরবাহিনী হইয়া পরে দক্ষিণপূর্ব দিকে 'পলাশপাই খাল' নামে দাসপুর থানার কাশীয়াড়ার (মৌজা নং ২৪৬) কাছে রূপনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে সেই নদীকে বোঝায়, তাহা হইলে ভানরাজ্যের সীমা কিছুটা সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। রেনেলের ম্যাপে বর্তমান পলাশপাই খালকে 'কাঁসাই নদী' রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব মনে হয় এই নদীটি তখন 'কাঁসাই নদী' বলিয়াই পরিচিত ছিল। এখনও কেহ কেহ ইহাকে 'কাঁসাই' বলিয়া থাকেন। তাই প্রাচীন ভানরাজ্য মোটামুটি এখনকার ঘাটাল মহকুমা লইয়াই গঠিত ছিল ইহা মনে করা যাইতে পারে।

ভানরাজ্য আনুমানিক ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে চৌহান বংশীয় বীরভান কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার আগে এই স্থানে কেতুবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন বলিয়া জানা যায়। এই কেতুবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রকেতু নামে এক রাজপুত। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী এইদেশের রাজা মল্লরাজ খয়রা মল্লের নিকট হইতে এই রাজ্য অধিকার করেন। এই দেশে চন্দ্রকেতুর আগমনের পূর্বে জরাসন্ধবংশীয় জররাজার রাজ্য উত্তরে মান্দারণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহার রাজধানী ছিল জাড়ায়। জাড়া, মহাবলা, কঙ্কাবতী প্রভৃতি স্থানে তাঁহার গড় ছিল। কিংবদন্তী, শ্রীনগরের নিকট (চন্দ্রকোণা থানা) 'রণথাকির মাঠ' নামক স্থানে তাঁহার সহিত জররাজার তুমুল যুদ্ধে জররাজা জয়লাভ করিলেও ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে তাঁহার রাজ্য চন্দ্রকেতুর হস্তগত হয়। পরে চন্দ্রকেতু পশ্চিমে বগ্‌ড়ি রাজ্য আক্রমণ করিয়া আত্মসাৎ করেন এবং মল্লভূমরাজ্যও জয় করেন এবং স্বনামে চন্দ্রকোণা নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রকোণার দক্ষিণের কিছু অংশও তিনি অনার্য চোয়াড়দের নিকট হইতে লাভ করেন এবং ব্রাহ্মণভূম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা উমাপতিদেবকে ঐ অঞ্চল দান করিয়া ক্ষেমেশ্বর শিবলিঙ্গের অর্চনার ভার দেন বলিয়া জানা যায়। ঐ ক্ষেমেশ্বরের মন্দিরটি কেশপুর থানার অন্তর্গত বর্তমানে 'নেড়াদেউল' বা 'রাঢ়া দেউল' নামে পরিচিত। কেতুরাজবংশের অধিকার দক্ষিণে ডেবরা থানার লোয়াদার পার্শ্ববর্তী কাঁসাই তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

চন্দ্রকেতু ও কেতুবংশ

রাজা চন্দ্রকেতুনির্মিত চন্দ্রকোণায় গড়ের ধ্বংসাবশেষ আজও লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান মল্লেশ্বরপুরের সন্নিহিত মল্লেশ্বর শিবমন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত ঐ স্থান 'বারদুয়ারী গড়' নামে পরিচিত। ঐ স্থানে চন্দ্রকেতু ও তদ্বংশীয় রাজারা বাস করিতেন এবং উহা হাজারিবেড় কেল্লার অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই কেল্লার মৃৎপ্রাকারের চিহ্ন এখনও লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রকেতুনির্মিত অপর দুটি কেল্লা রামগড় ও লালগড় চন্দ্রকোণা রোড্ যাইবার পথের নিকট অবস্থিত। ঐস্থানে এখন গড়ের আর কোন চিহ্ন নাই। প্রবাদ, রাজা চন্দ্রকেতুর দুই বীর সেনাপতি রামসিংহ ও লালসিংহের নামে ঐ কেল্লা দুটির নামকরণ হইয়াছিল। কেতুবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে চন্দ্রকোণায় রামজী, লালজী, মুরলীবিহারী প্রভৃতি দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অট্টালিকা ও দেবমন্দিরে চন্দ্রকোণা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। চন্দ্রকেতুর মন্ত্রী গঙ্গারাম শ্যামসুন্দরপুরে মদনমোহন বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। হাট, বাজার ও গঞ্জে চন্দ্রকোণা পরিপূর্ণ হয় এবং বহুপ্রকার ব্যবসায়-বাণিজ্যে চন্দ্রকোণা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর শিবের সেবাইতদের নিকট রক্ষিত ১২০৯ সালের



চাঁদ খাঁ পীরের আস্তানার অভ্যন্তরভাগ,
দাসপুর



'লালগড়' দুর্গের একাংশ, চন্দ্রকোণা



রাধানগরের (ঘাটাল) প্রাচীন আর্মাণী লিপি



রেশমকুঠির চিম্‌নি, কুঠিবাজার, ঘাটাল



শোভাসিংহগড়ের একাংশ, বরদা



কুঠিয়াল সাহেবের প্রাচীন বাসগৃহ, ঘাটাল
(মহকুমা শাসকের বর্ত্তমান কার্যালয়)



চাঁদ খাঁ পীরের আস্তানা, ডিহিচেতুয়া (দাসপুর)



লালগড়ের (চন্দ্রকোণা) নবাবিষ্কৃত কামান



বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির, বীরসিংহ

একখানি তায়দাদ হইতে জানা যায় চন্দ্রকেতু হইতে মোট পাঁচ পুরুষ এই কেতুবংশের রাজা ছিলেন। মল্লেশ্বর শিব চন্দ্রকেতুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানা যায়। তাঁহার পুত্র 'করভসণ্ড' বা 'কবব সণ্ড' জয়কেতু, তৎপুত্র পুষ্পকেতু ও শেষ রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রকেতু মোটামুটি ১৫০ বছর ধরিয়া চন্দ্রকোণায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব ভানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ১৫০ বছর আগে পনেরো শতকের একেবারে গোড়ার দিকে এই কেতুবংশীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহা অনুমান করা যায়।

ভানরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বীরভানু জগন্নাথধাম পুরী যাইবার পথে শেষ রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রকেতুকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এই রাজ্য জয় করেন বলিয়া জানা যায়। কথিত আছে, তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের অধিবাসী ছিলেন এবং পূর্বোক্ত 'সাহী সড়ক' দিয়াই এই দিকে আসিয়াছিলেন। তখন সমগ্র বঙ্গদেশে মোগল-পাঠানের তুমুল বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় এই অঞ্চলে ছোট-খাটো বহু জমিদার কয়েকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসিংহ নামে জনৈক ব্যক্তি এই গোলযোগের সুযোগে কর্ণদুর্গ ও বরদাভূমি দখল করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামটি বোধ হয় সেই বীরসিংহের স্মৃতিসূচক। বীরসিংহের ভাই হেমসিংহ বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের তীরে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন।

বীরভানু সিংহও সম্ভবত এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে দ্বিতীয় চন্দ্রকেতুকে পরাজিত করিয়া প্রাচীন সাহী সড়কের পার্শ্ববর্তী কেতুবংশীয়দের 'মহাবলা' দুর্গটি অধিকার করেন। বর্তমানে 'মহাবলা' নামে একটি গ্রাম ঐ স্থানে আছে (চন্দ্রকোণা থানা, মৌজা নং ১৫৩) এবং নিকটবর্তী একটি স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ স্থানটি বীরভানপুর নামে পরিচিত হয়। ইহা এখন চন্দ্রকোণা থানার ২০৭ নং মৌজা। পরে তিনি শিলাই অতিক্রম করিয়া দুর্বল দ্বিতীয় চন্দ্রকেতুকে সহজেই পরাজিত করেন এবং সমগ্র কেতুরাজ্য দখল করেন। কিংবদন্তী, চন্দ্রকেতু তাঁহাকে বাধা না দিয়া 'জহরব্রত' অবলম্বন করিয়া সবংশে নিহত হন। চন্দ্রকোণায় 'জহরে পুকুর' নামে যে পুষ্করিণীটি আছে, শোনা যায়, ইহাতেই নাকি চন্দ্রকেতু সপরিবারে ডুবিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কালাপাহাড় উড়িষ্যাবিজয় যাত্রাকালে এই দিকে আসিলে চন্দ্রকেতু (২য়) দারুণ ভয় পাইয়া এই জহরব্রত পালন করিয়াছিলেন।

এইভাবে বীরভানু কর্তৃক এই দেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশাল

ভান-রাজ্যের উদ্ভব হয়। ইহার চারপাশের সীমা পূর্বেই বলা হইয়াছে। চন্দ্রকোণার অযোধ্যাপল্লীর রঘুনাথবাড়ির লালজীউর মন্দিরে রক্ষিত একটি বৃহৎ শিলালিপিতে (শিলালিপিটি এই গ্রন্থের 'পুরাকীর্তি' নামক পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে) এই বীরভান, তাঁহার পুত্র হরিনারায়ণ এবং হরিনারায়ণের পুত্র মিত্রসেনের নাম আছে। বীরভানের পুত্রবধূ হরিনারায়ণের পত্নী রাণী লক্ষ্মণাবতী ১৫৭৭ শকাব্দে বা ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লালগড়ে গিরিধারী লালজীউর যে নবরত্ন মন্দিরটি তৈয়ারি করাইয়াছিলেন ইহা তাহারই লিপি। এই সময় হরিনারায়ণ জীবিত ছিলেন না, কারণ তখন তৎপুত্র মিত্রসেন রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া লিপিতে উল্লেখ আছে। অতএব ইহা হইতে সহজেই ধরিয়া লওয়া যায় বীরভান এই মন্দির প্রতিষ্ঠার অন্তত ১০০ বছর আগে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'তুজুক্-ই-জাহাঙ্গিরী'তে বীরভানের পুত্র হরিভানকে বিদ্রোহী বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও 'পদিশানামা'তে তাঁহাকে বাদশাহের পাঁচশত সৈন্যের মনসবদার নামে চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় প্রথমে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও পরে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিষী রাণী লক্ষ্মণাবতী মল্লরাজ হোলরায়ের কন্যা ও নারায়ণমল্লের ভগিনী ছিলেন। ইহা হইতে জানা যায় চৌহানবংশীয় ভানরাজাদের সঙ্গে মল্লভূমের মল্লরাজদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল।

'বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী' গ্রন্থে চন্দ্রকোণার চন্দ্রভান নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আমলে মোগল সৈন্যের বাংলা অভিযানের বিবরণ আছে। ইহাতে দেখা যায় সে সময়ে বরদার নাবালক জমিদার দলপতের সঙ্গে এই চন্দ্রভানের নিকট আত্মীয়তা ছিল। সতেরো শতকের গোড়ার দিকে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অতএব মনে হয়, এই চন্দ্রভান হরিভানের কোন আত্মীয় বা ভাই ছিলেন। ইঁহার নামে গড়বেতা থানায় চন্দ্রভানপুর নামে একটি মৌজাও আছে (নং ৯১৮)। হরিভানের নামে চন্দ্রকোণা থানার হরিনারায়ণপুর (মৌজা নং ১৬৪) ও হরিসিংপুর (নং ১১৭) নামে দুটি মৌজা বর্তমান। কেহ কেহ চন্দ্রভানকে হরিভানের পুত্র মিত্রসেনের পরবর্তী কোন রাজা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু উক্ত 'বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী' গ্রন্থ অনুসারে চন্দ্রভান হরিভানের সমসাময়িক হইয়া পড়েন। মিত্রসেন নিঃসন্তান ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁহার মৃত্যুর পর এই রাজ্য তাঁহার মাতুলবংশীয় মল্লরাজার এলাকাভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে শোভাসিংহের

বিদ্রোহে (১৬৯৫—১৬৯৬ খ্রীঃ) চন্দ্রকোণার রঘুনাথ সিংহ নামে যে রাজা যোগদান করিয়াছিলেন তিনি সম্ভবত মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ হইবেন।

রাজা হরিভান বা হরিনারায়ণের সময়ে চন্দ্রকোণা খুবই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। নানা দেশ হইতে এই সময় বহুলোক এই স্থানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। চন্দ্রকোণার কিছু দূরে ব্রহ্মপুরী (বর্তমানের ব্রহ্মঝাড়ুল) নামে একটি গ্রাম আছে। ইহাতে আগে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। বর্ধমানের অন্তর্গত নিলুটপাষণ্ডাগ্রাম নিবাসী নানা শাস্ত্রবিৎ ও ক্রিয়াকাণ্ডে অভিজ্ঞ পণ্ডিত রামভদ্র বাচস্পতিকে এই স্থানে আনাইয়া এবং তাঁহাকে ৩৬৫ বিঘা নিষ্কর জমি ও ৩৬৫ খানি গ্রামের হোত্রাচার্যের অধিকার দিয়া রাজা হরিনারায়ণের দেওয়ান রামজীবন মুখোপাধ্যায় বাস করাইয়াছিলেন। বাং ১০১৪ সালের একটি সনন্দে তাঁহাকে ঐরূপ হোত্রাচার্যবরণকর্মে নিয়োগের উল্লেখ আছে।

রাজা হরিনারায়ণের পুত্র মিত্রসেন চন্দ্রকোণার মৃৎপ্রাচীর বেষ্টিত দুর্গটি তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। সেই সময়ও চন্দ্রকোণার বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার নামাঙ্কিত মিত্রসেনপুর নামক একটি পল্লী চন্দ্রকোণায় আজও বর্তমান আছে। সেকালে এইস্থানে বহু তাঁতির বাস ছিল এবং তাঁহাদের কাপড়ের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত ছিল। সন ১০৭৬ সালের নাগরী অক্ষরে লিখিত একটি সনন্দে "শ্রীমহারাজা রাজা মিত্রসেনজী"র উল্লেখ আছে। এই সনন্দটি চন্দ্রকোণা-গোসাঁই বাজারের শ্রীযুক্ত রাধারমণ সিংহ মহাশয়ের নিকট রক্ষিত আছে।

ভানরাজাদের রাজত্বকালে সমৃদ্ধির দিনে চন্দ্রকোণা এতই জনবহুল ও বাজারপাট ও দোকানে পরিপূর্ণ ছিল যে লোকে বলিত, "বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি তবে জানবি চন্দ্রকোণা এলি"। এখানকার ভায়ের বাজার, খিড়কি বাজার, বড় বাজার, নূতন বাজার, সমাধি বাজারের নাম এখনও শোনা যায়। ইহা ছাড়া ইলাম বাজার, গোসাঁই বাজার প্রভৃতি এখনও আছে।

রাজা মিত্রসেনের পর মল্লরাজবংশ এই চন্দ্রকোণার শাসনভার প্রাপ্ত হন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আঠার শতকের গোড়ার দিকে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র মল্লভূমি জয় করিয়া চন্দ্রকোণা তাঁহার রাজ্যের এলাকাভুক্ত করেন। সেই সময় এইখানের কীর্তিস্তম্ভের ক্ষতি হয় এবং লালগড়, রামগড়, রঘুনাথগড় আক্রান্ত হইয়া বিধ্বস্ত হয়। তাঁহার প্রায় ১০০ বছর পরে বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের পুত্র তেজশ্চন্দ্র এখানকার প্রাচীন মন্দিরগুলির সংস্কার করেন।

বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রকর্তৃক এই মহকুমার বহুলাংশ বিজিত হইযার পূর্বে চেতুয়া ও বরদা পরগণায় এক ক্ষুদ্র রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র রাজবংশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন শোভা সিংহ। এই রাজ-বংশের উদ্ভবের ইতিহাস আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের শেষদিকে এই বংশের পরাক্রান্ত রাজা শোভা সিংহের অভ্যুদয় ঘটে এবং ঔরঙ্গজেবের তদানীন্তন শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রোহ ও বর্ধমান অভিযান এক ঐতিহাসিক ঘটনায় পর্যবসিত হইয়াছে।

ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষদিকে ঘাটাল অঞ্চলের ছোট বড় কয়েকজন জমিদার মোগল সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে কতকটা স্বাধীনভাবে চলিতে থাকেন। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক হিন্দুদের মধ্যে জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তন এইসব স্বাধীনচেতা জমিদারের নিকট অসহ্য হইয়া উঠে। সেই সময় এই অঞ্চলের জিজিয়া কর ও রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচন্দ্রের পিতামহ চৌধুরী কৃষ্ণরাম রায়ের উপর। এই বর্ধমান জমিদার বংশ ইতিপূর্বেই ঔরঙ্গজেবের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া জমিদারী প্রভৃতি অর্জন করিয়াছিলেন। চৌধুরী কৃষ্ণরাম রায় রাজস্ব আদায়ের ভার পাইয়া শোভা সিংহ ও এই অঞ্চলের অন্যান্য জমিদারের নিকট পরওয়ানা পাঠাইলে শোভা সিংহ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ফেরৎ দিলে তদানীন্তন ঢাকার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁনের কাছে এই সংবাদ পাঠান হয়। এদিকে শোভা সিংহ চন্দ্রকোণার জমিদার, বিদ্রোহী পাঠান রহিম খাঁ প্রভৃতির সাহায্যে বর্ধমানের দিকে অভিযান করিয়া প্রথমে হুগলীদুর্গ অধিকার করিয়া পরে বর্ধমানে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণরামকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন। এইভাবে গঙ্গার পশ্চিম তীরের এক বিস্তীর্ণ এলাকা তাঁহার অধিকারে আসে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার অকালমৃত্যুতে এই অভিযান স্তিমিত হইয়া পড়ে। অবশ্য, পরে শোভাসিংহের কাকা মহাসিংহ ও ভাই হিম্মৎ সিংহও এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ্রোহের গতি কতকটা লুঠতরাজের দিকে মোড় নেওয়ায় এবং রহিম খাঁনের অযোগ্য নেতৃত্বাধীন হওয়ায় তাহা প্রশমিত হইয়াছিল। বিদ্রোহীরা বিতাড়িত হইয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হিম্মৎ সিংহ ঘাটালের দক্ষিণে শিলাই তীরে হেমন্তনগর (বর্তমানে নিমতলা) নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। জানা যায়, আঠারো শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ মহম্মদ শাহের মোহরাঙ্কিত হইয়া কীর্তিচন্দ্রকে একটি

সনন্দ প্রদত্ত হয় এবং তাহাতে চন্দ্রকোণা, বরদা, চিতুয়া প্রভৃতি স্থান তাঁহার জমিদারীর এলাকাভুক্ত হয় বলিয়া জানা যায়। এই সনন্দে পূর্বোক্ত বিদ্রোহের কিছু কিছু উল্লেখ আছে। চন্দ্রকোণা অবশ্য ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারী বন্দোবস্তের সময় বর্ধমান জমিদারীর তালুকরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

শোভা সিংহের পূর্বপুরুষ রঘুনাথ সিংহ ষোড়শ শতকের শেষদিকে বিষ্ণুপুর রাজ্য অথবা বাংলার পশ্চিম প্রান্তের কোন স্থান হইতে চেতুয়ায় উপস্থিত হইয়া রাজনগর গ্রামের নিকটবর্তী এক স্থানে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বাস করেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কানাই সিংহ চন্দ্রকোণার রাজবংশীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে চেতুয়া ক্রয় করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ঋণদায়ে কানাই সিংহের নিকট হইতে চেতুয়ারাজ্য বরদার ভূস্বামী ফতে সিংহের নিকট হস্তান্তরিত হয়। কানাই সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দুর্জয় সিংহ পরে চেতুয়া উদ্ধার করেন। এই দুর্জয় সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শোভা সিংহ ও কনিষ্ঠ পুত্র হিম্মৎ সিংহ। বরদা রাজ্য পরে শোভাসিংহের হস্তগত হয় এবং তিনি এই স্থানে বিশাল গড় ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। চেতুয়া-রাজনগরে অবশ্য তাঁহার রাজধানী ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহার আর কোন চিহ্নই নাই।

শোভা সিংহ ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ চেতুয়ার খুবই উন্নতি করিয়াছিলেন। দুর্জয় সিংহের সময় গড় মান্দারণ হইতে আগত জনানন্দ দাস রাধাকান্তপুরে তাঁহার গড়বাড়ি তৈয়ারি করেন। তিনি বর্তমান দাসবংশের পূর্বপুরুষ। দাসপুরের চৌধুরী বংশের বঙ্গরাম চৌধুরী শোভাসিংহের দেওয়ান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। দুর্জয় সিংহের সময়ে 'চেতুয়া সমাজ' গঠিত হয় এবং গ্রাম গ্রামান্তরের উন্নত ও মহৎ ব্রাহ্মণবংশীয়গণকে তিনি নানা প্রকার মর্যাদা দান করেন। অনেক গ্রামেরই দেবতা, ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ প্রভৃতি জাতীয়গণকে তিনি দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও মহাত্রাণ নিষ্কর ভূমি দান করেন এবং বিশ্বস্ত কর্মচারীদিগকে জায়গীরদানে সম্মানিত করেন। তিনি স্বীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপন করেন এবং বাগ্‌দি প্রভৃতি কয়েকটি জাতির ভিতর সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রেরণাসঞ্চার করেন। এই বাগ্‌দিগণ তাঁহার পাইক ও সৈন্যদলভুক্ত ছিল। তাঁহার পুত্র শোভাসিংহও সৈন্যদল সংগঠন, রাস্তা ঘাট নির্মাণ এবং নৌচলাচলের সুবিধার জন্য খাত, প্রণালী প্রভৃতি খনন করাইয়াছিলেন। রাজনগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত কাঁকী খালটি তিনিই খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহার ফলে নৌযোগে বরদায় যাওয়া সহজ

হইয়াছিল। সৈন্যবাহিনীর চলাচলের জন্য রাজনগর হইতে ঘাটাল অবধি একটি রাজপথও তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বরদার প্রসিদ্ধ দেবী বিশালাক্ষী শোভাসিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। পূর্বে এই দেবীর মন্দির শোভা সিংহের গড়ে বর্তমান ছিল। চেতুয়া ও বরদায় এই সিংহবংশের কীর্তির স্মারক অনেকগুলি গ্রাম এখন বর্তমান—যেমন, রঘুনাথপুর, শোভাগঞ্জ, হেমনগর, হেমন্তপুর, হেমৎপুর, সিংহডাঙ্গা, সিংহচক, দুর্জয়ধাম প্রভৃতি। এই মহকুমার নানা স্থানে এই গ্রামগুলি বর্তমান। ঘাটাল থানার অন্তর্গত মহারাজপুর গ্রামটিও এই সিংহবংশের কোন রাজার স্মারক। এই থানার হরিনগরের (হরিনাগেড়িয়া) হাজারীগণের পূর্বপুরুষ বৃন্দাবন হাজারী শোভা সিংহের সেনাপতি ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

চিতুয়া পরগণা পূর্বে একটি 'মহাল' ছিল, ইহা আগেই বলা হইয়াছে। বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী এই স্থান বলিয়া আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার নামকরণ সম্পর্কে জানা যায়, পূর্বে বগড়ি অঞ্চলের চৌহানরাজ চেৎ বা চিত্রসিংহ আচরাজ পঞ্চম রাজত্ব করিতেন। ইহার রাজ্যকাল ১৫৪০—১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার সেনাপতি ছিল বীর দলেশ সিংহ। দলেশ সিংহ এই স্থানের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া চেৎ বা চিত্রসিংহের নামানুসারে চেতুয়ার প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘাটাল অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস বলিতে উপরিউক্ত রাজা-জমিদারদের ইতিহাসকেই শুধু বোঝায় না। এই অঞ্চলে সেকালে কিছু কিছু গরীব গণ-বিদ্রোহও দেখা দিয়াছিল। ইহাকে ইংরেজরা 'চোয়াড় বা চুয়াড়-বিদ্রোহ' এইরূপ আখ্যা দিয়াছেন। শোভা সিংহের বিদ্রোহের ১০০ বছরেরও বেশি পরে ১৭৯৮—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে চোয়াড়দের মধ্যে যে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয় তাহাই 'চোয়াড় বিদ্রোহ' বা 'Chuar Rebellion' নামে পরিচিত। এই মহকুমার পশ্চিমাংশে চন্দ্রকোণায় এই বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল। চোয়াড়গণ মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহালের অধিবাসী। তাহারা কৃষিকার্য, পশুপক্ষী শিকার এবং জঙ্গল মহলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সম্পূর্ণ ভার পাইলেন। তাহার পরের বৎসর ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি স্থির করেন যে মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিমভাগে জঙ্গলমহলে সৈন্য পাঠাইয়া সেই সকল স্থানের অবাধ্য জমিদারদের রাজস্বপ্রদানে বাধ্য করিবেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত

প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই জঙ্গল মহালের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক দারুণ বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে। এই জমিদারদের অধীনে ছোট ছোট বহু কৃষক জমি ভোগ করিতেন। তাঁহারা তৎপরিবর্তে জমিদারদের পাইক বা নায়েকের কাজ করিতেন। ইংরেজরা তাঁহাদের জমিগুলিও কাড়িয়া লইয়া তাহাতে উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য করিলেন। ইহাতে সেই সমস্ত কৃষকও বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন।

এই মহকুমার নানা স্থানে সেইসব কৃষকের বিদ্রোহের নেতা ছিলেন গোবর্ধন দিক্‌পতি। তিনি এইরূপ বহু বিদ্রোহী কৃষকদের লইয়া ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রকোণা আক্রমণ করিয়া ক্রমশ মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হন। কর্ণগড়ে রানী শিরোমণির দুর্গে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই বিদ্রোহ পরিচালনা করিতে থাকেন। পরে ইংরেজরা কঠোর হস্তে তাহাদের দমন করেন।

জানা যায়, গোবর্ধন দিক্‌পতি চেতুয়ার উত্তরধানখালের বাসিন্দা ছিলেন। চুয়াড়বিদ্রোহ ছাড়াও এই মহকুমার ক্ষীরপাইয়ে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একদল সন্ন্যাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইহা 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের নানা স্থানে সেই সময় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। এই সমস্তই এদেশে ইংরেজদের রাজ্য অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক গণজাগরণের পরিচায়ক।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও চুয়াড় হাঙ্গামাব আগে এই অঞ্চলের বেশ কিছুস্থানে বর্গীর হাঙ্গামা খুবই ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছিল। বর্গীরা দলে দলে আসিয়া এই অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। চন্দ্রকোণা ক্ষীরপাই, রাধানগর, খড়ার, চণ্ডীপুর, শ্যামপুর প্রভৃতি স্থানে বর্গীর অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাহাদের অত্যাচারে বহু গ্রাম দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গঙ্গারামরচিত 'মহারাষ্ট্র-পুরাণে' বর্গীদের এই অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যের কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধার করা হইল :

"কারু হাত কাটে কারু কাটে নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরাণ॥
······তবে কোন ২ গ্রাম বরগী দিল পোড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম শুন মন দিয়া॥
চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর আর দিখগপুর।
খিরপাই খোড়ার আর বদ্ধমান সহর॥

নিমগাছি সেড়গাঁ আর সিমইলা।
চণ্ডীপুর শ্যামপুর গ্রাম আনাইলা॥
এই মতে বর্দমান পোড়াএ চহির ভিতে।
পুনরপি আইলা বরগী বন্দর হুগলীতে॥"

এই সময় বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে যাঁহারা নিজেদের ভিটা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বাস্তুর 'আমলনামা' দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ একটি আমলনামার নকল নিম্নে উদ্ধার করা হইল:

"শ্রীহরি.স্মরণং

ইয়াদিকীর্দ্দ শ্রীহরিনারায়ণ প্রতীহার সচ্চুদারচরিতেষু লিখনং কার্যঞ্চাগে মৌজে চন্দননগর তরফ রাধানগর তপ্পেশ বরদা সরকার মান্দারণ মৌজে মজকুরে তোমার সাবিক সহস্তরদ বাটী ছিল বরগীর হাঙ্গামায় ওয়রান হইয়াছে এখন তুমি পুনরায় বাটী করিবে সাবিক ভিট্যা তোমাকে অসম্পস্থ হইল অতএব সম্পস্থ মাফিক তাহার এওজ শ্রীজীবন সামুই্র পলাতক ভিট্যা এক ভিট্যার সামিল জমী /৩ কাঠা কালা সহিত এক ভিট্যার সামিল সামুই মজকুরের আমল বৃক্ষ আদি এক গেড্যা এক সমেত তোমাকে বসত করিতে দিলাঙ...ইতি সন এগার সত্ত চোওয়ন্ন সাল তা ২০ বিশা কার্ত্তীক..."

বহু তায়দাদে এই হাঙ্গামার কথা আছে। নবাব আলীবর্দীর আমলে (১৭৪০—১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ) এই বর্গীর হাঙ্গামা হইয়াছিল। সেই সময় এক ধরণের পোড়ামাটির শক্ত শক্ত ছোট বাঁটুল বর্গীরা ব্যবহার করিত। এই দেশে এখনও মাটির মধ্য হইতে এইরূপ বাঁটুল বাহির হয়।

বর্গীর হাঙ্গামার মতো ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের 'নায়েক হাঙ্গামা' এই মহকুমার অঞ্চলকে কতখানি প্লাবিত করিয়াছিল তাহা বলা কঠিন। নায়েক হাঙ্গামা কতকটা চুয়াড় বিদ্রোহের মতো। অবশ্য এই হাঙ্গামা প্রধানত বগড়ী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিলেও চন্দ্রকোণার কিছু কিছু স্থানেও ইহা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল। একমাত্র বর্গীর হাঙ্গামা বাদ দিলে উপরিউক্ত এইসব হাঙ্গামাকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে স্থানীয় গণজাগরণ আখ্যা দেওয়া যায়। সাধারণ দরিদ্র কৃষকদের জমির উপর অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তদানীন্তন ইংরেজ সরকার নিজেদের স্বার্থে যে অন্যায় বিধিব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছিলেন এইসব হাঙ্গামায় তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বহু পরবর্তীকালে সেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এই দেশে যে ব্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলন দেখা দেয় তাহা এই ঐতিহ্যেরই বাহকমাত্র।

মুসলমান ও ইংরেজ আমলে মেদিনীপুর ও ঘাটাল অঞ্চল :

ঘাটাল অঞ্চলের একটি মোটামুটি নির্দিষ্ট আয়তন প্রথম জানিতে পারা যায় আকবরের রাজত্বকালে, যখন তাঁহার রাজস্ব সচিব তোডরমল্ল সমগ্র বাংলাদেশকে কয়েকটি সরকার ও প্রতিটি সরকারকে কয়েকটি মহালে বিভক্ত করেন। বাংলাদেশের ১৯টি সরকারের মধ্যে সরকার মান্দারণ ১৬টি মহাল লইয়া গঠিত হইয়াছিল। তার মধ্যে ৪টি মহাল বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় পড়ে। ইহাদের নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চিতুয়া ও হাভেলি মান্দারণ এই দুটি মহালের সমবায়েই আমাদের এখনকার ঘাটাল মহকুমা গঠিত। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার বেশির ভাগ অংশই তখন উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল এবং উড়িষ্যার সরকার জলেশ্বরের ২৮ টি মহালের মধ্যে ২০টি মহালই বর্তমান মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ছিল। উল্লেখ্য, বগ্‌ড়ি তখন সরকার জলেশ্বরের একটি মহাল ছিল এবং চন্দ্রকোণার কিছু অংশও তখন বগ্‌ড়ি মহালের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার পর সুলতান সুজার আমলে রাজস্বের নূতন হিসাবের জন্য যখন সুবা বাংলার আবার পুনর্বিন্যাস হয় তখন পূর্বতন সরকারগুলিকে ভাঙ্গিয়া সমগ্র বাংলায় মোট ৩৪টি সরকারও ১৩৫০টি মহাল গঠিত হয়। সেইসময় উড়িষ্যার কিছু অংশ মেদিনীপুরের সহিত যুক্ত হইয়া বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী হয়। পুরাতন সরকার মান্দারণের দুটি মহাল সাহাপুর ও মহিষাদল সেই সময় যথাক্রমে সরকার কিস্মৎ গোয়ালপাড়া ও সরকার কিস্মৎ মালঝিটার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই নূতন বন্দোবস্তেও বর্তমান ঘাটালের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল বাংলাদেশেই রহিয়া যায়।

বাংলাদেশের তৃতীয়বার রাজস্বের হিসাব তৈয়ারী করেন মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার সময়ে সমগ্র সুবা বাংলা ১৩টি চাক্‌লায় ও ১৬৬০টি পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। বর্তমান মেদিনীপুর জেলা তখন চাক্‌লা হিজলি, চাক্‌লা মেদিনীপুর ও চাক্‌লা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মেদিনীপুরের যেসব অংশ সুজার আমলে জলেশ্বর, মুজকুরি ও গোয়ালপাড়া সরকারের অধীন ছিল সেগুলি মুর্শিদকুলির রাজস্ব বন্দোবস্তে উড়িষ্যায় চলিয়া যায়। বর্তমান ঘাটাল মহকুমার প্রায় সব অংশই বাংলাদেশের অন্তর্গত চাক্‌লা বর্ধমানের অধীন থাকে। চাক্‌লা মেদিনীপুরে ৫৪টি পরগণা ছিল এবং পরিমাণ ফল ছিল ৬১০২ বর্গমাইল। অবশ্য এই পরিমাণ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ববিবরণী হইতে জানা যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, সেইসময় চাক্‌লা মেদিনীপুর বলিতে বর্তমান

মেদিনীপুর জেলার অনেক কম অংশই বোঝাইত। চিতুয়া, চন্দ্রকোণা, বরদা এবং চাক্‌লা হিজলির ৩৫টি পরগণা তখনও ইহার সহিত যুক্ত হয় নাই। অবশ্য উড়িষ্যার কিছু কিছু অংশ তখন চাকলা মেদিনীপুরের সহিত যুক্ত ছিল। কোম্পানির আমলে সেগুলি উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর নবাব মীরকাসেম ইংরেজ কোম্পানিকে চাক্‌লা বর্ধমান, চাক্‌লা মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের অধিকার ছাড়িয়া দেওয়ার সময়—(১) বগ্‌ড়ি, (২) ব্রাহ্মণভূম, (৩) বরদা, (৪) চন্দ্রকোণা, (৫) চিতুয়া, (৬) জাহানাবাদ (৭) মণ্ডলঘাট (৮) খারিজা মণ্ডলঘাট এবং (৯) ভূরসিট পরগণা—বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত এই ৯টি পরগণা চাক্‌লা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ইহাদের মধ্যে চিতুয়া, বরদা, চন্দ্রকোণা এবং চাক্‌লা মেদিনীপুরের ৫৪টি পরগণার মধ্যে নাড়াজোল পরগণার বেশির ভাগ অংশ ও চাক্‌লা বর্ধমানের ঐ পরগণাগুলির অবশিষ্টের কিছু কিছু অংশ লইয়া বর্তমান ঘাটাল মহকুমা গঠিত হইয়াছে। চাক্‌লা বর্ধমানের এই ৯টি পরগণার মধ্যে বগ্‌ড়ি ও ব্রাহ্মণভূম পরগণা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে এবং অবশিষ্টগুলি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার সহিত যুক্ত হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান ঘাটাল মহকুমা বর্ধমান ও হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেদিনীপুর জেলার সহিত যুক্ত হইবার পরেও ইহা গড়বেতা মহকুমা নামে পরিচিত ছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা ঘাটাল মহকুমা নামে পরিচিত হয় এবং সেই সময় মহকুমার সদর কার্যালয় প্রভৃতি গড়বেতা হইতে ঘাটালে স্থানান্তরিত হয়।

এই মহকুমার গঠন ও বিন্যাসে ইহাই লক্ষ্য করা গেল, প্রাচীনকাল হইতে এই দেশ বরাবরই বাংলাদেশের সহিত যুক্ত রহিয়াছে। এই জেলার বেশির ভাগ অংশ যেখানে এককালে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সময় বিশেষে যাহাদের অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে সেখানে ঘাটাল অঞ্চলের তেমন কোন পরিবর্তন হয় নাই। প্রাচীন দক্ষিণ রাঢ় ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের এক সুস্পষ্ট অংশ রূপে এই স্থান বরাবরই চিহ্নিত হইয়া আসিয়াছে। ভাষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে মেদিনীপুর জেলার অবশিষ্ট অংশের সহিত ইহার এক সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। এই জেলার বেশির ভাগ অংশ প্রাচীন ও মধ্যযুগে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এইসব অংশে উড়িষ্যার প্রভাব যতখানি পড়িয়াছে ঘাটাল অঞ্চলে ততখানি পড়ে নাই। কিন্তু বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী এই অঞ্চলে রাঢ়ীয় ও উৎকলীয় সংস্কৃতির এক

সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুযুগে উড়িষ্যার স্বাধীন রাজাদের সঙ্গে গৌড়ের রাজার অনেকবার সংঘর্ষ হইয়াছে, মধ্যযুগে মুসলমান আমলে গৌড়ের স্থলতান কোন কোন সময় উড়িষ্যা অভিযান করিয়াছেন এবং উড়িষ্যার রাজাও গৌড় অভিযান করিয়াছেন। উড়িষ্যায় কায়েম পাঠান শক্তির সঙ্গে মোগল-রাজশক্তির বহুবার সংঘর্ষ হইয়াছে। ইতিহাসের এই ঘটনাবলীর স্রোত বঙ্গ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী এই অঞ্চলের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। বহু যুদ্ধবিগ্রহ ও হাঙ্গামার ঝড় এই দেশকে সহ্য করিতে হইয়াছে। বাংলা ও উড়িষ্যার প্রান্তবর্তী বলিয়াই এই ঝড় এই দেশের উপর দিয়া বেশি করিয়া বহিয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে সমাজসংস্কার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে এই দেশের অগ্রণী ভূমিকার বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে।

প্রাচীন জমিদার ও রাজবংশ :

প্রাচীনকালে ঘাটাল অঞ্চলের কোন রাজার ইতিহাস আজ আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। হয়তো বিস্মৃত অতীতে এই অঞ্চলে অনেক ছোটবড়ো রাজা-জমিদার এই অঞ্চলে প্রভুত্ব করিতেন। প্রাচীন কিছু কিছু স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাধ্যমে এবং কিংবদন্তী-উপকথার মধ্যে বিস্মৃত যুগের কোন কোন রাজার ইতিহাস লুক্কায়িত আছে।

মৌর্যযুগে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অধীন ক্ষেপুতের (দাসপুর) 'ফিঙ্গা' নামক রাজবংশ সম্ভবত এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম-বিস্তারে অগ্রণী হইয়াছিলেন। ক্ষেপুত গ্রামের চৌধুরীবেড়ে একটি বুদ্ধ মন্দির ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। ফিঙ্গা রাজাদের আবাস ও কাছারীর স্থান এখনও ক্ষেপুতে লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত ঐ গ্রামের বড়রায়গণের বেড়ে তাঁহাদের রাজবাড়ী ও স্কুলের নিকট শিবতলায় তাঁহাদের কাছারী ছিল এইরূপ অনুমান করা যায়। ক্ষেপুতেশ্বরীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি ভগ্ন বুদ্ধমূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া একটি বিষ্ণুমূর্তিও ঐ গ্রামে আছে। ঘাটাল থানার পান্নার বিষয় আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

বহু পরবর্তীকালে অন্তমধ্যযুগের (Late Medieval age) যে সব রাজা বা জমিদার এই অঞ্চলের নানাস্থানে আধিপত্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি রাজবংশের ইতিহাস ইতিপূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। এই রাজবংশগুলি ছাড়াও আরও দুয়েকটি রাজবংশ এই অঞ্চলে বেশ কিছুকাল প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ দুয়েকটির বিবরণ এখানে বলা হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে নাড়াজোল রাজবংশের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নাড়াজোল রাজবংশ এই মহকুমার বৃহত্তম জমিদার রূপে পরিচিত। এই বংশের পূর্বপুরুষ উদয়নারায়ণ ঘোষ (সদ্‌গোপজাতীয়) দৈবানুগ্রহে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া নাড়াজোল পরগণায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অনুমান করা যায় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে এই বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। উদয়নারায়ণের পরে প্রতাপনারায়ণ, যোগেন্দ্রনারায়ণ, ভরতনারায়ণ, কার্ত্তিকরাম, জয়মণি, শ্যামসিংহ, বলবন্ত খান, গুণবন্ত খান (বাং ১০৩১—১০৬১) মহেশ খান (১০৬২—১০৯৩), অভিরাম খান (১০৯৪—১১২৫)। অভিরামের তিনপুত্র যদুনাথ, সভারাম ও ত্রিলোচন খান। যদুনাথের পুত্র মতিরাম খান (বাং ১১৫৩—১১৫৮) অপুত্রক ছিলেন। সভারামের পুত্র সীতারাম (১১৫৯—১১৯১), চুনীলাল ও হীরালাল।

নাড়াজোল রাজবংশ

প্রকৃতপক্ষে, নাড়াজোল রাজবংশের ইতিহাস জানিতে পারা যায় ত্রিলোচন খানের সময় হইতে। মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাজবংশের সহিত এই বংশের আগে হইতেই আত্মীয়তা ছিল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণগড়ের শেষ রাজা অজিত সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই রাণী ভবানী ও শিরোমণির সময়ে ঐ অঞ্চলে চুয়াড়দের উপদ্রব আরম্ভ হয়। রাণীদ্বয় ভয় পাইয়া নাড়াজোলে মৃত রাজা অজিতসিংহের মাতুলপুত্র ত্রিলোচন খানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পর ত্রিলোচন খান রাণীদের নিকট হইতে এই মর্মে এক হেবানামা লিখাইয়া লন যে চুয়াড়দের দমন করিলে রাণীদের অবর্তমানে তাঁহার বংশীয় কোন ব্যক্তি কর্ণগড় রাজ্যের অধিকারী হইবেন। রাণী ভবানী ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। ইহার পর ত্রিলোচন খানেরও মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ত্রিলোচনের ভ্রাতুষ্পুত্র মতিরাম রাণী শিরোমণির নায়েব হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সীতারাম এই পদ অলংকৃত করেন। সীতারামের পর তাঁহার পুত্র আনন্দলাল কিছুদিন রাণী শিরোমণির নায়েব ছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাণী শিরোমণির মৃত্যু হইলে আনন্দলালের ছোট ভাই মোহনলাল কর্ণগড় রাজ্য লাভ করেন। অবশ্য এর মধ্যে রাণী শিরোমণির এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বয়ং রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করিয়া আদালতে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু পরিশেষে মোহনলালই রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হন। মোহনলালের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয় আনন্দলাল ও নন্দলাল অপুত্রক ছিলেন। আনন্দলাল ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ও মোহনলাল ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। মোহনলালের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অযোধ্যারাম খান নাড়াজোল ও কর্ণগড়

জমিদারী লাভ করেন। মোহনলালের অন্যান্য পুত্রগণ রামজয়, ব্রজকিশোর, রামচন্দ্র, হৃদয়রাম ও রামকমল। অযোধ্যারাম রাজ্যলাভ করিলেও তাঁহার বিমাতা রঙ্গলতা তাঁহার পুত্রের রাজ্যলাভের দাবীতে মামলা দায়ের করেন। এইভাবে গৃহবিবাদে অযোধ্যারাম খুবই ব্যতিব্যস্ত হন। খাজনা বাকী পড়ায় ও দেনার দায়ে জমিদারী লাটে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত বর্ধমান জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে বর্ধমানের রাণী নারায়ণকুমারীর অনুগ্রহে তিনি রাজ্য ফিরিয়া পান। কিন্তু এই সংবাদ তাঁহার নিকট আসিবার দিনই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে জুন)।* অযোধ্যারামের পুত্র মহেন্দ্রলালই ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য শাসনকালের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সর্বপ্রথম 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার এক ভাই ছিলেন উপেন্দ্রলাল খাঁন। মহেন্দ্রলালের পুত্র রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন (জন্ম ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর)। তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রলাল ও বিজয়। দেবেন্দ্রলালের পুত্র অমরেন্দ্রলাল খাঁন।

নাড়াজোলরাজবংশের প্রতিষ্ঠিত বহু দেবকীর্তির বিষয় 'পুরাকীর্তি' পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। মোহনলাল খাঁন লঙ্কাগড় দীঘি খনন করেন এবং নিকটবর্তী সামাটগ্রামের অস্থলও প্রতিষ্ঠা করেন। নাড়াজোলে রামনবমীতে রথযাত্রা ও মেলা, জয়দুর্গার বাৎসরিক পূজামহোৎসব প্রভৃতি এই রাজবংশ কর্তৃক প্রচলিত হয়। ঐ সকল উৎসবে, চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদিতে ইহাদের বহু দান ছিল। বহু সদ্‌গ্রন্থ ইঁহারা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন। 'সঙ্গীতমঞ্জরী' নামক বিরাট্ গ্রন্থ রাজা নরেন্দ্রলালের আনুকূল্যে মুদ্রিত হইয়াছিল। কুতুবপুর পরগণা হইতে গৃহীত চল্লিশ মৌজার তপ্পে নাড়াজোল পরগণা ইঁহাদের পৈত্রিক জমিদারী ছিল। নবাব সরকার হইতে এই বংশের পূর্বপুরুষ কার্ত্তিকরাম 'রায়' উপাধি ও বলবন্ত 'খাঁন' উপাধি লাভ করেন। নাড়াজোলে ভিতর ও বাহির গড় নামে দুইটি গড় বর্তমান। ভিতরগড়ে রাজপ্রাসাদ চারপাশ পরিখা-বেষ্টিত এবং বাহিরগড়ে কয়েকটি মন্দির-দেবালয় বর্তমান। বর্তমানে রাজপ্রাসাদ প্রায় ভগ্ন ও পরিত্যক্ত। এই রাজপ্রাসাদে বর্তমানে নাড়াজোল রাজকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন মেদিনীপুরের বহু জনকল্যাণকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এই মহকুমার দ্বিতীয় বৃহৎ জমিদার জাড়ার রায়বংশ। ইঁহারা শুদ্ধ শ্রোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। আদিপুরুষ রামেশ্বর প্রতিষ্ঠিত দুইটি শিবলিঙ্গ ও গোপাল নিত্য পূজিত হন। রায়বংশের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় চার লক্ষ টাকা। ইঁহাদের

সুবিশাল প্রাসাদ ও কাছারী বাড়ী খুবই দর্শনীয়। বৎসরে দুর্গোৎসবাদিতে আনন্দ ও গ্রাম্যদেবদেবীগণের পূজায় সমারোহ হইয়া থাকে। সংস্কৃতলিপি যুক্ত বহু দেবালয় ইঁহাদের কীর্তি।

রাধানগর-শালিখার চৌধুরীগণও এই মহকুমার অন্যতম জমিদার ছিলেন। ইহাদের এক শাখা ডেবরা থানার মলিঘাটীতে উঠিয়া যান। চৌধুরীবংশ তন্তুবায়জাতীয়। বাংলা ও উড়িষ্যায় ইঁহাদের বিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল। আদিপুরুষ বংশীধর দাস সুত গোবর্ধন সুত গোপীমোহন সুত বৈদ্যনাথ সুত কৃষ্ণমোহন সুত নবকুমার। নবকুমার বাং ১২৭১ সালের দুর্ভিক্ষে অন্নসত্র করায় মলিঘাটীর একাংশের নাম "আড্ডা" হয়। ইঁহার দত্তক পুত্র ঈশ্বর তস্য দত্তক শান্তিনাথ।

ক্ষীরপাইয়ের পাহাড়ীদেরও ঘাটাল ও অন্যান্য মৌজায় বহু জমিজমা ছিল। রামসুন্দর পাহাড়ীর পুত্র হারাধন পাহাড়ী প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দির দেবালয় এই স্থানে আছে। ইহাদের বাড়িতে হাতে আঁকা বেশকিছু প্রাচীন চিত্র আছে। ক্ষীরপাইয়ের হালদারগণ গন্ধবণিক। ইহাদের আদিপুরুষ বৈষ্ণবচরণ। বৈষ্ণবচরণ ও তদ্বংশীয়দের জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল দেড় লক্ষ টাকা। এই বংশের বলরাম হালদার বন কাটিয়া কেশপুর থানার গোপীনাথপুর গ্রাম ও অন্যত্র আর এক গোপীনাথপুর নিষ্কর মহল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার আসন ও তাকিয়া এখনও পাতা হয়। দাসপুরের লাট গৌরা ইঁহাদের জমিদারী ছিল।

উপরিউক্ত জমিদারবংশ ছাড়াও এই মহকুমার রামজীবনপুর ও ইড়পালায় কিছু কিছু জমিদার বাস করিতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দশ সালা বন্দোবস্তের সময় এইসব ছোট বড়ো জমিদারগোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল। অবশ্য এই অঞ্চলের ছোট বড়ো সব জমিদারই বর্ধমান রাজার অধীন ছিলেন। বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের (১৭৭০—১৮৩২ খ্রীঃ) দেওয়ান প্রাণচন্দ্ররচিত "হরিহরমঙ্গলে" এদেশে বর্ধমান জমিদারীর কয়েকটির নাম পাওয়া যায়, যেমন—রানীহাটী, রায়পুর, বরদা, সেলামপুর, বালিগড়, চেতো, সাহাবাদ, বামুনভূম, বালিয়া, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, জাহানাবাদ, ভূরসিট, মণ্ডলঘাট ইত্যাদি।

সেকালের সামাজিক পরিস্থিতি ঃ

এদেশের হিন্দুসমাজ সেকালে হুগলি জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের অধীন ছিল। প্রতি পরগণায় একটি বিশেষ স্থান পরগণার সমাজের মিলনের

জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল। চেতুয়া পরগণার বেথুয়াবাটী কালীবাড়ীতে চেতুয়ার সামাজিক মজলিশ বসিত। সমগ্র পরগণার স্বার্থসম্পর্কিত কোন বিষয়ের আলোচনার জন্য ঐরূপ অধিবেশন আহূত হইত। প্রতি গ্রামেই গ্রামসম্পর্কিত আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল বারোয়ারির মণ্ডপ বা অনুরূপ কোন দেবস্থান। গ্রামের প্রতি পাড়া হইতে এক একজন প্রধান নির্বাচিত হইতেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য সকলকেই মজলিশে আহ্বান করা হইত। প্রতি পাড়ার নির্বাচিত প্রতিনিধিকে "ডাকের আসামী" বলা হইত। ইঁহারা প্রধানত এক একটি বিশিষ্ট বংশের প্রতিনিধিত্ব করিতেন। বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই সাধারণত 'ডাকের আসামী' হইতেন। পিতার জীবিতাবস্থায় পুত্র 'ডাকের আসামী' হইতে পারিতেন না।

সকল ডাকের আসামী মজলিশে সমবেত হইলে প্রধানত পাড়ার কর্তারাই বিচারাদি আলোচনায় অগ্রাধিকার পাইতেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সকলেই মানিয়া লইতেন। প্রধানগণের মধ্য হইতে একজন গ্রামের কর্তা নির্বাচিত হইতেন। তিনি গ্রামের উৎসবাদির ব্যবস্থা করিতেন। কোন নালিশ তাঁহাকেই জানাইতে হইত। তিনি মজলিশ ডাকিয়া বিচারাদিরও ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তাঁহার আদেশে গ্রহাচার্য মজলিশের ডাক দিতেন। কোন উৎসবাদি অনুষ্ঠানে গ্রামের ষোল আনার ভোজন ব্যাপারে কৃতীর অনুরোধেও এইরূপ মজলিশ বসিত। মজলিশে কৃতীর অনুকূলে সিদ্ধান্ত হইলে তবেই তিনি গ্রাম ষোল আনাকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিতেন। কোন কৃতী শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে সমগ্র পরগণাকে আমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছুক হইলে পরগণার মজলিশ ডাকা হইত। এই মজলিশের সিদ্ধান্ত মত সমগ্র পরগণা কিংবা কোন গ্রামকে বাদ দিয়া নিমন্ত্রণের বন্দোবস্ত হইত। বাদ দেওয়া গ্রামটি পরগণা সমাজে পতিত থাকিত।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য এক একজন গ্রাম বা পরগণার প্রধান থাকিতেন। তিনি নিজ নিজ জাতির সমস্যা বিষয়ক নিষ্পত্তির অধিকারী ছিলেন। প্রয়োজন হইলে গ্রামে বা পরগণায় মজলিশ ডাকিয়া তিনি বিচার প্রভৃতি করিতেন। প্রাচীন প্রথা, শাস্ত্রীয় বা কৌলিক আচার মানিয়া চলিলে সমাজ সুশৃঙ্খলায় চলিতে থাকিত। অন্যথায় বিচারাদির প্রয়োজন হইলে গ্রাম বা পরগণার মজলিশে নিষ্পত্তি হইত। এই ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিলে স্মার্ত অধ্যাপকের মতানুযায়ী ব্যবস্থা হইত। মতান্তর ঘটিলে ঊর্ধ্বতন সমাজ থানাকুল কৃষ্ণনগরের মতানুযায়ী কার্য হইত। নিম্নপক্ষ আবেদন করিলে এই সমাজ মতামত দিতেন, অন্যথা কোন নিয়ন্ত্রণ ইঁহাদের ছিল না। মতান্তর হইলে কখনও কখনও

দলের সৃষ্টি হইত। সকলে একমত হইয়া কোন দণ্ড দিলে কিংবা দায়ভাগজনিত ব্যবস্থা করিলে তাহা মানিতেই হইত।

প্রাচীনকালে স্থানে স্থানে যে সব স্বাধীন জমিদার বা সামন্ত রাজা ছিলেন তাঁহারা স্থানীয় অধ্যাপকগণের বৃত্তিস্বরূপ নিষ্কর ভূমির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ইহার দ্বারা অধ্যাপক ও দেবসেবাদির ব্যয় নির্বাহ হইত। বিভিন্ন গ্রামে ঐ সকল নিষ্কর জমি থাকিত। কর বা ফসল আদায়ের জন্য অধ্যাপক ঐ সকল স্থানে যাইতেন। শ্রাদ্ধাদিতে ষোড়শদানের মধ্যে ভূমি, শয্যা, অন্ন ও গোদান পুরোহিতের এবং জলদান গুরুর প্রাপ্য ছিল। বাকি এগারোটি দান বিভিন্ন সামাজিক গ্রামের অধ্যাপকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ভূরিভোজ্য ও দ্বিতীয়াদি অন্ন এবং জলদানের একটি ঐরূপ কোন কোন অধ্যাপককে দেওয়া হইত। রাজা পুরুষানুক্রমিক ঐ সকল দান স্বীকার করিতেন। অধ্যাপকেরাও বংশানুক্রমিক উহা পাইতেন। ধনীরাও অধ্যাপকদিগকে নগদ বৃত্তি দিতেন। কোন ক্রিয়া উপলক্ষ্যেও তৈজস, ভোজ্য ও বিদায়দানের ব্যবস্থা ছিল। এইরূপে অধ্যাপক সমাজ পালিত হইতেন।

সকল জাতিরই নিজ নিজ ব্যবসায় ছিল। সকল ক্রিয়াকলাপে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য গ্রামীণ জনতা ব্যবহার করিত। এইভাবে কেহই বেকার থাকিত না। বৃহৎ ক্রিয়ার সকল দ্রব্যই এইভাবে গ্রামস্থ উৎপাদনকারী যোগাইতেন। ধনীগৃহে এইজন্য ভূমিবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার না করা দণ্ডার্হ অপরাধ ছিল।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র পর হইতে সমাজে বিশৃঙ্খলা আসে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। পল্লী অপেক্ষা নগরের আকর্ষণ অধিক হইয়া পড়ে। ইংরাজের অনুকরণ, ইংরাজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহবৃদ্ধি সমাজকে ক্রমশ পাশ্চাত্ত্য রীতি নীতি ও সংস্কৃতির প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলে। পল্লীর একান্নবর্তী প্রথা ভূমি ও শিল্প ব্যবসায়াদি হইতে আয়ের ক্রমাবনতির ফলে লুপ্ত হইয়া আসিতে থাকে। গ্রামসমূহ পরিত্যক্ত ও বসতি বিরল হইয়া সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। স্বেচ্ছাচার প্রবল হয়। সমষ্টিগত একতা ক্ষীণ হইয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপ নেয়। আবহমানকাল ধরিয়া প্রাসাদবাসী ধনী আর পর্ণকুটীরবাসী দীন সমাজের চোখে এক ছিলেন। একের সম্মান বা অসম্মান অঙ্গ হিসাবে অঙ্গী সমাজের সম্মান বা অসম্মান ছিল। কোন কোন পারিবারিক বিচার প্রকাশ্য স্থানে না হইয়া পরিবার বিশেষের বৈঠকখানায় বসাইয়া ঐ পরিবারের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা হইত। সাধারণে যাহাতে বুঝিতে না পারে



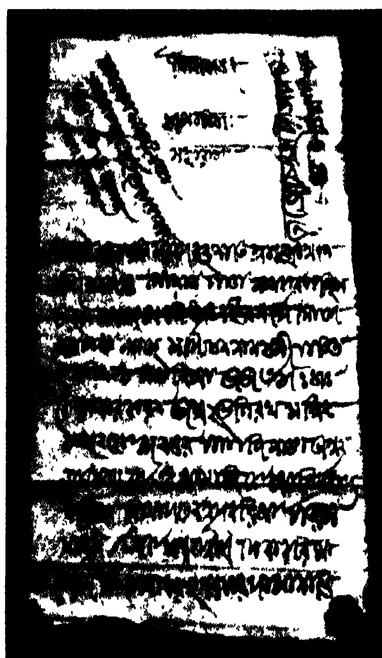
বর্গীর আমলের কালীমন্দির,
'চাঁদনী'রীতি, কোন্নগর-ঘাটাল



বিশালাক্ষীর টিনের 'আটচালা', বরদা



বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান, বীরসিংহ



'চুয়াড়বিদ্রোহে'র নায়ক গোবর্ধন দিক্‌পতির
স্বাক্ষরিত ভূমিদানপাট্টা, ১১৬২ সাল



মানবেন্দ্রনাথ রায় (তরুণ বয়সে)

আর্মাণীলিপি, রাধানগর

এইজন্য হেঁয়ালির মত ভাষায় কথাবার্তা হইত। যেমন, 'পাখী উড়েগেছে, পুটুলি খোয়া গেছে'। উত্তর: 'যেতে দিন, আবার ফিরবে, যা গেছে যাক্' ইত্যাদি।

ইংরেজ আমলে নবযুগের সূচনায় প্রাচীন এই সামাজিক বন্ধন ভাঙ্গিয়া গেল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা চলিয়া যাওয়ায় পাটোয়ার শ্রেণীর লোকের প্রাধান্য আসিয়া গিয়া পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিল। ভয়াবহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি হইল। এই অবস্থা সমগ্র ইংরাজ শাসনকালে গড়িয়া উঠিতে উঠিতে পরে শোচনীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। লোকে দলে দলে গ্রাম ছাড়িয়া ভরণপোষণ ও জীবিকার প্রয়োজনে শহরে ভিড় জমাইতে লাগিল। কলিকাতা বা অন্যান্য শিল্পসমৃদ্ধ শহরে গঞ্জে লোকবসতি বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। গ্রামের আকর্ষণ কমিয়া আসিল। এইভাবে প্রাচীন গ্রাম্য সমাজের অধঃপতন শুরু হইল। দেশ স্বাধীন হইবার পরও এই অবস্থার পরিবর্তন বা উন্নতি না হইয়া বরং অবনতির মুখেই চলিয়াছিল। এখনও গ্রাম্য সমাজের তেমন কোন উন্নতি লক্ষ্য করা না যাইলেও কলিকাতা বা শিল্পসমৃদ্ধ শহরগুলি হইতে ভীড় যেন কিছুটা কমিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই মহকুমার শিল্পব্যবসায়-সমৃদ্ধ ধনলোকবসতিপূর্ণ প্রাচীন পাঁচটি শহরের অধঃপতন উপরিউক্ত পরিস্থিতির উদ্ভবের ফলে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রকোণার অধঃপতন খুবই উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রকোণার পূর্ব-সমৃদ্ধির কথা পূর্বেই কিছুটা উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানকার রেশম ও বস্ত্র-শিল্প, নানা রকমের ধাতু ঢালাইয়ের কারখানা, মটকী ঘি, দুধ, দই, চাল, ডাল প্রভৃতির ব্যবসায় এককালে এখানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনিয়া দিয়াছিল। সহরের অধিবাসীরাও ইহার ফলে স্থিতিশীল ছিলেন। বহু বিচিত্র মন্দির ও প্রাসাদ এখানে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই অঞ্চলে কীর্তনের এক বিশেষ ধারা চলিত ছিল। রামশিঙ্গা এখানকারই একটি বংশীজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। কীর্তনের সঙ্গে উহাও বাজিত। নানা উৎসব নগরবাসীর অবকাশ আনন্দ-মুখর করিয়া রাখিত। পল্লীসমাজের অধ্যাপক, পত্রী ও ব্রাহ্মণাদি আহূত হইয়া সংস্কৃতির প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখিতেন। কিন্তু কালের কুটিল চক্রে এই স্থানের পতন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সবই কমিতে কমিতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। নানা প্রকার মিষ্টান্ন এস্থানের অধিবাসী ও আগন্তুকদের সেকালে মনোরঞ্জন করিত। উৎকৃষ্ট মালপোয়া, চাঁদসাই খাজা, বুটের মিঠাই এবং এখানকার অস্থলে প্রচলিত মগধ লাড়ু বিখ্যাত মিষ্টান্ন ছিল। ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, খড়ার শহরগুলিও শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা সেকালে খুবই সমৃদ্ধ হইয়াছিল এবং উপরিউক্ত

কারণে ব্যবসায়াদির অবনতির ফলে ইহাদেরও পতন আরম্ভ হয়। ঐ একই কারণে রেশম ব্যবসায়ে সমৃদ্ধিশালী রাধানগর, কাশীগঞ্জ প্রভৃতি শিল্প ও ব্যবসায়-সমৃদ্ধ স্থানগুলিরও পতন আরম্ভ হয়। নৌচলাচলের সুবিধার জন্য এবং রূপনারায়ণ কাছে থাকায় শিলাই তীরবর্তী ঘাটালের পতন পূর্বোক্ত শহরগুলির তুলনায় ততটা হয় নাই। ইংরেজ ও ডাচদিগের বাণিজ্যকুঠি এখানে ছিল। তিন জন রেসিডেন্টও এখানে ছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে রেশম ব্যবসায় ছাড়া অন্যান্য ব্যবসায় এখানে এখনও লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ঘাটাল মহকুমাঃ

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আজ আর কাহারও অজানা নয়। ঘাটাল মহকুমা এই জেলার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে এই সংগ্রামে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। বিদেশী অত্যাচারীদের হস্ত হইতে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করার এক সংঘবদ্ধ চেষ্টা এই মহকুমার অধিবাসীদের কাছে নূতন কিছু নয়। ইতিপূর্বে চেতুয়া-বরদার জমিদার 'বাংলার শিবাজী' শোভা সিংহের বিদ্রোহ মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে দারুণ আঘাত করিয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের কুখ্যাত 'জিজিয়া কর' ও দেয় রাজস্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া সেইযুগে শোভা সিংহ অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহার পর চুয়াড় নেতা গোবর্ধন দিকৃপতি এই মহকুমার গ্রামাঞ্চল হইতেই অত্যাচারী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক গণবিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি চারশ কৃষকসেনা লইয়া চন্দ্রকোণায় উপস্থিত হন এবং কাশীজোড়া, তমলুক, জলেশ্বর, ময়না, নারায়ণগড় প্রভৃতি পরগণায় পরে ব্যাপক গণঅভিযান করেন। এইভাবে দেখা যায় অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই মহকুমার অধিবাসীরা যুগে যুগে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই গৌরবজনক সংগ্রাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পবিত্রব্রতে এই দেশের বহু সন্তান দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহাদের অগ্রণী হইলেন শহীদ ক্ষুদিরাম (জন্ম ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৮৯ ফাঁসী ২১শে জুলাই, ১৯০৮), প্রদ্যোত ভট্টাচার্য এবং বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়। আরও বহু বিপ্লবী সুসন্তান ও স্বাধীনতা সংগ্রামী এই মহকুমায় জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের গৌরব বর্ধিত করিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকের কথা এই প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে এই দেশের বহু অধিবাসী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদেশী পণ্য বর্জনের জন্য মহকুমার নানাস্থানে সভাসমিতির মাধ্যমে সেই সময় ইহার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ঘাটাল নূতনগঞ্জে এক সভায় সেই সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ আসিয়াছিলেন। এইখানের আকাশ-বাতাস 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল। বীর শহীদ ক্ষুদিরামের জন্মস্থান এই মহকুমায় না হইলেও দাসপুর থানার রাধাকৃষ্ণপুর মৌজার হাটগেছিয়া গ্রামে তাঁহার মাসীর বাড়ী ছিল। শোনা যায়, বাল্যে তিনি এই গ্রামেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং কৈশোর ও যৌবনেও এই স্থানের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। উক্ত হাটগেছিয়া গ্রামে শহীদ ক্ষুদিরামের এক স্মৃতিস্তম্ভ ও আবক্ষ মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতেই ইংরাজ রাজত্বের অবসানের জন্য এই দেশে দুচারটি তরুণ বিপ্লবীদল গড়িয়া ওঠে। মাণিকতলার বোমার মামলার সঙ্গে এই দলের কোন কোনটির যোগাযোগ ছিল। দাসপুর থানার চাঁদপুরবাসী বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র সেন এই মাণিকতলার বোমার মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি ছাড়া পান এবং 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হন। ঘাটালের এই ধরণের একটি তরুণ বিপ্লবী দলের প্রধান পরিচালক ছিলেন রামচন্দ্র দাস। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে চারণ কবি মুকুন্দ দাস ঘাটালে আসিয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে ঘাটালের প্রশস্তি গাহিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঘাটাল-আলামগঞ্জের শিবু সেনের দৃপ্ত কণ্ঠে বহু দেশাত্মবোধক সঙ্গীত শোনা যাইত। যতীন ওস্তাদ বা পাগল গুরুদাসের কণ্ঠেও উদ্দীপনাময় বহু স্বদেশী গান শোনা যাইত।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই মহকুমার নানাস্থানে স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের বহু কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বহু ব্যক্তি এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে জাড়ার সাতকড়িপতি রায়, মোক্ষদা চরণ সামধ্যায়ী, মোহিনীমোহন দাস, যতীশচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী, মনতোষণ রায়, স্বদেশরঞ্জন দাস, হরিসাধন পাইন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চারণ কবি শরচ্চন্দ্র দাসের কণ্ঠে অগ্নিমন্ত্রের উদাত্ত বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কয়েকটি পংক্তি—"নগরে নগরে জ্বালরে আগুন

হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ

……অয়ি ভুবন মনমোহিনী

জনক জননী জননী।"

চারণ কবি মুকুন্দ দাসও এই সময় এখানে আসিয়া গাহিয়াছিলেন ঃ

"বিদেশী কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পর না
......সাবধান সাবধান
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান্
ঐ শোন তার গরজে কম্বু
অম্বুধি যথা উচ্ছলে
প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদে
মৃত্যুভূষণ কল্লোলে।"

ঘাটাল শহরে এবং পল্লী অঞ্চলে সেইসময়ের বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ আসিয়া এইদেশের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিধানচন্দ্র রায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতেই দাসপুর থানার রাধাকান্তপুর দাসবংশের মোহিনীমোহন দাস দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই জেলায় আন্দোলনের পুরোধারূপে অংশগ্রহণ করেন। মোহিনীমোহন তখন জেলা কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি। তিনি ও তাঁহার পুত্র স্বদেশরঞ্জন দাস ঐ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিপ্লবী যতীশচন্দ্র ঘোষও এই আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সময় পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়াও রামচরণ দাস, জহরলাল বক্সী, সনাতন রায়, অমলেশ্বর সিংহ, মোহিনীমোহন মণ্ডল প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া আরও বহু ব্যক্তি এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন যাঁহাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ এই মহকুমার গ্রাম গ্রামান্তরে কিরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার এক বিবরণ জানিতে পারা যায় গ্রন্থকারের পিতা সতীশচন্দ্র রায়ের আত্মজীবনীগ্রন্থ 'সংশপ্তক সতীশচন্দ্রে'। দাসপুর থানার চেতুয়া-বাসুদেবপুর গ্রামে স্বদেশী আন্দোলন কার্যের জন্য 'বাসুদেবপুর সংস্কার সমিতি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সতীশচন্দ্র ঐ সমিতির কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং স্বদেশী বস্ত্র, স্বদেশী দ্রব্য প্রভৃতির ব্যবহার সর্বসাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি ঐ অঞ্চলে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ

করেন। কিন্তু তখনও এই অঞ্চলে বহু দেশদ্রোহী তাঁহার ও তৎসহযোগীদের এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করিবার চেষ্টা করেন। সতীশচন্দ্র লিখিয়াছেন :

দেশে তখন স্বদেশী আন্দোলন খুব প্রবল। স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারে সকলেই উদ্যোগী। তৎসময়ে দোকানদারগণের অসাধুতায় দেশী কাপড় পাওয়া কষ্টজনক হইয়া পড়িল। উক্ত সমিতি এই কষ্ট মোচন করে।

'কমলা ভাণ্ডার' নামক স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়া কেবলমাত্র খরচা লইয়া বিনা লাভে বস্ত্র বিক্রয় করিতে লাগিল। দেশের মুদীখানা দোকানে বিলাতী চিনি ও লবণ বিক্রয় হইত। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও তাহাদের দ্বারা করকচ লবণ বা দেশী চিনি আমদানী করাইতে না পারায় অনেকে বাধ্য হইয়া বিলাতী লবণ ও চিনি ব্যবহার করিতেছিলেন। সমিতি এই কষ্ট দূর করিবার জন্যও উক্ত কাপড়ের দোকানের সহিত একটি মুদীখানা দোকান খুলিতেও বাধ্য হইল। তাহাতেও অল্পমাত্র লাভে বিক্রয় করায় অন্যান্য কাপড় দোকানদার ও মুদী ফেল হইবার উপক্রম হইল। তাহাতে অনেক মুদী বিলাতি লবণ ও চিনি বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয়।...এই সকল দোকান চালাইবার মূলধন জন্য দশ টাকা হিসাবে শেয়ার লইয়া সমিতির অধিকাংশ মেম্বারই উক্ত টাকা প্রদান করিলেন।..... বেশ সুন্দরভাবেই দোকান চলিতেছিল। ইহাতে দেশের লোকের প্রভূত উপকার হইতেছিল, কিন্তু বিধির বিধানে ইহার অন্যরূপ অবস্থা হইয়া গেল। আমি তখন সকল বিষয়েরই কার্যাধ্যক্ষ।.. এই সকল সৎকার্যও অসৎ পরশ্রীকাতর ব্যক্তিগণের নিকট মন্দ বলিয়া প্রতীত হইল। ...তখন মজঃফরপুরের বোমার কাণ্ড ঘটিয়া যাওয়ায় চারিদিকে খানাতল্লাসের ধূমধাম চলিয়াছে। দুষ্টগণ পথ পাইয়া আমাদের উক্ত সমিতিতে বোমা প্রস্তুত হয় বলিয়া লালবাজার পুলিশ কোর্টে এক মিথ্যা দরখাস্ত করিয়া দেয়।"

('সংশপ্তক সতীশচন্দ্র' পৃ ৪২-৪৪)

এই ধরণের বহু গ্রামে সেইসময় স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার বহিতেছিল। বহু গুপ্ত সমিতিতে তরুণ ও বিপ্লবীরা দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনের জন্য সক্রিয় আন্দোলন করিয়াছিলেন। সেই সময় 'যুগান্তর', 'নবশক্তি', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি নিষিদ্ধ সংবাদপত্র এইসব সমিতিতে লওয়া হইত। পরবর্তীকালে এই মহকুমার বিস্তৃত অঞ্চলে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের এই আন্দোলনে সমগ্র মহকুমা প্লাবিত হয়। এই আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল ঘাটাল কুঠি। দাসপুরের শ্যামগঞ্জ ও চেঁচুয়াহাটে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। শ্যামগঞ্জ লবণ আইন অমান্যের একটি কেন্দ্র

হইয়া উঠিয়াছিল। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষপ্রেরিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী এখানে লবণ প্রস্তুতের একটি ঘাঁটি স্থাপন করিয়া আন্দোলন চালাইয়া যাইতে থাকেন।

১৯৩০ সালের জুন মাসের প্রথমে চেঁচুয়ায় এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বহু লোকের জনতার উপর পুলিস অমানুষিক অত্যাচার করিলে দাসপুর থানার তদানীন্তন দারোগা ভোলানাথ ঘোষ ও তাঁহার সহকারী অনিরুদ্ধ সামন্তকে জনতা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া তাহাদের 'লাশ' জ্বালাইয়া দিলে মেদিনীপুর জেলার তদানীন্তন পুলিশ সুপার এই সংবাদ পাইয়া বিরাট পুলিশ বাহিনী লইয়া আসিয়া জনতার উপর নির্মম অত্যাচার করেন। তাহাতে ৬ই জুন তারিখে ১৪ জন ব্যক্তি শহীদ হন। চেঁচুয়ার উত্তরে নদীর অপর পারের মাঠের ঢিবিতে এই ঘটনা ঘটে। শহীদগণের বেশির ভাগের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল।

(১) চন্দ্রকান্ত মান্না (তেমোহানী), (২) শশিভূষণ মাইতি (সয়লা), (৩) কালীপদ শাসমল (জালালপুর), (৪) ভৃগুরাম পাল (মোহনমাইতিচক), (৫) দেবেন্দ্রনাথ ধাড়া (জোতভগবান্), (৬) সতীশচন্দ্র মিস্ত্রী (খাড়-রাধাকৃষ্ণপুর), (৭) রামচন্দ্র পাড়ুই (জোতশ্যাম), (৮) নিতাই পড়্যা (পাঁচবেড়িয়া), (৯) অবিনাশ দিণ্ডা (বাঁশখাল), (১০) অশ্বিনী দোলুই (বর্ধমান, কিন্তু চকবোয়ালিয়ায় বাস করিতেন), (১১) সত্য বেরা (বাঁশখাল), (১২) শশী দিণ্ডা (গোবিন্দনগর)। আরও দুইজনের নাম জানা যায় নাই। ইহাদের স্মরণে প্রতিবৎসর ৬ই জুন চেঁচুয়াহাটে বিরাট্ সভার অনুষ্ঠান হয়। সেই সভায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

ভারতের মুক্তি আন্দোলনে এই মহকুমার আরও কয়েকজনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা হইলেন ব্রাহ্মণবসানের (দাসপুর) স্বনামধন্য কৃত্তিবাস মণ্ডলের পুত্র শহীদ মোহিনী মণ্ডল, কানন বিহারী গোস্বামী, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, হৃষীকেশ পাইন, নিত্যানন্দ জানা, ধর্মদাস হড়, নূট বিহারী মণ্ডল, অলৌকিক মাইতি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাড়ুই প্রভৃতি। আরও বহু দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা আছেন। সকলের নাম বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করা হইল না। তাঁহারা সকলেই দেশের শ্রদ্ধার পাত্র এবং তাঁহাদের আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম ও সংগঠনী শক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য।

কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সেই দুর্ধর্ষ বীর শহীদ ক্ষুদিরাম, শহীদ প্রদ্যোত ভট্টাচার্য এবং বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নামগুলি সত্যই

অবিস্মরণীয়। বীর অমর শহীদ ক্ষুদিরামের বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। প্রদ্যোত ভট্টাচার্য দাসপুর থানার গোকুলনগরে (মৌজা নং ২৮) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বীরত্ব ও জলন্ত দেশপ্রেম এবং অসাধারণ আত্মত্যাগ সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁহাকে অমরস্থান দিয়াছে। গোকুলনগর গ্রামে তাঁহার স্মরণে একটিস্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মেদিনীপুর শহরেও তাঁহার মূর্তি স্থাপিত আছে। তাঁহার জন্ম ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বরে। ফাঁসী হয় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী ডগলাস হত্যা মামলায়।

বীর ক্ষুদিরাম শহীদপ্রদ্যোত ও মানবেন্দ্রনাথ

বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় দাসপুর থানার ক্ষেপুতগ্রামে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ক্ষেপুতের প্রসিদ্ধ দেবী ক্ষেপুতেশ্বরীর পূজক ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুত্র পণ্ডিত দীনবন্ধু ভট্টাচার্যের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। দীনবন্ধু পরে চব্বিশ পরগণার কোদালিয়া গ্রামে শ্বশুরালয়ে বাস করেন। ঐ জেলার আড়িয়াদহ স্কুলের তিনি ছিলেন সংস্কৃত শিক্ষক। মানবেন্দ্রনাথ ঐ স্কুল হইতেই ১৯০৫ কি ১৯০৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০৬ সালে শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষের দলে যোগ দেন। ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারত জার্মান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া 'মার্টিন' নাম লইয়া ইংরেজের ছদ্মবেশে ভারত ত্যাগ করেন। ১৯১৭ সালে মেক্সিকোতে পৃথিবীর প্রথম কমিউনিষ্ট দল গঠন ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৯ সালে লেনিনের আহ্বানে রাশিয়ায় গিয়া মানবেন্দ্রনাথ লেনিন ও ট্রট্স্কীর সহযোগীরূপে কাজ করিতে থাকেন। ১৯২৭ সালে মস্কোতে ইষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি উহার ভারতীয় শাখার প্রধান হন। স্ট্যালিনের সহিত মতবিরোধ হইলে ১৯৩০ সালে গোপনে ভারতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৬ সালে কারামুক্ত হইয়া তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন, কিন্তু মতবিরোধ হওয়ায় ১৯৪০ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। নয়া মানববাদ প্রচার তাঁহার শেষ কীর্তি। ১৯৫৪সালে এই বহুভাষাবিদ্ বিপ্লবী মনীষীর মৃত্যু হয়।

মানবেন্দ্রনাথ রায়

এই বিপ্লবী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বিশিষ্ট ভূমিকা লইয়াছিলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁহার ষড়যন্ত্র ও অস্ত্রসংগ্রহের অভিযান এক লোমহর্ষক

ঘটনা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার 'ভারত পথিক' নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন:

"কোদালিয়া, চিংড়িপোতা, হরিনাভি, মালঞ্চ, রাজপুর ইত্যাদি গ্রামগুলি আবার কর্মকোলাহলমুখর হয়ে ওঠে।······বিশ্ববিখ্যাত কমরেড এম. এন. রায় এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।"

মানবেন্দ্রনাথের জন্মস্থান সম্পর্কে নেতাজীর এই মন্তব্য ঠিক নয়। কোদালিয়ায় তাঁহার মাতুলালয়ে তিনি বাল্যকালে ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান ছিল ক্ষেপুতগ্রামে। 'শোনা যায়, শেষ জীবনে তিনি একবার দাসপুর অঞ্চল ঘুরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ছদ্মনাম ছিল এম. এন. রায় বা মানবেন্দ্রনাথ রায়। এই মনীষীর জীবন ও দর্শন বিষয়ে ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হয়। অগ্নিযুগের এই বিপ্লবী ঘাটাল মহকুমার এই অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমিকে যথার্থই গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

এই মহকুমায় আরও অনেক আন্দোলন হইয়াছে। যেমন কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য বোরো বাঁধ আন্দোলন। এই আন্দোলনের নায়ক ছিলেন সরবেড়িয়ার মহেন্দ্র চৌধুরী। চেঁচুয়ার গণজাগরণ তাঁহারই আন্দোলনের পরিণতি। ইহা ছাড়া প্লেগ আন্দোলনে ঘাটালের পরেশ ভূঞার ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযান খুবই রোমাঞ্চকর। এই সবই ইংরেজ রাজত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নামান্তব মাত্র। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে "সত্যমেব জয়তে" এই মন্ত্রটি ভারত সরকারের সাধনমন্ত্র রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। দাসপুর থানার রবিদাসপুরের পণ্ডিত কৃষ্ণ দিণ্ডা একশ বছরেরও বেশি আগে এই 'সত্যমেব জয়তে' মন্ত্রটি তাঁহার প্রাসাদ শীর্ষে ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই দূরদর্শিতার কথা ভাবিলে সত্যই অবাক্ হইতে হয়। এখনও সেই কংসাবতীতীরের প্রাসাদ ঐ মন্ত্রটি মস্তকে ধারণ করিয়া বিজয়ীর গৌরবে বর্তমান।

ঘাটাল এইরূপে নানাভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনেও এখানকার জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ উপেক্ষণীয় নয়। বর্তমানে বহু যুবক ও দেশকর্মী এইসব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া পূর্বতন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দুর্নীতিদমন, কৃষিবিপ্লব, পরিবার-পরিকল্পনা, পণপ্রথাবিলোপ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, অসবর্ণবিবাহ প্রভৃতি নানা

প্রগতিমূলক সামাজিক আন্দোলনের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন এখানকার বহু ছাত্র, যুবক, শিক্ষাব্রতী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ। স্বাধীনতাপূর্ব ও তৎপরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে ঘাটালের অবদান এইকারণে নিঃসন্দেহে স্মরণীয়।

ইংরেজ শাসকের অত্যাচার ও প্লেগের মামলাঃ

ঘাটালের ইতিহাসে বাংলা ১২৫৭ সাল এক স্মরণীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। দুর্ধর্ষ ও প্রবলপ্রতাপশালী বৃটিশ সরকারের শাসনে তখন দেশ জর্জরিত। সেই সময়ে ঘাটাল অঞ্চলে সংক্রামক প্লেগ রোগ দেখা দেয়। সেইজন্য ইংরেজ সরকার ঘাটাল শহরের অদূরে একটি প্লেগ হাসপাতাল তৈয়ারি করার চেষ্টা করেন।

হঠাৎ একদিন হিংস্র বন্য বরাহের অত্যাচারের কথা শুনিয়া নির্ভীক জমিদার রামতারক ভূঞা মহাশয় তাহা শিকার করিবার জন্য বাহির হইলেন এবং বন্দুকের সাহায্যে বরাহটিকে শিকার করিলেন বটে, কিন্তু সুচতুর ইংরেজ সরকার এই বন্দুকের গুলিকে অবলম্বন করিয়া স্বদেশীদের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য জমিদার রামবাবুর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলার সৃষ্টি করিলেন। সরকারী মামলার বক্তব্য হইল 'জমিদার রামবাবু বন্দুকের সাহায্যে সাহেবদের গুলি করিয়া মারিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে প্রায় ২০০ জন লোক ছিল।

মেদিনীপুর জজকোর্ট, কলিকাতা হাইকোর্ট এবং সর্বশেষ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট পর্যন্ত এই মামলা চলিয়াছিল এবং মামলা এমন গুরুতর অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল যে রামবাবুর ফাঁসীর রায়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু রামবাবু নির্ভীকচিত্ত হইয়া তাঁহার পক্ষে বিলাতের প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার ব্যারো সাহেবকে নিযুক্ত করিলেন এবং বহু অর্থব্যয়ে এই মামলা পরিচালনা করিলেন। রামবাবুর সত্যে নিষ্ঠা ও ন্যায়নীতির জন্য সমস্ত লোক তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং ভয়ও করিত।

কিছুকাল পরে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট কর্তৃক মামলার রায় প্রকাশ পাইল। এই রায়ে জমিদার রামবাবু নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইলেন এবং ইহাও আদেশ দেওয়া হইল তিনি তাঁহার এলাকায় সসম্মানে থাকিবেন এবং তাঁহার উপর তদানীন্তন সরকার কর্তৃক প্রযুক্ত কয়েকটি বিশেষ আইনও শিথিল করা হইল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া রামবাবুর ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা ও সাহসিকতার জন্য

তাঁহাকে প্রশংসাপত্র দিয়া সম্মানিত করিলেন। এই সাহসী বীর রামবাবুর জীবনদীপ নির্বাপিত হয় বাংলা ১৩০৯ সালে।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এই মহকুমার অপর এক নীরব স্বাধীনতা-সৈনিক ছিলেন ঘাটাল থানার রাধানগর মৌজার সতীশচন্দ্র মিশ্র। ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ১৩ই শ্রাবণ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বি. এ. পাঠরত অবস্থায় তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাকে শিক্ষা লাভ হইতে বিরত হন। আন্দোলনে যোগদান করা ছাড়াও তিনি নীরবে সাহিত্যসাধনা করিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু অপ্রকাশিত শ্যামাসংগীত, শ্যামসংগীত এবং নাটক আছে। নাটকগুলির কয়েকটির নাম: মারাঠি মেয়ে, চক্রধ্বংস, ক্ষত্রিয়রাক্ষস ইত্যাদি। প্রায় পাঁচশত গান ও তিনটি নাটকের পাণ্ডুলিপি তাঁহার পৌত্র শ্রীপ্রভাত কুমার মিশ্রের নিকট আজও রক্ষিত আছে। ১৩৭০ বঙ্গাব্দে ২৫শে বৈশাখ এই আত্মপ্রচারবিমুখ ব্যক্তিটির জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী:

L. S. S. O'Malley : District Gazetteer, Midnapore (1911)
নীহাররঞ্জন রায়: বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (১৩৫৬)
যোগেশচন্দ্র বসু: মেদিনীপুরের ইতিহাস (১৩২৮)
Pramode lal Pal : Early History of Bengal, Vol I & II (1940)
বিধুভূষণ ভট্টাচার্য: হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস (১৩৩২)
সারদাচরণ মিত্র: উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১৩২৪)
Ghatal Municipality : Centenary Souvenir (1869—1969)
সতীশচন্দ্র রায়: সংশপ্তক সতীশচন্দ্র (১৩৭৫)
পঞ্চানন রায়: দাসপুরের ইতিহাস (১৩৬৫)
J. Rennell : Map of Bengal (1767—1774)
'সাহিত্য ও সংহিতা' পত্রিকা (১৩১২)
'মেদিনীবাণী' পত্রিকা: মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৪৫ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৪৭

'প্লেগের মামলা' অংশটি অজিতকুমার ভৌমিক প্রদত্ত তথ্য হইতে রচিত।

তৃতীয় অধ্যায়

জনসাধারণ ও জনসমাজ

ইতিপূর্বে ভূমি ও প্রকৃতির আলোচনাশেষে এই দুইটির তৃতীয় বা বর্তমান মালিক জনসাধারণ ও রাষ্ট্র ইহা বলা হইয়াছে। রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান শক্তি জনসাধারণ। বর্তমান পরিচ্ছেদে এই মহকুমার জনসমীক্ষা ও সমাজব্যবস্থার দিকটিকে সংক্ষেপে তুলিয়া ধরা যাইতেছে।

থানাবিভাগ ও মহকুমার উৎপত্তিঃ

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ইংরেজদের সৃষ্ট তিনটি থানা লইয়া এই মহকুমা গঠিত—(১) দাসপুর, (২) ঘাটাল ও (৩) চন্দ্রকোণা। থানার কার্যালয়গুলি পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও যথাক্রমে দাসপুর, ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা শহরেই রহিয়াছে।

অবশ্য আজ হইতে একশ বছরের কিছু বেশি আগে ঘাটাল মহকুমা বলিতে বর্তমানে যে ভূভাগকে বোঝায় তাহা ছিল না। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ঘাটাল নামক মহকুমাটির জন্মই হয় নাই। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানা বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ জেলার কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া হুগলি জেলা গঠিত হইলে এই দুইটি থানা ঐ জেলার অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ক্ষীরপাই মহকুমা নামে কথিত হয়। বর্তমান চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত ক্ষীরপাইয়ে তখন মহকুমার কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে ক্ষীরপাই হইতে মহকুমার কার্যালয় জাহানাবাদে স্থানান্তরিত হয়। ইহা বর্তমানে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমা।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রকোণা থানার অধিবাসীদের ফৌজদারী সংক্রান্ত বিষয়গুলি মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন করিবার ব্যবস্থা হইলে এই থানা হুগলি জেলা হইতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হইলেও ঘাটাল থানার ফৌজদারী ও রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় দুটি এবং এই থানার শুধুমাত্র রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়গুলি হুগলি জেলার কর্তৃত্বাধীনেই থাকে। ঘাটাল থানার ফৌজদারী বিষয়গুলি ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত হুগলি জেলার কর্তৃত্বাধীনে থাকে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইহা গড়বেতা মহকুমা নামে পরিচিত ছিল এবং মহকুমার কার্যালয়াদি গড়বেতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট হইতে ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানার ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় বিষয়ই গড়বেতা মহকুমার অধীন হয় এবং এই মহকুমা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' রচয়িতা যোগেশচন্দ্র বসু বলিয়াছেন ঃ

"১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে এই মহকুমার কার্যালয়াদি গড়বেতায় প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহা 'গড়বেতা মহকুমা' নামে অভিহিত হইত। পরে হুগলি জেলা হইতে চন্দ্রকোণা পরগণা বিচ্ছিন্ন করিয়া এই জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে, ঘাটাল সহর এই মহকুমার প্রধান সহর বলিয়া গণ্য হয় এবং গড়বেতা মহকুমার পরিবর্তে এই মহকুমা 'ঘাটাল মহকুমা' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত যখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর ছিলেন, সেইসময় ঘাটালের ফৌজদারী কার্যালয় একবার কিছুদিনের জন্য গড়বেতায় উঠিয়া গিয়াছিল। (১৮৯২)" (পৃষ্ঠা—৫৩, ১৩২৮ সংস্করণ)।

দাসপুর থানা কিন্তু ঘাটাল মহকুমার সঙ্গে যুক্ত হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী। তার আগে এই থানা মেদিনীপুর সদর মহকুমার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সে সময়ে বাংলার গভর্ণর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় দেওয়ানী আদালত আইনের (ষষ্ঠ) ১০ নং ধারা অনুসারে এই থানাকে মেদিনীপুর ও তমলুকের বিচার্য এলাকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঘাটাল দেওয়ানী আদালতের এলাকাভুক্ত করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হাণ্টার সাহেবের A Statistical Account of Bengal, Vol III গ্রন্থে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে অঙ্কিত বর্ধমান বিভাগের মানচিত্রের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার যে চিত্র আছে তাহাতে মেদিনীপুর জেলার ৪টি মহকুমার মধ্যে দাসপুর থানাকে মেদিনীপুর সদর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং গড়বেতা মহকুমা-সহর রূপে চিহ্নিত আছে। অতএব বোঝা যাইতেছে, ঘাটাল তখনও মহকুমা সহর হইয়া উঠে নাই এবং মহকুমা বলিতে তখন গড়বেতা মহকুমাকেই বোঝাইত। ইহার এলাকা গড়বেতা, নয়াবসত, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, ঘাটাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ঘাটাল শহর এলাকায় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল সর্বপ্রথম মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইলে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গড়বেতা মহকুমা রূপান্তরিত হইয়া ঘাটাল মহকুমায় পর্যবসিত হয়। গড়বেতার শেষ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট যদুনাথ বসু এবং ঘাটালের সর্বপ্রথম মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন হরিমোহন সেন। পরের বছর দাসপুর থানা এই মহকুমার সহিত যুক্ত হয় এবং গড়বেতা থানা মেদিনীপুর সদর মহকুমার সহিত যুক্ত হয়। এইভাবে বর্তমান ঘাটাল মহকুমার জন্ম হইয়াছিল। দাসপুর থানার সরবেড়িয়ার আদালতটি এই সময় ঘাটালে উঠিয়া আসিয়াছিল। পূর্বে সোনাখালি ও কল্মিজোড়েও থানা ছিল।

ইহার বহু পূর্বে এই অঞ্চলের অবস্থা ও সীমা কিরূপ ছিল তাহা বর্তমান গ্রন্থের 'ইতিহাস' নামক পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

প্রাচীন পরগণাবিভাগ ও ঘাটাল মহকুমা ঃ

মুসলমান আমলে ক্ষুদ্রতম সরকারী বিভাগ ছিল পরগণা। চন্দ্রকোণা, বরদা, চেতুয়া, তপ্পে নাড়াজোল পরগণাগুলি সমগ্র এবং কাশীযোড়া, জাহানাবাদ ও মণ্ডলঘাট পরগণাগুলির কতকাংশ, ভূরস্থট, ব্রাহ্মণভূম ও বগ্‌ড়ী পরগণার কিয়দংশ লইয়া এই মহকুমা গঠিত। পরগণাগুলির আয়তন ঃ চন্দ্রকোণা ১২৪'০৪ বর্গমাইল, চিতুয়া বা চেতুয়া ১০৪'১৯, বরদা ৭৯'১৫, জাহানাবাদ ৩'৯৭ (?), মণ্ডলঘাট ৩৬'২১, খারিজা মণ্ডলঘাট ১৩'৯২, তপ্পে নাড়াজোল ১১'৯৬, কাশীযোড়া ১১৯'০৪, কিস্মৎ কাশীযোড়া ০'৪৭, বগ্‌ড়ী ৪৪৫'৮৩, ব্রাহ্মণভূম ৯৩'৬৬, ভূরশুট ১'৭৪। মনে হয়, বগ্‌ড়ী ও ব্রাহ্মণভূমের প্রদত্ত আয়তনের কিয়দংশ ও ভূরশুটের প্রদত্ত সমগ্র আয়তন এই মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। এই মহকুমার কোন নদীগর্ভে ভূরশুটরাজ উদয়নারায়ণের লিপিযুক্ত মন্দির দেখা গিয়াছিল। কুতুবপুর পরগণার চল্লিশটি গ্রাম লইয়া তপ্পে নাড়াজোল পরগণা গঠিত হইয়াছিল।

কেতুবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রকেতুর নামানুসারে চন্দ্রকোণা, বিশালাক্ষী বা অনুরূপ দেবীর নাম হইতে বরদা, বগ্‌ডীরাজ চিত্রসিংহ বা চেৎসিংহের নাম হইতে চেতুয়া, সেনবংশীয় বিখ্যাত বল্লাল সেনের মহামাণ্ডলিক বর্তমান দাসপুর থানার মহিষঘাটা গ্রামবাসী মহেশ মণ্ডলের নাম হইতে সম্ভবত মণ্ডলঘাট পরগণার নামকরণ হইয়াছে। ১৭৬৭ হইতে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রেনেল্‌ সাহেবের নেতৃত্বে যে জরীপ কার্য সারা বাংলাদেশে হয়, তাহাতে এই অঞ্চলের (অন্যান্য সব স্থানের মতো) পরগণাগুলির মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। প্রাচীন তুলট কাগজে লিখিত কয়েকটি নথিপত্রে এই অঞ্চলের কোন কোন পরগণা ও তদন্তর্ভুক্ত গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ধরণের বাং ১১৮৯ সালের জলদান আদায়ের একটি ফর্দে বরদা পরগণার ১২৮টি গ্রামের নাম পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রামের নাম এখনও চলিত আছে। অবশ্য পরগণা বর্তমানে নামেমাত্র থাকিলেও থানাবিভাগ অনুসারেই বর্তমানে শাসনকার্য নির্বাহিত হয়।

থানার উপ-বিভাগ ঃ

প্রতিটি থানা আগে ইউনিয়নে বিভক্ত ছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এখন প্রতি থানার অন্তর্গত সমষ্টি বা ব্লক এবং প্রতিটি ব্লকের অধীন কয়েকটি অঞ্চল ও প্রতিটি অঞ্চলের অধীন কয়েকটি গ্রাম আছে। প্রতিটি থানায় এক বা একাধিক ব্লক অবস্থিত।

লোকসংখ্যা :

১৯৭১ সালের শেষ আদমসুমারী (Census) অনুসারে সমগ্র ঘাটাল মহকুমায় মোট ৬৯২টি মৌজায় মোট জনসংখ্যা ছিল ৫,৪৪,১৫৩। এই ৬৯২টি মৌজার মধ্যে অবশ্য ৩৩টি মৌজা জনবসতিহীন। জনসংখ্যা গত পাঁচবছরে নিশ্চয়ই আরও বাড়িয়াছে, তবে তাহার সঠিক পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায় নাই। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে মহকুমার এই তিনটি থানার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪,২২,০২৯ অর্থাৎ ১৯৬১ ও ১৯৭১ এর দশ বছরের মধ্যে মোট ১,২২,১২৪টি শিশুর জন্ম হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, এই দশ বছরে মহকুমায় শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ জনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এইরূপ জনবৃদ্ধি গড়পড়তা ধরিয়া লইলে ১৯৭১ সালের লোকগণনা হইতে গত পাঁচ বছরের মধ্যে এই মহকুমায় আরও প্রায় ৭০ হাজারের মতো জনবৃদ্ধি হইয়াছে। অর্থাৎ সমগ্র মহকুমায় ৬ লক্ষ ৩০ হাজারের মতো লোকসংখ্যা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে সরকারী পরিবার পরিকল্পনার প্রসারের ফলে প্রায় প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাম-গ্রামান্তরে জনসংখ্যা সীমিত করার যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে এতখানি জনবৃদ্ধি সম্ভবত হয় নাই।

এই মহকুমার অন্তর্গত দাসপুর, ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানার প্রতিটির গত দুইটি আদমসুমারী অনুসারে লোকসংখ্যার একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হইল এবং একশ বছর আগে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ বিভারলির নেতৃত্বে যে লোকগণনা হয়, তাহারও এক বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে এই দেশে জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি কতকটা জানা যাইবে :

(ক) **দাসপুর থানা :**

১৯৬১ (মোট জনসংখ্যা)	১৯৭১ (মোট জনসংখ্যা)	মোট মৌজা	পরিত্যক্ত বা জনবসতিহীন মৌজা	শহর ও তাহার জনসংখ্যা
১৯১,৫২৪	২৩৭,৯৪৪	২৪৮	৫	নাই

এই থানার সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ও জনবসতিপূর্ণ মৌজা চাঁইপাট (মৌজা নং ২১৬)। ১৯৭১ এর সেন্সাসে ইহার লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৯,৫৬৮ এবং ১৯৬১ এর সেন্সাসে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৮,৫৪৩। আয়তন ২৫৭৮ একর। দ্বিতীয় ঘনবসতিপূর্ণ মৌজা জোতঘনশ্যাম (নং ২৪০)। জনসংখ্যা ৯,০৪৬ (১৯৭১) এবং ৮৭৯০ (১৯৬১)। আয়তন ১৯৩৮ একর। রাণীচক (নং ২১৩) তৃতীয় ঘনবসতিপূর্ণ মৌজা। জনসংখ্যা ৪৬১৬ (১৯৭১) ও ৪১৪৮ (১৯৬১)।

আয়তন ৯৬৫ একর। চতুর্থ ঘনবসতিপূর্ণ মৌজা জোতকান্থুরামগড় (নং ২১২)। জনসংখ্যা ৩৮৫৭ (১৯৭১) ও ৩১৫৯ (১৯৬১)। আয়তন ৮৫১ একর। পঞ্চম মৌজা নিশ্চিন্তপুর (নং ২৩০) জনসংখ্যা ৩,৪৩৫ (১৯৭১) ও ৩৭৭৯ (১৯৬১)। আয়তন ১,০৯৪ একর। নিশ্চিন্তপুরের জনসংখ্যা দশ বছরে কিছু কমিয়া গিয়াছে। ইহার পর কুলটিকরির (নং ২৪১) স্থান। জনসংখ্যা ৩,৩০৯ (১৯৭১) ও ২,৮০৬ (১৯৬১)। আয়তন ৮৮০ একর। পরে গোৌরা (নং ৮০)—২,৯৯৫ (১৯৭১) ও ২,২৩৩ (১৯৬১) আয়তন ৯১৩ একর এবং পলাশপাই—২,৯৬৯ (১৯৭১) ও ২,১৪৪ (১৯৬১) এবং আয়তন ৬৯১ একর।

এই থানার ক্ষুদ্রতম জনসংখ্যা লক্ষ্য করা যায় গোব্‌রাকুণ্ডু মৌজায় (নং ২১)। জনসংখ্যা ৪৬ (১৯৭১) ও ২৪ (১৯৬১)। ইহার পরেই শিমূলতলার (নং ৫২) স্থান। জনসংখ্যা ৯৫ (১৯৭১) ও ৭৩ (১৯৬১)। এই দুটি মৌজাই শিলাই-তীরবর্তী, তবে দ্বিতীয়টির আয়তন খুবই কম। মাত্র ৪৯ একর।

এই থানার দাসপুর (নং ৬০), গোৌরা (নং ৮০), খুকুড়দহ (নং ১৫০) প্রভৃতি মৌজাগুলি ক্রমশ শহরে পরিণত হইতেছে এবং এই সব স্থানে জনবসতিও বেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। গত কয়েক বছরে দাসপুর সহরাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। এখানে কয়েকটি সরকারী কার্যালয় ও একটি ব্যাঙ্কও স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯৬১ সালে এই স্থানের লোকসংখ্যা ছিল ১,০৪০, ১৯৭১ সালে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৯১৫ তে। সম্ভবত শহর গড়িবার জন্য পুরানো বাসিন্দাদের উৎখাত করার ফলে লোকসংখ্যা কিছু কম দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য, দাসপুরের মোট ভূমি পরিমাণ ২০১ একর মাত্র। ইহার পার্শ্ববর্তী কিছু কিছু স্থানও দাসপুর নামে পরিচিত হইতেছে।

এই থানার জনবসতিহীন গ্রাম:

(১) বালকরাউত—১৯৬১ ও ১৯৭১ কোন সময়েই এখানে লোকবসতি গড়িয়া উঠে নাই। মৌজা নং ৯৩। ভূমিপরিমাণ মাত্র ৭৬ একর। ইহার দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী গ্রাম, (২) বেহারীচক (নং ৯২), আয়তন ১০৫ একর এবং পশ্চিম পার্শ্ববর্তী বুজরুক-বৈকুণ্ঠপুরে (নং ৯৪) ১৯৬১ সালে কোন জনবসতি ছিল না। ১৯৭১ সালে সেইখানে বেশ জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসংখ্যা ৬০৫। আয়তন মাত্র ১১৮ একর অর্থাৎ প্রতি একরে প্রায় ৫ জন করিয়া লোকবসতি হইয়াছে। (৩) ১১ নং মৌজা দক্ষিণ ঝরিয়া—১৯৬১ ও ১৯৭১ কোন সময়েই লোকবসতি ছিল না। আয়তন ৩৪৩ একর। এই স্থানটির চারপাশ নদীনালা বেষ্টিত এবং বর্ষায় খুবই দুর্গম হয়। (৪) ১৫ নং মৌজা মেটিয়াসরা দক্ষিণ

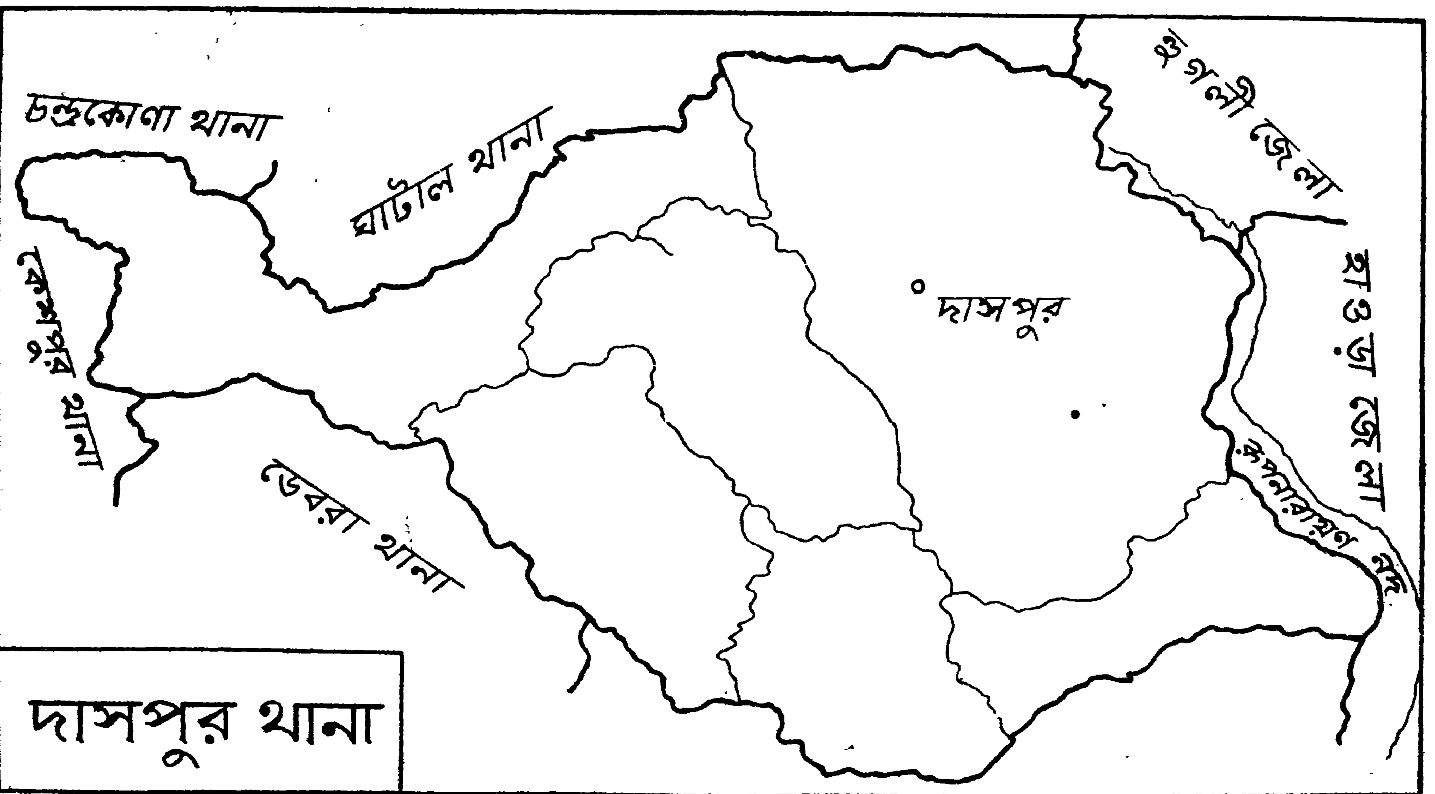
ঝরিয়ার ঠিক পূর্ব পার্শ্ববর্তী গ্রাম। বিগত দুই সালের মধ্যেও এখানে কোন লোকবসতি গড়িয়া উঠে নাই। এই স্থানের আয়তন মাত্র ৯৫ একর এবং ইহার পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সব দিক দিয়াই শিলাই নদী প্রবাহিত। বর্ষায় এই দুটি স্থান ভয়ঙ্কর দুর্গম ও বন্যাপ্লাবিত হয়। সম্ভবত সেইজন্যই এখানে কোন জনবসতি গড়িয়া উঠে নাই। এই দুটি গ্রাম দাসপুর-ঘাটাল থানার সীমান্তবর্তী এবং নিজনাড়াজোলের উত্তরে অবস্থিত। (৫) ৫ নং মৌজা উত্তর ঝরিয়াও দক্ষিণ ঝরিয়ার মতো জনবসতিহীন। ইহার আয়তন ৪৪১ একর। ইহারও বেশির ভাগ অংশ শিলাইয়ের খাল ও বুড়িগাং নদী বেষ্টিত এবং দুর্গম। অতএব ১৯৬১ ও ১৯৭১ কোন সময়েই এখানে লোকবসতি গড়িয়া উঠে নাই।

দাসপুর থানায় গত একশ বছরে জনসংখ্যা কখনও বাড়িয়াছে, কখনও বা কমিয়াছে লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যে লোকগণনা হয় তাহার ৬০ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া বরং কমই হইয়াছে দেখা যায়। ১৯৫১ সাল হইতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং তাহার পর হইতেই এই থানায় লোকসংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হাণ্টার সাহেবের A Statistical Account of Midnapur যখন প্রকাশিত হয়, তখন এই থানা মেদিনীপুর সদর মহকুমার অন্তর্গত ছিল, ইহা আগেই বলা হইয়াছে। হাণ্টার সাহেবের উক্ত গ্রন্থে দাসপুর থানা সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাহা উল্লেখ করা হইল :

থানা	আয়তন	গ্রাম/মৌজার মোট সংখ্যা	গৃহসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা
দাসপুর	(বর্গমাইল)			(১৮৭২)
(সদর মহকুমা)	১০৪	৩৭৯	২৪,০৪৪	১৩৬,৩৫৯

এই পরিসংখ্যানে আরও জানা যায় যে ঐ সময় প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা ১৩১১ জন লোক বাস করিত, প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা ৩'৬৪টি মৌজা ও গ্রামের অবস্থান ছিল এবং প্রতি মৌজা বা গ্রামে গড়ে ৩৬০ জনের বসতি ছিল। প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ২৩১টি গৃহ এবং প্রতি গৃহে ৫'৭ জন লোক থাকিত।

সাল	থানার মোট লোকসংখ্যা	সাল	থানার মোট লোকসংখ্যা
১৮৮১	১,১৫,২৬৯	১৯৩১	১,১৮,৩৭৯
১৮৯১	১,৩৩,৮৩০	১৯৪১	জানা যায় নাই
১৯০১	জানা যায় নাই	১৯৫১	১,৪০,৩৬৯
১৯১১	১,২৩,১৫৭	১৯৬১	১,৯১,৫২৬
১৯২১	১,১৯,০৮২	১৯৭১	২,৩৭,৯৪৪


চন্দ্রকোণা থানা
ঘাটাল থানা
হুগলী জেলা
হাওড়া জেলা
দাসপুর
রূপনারায়ণ নদ
কেশপুর থানা
ডেবরা থানা
দাসপুর থানা

চন্দ্রকোণা থানা

শহরাঞ্চল

হুগলী জেলা

রামজীবনপুর

চন্দ্রকোণা

ক্ষীরপাই

গড়বেতা থানা

ঘাটাল থানা

কেশপুর থানা

দাসপুর থানা

ঘাটাল থানা

শহরাঞ্চল

হুগলী জেলা

খড়ার

ঘাটাল

চন্দ্রকোণা থানা

দাসপুর থানা

এই তালিকা হইতে জানা যায় ১৮৭২ সালের পরবর্তী ১০ বছরে থানার লোকসংখ্যা ২১,০৯০ জনে কমিয়াছে। সম্ভবত ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা রোগের প্রাদুর্ভাবের ফলে লোকসংখ্যা এইরূপ অস্বাভাবিক কমিয়াছিল। পরবর্তী দশ বছরে আবার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। বর্তমান শতকের সুরুতে ঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও ১৯১১, ১৯২১ ও ১৯৩১ সালের জনসংখ্যা দেখিয়া অনুমান করা যায় সেইসময় জনসংখ্যা বরং কমের দিকেই যাইতেছিল। ১৯৪১ সালেও আশানুরূপ বৃদ্ধি হয় নাই মনে হয়। কিন্তু ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৭১ পর্যন্ত পরবর্তী ২০ বছরে আনুপাতিক হার কম নয়। সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে ১৯৬১ সালে। ১৯৭১ সালে বৃদ্ধি ১৯৬১ সালের তুলনায় কিছুটা কম দেখা যায়। ১৮৭২ হইতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই একশ বছরে থানায় লক্ষাধিক লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(খ) ঘাটাল থানা ঃ

হান্টার সাহেবের উক্ত গ্রন্থে গড়বেতা মহকুমার অন্তর্গত এই থানার ১৮৭২ সালের জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে যে পরিসংখ্যান দেওয়া আছে তাহা উল্লেখ করা হইল ঃ

	আয়তন	মৌজাসংখ্যা	গৃহসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা
ঘাটাল থানা) ঃ (গড়বেতা মহকুমা) ঃ	৯১ বঃ মাঃ	১৯১	১৮,৩৯৬	১০২,৭৪২

গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ১১২৯ জনের বাস, মৌজা ২'১০, প্রতি মৌজায় গড়ে ৫৩৮ জনের বাস, প্রতি বর্গমাইলে গৃহসংখ্যা গড়ে ২০২ এবং প্রতি গৃহে ৫'৬ জনের বাস ছিল।

১৯৬১ ও ১৯৭১ সালের জনসংখ্যা ইত্যাদি

মোট মৌজাসংখ্যা	জনবসতিহীন মৌজা	জনসংখ্যা (১৯৬১)	(১৯৭১)
১৫৭	৮	১১৪,৪৬৯	১৪৯,৩৫৮

এই থানার জনবসতিশূন্য মোট মৌজা ৮টি ঃ

(১) অযোধ্যাকুণ্ডু (জে. এল. নং ৩৬। ১৯৬১ ও ১৯৭১ কোন সময়েই জনবসতি ছিল না) আয়তন ২৯১ একর।

(২) বৃন্দাবনচক (নং ৩৫, দুই সালেই জনবসতিহীন) ঃ আয়তন ১৯০ এঃ

(৩) গামারিয়া (নং ১০৫/১৫৭, দুই সালেই জনবসতিহীন)ঃ আয়তন জানা যায় নাই

(৪) কৃষ্ণনগর (নং ১৪৬, কোন সালেই জনবসতি নাই) : আয়তন ১১২ এঃ

(৫) ক্ষুদ্রমনোহরপুর (নং ১০৩, কোন সালেই জনবসতি নাই) : আয়তন ৫৯ এঃ

(৬) পাথরচক-গোবিন্দপুর (নং ১৫০), ১৯৬১ তে ১ জন ও ১৯৭১ এ জনবসতিহীন, আয়তন ১৩৩ এঃ

(৭) রঘুনাথকুণ্ডু (নং ৫৮, কোন সময়েই জনবসতি নাই) : আয়তন ১৫৫ এঃ

(৮) ঠাকুরানীচক (নং ৬১, কোন সময়েই জনবসতি নাই) : আয়তন ১৮৮ এঃ

এই থানার ঘাটাল ও খড়ার পুরসভা এলাকার জনসংখ্যার কথা বাদ দিলে ঘনজনবসতিপূর্ণ স্থানগুলি হইল :

মৌজার নাম	আয়তন	জনসংখ্যা ১৯৭১	১৯৬১
(১) মনস্থখা (নং ২৫) :	১৩৮৬ এঃ	৪৮৬০	৩৭৮০
(২) গোপমহল (নং১৫৪) : ওরফে মনোহরপুর	১১৩৮ „	৩৪৯৪	২৫৮৭
(৩) প্রতাপপুর (নং ১৫২) :	৭৬৫ „	৩১৩৮	২২১৫
(৪) ইড়পালা (নং ১৭) :	৭২৫ „	২৯০১	২৩৪১
(৫) রাধানগর (নং ৭৮) :	৯২২ „	২৭০৯	১৯৮২
(৬) দীর্ঘগ্রাম (নং ৩৭) :	৮৫১ „	২৩৪৪	২০০৩
(৭) বক্তেশ্বরবাটি (নং ১৫৩) :	৬৯৫ „	২৩৩৬	১৭৮৪
(৮) শিলাবাজনগর(নং১৪৪):	৬৮৩ „	২২৫৫	৭১৬
(৯) বনহরিসিংহপুর(নং২৪) :	৪৫৮ „	২২৩৪	১২৩২

দেখা যাইতেছে, দাসপুর ও ঘাটাল থানার মধ্যে দাসপুরে যেখানে ১৮৭২ সাল হইতে ১৯৭১ সালের মধ্যে লক্ষাধিক লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে, ঘাটালে সেখানে ১৫৭টি মৌজায় লোকবৃদ্ধি হইয়াছে ৪৬,৬১৬ জন। এই থানার অল্প লোকবসতি-পূর্ণ স্থানগুলির কয়েকটির নাম—

মৌজার নাম	আয়তন	জনসংখ্যা (১৯৭১)	(১৯৬১)
(১) লালকুণ্ডু (নং ৩৪) :	২০০ এঃ,	৬৩	৫০
(২) ধর্মাপুর (নং ১২৫) :	১১৩ „	৮১	১২০
(৩) ভেড়িবলরামকুণ্ডু(নং ৬৭):	৪০৬ „	১২৯	৮৮৫
(৪) খড়িগেড়িয়া (নং ৯০) :	৭৬ „	১২৪	৭৯
(৫) গোপালনগর (নং ১১৮) :	১২৭ „	১২৮	৭২

ঘাটাল ও খড়ার মিউনিসিপ্যাল শহর ঃ

এই থানার অন্তর্ভুক্ত দুটি শহর ঘাটাল ও খড়ার। পুরসভার অধীন এই দুটি শহরের জনসংখ্যা ইত্যাদি উল্লেখ করা হইল ঃ

সাল	শহর (১)	জনসংখ্যা (মোট)	শহর (২)	জনসংখ্যা (মোট)
১৯৭১	ঘাটাল	২৭,৫৭০	খড়ার	৭২৬২
১৯৬১	ঐ	২১,০৬২	ঐ	৫৯০৯
১৯৫১	,,	১৬,১২৫	,,	৫০২৩
১৯৪১	,,	১৭,২২৬	,,	৫৫৭০
১৯৩১	,,	১২,৪০০	,,	৫৭৩৬
১৯২১	,,	১০,৭৭০	,,	৬৫৮০
১৯১১	,,	১২,০৬৪	,,	৮৮৩৯
১৯০১	,,	১৪,৫২৫	,,	৯৫০৮
১৮৭২	..	১৫,৪৯২	—	—

উপরি উল্লিখিত তালিকায় লক্ষ্য করা যায়, ঘাটাল শহরের লোকসংখ্যা যেমন একদিকে ১৯৪১ সাল হইতে (১৯৫১ সালে কম) ক্রমবর্ধমান, অপরদিকে খড়ারের জনসংখ্যা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। ১৯৩১—১৯৬১ পর্যন্ত খড়ারের জনসংখ্যা অল্পবিস্তর কমবেশি ছিল। ১৯৭১ হইতে ইহা আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘাটালের জনসংখ্যা ১৯০১ সালের তুলনায় ১৯৭১ সালে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, খড়ারে বরং ১৯০১ সালের অপেক্ষায় ১৯৭১ সালে জনসংখ্যা বেশ কমিয়াছে। কাঁসা-পিতল ব্যবসায়ের পতনের ফলেই সম্ভবত এই জনসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাসে ঘাটাল পৌরএলাকার জনসংখ্যার যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। উল্লেখ্য, এই সমীক্ষায় হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও উল্লেখ করা হইয়াছে। খড়ারের কোন পরিসংখ্যান জানা যায় নাই।

শহরের নাম	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	খ্রীষ্টান	অন্যান্য
ঘাটাল	১৫,৪৯২	১৫,১৩০	৩৬১	১	—

(গ) চন্দ্রকোণা থানা ঃ

১৮৭২ সালের সেন্সাস অনুসারে জনসংখ্যা ইত্যাদি

পরিমাণফল	মৌজা, গ্রামসংখ্যা	গৃহসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা
১২১ বর্গমাইল	২৭৮	২০,১৭৪	১০৬,৪৮০

এই থানা তখন গড়বেতা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ২·৩০টি গ্রাম ও জনসংখ্যা ৮৮০, প্রতি বর্গমাইল এলাকার প্রতি গ্রামে গড়ে ৩৮৩ জনের বাস, ১৬৭টি বাড়ি এবং বাড়িপ্রতি গড়ে ৫·৩ জনের বাস ছিল।

এই থানার ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালের সেন্সাস-প্রতিবেদনে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

মৌজা, গ্রামসংখ্যা	জনবসতিহীন মৌজা	মোট জনসংখ্যাঃ ১৯৭১	১৯৬১
২৮৭	২০ •	১৫৬,৮৫১	১১৬,০৩৬

জনবসতিশূন্য মোট মৌজা সংখ্যা ২০। এই মৌজাগুলির নামঃ

(১) শুড়ি পুষ্করিণী (১৬২), (২) তিলাড়া (৬০), (৩) সুবুধিচক (২০৬), (৪) শিরোমণিপুর, (৮২), (৫) সাতড়াগেড়িয়া (১৬৮), (৬) সঙ্করপতা (৮১), (৭) রানকানকি (১৩৬)—১৯৬১ সালে এখানে লোকসংখ্যা ৭৬ ছিল, (৮) রামগঞ্জ (১০৭), (৯) রামেশ্বরপুর (১৮), (১০) রাজমা (২৫), (১১) পরদেশিপাড়া (২৪১)—১৯৬১ সালে লোকসংখ্যা ছিল ৯, (১২) পড়ুয়া (২৫০), (১৩) মীরেরচক (১৭৩), (১৪) মাধবপুর (৯৪), (১৫) লাঙ্গলভাঙ্গা (১৩৯), (১৬) কুমারগঞ্জ (১০৮), (১৭) কৃষ্ণকুণ্ডা (১২৪), (১৮) কল্যাণচক (১২), (১৯) বড়বিলা (৭০), (২০) সাউবেড়িয়া (৩৬)—১৯৬১ সালে এখানের লোকসংখ্যা ছিল ২০।

১৯৬১ সালের লোক গণনায় নিম্নলিখিত মৌজা সমূহে কোন লোকবসতি ছিল না বলিয়া জানা যায়ঃ

(১) পাড়াহরি (৬১)—১৯৭১ সালে লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৯১
(২) পাণ্ডুয়া (১৫)— ,, ,, ,, ,, ১৭০
(৩) মদনচক (১৮৩)— ,, ,, ,, ,, ৭৯
(৪) বনকাটি (৫৩)— ,, ,, ,, ,, ৬০

চন্দ্রকোণা থানার ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর ও চন্দ্রকোণা শহরের পুরসভা এলাকার জনসংখ্যা বাদ দিয়া ঘনজনবসতিপূর্ণ স্থানগুলির নাম, আয়তন ও জনসংখ্যার উল্লেখ করা গেলঃ

মৌজা	আয়তন	জনসংখ্যা ১৯৭১	১৯৬১
(১) জাড়া (নং ১৫২)	১,৬০৫ এঃ	৩,৭৮৭	৩,১৫৮
(২) মংকুল (নং ১৭৬)	২,০৯০ এঃ	২,৯১১	২,৫২৮
(৩) ঝাকুরা (নং ২৩৫)	১,৫০৪ এঃ	২,৪০৪	১,৭২৫
(৪) বালা (নং ২৩৯)	১,৩৭৯ এঃ	২,৩৭৪	১,৭০৬

	মৌজা	আয়তন	জনসংখ্যা ১৯৭১	১৯৬১
(৫)	মাধবপুর (নং ১৭২)	১,৫৩৪ এঃ	২,০৬৯	১,৩৯১
(৬)	কৃষ্ণপুর (নং ৩৫)	৪২৮ এঃ	১,৯৫২	১,৬৪৫
(৭)	কেঁচ্‌কাপুর (নং ২৩৪)	১,০৫০ এঃ	১,৮৭৮	১,৩৯৩
(৮)	লক্ষ্মীপুর (নং ৩০)	৫২০ এঃ	১,৬২৯	১,১১৪
(৯)	মহেশপুর (নং ৪৮)	১৯৮ এঃ	১,৫৯৯	১,০৮৫
(১০)	ধান্যগাছি (নং ২৬৩)	১,২৫৬ এঃ	১,৫৬২	১,৪৬৫

চন্দ্রকোণা থানার জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ১৮৭২ সাল হইতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এখানে ১০০ বছরে জনসংখ্যা ৫০,৩৯১ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ঘাটালে বৃদ্ধি পাইয়াছে ৪৬,৬১৬ এবং দাসপুরে ১,০১৫৮৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিক হইতে এই মহকুমায় দাসপুর প্রথম, চন্দ্রকোণা দ্বিতীয় এবং ঘাটাল তৃতীয় স্থানের অধিকারী। অবশ্য চন্দ্রকোণা ও ঘাটালের ৫টি শহরের জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় এই দুইটি থানায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি এইরূপ হইয়াছে। দাসপুরের বৃহত্তম মৌজা চাঁইপাটের লোকসংখ্যা ঘাটালের মনস্থার দ্বিগুণেরও বেশি বা চন্দ্রকোণার জাড়ার লোকসংখ্যার প্রায় তিনগুণ। আয়তন ও মৌজার দিক দিয়া চন্দ্রকোণা থানা দাসপুর অপেক্ষা কিছু বেশি হইলেও জনসংখ্যার দিক হইতে দাসপুর চন্দ্রকোণার প্রায় দেড়গুণ। ২০০০ হাজারের অধিক লোকসংখ্যাযুক্ত মৌজা দাসপুরে ২৫টি, ঘাটালে ১০টি এবং চন্দ্রকোণায় মাত্র ৫টি। মোট মৌজাসংখ্যা যথাক্রমে ২৪৮, ১৫৭ ও ২৮৭। অবশ্য ১৮৭২ সালের সেন্সাসে হুগলি জেলার সীমান্তবর্তী চন্দ্রকোণা, ঘাটাল ও দাসপুরকে মেদিনীপুর জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনজনবসতিপূর্ণ অংশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পাঁশকুড়া ও তমলুকও ইহার অন্তর্ভুক্ত। তখন এই থানাগুলির প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা লোকসংখ্যা ছিল ৮৫০ এরও বেশি। (Statistical Account of Bengal, Vol III, The census of 1872, page 41, 1876 edition)

চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্ভুক্ত পৌরপ্রতিষ্ঠানযুক্ত তিনটি শহর—ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর ও চন্দ্রকোণা। নিম্নে এই তিনটি শহরের ১৮৭২ এবং ১৯০১—১৯৭১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার একটি পরিসংখ্যান পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল :

সাল	জনসংখ্যা	ক্ষীরপাই	রামজীবনপুর	চন্দ্রকোণা
১৮৭২	„	৮,০৪৬	১১,১৬৬	২১,৩১১
১৯০১	„	৫,০৪৫	১০,২৬৪	৯,৩০৯

সাল	জনসংখ্যা	ক্ষীরপাই	রামজীবনপুর	চন্দ্রকোণা
১৯১১	”	৪,৬০৫	৮,৪৮১	৮,১২১
১৯২১	”	৩,৭৫৬	৬,৭০০	৬,৪৭০
১৯৩১	”	৩,৬৯৩	৬,২৩০	৬,০১৬
১৯৪১	”	৩,৬২৩	৬,০৩৬	৬,৪১১
১৯৫১	”	৪,২৪৬	৭,৫৩৯	৫,৭১৭
১৯৬১	”	৫,৮০৩	৭,৬২১	৭,৩৮৩
১৯৭১	”	৭,০৭৫	১০,৩৬৪	৯,৮১১

উপরের তালিকা হইতে লক্ষ্য করা যায় যে এই তিনটি শহরের জনসংখ্যা মোটামুটিভাবে ১৯১১ সাল হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ক্রমশ কমের দিকে গিয়াছে এবং ১৯৬১ সাল হইতে তাহা আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৭১ সালে রামজীবনপুর ও চন্দ্রকোণা তাহাদের ১৯০১ সালের জনসংখ্যাকে অতিক্রম করিয়াছে এবং ক্ষীরপাই ১৯০১ সালের জনসংখ্যার প্রায় দেড়গুণ হইয়াছে। রাস্তাঘাট ও যাতায়াতের ক্রমবর্ধমান সুবিধাসুযোগ, সরকারি প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রভৃতির ফলেই এই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে মনে হয়। তবে বর্তমানে পরিবারপরিকল্পনার অল্পবিস্তর প্রসাবের ফলে ভবিস্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ততটা হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

মহকুমার গ্রাম-নামের বৈচিত্র্য :

এই মহকুমায় ৬৯২টি মৌজা ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি মৌজা। ঐ গ্রামগুলির নাম প্রধানত দেশজ, সংস্কৃত, বিদেশী ও মিশ্রশব্দ হইতে উৎপন্ন। নামকরণের কতকগুলি কারণ অনুসন্ধান করা যায়—(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ, (২) দেবতার স্মৃতিরক্ষা, (৩) রাজা, জমিদার বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের স্মৃতি, (৪) কোন ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণ। প্রথমজাতীয় গ্রামগুলির অনেকগুলিই বেশ প্রাচীন। দাসপুর থানায় এই শ্রেণীর অনেক গ্রাম-নাম আছে। ইহাদের কয়েকটির উল্লেখ করা হইল :

নাড়াজোল—ইহা অষ্ট্রিক শব্দজাত মনে হয়। অর্থ—নলখাগড়া জাতীয় উদ্ভিদ্ এবং জোল বা নালা। নড়জুলি > নাড়াজোল।

ডানিকল্লা, সুপাপুড়সুড়ি, সামাট, গুড়লি, ঝুমঝুমি, মেট্যাসরা, বাছড়াকুণ্ড, লাওদা, খাটবাড়ই, কলোড়া, চেঁচুয়া, সৌলান, খুকুড়দহ, কৈজুড়ি, বেল্লাই, আরিট, ডোঙ্গাভাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম-নামগুলি প্রথম জাতির মধ্যে পড়ে।

ঘাটাল থানার অন্তর্গত শান্তি, কলিসা, সসরাগেড়্যা, পাথরা, মরীচা, খড়িকা, আলুই, নতুক, বারাণ্ডী, ব্যাঙরাল, ম্যাণ্ডরাল, ঘোল এবং চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত আগর, বাদরা, ডিঙ্গাল, খারসা, গাংচা, খরসী, মাঙ্গরুল, মাড়, বেলাদণ্ড, নিচনা, মৌলা, মুইদা, মেটেদা, পাইকমাজিট্যা, পিঙ্গলাস প্রভৃতি গ্রামনামগুলিও এই জাতীয়।

এই মহকুমায় সংস্কৃতশব্দের গ্রাম-নাম বহু আছে। সাধারণত ইহাদের শেষে পুর, নগর ও বাটী যুক্ত থাকে। যেমন, শিরোমণিপুর, রঘুনাথপুর, প্রতাপপুর, গোবিন্দনগর, গম্ভীরনগর, ঘনশ্যামবাটী, রত্নেশ্বরবাটী, জগন্নাথবাটী প্রভৃতি। ইহা ছাড়া সংস্কৃতশব্দের আরও গ্রাম নাম—দেবকুল, রামসাগর, ধর্মসাগর, গঙ্গাপ্রসাদ, দীর্ঘগ্রাম, মূলগ্রাম, অর্জুনারি, কুশমান, বেলসার, মালঞ্চ, হরশংকর, বালা, কঙ্কাবতী, পঞ্চমহার, শাখা ইত্যাদি।

বিদেশী শব্দজাত গ্রামনাম—ফকিরবাজার, সেকেন্দারী, ফরাসডাঙ্গা, খাসবাড়, দেওয়ানচক ইত্যাদি। সংস্কৃত ও বিদেশীশব্দজাত মিশ্র নাম—মামুদপুর, হবিবপুর, হোসেনপুর, সুজানগর, ইয়াকুবপুর, বাহাদুরপুর, দৌলতপুর ইত্যাদি। দেশী ও বিদেশী শব্দজাত মিশ্রনাম: বাড়কাশিমপুর, ঘোলসাই, খলিসাকুণ্ডু, পরদেশীপাড়া, ফুলচক ইত্যাদি।

দেবতার নাম হইতে যেসব গ্রাম নামের উদ্ভব হইয়াছে—রাধাকান্তপুর, বাসুদেবপুর, ক্ষেপুত, গোপীনাথপুর, বেহারীচক, রাধাবল্লভচক, ধর্মপুর, কঙ্কাবতী, কৃষ্ণপুর, গোবিন্দপুর, লক্ষ্মীপুর, মল্লেশ্বরপুর, বাঁশুলিয়া, হরেকৃষ্ণপুর, রামকৃষ্ণপুর, শ্যামসুন্দরপুর, ভৈরবপুর ইত্যাদি।

রাজা অথবা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের স্মরণে গ্রামনাম—কল্যাণপুর (কুতুবপুর পরগণার রাজা কল্যাণ রায়ের নামে) জুবরাজপুর, হোসেনপুর (সম্ভবত গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ প্রসিদ্ধ চাঁদ খাঁ পীরের সন্ধানে দাসপুর থানার কাঁসাই ও কাঁকীতীরবর্তী এই স্থানে আসিয়াছিলেন। হোসেন শাহের রাজ্যকাল ১৪৯৩ খ্রীঃ—১৫১৯ খ্রীঃ), চাঁদপুর (চেতুয়া পরগণায় প্রসিদ্ধ চাঁদ খাঁ পীরের স্মরণে), রঘুনাথপুর (রঘুনাথ সিংহ নামে এক রাজার স্মরণে), শঙ্করপুর, সিংহচক (বিদ্রোহী শোভাসিংহের অথবা তাঁহার কোন পূর্বপুরুষ সিংহ উপাধিধারীর স্মরণে), কামুরামগড়, দুর্জয়ধাম, রানীচক, কুমারচক, মহিষঘাটা, রামেশ্বরপুর, বীরসিংহ, শোভাগঞ্জ (প্রসিদ্ধ শোভাসিংহের নামাঙ্কিত), হেমগঞ্জ, হেমন্তনগর, হেমনগর (শোভাসিংহের ভ্রাতা হেমন্তসিংহের নামানুসারে), বীরভানপুর (ভানরাজ বীরভানের নামে), হেমন্তপুর, মহারাজপুর, লালগড়, রামগড়,

রামজীবনপুর (ভানরাজত্বকালে জনৈক প্রসিদ্ধব্যক্তি রামজীবনের নামে), মাধবপুর, শিরোমণিপুর, হরিনারায়ণপুর (বীরভানের পুত্র হরিনারায়ণের নামে), হেমতপুর, মিত্রসেনপুর (ভানরাজ হরিনারায়ণের পুত্র মিত্রসেনের নামে), চন্দ্রকোণা (প্রসিদ্ধ চন্দ্রকেতুর নামে) ঘনরামপুর, সেকেন্দারপুর, রত্নেশ্বরবাটী, ঘনশ্যামবাটী, দলপতিপুর (বরদার প্রাচীন রাজা দলপৎ সিংহের নামে) ইত্যাদি এই প্রকারের বহু গ্রামনাম আছে।

কোন প্রসিদ্ধ স্থান, সেকালের কোন বাজার বা স্থান অথবা রাজধানী (যাহা বর্তমানে নাই) বা সামাজিক ব্যবস্থা বা ঘটনার স্মারক বহু গ্রামনাম এই মহকুমায় আছে। যেমন,—অযোধ্যা, অযোধ্যাকুণ্ডু, রানীর বাজার, বড়বাজার, নির্মলবাজার, আটঘরা, বাঙালীটোলা, ঠাকুরানীচক, আগ্রা, মুড়াকাটা, বৃন্দাবনপুর, বিষ্ণুপুর, রাজনগর ইত্যাদি।

দেবতার নামে কোন কোন গ্রামের নামকরণের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে। যেমন,—দাসপুর থানার ৬৩ নং মৌজা বাসুদেবপুর। বাসুদেব নামক প্রস্তরনির্মিত প্রাচীন ঠাকুরের নামে হইয়াছে জানা যায়। বাসুদেবপুর গ্রামের প্রাচীন ভট্টাচার্য-বংশের দৌহিত্র মহাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জ্ঞাতিবংশীয় রায়পরিবারে এখনও ঐ ঠাকুর পূজিত হইতেছেন। সম্ভবত একটি মন্দিরে দুটি মাঝারি আকারের পাথরের তৈরি বাসুদেব মূর্তি ছিল। ইঁদুরের গর্ত খুলিতে খুলিতে দুটি বাসুদেব মূর্তি পাওয়া যায়। উহার একটিকে পুকুরে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

দাসপুর থানার ৬৭ নং মৌজা রাধাকান্তপুর ঐ গ্রামের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-রায়বংশের গৃহদেবতা রাধাকান্তজীউ হইতে হইয়াছে। এই মৌজার গোপীনাথপুর গ্রামটি দাসবংশের দেবতা গোপীনাথজীউর নামানুসারে সম্ভবত হইয়াছে। ২২২ নং মৌজা উত্তরবাড় ও ২২৪ নং মৌজা দক্ষিণবাড়ের মিলিত নাম ক্ষেপুত ক্ষেপুতেশ্বরী দেবীর নাম হইতে হওয়া সম্ভব।

চন্দ্রকোণা থানার ১৮৯ নং মৌজা কঙ্কাবতী ও ১০০ নং মৌজা মল্লেশ্বরপুর যথাক্রমে দেবী কঙ্কাবতী বা কনকবতী এবং মল্লেশ্বর শিবের নামানুসারে হইয়াছে।

কোন বিশেষ গাছ, লতা, সব্‌জি প্রভৃতির উৎপত্তিস্থল হইতেও সেকালে তৎতৎস্থান ঐ নামে পরিচিত হইয়াছিল। তাহাই এখন বর্তমানে চলিয়া আসিতেছে—যেমন, বড়শিমুলিয়া বা বড়শিমলা, নবীন শিমুলিয়া বা নবীন শিমলা, বেলিয়াঘাটা—বেলগাছের কাছাকাছি ঘাট, পল্‌তাবেড়িয়া, মাছগেড়িয়া

—মাছে ভরা গেড়ে পুকুর, পাঁচগেছিয়া—পাঁচটি গাছ, মাকালপোতা বা মহাকালপোতা—মাখাললতা পূর্বে এইস্থানে প্রচুর হইত, চকদোগাছিয়া—কোন চৌমাথায় দুটি গাছ, চক মাদারিয়া—কোন চৌমাথায় 'মাদার' গাছ ছিল। ঘাটাল থানার ৬২ নং মৌজা দ্বন্দীপুরের অধীন সলাগেড়িয়া—সোলাগাছে ভরা গেড়ে পুকুর, নিমগেড়িয়া—নিমগাছের ধারের গেড়ে পুকুর, পাঁচ পুকুরিয়া (ঘাটাল থানার ১৪৯ নং মৌজা কাটানের অধীন গ্রাম)—পাঁচটি পুকুর, চন্দ্রকোণা থানার ১৯৬ মৌজা অর্জুনগেড়িয়া—অর্জুন গাছের কাছে গেড়ে পুকুর, ১৩৩নং মৌজা বারাসাত—বারোটি অশ্বত্থ গাছ, ২৬৮নং মৌজা কৈগেড়ে কৈমাছ ভরা পুকুর, ২০ নং মৌজা খেজুরবনী—খেজুরবন, ১২৫ নং মৌজা বেলগড়ে, ২০৪ নং মৌজা বেলডাঙ্গা—বেলগাছ, গেড়েপুকুর ও ডাঙ্গাজমি।

দাসপুর থানার ১৮৮ ও ২৪০ নং মৌজা যথাক্রমে ঘনশ্যামবাটী ও জোতঘনশ্যাম। এই দুটি মৌজা ঘনশ্যাম নামক কোন ব্যক্তির স্মৃতিসূচক। ঐরূপ নামের পর 'বাটী' ও 'চক' এবং আগে 'জোত' শব্দ এই মহকুমার প্রায় সব থানায় আছে। ঐগুলি কোন স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা তাঁহার সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করিতেছে। চন্দ্রকোণা থানার ৮৬ নং মৌজা ভগবানবাটী, দাসপুর থানার ১৬৮ নং মৌজা জোতভগবান ও ২৩৪ নং মৌজা ভগবানচক একই ব্যক্তিসম্পর্কিত হইতে পারে। চন্দ্রকোণা পরগণার কোন ব্যক্তির বা জোতদারের জমিজমা চেতুয়া পরগণায় থাকা খুবই স্বাভাবিক। ক্ষীরপাইয়ের হালদারদিগের জমিদারী চেতুয়ায় ছিল। পরে তাহা দাসপুর থানার ৮০ নং মৌজা গৌরার মণ্ডলদের হয়।

দাসপুর থানার ৩ নং ও চন্দ্রকোণা থানার ১৭১নং মৌজা দুটির একই নাম 'সীমানা' কোন সময় হয়তো কোন দুটি রাজ্যের সীমানা ছিল। ঘাটাল থানার ৪৮ নং মৌজা বীরসিংহের নামের সহিত হয়তো প্রচণ্ড বল বীরসিংহ নামে কোন রাজার নাম জড়িত। এইরূপ অনেক গ্রাম বা মৌজা আছে। সবগুলির উল্লেখ এখানে করা সম্ভবপর নহে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে ইহা বর্জন করিতে হইল।

সমাজ ঃ

(ক) জাতি ও বৃত্তি

জেলা বা মহকুমার ক্ষুদ্রতম অঙ্গ গ্রাম। সমাজ এই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মহকুমার অন্তর্গত থানা এক বা একাধিক 'ব্লক' বা সমষ্টি লইয়া গঠিত হইয়াছে। প্রতিটি

ব্লক কয়েকটি অঞ্চলের সমষ্টি এবং প্রতিটি অঞ্চল কয়েকটি গ্রাম ও মৌজার সমষ্টি। এই মহকুমায় প্রাচীন কাল হইতে নানা জাতি বসবাস করিয়া বিভিন্ন উপজীবিকার সাহায্যে জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ধর্মসম্প্রদায়ভেদে নানান্ জাতি এই মহকুমায় বাস করেন।

প্রথমে বর্ণহিন্দু: এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখ জাতীয়গণের বাস অল্পবিস্তর সব বর্ধিষ্ণু গ্রামাঞ্চলেই লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে এইদেশে ব্রাহ্মণগণ প্রধানত ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—রাঢ়ী, উৎকল, মধ্যরাঢ়ীয়, কনৌজ, বৈদিক ও বর্ণ। উৎকল শ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের বাস রাঢ়ী ও মধ্যরাঢ়ীয়ের প্রায় সমান। দাসপুর, ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা এই তিনটি থানায়ই ইঁহাদের বাস আছে। ইঁহাদের পদবীগুলি চক্রবর্তী, পাণ্ডা, অধিকারী, মিশ্র, পাণিগ্রাহী, সাণিগ্রাহী, পাহাড়ী, কর প্রভৃতি।

ব্রাহ্মণের পর দুই শ্রেণীর কায়স্থজাতি মহকুমার বহু গ্রামে বাস করেন। উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদের রায়, বসু, মিত্র, ঘোষ, সেন, সিংহ, দত্ত প্রভৃতি পদবী আছে। ইহা ছাড়া চৌধুরী, দাস, সরকার, পাল, বিশ্বাস প্রভৃতি পদবীধারী কায়স্থেরাও বহু গ্রামে বাস করেন। সদ্‌গোপজাতিও এই দেশের বহুস্থানে বসবাস করেন। ইঁহাদের ঘোষ, পাল, মণ্ডল প্রভৃতি পদবী আছে। দাসপুর থানার নাড়াজোল, গদাইপুর, নন্দনপুর প্রভৃতি স্থান সদ্‌গোপপ্রধান এবং তাঁহারা ঐসব স্থানের বর্ধিষ্ণু ও সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায়। বৈদ্যজাতিও এদেশের বহু স্থানে বাস করিয়া থাকেন। এই অঞ্চলে ইঁহাদের পদবী প্রধানত দাসবৈদ্য, দাস, সেন প্রভৃতি। ইহা ছাড়া ভাট জাতীয় এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাসও অল্প সংখ্যায় এদেশে আছে।

শূদ্রজাতীয়দের মধ্যে 'নবশাখ' নামে পরিচিত জাতি—কামার, কুমোর, গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক, তাম্বুলিবণিক, নাপিত, শাঁখারি, মালাকার, কাঁসারি, তেলি বা তিলি, ধোবা প্রভৃতি। গোপ বা গয়লাও বহুস্থানে বাস করেন। ময়রাদের সংখ্যাও এই মহকুমায় অল্প নয়।

মাহিষ্যজাতি মহকুমার প্রায় সব গ্রামেই বাস করেন। এইদেশে তাঁহারা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ইঁহাদের বহু প্রকারের পদবী লক্ষ্য করা যায়। তাহার মধ্যে কয়েকটির এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে, যেমন, মাইতি, বেরা, ভুঁইয়া, চরণ, পোড়্যা, মাণিক, সামন্ত, পাত্রা, ভৌমিক, চৌধুরী, মণ্ডল ইত্যাদি। দাসপুর থানায় মাহিষ্যজাতীয়েরা সর্বাধিক সংখ্যায় বাস করেন। ইহা ছাড়া কৈবর্ত, তন্তুবায় (গুঁই, নন্দী, দালাল প্রভৃতি

উপাধিধারী), বৈষ্ণব, শুকলি, চিত্রকর বা পটীদার, সূত্রধর বা ছুতার, বারুই, বাগ্‌দি, ঢুলে, হাড়ি, ডোম, মুচি প্রভৃতি জাতিও কমবেশি এই মহকুমার বহু স্থানে বাস করেন। এই দেশে উড়িষ্যার 'খণ্ডাইৎ' জাতি লক্ষ্য করা যায় না। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল ছাড়া মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম বা দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের ন্যায় লোধা, রাজবংশী, মাহিলী প্রভৃতি জাতিরা এদিকে বাস করেন না। নায়েক, কূর্মী প্রভৃতি জাতিরাও এদেশে থাকেন না।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সুন্নী ও শিয়া এই দুই জাতীয় মুসলমান সম্প্রদায় বেশ কিছু গ্রামাঞ্চলে বাস করেন। সুন্নী সম্প্রদায়ের চারটি ও শিয়া সম্প্রদায়ের বারোটি উপবিভাগ আছে। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা এই দেশে একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। পূর্বে রেশম ও নীলকুঠির প্রসারেব যুগে এই মহকুমার বহু গ্রামে বিদেশীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করিতেন। ইঁহারা দাসপুর থানার গুড়লি, সুরতপুর, কল্‌মিজোড়, মহেশপুর, কুঞ্জপুর এবং ক্ষীরপাই, রাধানগর, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন। চন্দ্রকোণা ও ক্ষীরপাইয়ে পূর্বে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক ছিলেন। ইঁহাদের অনেকে তন্তুবায় জাতীয় এবং 'শরাক' নামে পরিচিত ছিলেন। এখন ইঁহারা সকলে ঐ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তন্তুবায় জাতীয়দের আশ্বিন উত্তরকুল, শিবকুল, শরাক, যোগী ও জোলা এই কয়েকটি শ্রেণী আছে। ইঁহাদের মধ্যে শরাকেরা আগে বৌদ্ধ ছিলেন। শরাক শব্দটি 'শ্রাবক' শব্দ হইতে জাত। পূর্বে বৌদ্ধ গৃহীদিগকে শ্রাবক বলা হইত এবং শ্রমণেরা ছিলেন ভিক্ষুসন্ন্যাসী। এখন ইঁহারা হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত। অবশ্য দেবপূজার জন্য ইঁহাদের পৃথক ব্রাহ্মণ আছেন। বৈশাখী পূর্ণিমা বুদ্ধপূর্ণিমা। ঐ তিথিতে শরাকদের ঘরে কুলপূজা হইয়া থাকে। কুলপূজা মানে ভগবান বুদ্ধের পূজা। কুলপূজার একটি মন্ত্র নিম্নে উদ্ধার করা হইল :

"ওঁ হুঁ নমো বুদ্ধায় বৌদ্ধায় সর্বারিষ্টদায়ক দায়ক নাশকায় বিষ্ণুরূপায়
তথা গডায় ধারকায় মাহুতং নমস্তে বুদ্ধদেবায় নমঃ" ॥

পূর্বে চন্দ্রকোণার অযোধ্যার বর্ধনবংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহাদের একজনের বাড়িতে একটি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি ছিল। পরে ইঁহারা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাসপুর থানার কিশোরপুর প্রভৃতি গ্রামে পূর্বে 'বাইতি' নামে এক জাতি বাস করিতেন। মাতুর, মসলন্দী প্রভৃতি তৈয়ারী করাই ইঁহাদের উপজীবিকা ছিল। হাণ্টার সাহেবের Statistical Account of Midnapur (1876) গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় হিন্দু জাতীয়ের (৮০)-সংখ্যায় বলা হইয়াছে, "Ba'iti,

makers of fine floor matting ; 1982 in number"। বর্তমানে এই মহকুমায় ইহাদের বাস সম্ভবত'নাই।

উল্লিখিত এই সমস্ত জাতির বৃত্তি বা উপজীবিকা পূর্বে বিভিন্ন ছিল। তখন সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও ভাট উচ্চ জাতীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ব্রাহ্মণের প্রধান উপজীবিকা ছিল পৌরোহিত্য ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা। অনেকে জমিদার এবং কিছু কিছু সরকারি ও বেসরকারি কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। কায়স্থের উপজীবিকা ছিল সরকারি কাজ ও জমিদারির রাজস্ব সংগ্রহ। কেউ কেউ অভিজাত জমিদার এবং অপরে উচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। বৈদ্যেরা পুরুষানুক্রমে চিকিৎসক, কেহ কেহ পরে চিকিৎসা ছাড়িয়া সরকারি কর্মচারী, জমির মালিক প্রভৃতি হইতেন। ভাটদের সম্পর্কে হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন : (তাহারা) "heralds and bards. Their profession is to carry letters of invitation on occasions of marriages and funeral obsequ es. They claim to be fallen Brahmans, and wear the sacred thread ; but it is doubtful whether they have any well-founded claim to Brahmanhood" অর্থাৎ ভাটেরা বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণপত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। হাণ্টার সাহেবের Ethnical Division of population তালিকায় অবশ্য বৈদ্য, ভাট ও কায়স্থ জাতিকে 'Intermediate castes' বা মধ্যশ্রেণীয় জাতিরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

নানাশ্রেণীর বৃত্তি বা উপজীবিকার ভিত্তিতে সেকালে হিন্দুগণ বিভক্ত ছিলেন, যেমন, বণিকসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, বণিয়া, গন্ধবণিক, আগরওয়ালা ও মাড়ওয়ারি এবং ক্ষত্রি। হাণ্টার সাহেবের তালিকায় পেশা বা বৃত্তির উপর নির্ভরশীল জাতিসমূহের উল্লেখ আছে। নিম্নে তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল :

কৃষকসম্প্রদায়—আগুরী, বারুই, দোলুই, ঘড়ুই, কৈবর্ত, কৃষাণ, সদ্গোপ, প্রভৃতি।

শিল্পিসম্প্রদায়—চিত্রকর, দরজি, কামার, কুমার, শাঁখারি, সূত্রধর, তেলি, কলু, কাঁসারি ইত্যাদি।

তাঁতিসম্প্রদায়—জোলা, সুকলি, তাঁতি ইত্যাদি।

শ্রমজীবী—নাইক, সামন্ত, চুনারি প্রভৃতি।

ব্যক্তিগত কর্মে নিযুক্ত সম্প্রদায়—বেহারা ও দুলিয়া, ধোবা, নাপিত, কাহার, প্রভৃতি।

মৎস্যব্যবসায়ে নিযুক্ত—জেলিয়া, কেউট, তিওর প্রভৃতি।

মিষ্টান্নব্যবসায়ী—মদক

গোসেবায় নিযুক্ত—গোয়ালা

নিম্নকথিত সম্প্রদায় হিন্দুজাতীয় হইয়াও জাতিভেদে বিশ্বাস করেন না—

অঘোরী, বৈষ্ণব ইত্যাদি।

এই মহকুমায় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত বহু ব্যক্তি আছেন। তাঁহাদের বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে।

সাম্প্রতিককালে উল্লিখিত এইসব জাতিরা স্ব-স্ব বৃত্তিগত কাজে নিযুক্ত না থাকিয়া প্রধানত কৃষিকার্য ও বাণিজ্যে ব্যাপৃত আছেন। এই মহকুমায় উল্লিখিত প্রায় সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সাধারণ উপজীবিকা কৃষি। ইঁহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা শ্রেণীর কৃষক আছেন। ক্ষুদ্র কৃষকেরা কৃষি ছাড়াও অন্যান্য কিছু কিছু কাজ করেন, যেমন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান, জমি জরিপ, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি। শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় খুব কমই এই মহকুমায় আছেন। ইঁহাদের সংখ্যা নগণ্য। এমনকি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের অনেকে কৃষিকার্যও করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী ব্যক্তির সংখ্যাও কম নয়। বৃত্তিমূলক কর্মে নিযুক্ত যেমন, চিকিৎসক, যন্ত্রবিদ্ প্রভৃতি ব্যক্তিগণও এই দেশে আছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার তুলনায় মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। চিকিৎসকদের দুইটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়—(১) বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান হইতে উপাধি বা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এবং (২) ঐরূপ কোন প্রবীণ চিকিৎসকের নিকট শিক্ষা পাইয়া বিনা উপাধিতে চিকিৎসা-কর্মে রত। দ্বিতীয় শ্রেণীর চিকিৎসকের সংখ্যাই এই মহকুমায় অধিক। ইঁহাদের অনেকের রোগীর সংখ্যাও কম নয়। এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতির উভয় চিকিৎসকই এইদেশে আছেন। পূর্বে কিছু কিছু কবিরাজী চিকিৎসাও চলিত ছিল। এখন তাহা কমিয়া গিয়াছে।

সেকালের নানা কুটির শিল্পে নিযুক্ত শিল্পিসম্প্রদায়ের বেশির ভাগই আজ সেইসব শিল্পকর্ম ছাড়িয়া কৃষিকার্যে বা দৈনিক মজুরীতে শ্রমসাধ্য নানা কর্মে জীবনধারণের তাগিদে নিযুক্ত হইয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ এখনও পৈতৃক কর্ম ছাড়িয়া দিতে পারেন নাই। সেকালের সূত্রধর বা ছুতার জাতি মন্দির ও পোড়ামাটির পুতুল তৈয়ারি, কাঠ খোদাই ও প্রতিমা নির্মাণ করিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এখনও এই মহকুমার নানা স্থানে প্রতিমা নির্মাণ করিয়া

থাকেন। খুব অল্পক্ষেত্রে তাঁহাদের দ্বারা দুয়েকটি মন্দির নির্মাণও হইয়াছে। নানাস্থানের সমাধিমন্দিরগুলি সম্ভবত এই জাতিই তৈয়ারি করিয়া থাকেন। দাসপুর থানার দাসপুর, কল্‌মিজোড়, আজুড়িয়া, গৌরা প্রভৃতি স্থানে, ঘাটাল থানার নিশ্চিন্দীপুর ও আরও কয়েকটি স্থানে এবং চন্দ্রকোণা শহর সংলগ্ন দুয়েকটি পল্লীতে ইহাদের বাস আছে। কামার ও কুমোর জাতি এখনও অনেক স্থানে যথাক্রমে লৌহের যন্ত্রপাতি ও মাটির হাঁড়িকুঁড়ি প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের সকলেরই অবস্থা খুবই শোচনীয়। কাঁসারিরা সকলে আজ আর পিতল কাঁসার উৎপাদন বা ব্যবসায়ে লিপ্ত নাই, অন্য জাতীয় ব্যক্তিরা তাঁহাদের পূর্বের একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকার করিয়াছেন। শাঁখারি, স্যাক্‌রা (ইহারা সোনার গহনা তৈয়ারি করেন) প্রভৃতি জাতিরও অবস্থা এইরূপ। তাসত্ত্বেও ইহারা এখনও কোনক্রমে টিকিয়া আছেন।

এই মহকুমায় সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থায় রহিয়াছেন তপঃশীল জাতির বাগ্‌দি, দুলে, হাড়ি, ডোম, মুচি বা চামার প্রভৃতি। বাগ্‌দি জাতীয় ব্যক্তিরা প্রায় প্রতি গ্রামেই অল্পবিস্তর আছেন। তবে ইহাদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায় দাসপুর থানার ঢোল ও পেটোর খালে এবং ঘাটাল শহরের আশপাশের কিছু কিছু স্থানে। 'দোলুই' পদবীধারী ব্যক্তির সংখ্যা এই মহকুমায় বেশি। এই জাতির প্রধান উপজীবিকা বর্গাদারীতে অপরের জমিতে চাষবাস ও দিনমজুরী। শিক্ষার হার একেবারেই কম। দুয়েকজন অবশ্য উচ্চ শিক্ষিতও আছেন, কিন্তু সমষ্টির তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা গণনার মধ্যেই নয়। তপঃশীল জাতির অপরাপরের অবস্থাও এইরূপ। ইহাদের নিজস্ব জমি-জায়গা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে, অবশ্য এখন কেহ কেহ জমিজায়গা করিতেছেন। তপঃশীল জাতির মধ্যে জেলেজাতীয়দের অবস্থা অনেকটা ভালোর দিকে। মৎস্যচাষের ব্যাপক প্রসার ও মাছের দাম বাড়ার ফলে ইহাদের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ইহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারও হইতেছে। কেহ কেহ নানান্ কাজকর্মে যুক্তও আছেন। ঘাটাল শহরাঞ্চলের কোন কোন পল্লীতে সমৃদ্ধিশালী কিছু কিছু জেলেজাতীয় ব্যক্তিও আছেন।

উল্লিখিত বিভিন্ন জাতি ও তাঁহাদের বৃত্তির সর্বাধুনিক সঠিক কোন পরিসংখ্যান না পাওয়ায় এখানে তাহা উল্লেখ করা গেল না।

সেকালের জাতিগতবৃত্তি বা পেশা এখন শুধুমাত্র কল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছে। স্বাধীনতার গত ২৯ বছরে সমাজ ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতা ও সমৃদ্ধিতে উন্নত সেকালে সমাজে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন

ব্যক্তিগণের উত্তরসূরীদের আজ অনেকেই হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। অপরপক্ষে, সমাজের তথাকথিত নিম্নজাতীয় ও শিক্ষায় অনগ্রসর ব্যক্তিদের অনেকের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। জাতিভেদ প্রথা দেশ হইতে অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার অপসারিত হইয়া নবযুগের সূচনা হইয়াছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় জাতি শুধু কথার কথা মাত্র। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা ও সমাজসেবাই আজ ব্যক্তি বা জাতির মূল্যায়নের মাপকাঠি। এই বিরাট্ পরিবর্তন ও উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ব্যক্তি ও সমষ্টিজীবন সম্ভবপর হইয়াছে দেশব্যাপী গণজাগরণের মধ্যে।

ভাষা ঃ

এই মহকুমার পল্লীপ্রধান অঞ্চলসমূহে অধিবাসীদের ভাষাবৈশিষ্ট্য একটি লক্ষণীয় বিষয়। পৌরপ্রতিষ্ঠানযুক্ত স্বীকৃত শহরের সংখ্যা মহকুমায় পাঁচটি। কিন্তু বর্তমানে আরও দুয়েকটি শহর বা আধা শহরের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। বিগত কয়েক বছরে রাস্তাঘাটের কিছুটা উন্নতি হওয়ায় দূরবর্তী স্থানের নানা ভাষাভাষী ব্যক্তিদের সঙ্গে এই দেশের অধিবাসীদের যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় এবং স্থানে স্থানে সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কার্যালয় স্থাপিত হওয়ায় অধিবাসীদের ভাষার কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই পরিবর্তন সাধারণত মুষ্টিমেয় কয়েকটি স্থানে লক্ষ্য করা যায়। সুদূর গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দ, উচ্চারণরীতি আজও অনেকের নিকট অজ্ঞাত। এই ধরণের কয়েকটি শব্দ ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

যেমন, কাঠি (=চাবি), পাঁজারি (=ফড়িয়া), ছিরত্তিরি (=শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বৈদিক ব্রাহ্মণ), কঁ্যাদাল (==ঘরের আশপাশ বা পেছন দিক), দলিজ (=দালান), ম্যাচ্‌লা (=তামাকমাখা পাত্র), গব্‌রান (=কালি দিয়া কাগজের উপর হিজিবিজি লেখা, যেমন—'ছেলেটি কাগজে গব্‌রাচ্ছে'। তাঙ্গুড়া (=সঞ্চয়, যেমন—'সেসব জিনিসেরই কিছু কিছু তাঙ্গুড়ে রাখে'), বাখুল (=চারদিকে দেওয়ালযুক্ত বাড়ি, যেমন—'তুমি বাখুলে যাও না'), চচ্চড়ি (=ছেঁচ্‌কি বা ভাজা), রাকাড়া (=শব্দ করা, যেমন—'সে কোন রাকাড়ছে না'), হেউড়া (=পাগল), ম্যাক্ (=গোঁজ) প্রভৃতি।

উচ্চারণরীতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় কোথাও এ-কারের উচ্চারণ 'অ্যা' হইয়াছে—হেথা=হ্যাথা, সেথা=স্যাথা, খেদাড়া=খ্যাদাড়া (অর্থ, তাড়াইয়া দেওয়া,যেমন, 'কুকুরটা শিয়ালটাকে খ্যাদাড়ে দিল') কেঁদাল=কঁ্যাদাল। অ-কার

কোন স্থানে ও-কার, একার=ইকার, ওকার=উকার বা অ-কার কোন কোন স্থানে হইয়াছে : যেমন, লজ্জা=লোজ্জা, অন্যায়=ওন্যায়, (উদাহরণ, 'এ তোর বোড়ো ওন্যায়, বাবু') শেয়ান=শিয়ান, মেঠাই=মিঠাই, বোয়াল=বুয়াল ('বুয়াল মাছ'), গোটা=গটা, বোসো=বুসো ইত্যাদি। 'আমি' পদের রূপান্তর 'মুই', না=নি, দেবে=দিবে, কোথা=কুথা ('তুমি কুথা যাবে ?'), চকুটা (অর্থ—হাত দিয়ে ডলা বা টিপে নরম করা, 'সে চকুটে চকুটে খাচ্ছে'), দিব=ডুবো, মজুর বা শ্রমিক=মুনিস ('সে মুনিস খেটে খায়')। এই ধরণের আরও বহু শব্দ ও উচ্চারণরীতি নানা স্থানে লক্ষ্য করা যায়।

উপরি উল্লিখিত উদাহরণগুলি একেবারে গ্রাম্যভাষা এবং নীচু বা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অশিক্ষিত তফঃশীল জাতি বা উপজাতির মধ্যে চলিত আছে। কখনও কখনও শিক্ষিত নাগরিকদেরও এই ধরণের কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষী, খেতমজুর প্রভৃতিদের এই ধরণের ভাষা বেশি ব্যবহার করিতে দেখা যায়। অবশ্য, এখন সুদূর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকারের শব্দ ব্যবহার বা উচ্চারণভঙ্গী ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে এবং একেবারে নিরক্ষর শ্রেণীর মধ্যেও নাগরিক ভাষার, এমন কি কিছু কিছু ইংরেজি শব্দেরও আবির্ভাব হইতেছে। নিরক্ষর গ্রাম্য ব্যক্তিকেও এখন বলিতে শোনা যায়—"এখন 'টাইম' কত হোল ?' ইত্যাদি। বহু তফঃশীল জাতি বা উপজাতির ছেলে মেয়েরা এখন স্কুল-কলেজে পড়িয়া শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার ফলে গণ্ডপল্লীতেও নাগরিক ভাষার প্রসার ঘটিতেছে।

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম বা দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণাঞ্চল যথাক্রমে বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী হওয়ায় ঐসব সীমান্তবর্তী স্থানের অধিবাসীদের ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গীতে বাংলাভাষার বিশেষ রকমের রূপান্তর ঘটিয়াছে, যেমন ঝাড়গ্রাম মহকুমার মানভূম-সিংভূম সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় বিহারী, সাঁওতালি ও বাংলাভাষার মিশ্রণে এক বিশেষ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। সেইরূপ দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিমে নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানের ভাষা উড়িষ্যার বালেশ্বর বা ময়ূরভঞ্জ জেলার উড়িয়া ভাষার প্রভাবে অনেকখানি রূপান্তরিত হইয়াছে। ঘাটাল মহকুমায় ব্যবহৃত বাংলা ভাষার ঠিক ঐরূপ রূপান্তর বা পরিবর্তন ঘটে নাই। এই অঞ্চলে খাঁটি দেশজ ভাষার ব্যবহার খুবই বেশি, উড়িয়া বা বিহারীর কোন প্রভাব এখানকার ভাষায় আসা সম্ভবপর হয় নাই। প্রাচীন রাঢ়দেশের অন্তর্বর্তী এই স্থানে বাংলাভাষার সহিত উড়িয়া বা বিহারীর কোন সংশ্রব হয় নাই, তবে বাংলা ভাষার স্থানীয় রূপান্তর এই অঞ্চলে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।



ঘাটাল শহরের প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীপ্রতিমা



কোন্নগরে (ঘাটাল) পূর্বতন ব্র্যাড্‌লি-বার্ট
ডিসপেনসারী



মন্দিরগাত্রে খোদিত
মহিষাসুরমর্দিনী, ক্ষীরপাই



কোন্নগরে ধর্মঠাকুরের
'চাঁদনী' মন্দির





দশভূজা মহিষাসুরমর্দিনী

প্রাচীন পটীদারপট

অবশ্য, পূর্বেই বলা হইয়াছে এই মহকুমার বেশ কিছু স্থানে উৎকলশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বসবাস করেন এবং তাঁহারা বহু পূর্বে উড়িষ্যা হইতে এইদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বর্তমানে তাঁহাদের বংশীয়েরা উড়িষ্যাদেশীয় পদবীসমূহ ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে বঙ্গভাষীই হইয়া গিয়াছেন। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষার সহিত তাঁহাদের ভাষার কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। বা বহু পূর্বে তাঁহাদের ভাষার সাহচর্যে এখানকার ভাষারও তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বর্তমানে তাঁহারা পুরাপুরি বাঙালিই হইয়া গিয়াছেন। সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মধ্যে একমাত্র এই মহকুমার অধিবাসীদের ভাষায় উড়িয়া ভাষার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে নাই।

মেদিনীপুর জেলার উত্তরপূর্বাংশে অবস্থিত এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা সম্পর্কে ডঃ গ্রীয়ারসন সাহেবের Linguistic Survey of India, Vol V (Indo-Aryan family—Eastern Group, Part I, 1903 edition) গ্রন্থের একস্থানে বলা হইয়াছে :

"In the North and East of the District (Midnapore) there is spoken a tolerably pure Bengali belonging to the standard dialect. The members of the Kaivartta caste speak the curious dialect which I have named South-WesternBengali ; and they are so numerous in the centre of the District and in the west of the Tamluk subdivision, that their language must be considered the main language of the tract". (পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬) অর্থাৎ ডঃ গ্রীয়ারসন সাহেব এই জেলার উত্তর ও পূর্বে অবস্থিত অঞ্চলে বেশ খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন যাহা এই জেলার অন্য কোন অংশে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় নাই। এই জেলার মাঝামাঝি স্থানে অধিক সংখ্যায় বসবাসকারী কৈবর্ত জাতি বলিতে গ্রীয়ারসন সাহেব কাহাদের বোঝাইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট নয়। কৈবর্ত জাতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। তবে, এই মহকুমায় সর্বাধিক সংখ্যায় মাহিষ্য জাতির বাস আছে, তমলুক ও জেলার অন্যান্য স্থানেও এই জাতির অধিক সংখ্যায় বাস লক্ষ্য করা যায়। গ্রীয়ারসন সাহেব কৈবর্ত জাতির ভাষা 'দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই মহকুমার তথা সমগ্র জেলার অধিবাসীদের সম্পর্কে বেলি সাহেবের ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লিখিত 'Memorandum on Midnapur' নামক পাণ্ডুলিপি গ্রন্থে বলা হইয়াছে 'মেদিনীপুরের জনসাধারণ সাধারণত

একটি মিশ্রিত জাতি, তাঁহাদিগকে পুরাপুরি বাঙালি বা উড়িয়া বলা যায় না, কিন্তু ইঁহারা এই উভয় জাতির মিশ্রণ। অবশ্য ইহা বলা অভিপ্রেত নয় যে, এই দুই জাতির পারস্পরিক বিবাহ সম্বন্ধের দ্বারাই এই মিশ্রণ খুব একটা সংঘটিত হইয়াছে, যতটা হইয়াছে পারস্পরিক আচার-ব্যবহার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া। মেদিনীপুরের জনসাধারণ বাংলা এবং উড়িষ্যার। অর্থাৎ বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী ভূভাগ মেদিনীপুর হওয়ায় এই জেলার মধ্য দিয়া উড়িষ্যার অধিবাসীরা বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং বাঙালিরাও উড়িষ্যায় গিয়াছে। অতএব এই জেলার অধিবাসীরা প্রধানত উভয় অঞ্চল হইতে আগত এবং পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘদিন মেলামেশার ফলে ইঁহারা স্বজাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ হারাইয়া এক পৃথক্ জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু এই জেলায় আগত বাঙালির সংখ্যা উড়িষ্যা হইতে আগত উড়িয়াদের তুলনায় খুবই কম।'

ঘাটাল অঞ্চলেই একমাত্র উত্তর-পূর্ব দেশ হইতে আগত প্রকৃত বাঙালি অধিবাসীরা রহিয়াছেন এবং পরবর্তীকালে ইঁহাদের সহিত বসবাস করিয়াছেন দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দেশ হইতে আগত উড়িষ্যাদেশীয় অধিবাসিগণ। দীর্ঘদিন ধরিয়া এইদেশে বসবাস করার ফলে ইঁহাদের ভাষা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া বাংলাভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে ইঁহাদের একটি পরিসংখ্যান দেওয়া গেল না।

পথঘাট ঃ

ঘাটাল মহকুমার প্রধান প্রধান পথগুলি ঃ ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রোড্ (২৮ মাইল), ঘাটাল-পাঁশকুড়া রোড্ (১৯ মাইল), ক্ষীরপাই-রামজীবনপুর-আরামবাগ ও ক্ষীরপাই—মেদিনীপুর (ভায়া কেশপুর) রোড্। চন্দ্রকোণা থানার রামজীবনপুর হইতে গড়বেতা স্টেশন পর্যন্ত একটি রাস্তাও বেশ বড়ো। ইহা ছাড়া শহর চন্দ্রকোণার গাছশীতলামাড়ো হইতে দক্ষিণমুখী একটি রাস্তা পূর্বোক্ত ক্ষীরপাই-মেদিনীপুর (ভায়া—কেশপুর) রাস্তার সহিত কেশপুর থানার কেশুরগেড়্যার নিকট মিলিত হইয়াছে। শহর চন্দ্রকোণা হইতে পলাশচাবড়ির ঘাট যাওয়ার রাস্তাটিও উল্লেখযোগ্য। ঘাটাল থানার বরদা-নির্মলবাজার হইতে খড়ারের পাশ দিয়া হুগলি-মেদিনীপুর জেলার সীমান্তবর্তী সুলতানপুর রাস্তা এবং খড়ার-জাড়া রাস্তা দুটি উল্লেখযোগ্য। ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রাস্তা হইতে বাহির হইয়া সিংহডাঙ্গা-বীরসিংহ পর্যন্ত একটি রাস্তা আছে। ঐ রাস্তাটি উদয়গঞ্জ হইয়া পূর্বোক্ত খড়ার-জাড়া রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই মহকুমার তিনটি থানার মধ্যে চন্দ্রকোণা থানায় সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যায় ভালো রাস্তাঘাট আছে এবং বাস প্রভৃতি যান-বাহন চলাচলও ঐসব স্থানে বেশি। রাস্তাঘাটের দিক হইতে ঘাটাল থানা দ্বিতীয় এবং দাসপুর তৃতীয়। দাসপুরের মধ্য দিয়া কয়েক বছর আগে নির্মিত ঘাটাল-পাঁশকুড়া পাকা রাস্তাটি ছাড়া অন্য কোন উল্লেখযোগ্য রাস্তা নাই। লঙ্কাগড়-কেশপুর রাস্তাটি লঙ্কাগড়, নাড়াজোল হইয়া কেশপুরে গিয়া পূর্বোক্ত ক্ষীরপাই-মেদিনীপুর (ভায়া কেশপুর) রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া পাকা রাস্তা আর নাই। একমাত্র ঘাটাল-পাঁশকুড়া পাকা রাস্তাটি দিয়া বাস প্রভৃতি যানবাহন চলাচল করে। কেশপুর-লঙ্কাগড় রাস্তায় ঘাটাল হইতে দুয়েকটি বাসও চলে। কিন্তু এই থানার অন্যান্য দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই শোচনীয়। এই থানায় প্রাচীন কাঁচা রাস্তা কয়েকটি আছে, যেমন, ঘাটাল-বিষ্ণুপুর রাস্তা (২২ মাইল) শিলাই তীরবর্তী রসিকগঞ্জ হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণদিক বরাবর দাসপুরের মধ্য দিয়া বৈকুণ্ঠপুর—কল্‌মিজোড় এবং কাঁসাই অতিক্রম করিয়া পরে দাসপুর-ডেবরার সীমানার নিকট কাঁকদাড়ির খাল অতিক্রম করিয়া গোলগ্রাম, লোয়াদা হইয়া কাঁসাই অতিক্রম করিয়া বর্তমান বোম্বাই রোডের নিকট আষাড়ীবাঁধে মিলিত হইয়াছে। অবশ্য লোয়াদা হইতে আষাঢ়ী বাঁধ পর্যন্ত এই রাস্তাটি পাকা হইয়াছে। দাসপুর-আজুড়িয়া রাস্তাটি দাসপুর হইতে আরম্ভ হইয়া বলিহারপুর (পুরুষোত্তমপুর), রাধাকৃষ্ণপুর হইয়া মহবত্‌পুর-বড়শিমূলিয়ার পাশ দিয়া হরেকৃষ্ণপুর হইয়া সোনাখালি, গুছাইতি হইয়া আজুড়িয়া গ্রামে চেতুয়া সার্কিট্‌ বাঁধে মিলিত হইয়াছে। হরেকৃষ্ণপুরের নিকট হইতে সোনাখালি হইয়া সোনাখালি হাটের পূর্ব দিক হইতে উত্তরপূর্ব ও পরে চাঁইপাটের ভিতর দিয়া পূর্বমুখী হইয়া ক্ষেপুতের মধ্য দিয়া গোপীগঞ্জ পর্যন্ত গিয়া একটি রাস্তা রূপনারায়ণের তীরে পূর্বোক্ত সার্কিট্‌ বাঁধের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা 'রাইমণি রোড্‌' নামে পরিচিত। রাস্তাটি কাঁচা হইলেও ঘাটাল-পাঁশকুড়া পাকা রাস্তা তৈয়ারি হওয়ার আগে দাসপুর অঞ্চলের বেশির ভাগ লোকেদের কলিকাতায় যাওয়ার ইহাই একমাত্র রাস্তা ছিল। এই রাস্তাটি দাসপুর থানার ১৭৪ নং মৌজা কেলেগোদার রাধানাথ মাইতি মহাশয় তাঁহার স্ত্রী রাইমণির স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। রাধানাথ মাইতির কলিকাতার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে দেড়শ বিঘারও বেশি জমির চাষ ছিল। তিনি হগ্‌ মার্কেটে প্রসিদ্ধ সব্‌জি বিক্রেতা ছিলেন।

দাসপুর থানায় আরও কয়েকটি কাঁচা রাস্তা উল্লেখযোগ্য : যেমন বৈকুণ্ঠপুর-

রাজনগর রাস্তা এবং বৈকুণ্ঠপুর-সাগরপুর-বিষ্ণুপুর রাস্তা, দাসপুরের কিছু উত্তরে বেলিয়াঘাটা হইতে গোপালপুর, কামালপুর, কিস্মৎ খাঙ্গাপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া জোতকানুরামগড় পর্যন্ত একটি রাস্তা আছে। ইহা ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি ছোট খাটো রাস্তা এই থানার নানাস্থানে রহিয়াছে। বর্তমানে সুলতাননগর হইতে একটি নূতন চওড়া রাস্তা পূর্বদিকে সোনাখালি গিয়াছে।

ঘাটাল থানায় বরদার চৌকান হইতে দক্ষিণমুখী একটি রাস্তা বলরামগড়ের ভিতর দিয়া পান্নার খালের কাছে পান্না বেষ্টনীর সঙ্গে মিলিত হইয়া পরে পান্না গ্রামের শিবপুকুরের পাশে মাঠের মধ্যে লুপ্ত হইয়াছে। পরে এই রাস্তাটি ভাঙ্গাদহ পর্যন্ত গিয়া শিলাই অতিক্রম করিয়া ওপারে দাসপুর থানায় রঘুনাথপুর, ধরমপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া ডিহিচেতুয়ায় পুর্বোক্ত বৈকুণ্ঠপুর-রাজনগর রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। ডিহিচেতুয়ার শীতলা মন্দিরের দক্ষিণ দিক দিয়া রাস্তাটির ক্ষীণ অস্তিত্ব এখনও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ইহার বেশির ভাগই ধানখেতে পরিণত হইয়াছে।

সুপ্রাচীন রাস্তা : 'দারির জাঙ্গাল'

এই রাস্তাটি খুবই প্রাচীন এবং ইহা একপ্রকার পরিত্যক্ত বলিলেও চলে। ইহার প্রাচীন নাম 'দারির জাঙ্গাল', বর্তমানে 'নন্দ কাপাসিয়া রোড্' নামে পরিচিত। শোনা যায়, দক্ষিণে ইহা তমলুক পর্যন্ত গিয়াছিল। ডিহিচেতুয়া গ্রামের দক্ষিণে ঝুমঝুমি হইয়া দক্ষিণে দাদপুরের কাছাকাছি কাঁসাই খাল পর্যন্ত রাস্তাটির অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এখনও ইহার গতিপথ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যাইবে। উত্তরে বরদার চৌকান হইতে খড়ার হইয়া সুলতানপুর পর্যন্ত যে রাস্তাটি আছে, উহা এই রাস্তারই অংশ এবং আরও উত্তরে ইহা বর্ধমান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সম্ভবত হিউয়েন সাঙ্ (বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক) এই রাস্তা ধরিয়াই তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পান্নায় গুপ্ত ও পালযুগের প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং রাস্তাটি এই গ্রামের পাশ দিয়া যাওয়ায় এই অনুমান ভিত্তিহীন নাও হইতে পারে।

পূর্বোক্ত ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রোড্ পাকা রাস্তায় রাধানগর গ্রামের মোড়ের দক্ষিণ দিক দিয়া ইয়াকুবপুর গ্রামের মধ্য দিয়া হরিনাগেড়িয়া হইয়া লোছিপুরের দিকেও একটি কাঁচা রাস্তা গিয়াছে। চন্দ্রকোণা থানায় এইরূপ অনেক কাঁচা রাস্তা আছে।

হাণ্টার সাহেবের Statistical Account of Midnapur (1876) গ্রন্থে বর্ধমান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মেদিনীপুর জেলার যে মানচিত্র অঙ্কিত আছে,

তাহাতে এই মহকুমার (অবশ্য তখন ইহা গড়বেতা মহকুমা) মধ্য দিয়া ক্ষীরপাই-মেদিনীপুর (ভায়া কেশপুর) পাকা রাস্তাটি অঙ্কিত আছে। এই রাস্তাটি উত্তরে হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত গোঘাট থানা ও জাহানাবাদ মহকুমার মধ্যদিয়া বহুদূর বর্ধমান পর্যন্ত পরে আরও উত্তরে বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানা ও বীরভূমের মধ্য দিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির উপর দিয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বহরমপুরের মুখোমুখি পৌঁছিয়াছে। তখন ঘাটাল হইতে চন্দ্রকোণা পর্যন্ত রাস্তাটি কাঁচা ছিল এবং এই মহকুমায় আর কোন উল্লেখযোগ্য রাস্তা ছিল না। তখন বীরভূম জেলার বোলপুর হইতে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর হইয়া একটি পাকা রাস্তা মেদিনীপুর জেলার তদানীন্তন মহকুমা শহর গড়বেতার উপর দিয়া সোজা দক্ষিণে শালবনীর পাশ দিয়া মেদিনীপুর শহরে পৌঁছিয়াছে দেখা যায়। ইহা বর্তমানে রাণীগঞ্জ রাস্তা নামে পরিচিত। হাণ্টার সাহেব ক্ষীরপাই-মেদিনীপুর (ভায়া-কেশপুর) রাস্তাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

একশ বছর আগে মহকুমার রাস্তাঘাটের অবস্থা

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে এই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য তখন ২১ মাইল ছিল। (Hunter's Statistical Account of Midnapur, 'Roads and Means of communication', Page 148) চন্দ্রকোণা থানায় পরবর্তীকালে যে সব পাকা রাস্তা হইয়াছে, হাণ্টার সাহেবের উক্ত পুস্তকে ব্যবহৃত মানচিত্রে তাহাদের কোন চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। উক্ত মানচিত্রটি কলিকাতার সার্ভেয়ার জেনারেল অব্ ইণ্ডিয়ার অফিস হইতে ১৮৭৪ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। দাসপুর থানায় কোন পাকা রাস্তা উক্ত মানচিত্রে অঙ্কিত নাই। বর্তমানে লঙ্কাগড়-কেশপুর পাকা রাস্তাটি তখন যে ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। (উক্ত মানচিত্রটি ১″=১৬ মাইল স্কেলে অঙ্কিত হইয়াছিল)।

এই মহকুমায় ৫৭৬ টিরও বেশি কাঁচা ও পাকা রাস্তা বর্তমান। সম্প্রতি আরও কয়েকটি রাস্তা তৈয়ারি হইতেছে।

১৯৭১ সালের সর্বশেষ আদমসুমারীতে এই মহকুমার অন্তর্ভুক্ত তিনটি থানার কোন্ কোন্ মৌজায় পাকা রাস্তার মাধ্যমে যাতায়াতের সুবিধা আছে; তাহার এক পরিসংখ্যান জানা গিয়াছে। নিম্নে থানা অনুসারে সেই সেই মৌজাগুলির উল্লেখ করা হইল। তবে এই আদমসুমারীতে পাকা রাস্তার পরিমাণ কত তাহার উল্লেখ করা হয় নাই।

চন্দ্রকোণা থানা ঃ

মৌজার নাম ও সংখ্যা	মৌজার নাম ও সংখ্যা
শ্রীনগর (২৭)	বীরভানপুর (২০৭)
রাধাবল্লভপুর (৯৯)	বারা (২০৮)
ঝালুর (১১২)	হেমতপুর (২০৯)
পীরচক (১১৩)	ভবানীপুর (২১১)
জগন্নাথপুর (১১৪)	মোহনপুর (২২৪)
কোচগেড়িয়া রামচক (১৪৪)	কুয়াপুর (২৪২)

বাঁকা সুলতানপুর (১৫০) এই থানার মোট ১৩টি মৌজায় পাকা রাস্তা আছে। বলা বাহুল্য এইসব মৌজায় কাঁচা রাস্তাও আছে।

ঘাটাল থানা ঃ

মৌজার নাম ও সংখ্যা	মৌজার নাম ও সংখ্যা
বলরামপুর (১১)—কাঁচারাস্তা ও নদী	রাধানগর (৭৮)
আনন্দপুর (১২)—কাঁচারাস্তা ও নদী	শ্রীরামপুর (৯১)—কাঁচা রাস্তা ও নদী
ইড়পালা (১৭)—	কোণ্ডরপুর (৯৯)—নদী
বনহরিসিংহপুর (২৪)—কাঁচা রাস্তা ও নদী	ঘোলশাহী(১০০)—কাঁচা রাস্তা ও নদী
মনসুখা (২৫)—কাঁচা রাস্তা ও নদী	কোটালপুর(১০২)—কাঁচা রাস্তা ও নদী
লালকুণ্ডু (৩৪)—কাঁচা রাস্তা ও নদী	রঘুনাথপুর (১০৪)—কাঁচা রাস্তা ও নদী
কামদেবপুর (৪৫)—শুধুমাত্র পাকা রাস্তা	চৌকা (১০৯) কাঁচা রাস্তা ও নদী
কুরান (৪৬)—শুধুমাত্র পাকা রাস্তা	রাধাবল্লভপুর (১১২)—নদী
বীরসিংহ (৪৮)	জয়কৃষ্ণপুব (১১৩)— ঐ
পাথ্‌রা (৪৯)	রাধাচক (১১৪)— ঐ
কাঞ্চিয়া (৫০)	বাড়গেবিন্দ (১১৫)— ঐ
মারিচ্যা (৫৭)	বাড় আনন্দি (১১৬)— ঐ
নির্মলবাজার (৫৯)	ভাঙ্গাদহ (১১৭)— ঐ
রথীপুর (৬০)	গোপালনগর (১১৮)— ঐ
দ্বন্দীপুর (৬২)	রাধাকান্তপুর (১১৯ — ঐ
শ্যামসুন্দরপুর (৬৩)	মন্দারপুর (১২২)— ঐ
শ্যামপুর (৬৬)—পাকা রাস্তা	কনকপুর (১২৩)— ঐ
শিবপুর (৬৯)—পাকা রাস্তা	কালীচক (১২৪)—কাঁচা রাস্তা ও নদী
জলসরা (৭৩)	ধর্মপুর (১২৫)—কাঁচা রাস্তা ও নদী

এইগুলি ছাড়াও বাড়নবনী (১২৬), হেমন্তপুর (১২৭), ইসলামপুর (১৩০), মালঞ্চ (১৩১), গঙ্গাদাসপুর (১৩২), সিংহচক (১৩৩), নারায়ণপুর (১৩৪), কাটান (১৪৯, পাকা, কাঁচা ও নদী), হরিসিংপুর (১৫১) মৌজাগুলিতে নদী ও কাঁচারাস্তা যাতায়াতের উপায়।

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে জানা যায়, ঘাটাল থানার মাত্র ১৫টি মৌজায় পাকা রাস্তায় যাওয়ার সুবিধা ও অধিকাংশ মৌজায় নদী যাতায়াতের সহজ পথ।

দাসপুর থানাঃ (এই থানায় প্যাকা রাস্তায় যাওয়ার সুবিধা যে যে মৌজায় আছে তাহার উল্লেখ করা হইল)

মৌজার নাম ও সংখ্যা—চণ্ডীপুর (৭), সিংহঘাই (৮), ভুবরাজপুর (৯), হরিরাজপুর (১০), কিস্মৎ নাড়াজোল (১৬), নিজনাড়াজোল (১৭), কল্যাণপুর (১৮), রামদাসপুর (১৯), বালিপাতা (২০), বাছুরাকুণ্ডু (২২), সুরতপুর (৪১), সীতাকুণ্ডু (৪২), মজলিসপুর, খোরদা বিষ্ণুপুর (৪৪), পলতাবেড়িয়া (৪৭), ডিহিচেতুয়া (৪৮), রসুলপুর (৪৯), শ্যামসুন্দরপুর (৫০) প্রভৃতি ৬০টি মৌজায় পাকা রাস্তায় যাওয়ার সুবিধা আছে। অবশ্য, পাকারাস্তা এইসব মৌজার কোন কোনটির মধ্য দিয়া না গেলেও বেশি দূরবর্তী নয়। এই মৌজাগুলির অনেকগুলিতে নদীপথের সাহায্যে যাওয়া যায়।

জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাঃ

এই মহকুমার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে বলিতে হইলে ইহার ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'ভূমি ও প্রকৃতি' নামে আগের অধ্যায়ে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিচয় মোটামুটি আলোচিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, মহকুমার বেশির ভাগ অংশই শিলাই ও কাঁসাই নদীর পলিমৃত্তিকায় গঠিত এবং উত্তরপূর্ব অংশ বিশেষভাবে খালবিলে পরিপূর্ণ। এই খালবিল ও নদী অনেকগুলি বাঁধ ও বেষ্টনীতে পরিবেষ্টিত—বিশেষভাবে দাসপুর ও ঘাটাল থানার বেশ কিছু অংশ এইরূপ। চন্দ্রকোণা থানার তিন-চতুর্থাংশ পলিমাটিতে ও এক অংশ মাকৃড়া পাথরে গঠিত, কিন্তু ঘাটাল ও দাসপুর অঞ্চল পুরাপুরি পলিমাটিতে গঠিত এবং এই অঞ্চলের ভূমিভাগ উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া উত্তরপূর্বে এবং পূর্বে নীচু জমিতে পরিণত হইয়াছে এবং শিলাই ও তাহার শাখানদীসমূহ হইতে নানা খালবিল এই নিম্ন অঞ্চলের ভূমির মধ্য দিয়া বাহিত হইয়া পূর্বে রূপনারায়ণের সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকালে এইসব অঞ্চল প্রায়ই প্লাবিত হয় এবং

অনেক সময় বন্যানিরোধক কিছু কিছু বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে এই সব নীচু স্থান বন্যাকবলিত হয় এবং বর্তমানে জল নিকাশের প্রাচীন খালগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মজিয়া যাওয়ায় বন্যা বা নদী হইতে বহির্গত অতিরিক্ত জল গ্রামাঞ্চলের স্থানে স্থানে আটকা পড়িয়া আবর্জনাপূর্ণ ও বেশির ভাগ ভূমি-ভাগকে আর্দ্র করিয়া রাখে। বর্ষার পর এই সব নিম্নস্থানের আবদ্ধ জল ও খালবিলে পাট পচানোর জলে আবহাওয়া বেশ দূষিত হইয়া পড়ে এবং মশা ও মাছির উপদ্রব খুব বেশি হয়। ইহার ফলে এই অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য খুবই বিপন্ন হয় এবং উদরাময়, আমাশয়, জ্বর প্রভৃতি নানা রোগের সৃষ্টি হয়।

বেশ কিছুকাল আগে, বিশেষভাবে, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভয়াবহ ম্যালেরিয়া রোগ সরকারি প্রচেষ্টায় নির্মূল হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মহকুমার নিম্নাঞ্চলের আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় অন্যান্য নানা রোগের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ও হাসপাতালে প্রতিদিন অজস্র রোগীর ভিড় দেখিলেই তাহা অনুমান করা যায়। আজ হইতে-একশ বছরের কিছু বেশি আগে এই মহকুমার প্রায় সমগ্র অংশে ম্যালেরিয়া-মহামারী কিরূপ ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছিল তাহার এক চিত্তাকর্ষক বিবরণী মেদিনীপুর জেলার তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লিখিত ডাঃ ম্যাথুয়ের এক রিপোর্ট হইতে জানিতে পারা যায়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ম্যালেরিয়া জ্বর হুগলি-মেদিনীপুর জেলার সীমান্তবর্তী স্থানসমূহে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল। চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, ঘাটাল প্রভৃতি স্থানে এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। পরে অবশ্য তাহা কিছুকাল কমিয়া গিয়া পর বৎসর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে ভীষণভাবে আরম্ভ হয়। ঐ রোগ বর্ধমান ও জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ, হুগলি জেলা) হইতে এদেশে সংক্রমিত হয় এবং চন্দ্রকোণা ও ঘাটালের বেশ কিছু অঞ্চলে সংক্রমিত হইয়া দাসপুরে ভয়াবহরূপ ধারণ করে। ঐসময় দাসপুর থানার নানা স্থানে ঐ জ্বরের প্রকোপ এত বেশি হইয়াছিল যে ইহাতে শত শত লোক মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। ম্যাথুসাহেব ১৮৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর দাসপুর থানায় পৌঁছিয়া ৬টি বড় বড় গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং পরে ঘাটালে উপস্থিত হন। তিনি রিপোর্টে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঠিক এই সময়ে কিন্তু তমলুক পরগণা ও জেলার যে যে স্থান সমুদ্রতীরবর্তী সেসব স্থানে এই সংক্রামক জ্বরের প্রকোপ হয় নাই। এবং পাথুরে মাটির উঁচু অঞ্চলগুলিতেও ইহা সংক্রমিত হইতে পারে নাই।

১৮৭২ সালে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে এই জ্বর নাড়াজোলে ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল এবং চন্দ্রকোণা ও ঘাটালেও তাহা মারাত্মক রূপ নেয়। চন্দ্রকোণা ও ক্ষীরপাইয়ে এই রোগের প্রকোপ যতখানি হওয়ার কথা ততখানি হয় নাই, কারণ এই স্থানগুলি ঘাটাল বা দাসপুরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে অবস্থিত। কিন্তু দাসপুর, নাড়াজোল, সাহাপুর প্রভৃতি স্থান ও তাহাদের পার্শ্ববর্তী এলাকা নীচু এবং আর্দ্র জলাভূমিপরিবৃত থাকায় এই রোগের বীজাণু ঐ সব স্থানে বিশেষভাবে সংক্রমিত হইয়া ভয়াবহরূপ ধারণ করে। তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টের কিছু অংশ হইতে ইহা জানা যায়:

"I am far from saying that Khirpai and Chandrakona will escape: They are only on relatively high ground, not on the laterite: and I fear that the fever showed some slight tendency to gain ground in 1872. All I contend for is, that the epidemic seems to have experienced a marked check in this quarter, while it poured on in an unrestrained stream through Daspur towards Parganas Na'ra'jol and Sha'hpur."

ম্যাথুসাহেবের রিপোর্টে আছে, এইসব স্থান সমতল পলিভূমি ও কাঁসাই ও শিলাই নদীর সম্মিলিত উপত্যকা এবং অসংখ্য খাল নালা ইহাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং ইহাদের প্রায় সবগুলিরই চারপাশে বাঁধ আছে। সরকারি বাঁধগুলির সঙ্গে প্রধান প্রধান নদীগুলির যোগ থাকায় জলনিকাশের বিশেষ অসুবিধা হয় না, কিন্তু এদেশে যে সব জমিদারী বাঁধ আছে তাহা হইতে উপযুক্ত জলনিকাশের বেশ অসুবিধা হয়। ম্যাথুসাহেবের রিপোর্টের উপর মন্তব্য করিয়া তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিয়াছেন, যেহেতু নদীসমূহ বেশির ভাগই পলি জমিয়া অগভীর হইয়া গিয়াছে, সেজন্য এই অঞ্চলের বাঁধগুলির প্রয়োজনীয়তা বেশি বাড়িয়াছে। কেননা, বর্ষায় এইসব নদী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে এই বাঁধগুলিই বন্যার প্রবল তাণ্ডব হইতে এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু এই বাঁধপ্রথায় বাঁধের ভিতরকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নদী হইতে বাহিত পলিমৃত্তিকা জমিতে না পারায় স্বাভাবিকভাবেই তাহা নীচু রহিয়া যায় এবং যে সব খাল এই বাঁধের কোন স্থান হইতে বাহির হইয়াছে তাহারা জলনিকাশী খালের বদলে ক্রমশ সেচের খালের কাজই করিয়া থাকে এবং প্রায়ই এইসব খালের নিকাশীমুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বর্ষার জল বাহির হইতে পারে না এবং তাহার ফলে এক বিস্তীর্ণ এলাকা অবরুদ্ধ জলে পূর্ণ থাকে।

এই সব নীচু স্থানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের উল্লেখ করিয়া সিবিল সার্জন ডাঃ ম্যাথ্‌ রিপোর্টে লিখিয়াছেন :

"The sanitary condition of the villages, it is needless to say, is deplorably bad in every respect. Buried in jungle, studded with filthy tanks, houses crowded together and surrounded by all kinds of filth, are the most common characteristics of the villages of the District. The water-supply is contaminated, and the atmosphere laden with the gaseous products of rotting vegetation and the excreta of the inhabitants. This description applies with equal truth to villages where the fever manifested itself in its most fatal form,...Every village that I have ever visited is pervaded by odours more or less offensive. Utterly regardless of every law that conduces to health, the villagers remain on year after year surrounded by all those oft described sources of nuisance with which we are only too familiar ;" [Hunter : S.A.B., Mid. P—239]

উক্ত রোগের কারণ শুধুমাত্র আবদ্ধ জল বা নোংরা দুর্গন্ধ জলাশয় নয়, অধিবাসীরা যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া আবহাওয়াকে আরও দূষিত করে এবং বছরের পর বছর তাহারা এইরূপ দূষিত পরিবেশে বাস করে।

ইহা সত্বেও তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেটের মতে ঘাটাল মেদিনীপুরের পরেই একটি সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। তাঁহার রিপোর্টে আছে—

"Here, too, the Brāhmans and Kāyasths of the District are to be found, and the bhadralok or gentlemen, are so numerous, that I have heard it said with reference to this fever, "It is better to die in Dāspur than to live in one of the jungle mahals."

[Hunter : S. A. B., Mid. P—241]

ম্যাথ্‌ সাহেব সে সময়ের ভয়াবহ ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,

"...that the epidemic is due to a concurrence of causes partly known, partly unknown. It finds a congenial home in a depressed and water-logged country, a dense population, and all the insanitary surroundings which a dense population entails."

অর্থাৎ নীচু ও বদ্ধজলে পূর্ণ স্থান, ঘনলোকবসতি এবং সর্বপ্রকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যাহা ঘনজনবসতির ফলে উৎপন্ন হয়—এইরূপ স্থানে ঐ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হওয়ার সুবিধা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সর্বশেষ রিপোর্টে ঘাটাল, দাসপুর, নাড়াজোল ও সাহাপুরের কতগুলি লোক ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার সুযোগ পাইয়াছিল এবং মৃত্যুর সংখ্যাই বা কত ছিল তাহার এক পরিসংখ্যান জানা যায়। এই পরিসংখ্যান ১৮৭২ সালের অক্টোবর হইতে ১৮৭৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। নিম্নে উহা প্রদত্ত হইল ঃ

গ্রামের নাম	চিকিৎসিত রোগীর মোট সংখ্যা	মৃতের মোটসংখ্যা
ঘাটাল	৪,৮৯৯	২৯
দাসপুর	৯,৭২৮	৯৩
নাড়াজোল	৭,৫২৫	৯৯
সাহাপুর	১,৮৫৫	১৫
	মোট ২৪,০০৭	২৩৬

উপরি উক্ত প্রথম তিনটি স্থান ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত এবং ইহাদের চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ২৩,১৫২ এবং মৃতের সংখ্যা ২২১। চন্দ্রকোণা বা ক্ষীরপাইয়ের কোন পরিসংখ্যান উক্ত রিপোর্টে উল্লিখিত নাই। ইহা হইতে এই মহকুমার উত্তর ও উত্তর পূর্বাংশে ঐ সংক্রামক রোগের ভয়াবহতা অনুমিত হয়। বিনা চিকিৎসায় যাহাদের মৃত্যু হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা বহুশত ছিল। তাহার কোন রেকর্ড পাওয়া যায় নাই।

সাম্প্রতিককালে মহকুমার এইসব স্থানে কিছু কিছু পরিবর্তন হইলেও বদ্ধ জলনিকাশের ব্যবস্থা বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের তেমন কিছু উন্নতি হয় নাই। বিশেষভাবে দাসপুর থানায় এবং ঘাটাল ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে এই অবস্থা একপ্রকার অব্যাহত আছে। কিন্তু রাস্তাঘাটের কিছু কিছু উন্নতি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, গত ১৯৭৫ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধীজয়ন্তী দিবসে মহকুমার বৃহত্তম হাসপাতালটির উদ্বোধন প্রভৃতির মাধ্যমে এই দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চিকিৎসাবিদ্যায় উপাধি লাভ করিয়া এই অঞ্চলে বহু ডাক্তার আছেন যাঁহারা সুনামের সঙ্গে অনেক রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন। বর্তমানের উন্নততর য়ুরোপীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং নিত্য নূতন নূতন ঔষধের আবিষ্কার ও

নবনির্মিত ঘাটাল সাব্‌ডিভিসন্যাল হাসপাতাল

তাহার ব্যবহারের ফলে এইদেশে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হইতে পারিয়াছে। ঘাটাল শহরের উপকণ্ঠে উক্ত নবনির্মিত বৃহৎ হাসপাতালটি উন্মুক্ত আবহাওয়ায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে নির্মিত হইয়াছে এবং উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামযুক্ত একটি প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসালয়ে পরিণত হইয়াছে। বহু মেধাবী ও কৃতবিদ্য চিকিৎসক এই হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং সেই কারণে মহকুমার, বিশেষভাবে ঘাটাল ও দাসপুরের অধিবাসীদের উত্তম চিকিৎসার সুযোগ এইখান হইতে পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে এইখানে রোগীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে এবং অনেক জটিল ও দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা ও নিরাময় সম্ভব হইতেছে।

এই হাসপাতালটি ছাড়া দাসপুর, নাড়াজোল, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি বহুস্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও তৎসহ পরিবার-পরিকল্পনা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এইসব কেন্দ্রের মাধ্যমে নিত্যনৈমিত্তিক বহু রোগীর চিকিৎসা হইতেছে। বহু উপাধিধারী চিকিৎসকও ব্যক্তিগত চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া বহু রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন। ইঁহাদের অনেকে বেশ সুনামও অর্জন করিয়াছেন। এইসব চিকিৎসকের তিনটি শ্রেণী এই দেশে লক্ষ্য করা যায়: (১) হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিযুক্ত চিকিৎসক। ইঁহারা অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী (২) ব্যক্তিগত চিকিৎসা-ব্যবসায়ে নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী চিকিৎসক এবং (৩) উপাধি-বিহীন এবং বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দুই পদ্ধতির চিকিৎসা করিতেছেন এমন বহু চিকিৎসক। উল্লেখযোগ্য, এই মহকুমায় এই তৃতীয় শ্রেণীর চিকিৎসকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয় এবং তাঁহাদের অনেকে চিকিৎসা বিদ্যার বই প্রভৃতি পড়িয়া বা কোন প্রবীণ অভিজ্ঞ উপাধিধারী চিকিৎসকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বেশ সুনামের সঙ্গে বহু রোগীর চিকিৎসাদি করিতেছেন। এই মহকুমার বহু গরীব ও বিপন্ন রোগী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ না করিয়া ইঁহাদের নিকট চিকিৎসা করেন। অবশ্য, উপাধিধারী কোন কোন চিকিৎসকও অনেক বিপন্ন রোগীর চিকিৎসা বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া থাকেন।

কিন্তু চিকিৎসালয় বা চিকিৎসকের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইলেও এই মহকুমার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং বদ্ধ ও মজা খাল ও নালায় দূষিত এবং আবর্জনাপূর্ণ জল পচিয়া মশা, মাছি ইত্যাদি কলেরা প্রভৃতি

সংক্রামক রোগের বাহনের জন্মদান করিতেছে। বর্তমানে এদেশে ম্যালেরিয়া একেবারে নির্মূল হইলেও যে হারে আবার গ্রাম-গ্রামান্তরে খানা-ডোবার সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে এই রোগ যে ভবিষ্যতে আবার প্রাদুর্ভূত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? তবে সুখের কথা, এই দেশে কৃষিব্যবস্থার অনেক অগ্রগতি হওয়ায় এইসব খানা-ডোবার নোংরা পচা জল বহুলাংশে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহার ফলে দূষিত আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হইতেছে। মাঝে মাঝে এই অঞ্চলে বিশেষ করিয়া ঘাটাল, দাসপুরে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা হওয়ায় গ্রামের ময়লা, আবর্জনা অনেকটা পরিষ্কার হওয়ায় রোগের অনুকূল পরিবেশ কিছুটা দূরীভূত হয়।

টীকা দেওয়ার অনেকগুলি কেন্দ্রের মাধ্যমে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক রোগের টীকা জনসাধারণের মধ্যে চলিত হওয়ায় এইসব মারাত্মক রোগ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সরকারের সুপরিকল্পিত পরিবার-পরিকল্পনার প্রসার এই মহকুমার বহুস্থানে হইয়াছে, তাহাতে নিয়ন্ত্রিত পরিবার হওয়ায় শিশু-মৃত্যুর হার অনেকটা কমিয়াছে মনে হয়। জনস্বাস্থ্যবিভাগের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ম্যালেরিয়া বা সংক্রামক কোন রোগের অনুসন্ধান করিয়া তাহার জন্য ঔষধ প্রভৃতি প্রয়োগের ব্যবস্থাদিও করিয়া থাকেন। সাম্প্রতিককালে সরকারের গুটীবসন্ত (Small pox) নির্মূলীকরণের যে দেশব্যাপী আন্দোলন চলিয়াছে, তাহার ফলে এই দেশ হইতে গুটীবসন্ত নির্মূল হইয়াছে।

এইসব কারণে মহকুমার জনস্বাস্থ্য যে পূর্বাপেক্ষা বহুলাংশে উন্নত হইয়াছে এবং সংক্রামক রোগের আক্রমণ অনেক কমিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এমনকি, সরকারের অধীনে বহু পশুচিকিৎসালয়ও নানাস্থানে স্থাপিত হওয়ায় পশুমড়কের হারও অনেক কমিয়াছে। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে সাধারণ রোগের চিকিৎসা ছাড়াও বহু দুরারোগ্য ব্যাধি ও শিশুরোগের চিকিৎসা হয় এবং ঐ সব কেন্দ্র ও হাসপাতালে প্রসূতি-সদনের জন্য আলাদা বিভাগে মহিলাদের স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রসব করানো হয়। ইহার ফলে পূর্বে প্রসবের কালে প্রসূতির বিপদ্ বা মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা যাইত, এখন তাহা অনেক কমিয়াছে।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও রোগ বা রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটিতেছে। পূর্বাপেক্ষা চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও এই মহকুমায় প্রয়োজনের তুলনায় তা নেহাতই কম। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বা হাসপাতালে রোগীর ভিড়

বাড়িয়া যাওয়ার ফলে চিকিৎসকদের পক্ষে প্রতিটি রোগীর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তাছাড়া সকলের জন্য উপযুক্ত ঔষধ সরবরাহ করাও সম্ভব হয় না। প্রসূতিসদনে শয্যাসংখ্যা খুবই কম এবং প্রয়োজনের তুলনায় তাহা খুবই নগণ্য। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও অনেক সময় থাকেন না। ফলে মহকুমার বেশির ভাগ মহিলাকে (বিশেষভাবে নীচু শ্রেণীর মহিলাদের) সাবেক কালের পদ্ধতিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে প্রসব হইতে হয়। ফলে বহু ক্ষেত্রে অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঔষধপত্র ও পথ্যের অপ্রতুলতাও সন্তোষজনক না হওয়ায় রোগীর রোগ উপশম বহু ক্ষেত্রে বিলম্বিত হয় এবং দুর্ঘটনাজনিত বহু বিপন্ন রোগীর চিকিৎসা বিলম্বিত হওয়ার ফলে তাহাদের প্রাণহানি ঘটে।

এইসব ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে মলমূত্রত্যাগের কু-অভ্যাস এই মহকুমার গ্রামাঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই আছে। স্যানিটারি বা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বা শৌচাগার নাই বলিলেই চলে। অধিবাসীরা মাঠে ঘাটে যেতে যেখানে সেখানে মলমূত্রত্যাগের চিরন্তন অভ্যাস ছাড়িতে অসমর্থ। খুব কম ক্ষেত্রেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ফলে দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় এবং আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ জন্মায়। চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতি ও উন্নততর ঔষধ প্রয়োগের ফলে অবশ্য পূর্বের তুলনায় মৃত্যুর হার অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু গ্রাম্য অধিবাসীদের দারিদ্র্য ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে আজ অপুষ্টি এবং তজ্জনিত বহু জটিল রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই সংক্রামক রোগসমূহের প্রায় বিলোপ ঘটিলেও অবস্থা প্রায় পূর্ববৎ রহিয়া গিয়াছে—তবে মৃত্যুর হার নিশ্চিতভাবে কমিয়াছে।

নিম্নের একটি পরিসংখ্যানে এই মহকুমার প্রতিটি থানায় কতগুলি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতাল আছে, তাহা জানা যাইবে ঃ ইহা ১৯৭১ সালের সর্বশেষ Census Report হইতে গৃহীত হইয়াছে।

দাসপুর থানা ঃ

নাম	স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Health Centre)	পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র
নিজনাড়াজোল······	১	—
দাসপুর······	১	—
মকারামপুর······	১	—
খুকুড়দহ······	১	১
নিশ্চিন্তপুর······	১	—

এই থানায় মোট ৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে।

উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি ছাড়া এই থানার ৫৭টি মৌজায় মোট ৭১টি প্রাইভেট্ ডিস্‌পেনসারি আছে। গত ৫ বছরে অন্যান্য গ্রামে আরও কিছু কিছু ডিস্‌পেনসারি হইয়াছে।

ঘাটাল থানা ঃ

নাম	স্বাস্থ্যকেন্দ্র	মাতৃ ও শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠান (Maternity child welfare)	পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র
আমোদরকুল·········	১		
খাসবাড়·········	১		
ইড়পালা·········	১		
মনস্থখা······ ···		১	
বীরসিংহ·········	১		১
নিশ্চিন্দিপুর······	১		
নতুক জয়কৃষ্ণপুর······	১		
জয়নগর·········		১	

এই থানায় মোট ছয়টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দুটি মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র ও মাত্র একটি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র আছে। প্রাইভেট্ ডিস্‌পেনসারিও আছে, তবে তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এই থানার অন্তর্গত দুটি মিউনিসিপ্যাল শহরের মধ্যে ঘাটালে একটি নবতম বৃহৎ হাসপাতালের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পূর্বতন ব্র্যাড্‌লি বার্ট হাসপাতালটি ভাসাপুলের নিকট কোন্নগরে অবস্থিত ছিল। ইহা এত ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ ছিল যে মহকুমার মধ্যে এইরূপ একটি ক্ষুদ্র হাসপাতাল থাকা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। ১৯১৪ সালে ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন জেলার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট্ ও কালেক্টার F. B. Bradley-Birt. ঐ পুরাতন হাসপাতালটির সামনে একটি মর্মরফলকে লিখিত আছে ঃ

BRADLEY-BIRT DISPENSARY

GHATAL—1914

**Foundation stone laid by F. B. Bradley-Birt esq. I. C. S.
Magistrate & Collector of Midnapore whose sympathy
for the poor will be gratefully remembered."**

কিন্তু, গরীবদের প্রতি সহানুভূতিতে অতি সংকীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নির্মিত এই পূর্বতন হাসপাতালটি রোগীদের কতদূর উপকার করিত, তাহা

সন্দেহের বিষয়। শহরের পূর্বদক্ষিণ উপকণ্ঠে কোন্নগর এলাকায় ঘাটাল-পাঁশকুড়া রোডের ধারে নবনির্মিত বর্তমান হাসপাতালটি শুধু মহকুমায় নয়, জেলারও একটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হাসপাতাল।

এই থানার দ্বিতীয় মিউনিসিপ্যাল শহর খড়ারে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল নাই।

চন্দ্রকোণা থানা ঃ

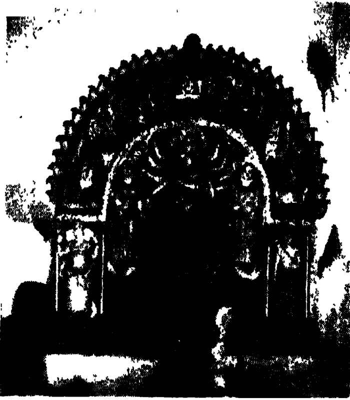
এই থানার মোট ২৮৭টি মৌজার মধ্যে মাত্র কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উল্লেখ সেন্সাস রিপোর্টে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে চন্দ্রকোণা শহরে মাত্র একটি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র আছে। অন্যান্য মৌজায় যেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে তাহাদের নাম—

বসনছাড়া········· · · ·	স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১
রামকৃষ্ণপুর (১৬৬)	···স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১
নিচ্‌না······	ঐ	১
ডিঙ্গাল ···	ঐ	১

অবশ্য, এই থানার বহু গ্রামের কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। এই থানার অন্তর্গত তিনটি মিউনিসিপ্যাল শহরের মধ্যে চন্দ্রকোণায় যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি আছে তাহাতে ৫০টি শয্যার উল্লেখ রিপোর্টে পাওয়া যায়। সম্ভবত শয্যাসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্ষীরপাই শহরে অবস্থিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১০টি মাত্র শয্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সম্ভবত আরও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐখানে দুয়েকটি প্রাইভেট্ ডিস্‌পেনসারিও আছে। রামজীবনপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিও ১০টি শয্যাযুক্ত।

বহু আগে এই মহকুমার নানা স্থানে কবিরাজী চিকিৎসার যে ব্যাপক প্রসার ছিল তাহা জানা যায়। বর্তমানে এই চিকিৎসা একপ্রকার লুপ্ত। কবিরাজদের চিকিৎসাপদ্ধতি এইরূপ ছিল—জ্বর হইলে রোগীকে প্রথমে তাঁহারা উপবাস করাইতেন, সে যে কোন জ্বরই হোক না কেন। উপবাস কঠোরভাবে পালিত হইত। কয়েকদিন পরে যখন রোগের প্রকোপ কিছুটা কমিয়া যাইত তখন পথ্য হিসাবে শুকনো মুড়ি ও মিছরির ব্যবস্থা করা হইত। কবিরাজেরা রোগী তৃষ্ণার্ত হইলেও তাহাকে ঠাণ্ডা জল দেওয়া বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করিতেন। মাটির হাঁড়ি করিয়া গরম সেঁকও রোগীর কোন কোন স্থানে দেওয়া হইত এবং সাংঘাতিক ঘাম জন্মাইলে তাহা বন্ধ করা হইত। নানা গাছগাছড়ার ঔষধ

সেকালের কবিরাজী চিকিৎসা



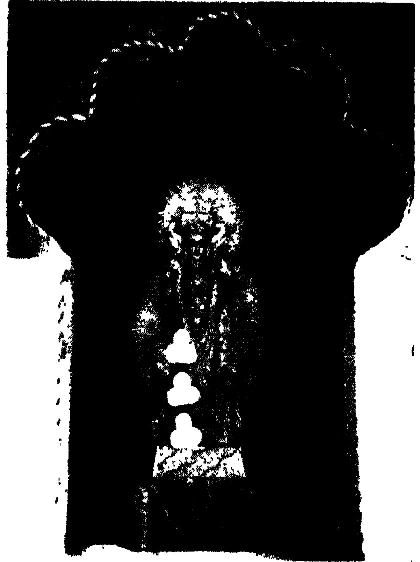
প্রাচীন রীতির দুর্গাপ্রতিমা, ঘাটাল



'মেড়'-বেষ্টিত দুর্গাপ্রতিমা



ঘাটাল মহকুমায়
'শিবায়নগানে'র দৃশ্য



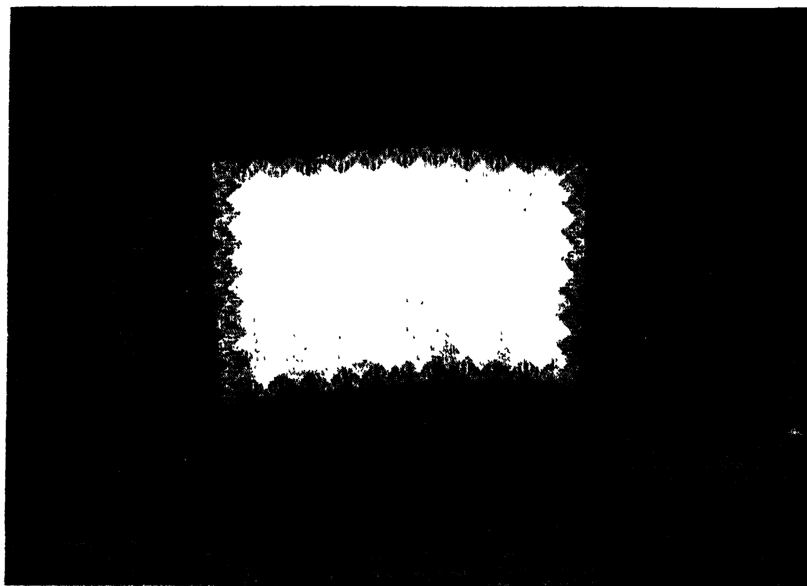
দিয়াশলাই কাঠির তৈরী আধুনিক
সরস্বতীমূর্তি, ঘাটাল



ব্যাড়লি-বার্ট ডিসপেনসারির মর্মর ফলক



আধুনিক দুর্গাপ্রতিমা, ঘাটাল



প্রাচীন নকশাকরা শাল



চেতুয়া–বাসুদেবপুরের (দাসপুর) পটীদার ও পট

যেমন, নিমছালের রস, পটল, মুথা, হরিতকী প্রভৃতির মিশ্রণে তৈয়ারী ঔষধ বেশ ব্যবহৃত হইত। সাত দিন পরেও জ্বরের উপশম না হইলে নানা প্রকারের বড়ি ও গুঁড়া ঔষধের প্রয়োগ চলিত। কোন কোন বড়িতে ৮০ প্রকারেরও বেশি গাছগাছড়ার উপাদান থাকিত। এই সমস্ত ঔষধ প্রতিদিন তিনবারের বেশি রোগীকে দেওয়া হইত না এবং এক একটি পিল বা বড়ি মটরদানার আকার হইত। ঔষধ প্রয়োগ করার সময় বড়িগুলিকে গুঁড়া করিয়া একপ্রকার জেলির মতো করা হইত। ইহা সত্ত্বেও জ্বর যদি দশ বা বারোদিনের দিনও না কমিত তখন কবিরাজেরা শেষ ঔষধরূপে কুইনিনের বিধান দিতেন। কিছু কিছু পুরানো রোগে ধাতুঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করা হইত। যখন কোন ব্যবস্থাই কৃতকার্য হইত না তখন 'মকরধ্বজ' নামে পরিচিত সোনা ও অভ্রের চূর্ণ রোগীকে মধুর সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া চলিত। এই চিকিৎসায় অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী অনেক রোগ ও আমাশয় অম্লরোগের অনেক উপকার হইত।

কবিরাজী চিকিৎসায় ঔষধ হিসাবে যেসব গাছগাছড়ার বহুল ব্যবহার ছিল তাহাদের কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হইল: কথ, কাতবিষ, বাকোড়, বেল, ঘৃতকুমারী, হিজ্‌লি বাদাম, খস্‌খস্‌, চীনাবাদাম, শিয়ালকাঁটা, নিম, মাদার, জংলি বাদাম, পপয়, দাদমর্দন, পাতিনেবু, ভান্ত, গালিঞ্চা, ললিতাপাট, জায়ফল, সশা, কাঁকুড়, হল্‌দি, মুথা, সাদা ধুতুরা, গাব, আমলকি, আয়াপান, মনসা, অনন্তমূল, নীল; মসিনা, পুদিনা, নাগেশ্বর, চাঁপা, আলকুশী, কৈ*গফল, শ্বেত করবী, খেতপাপ্‌ড়া, গন্ধভাদুলী, কালাদানা, পান, চিতা, ডালিম, ভেলা, সাদা সরিষা, কালা সরিষা, কুচিলা (ইহা হইতে হোমিও প্যাথিক ঔষধ নাক্‌স্‌ ভোমিকাও তৈয়ারি হয়। ইহার বিদেশী নাম—Strychnos Nux-vomica), তেঁতুল, বহড়া, হরিতকী, পাণিফল, পটল, কুড়চি ও অদ্রক। ধাতুগঠিত ঔষধ ছিল লবণ, লৌহ ও সিসা।

কবিরাজী চিকিৎসায় ব্যবহৃত গাছগাছড়া

কবিরাজী চিকিৎসা এইদেশে একপ্রকার লোপ পাইলেও বর্তমানে কোন কোন এ্যালোপ্যাথী চিকিৎসকও ইহার উপকারিতা বিষয়ে কৌতূহলী হইতেছেন। ধোবাখালির (দাসপুর) পরাণ বৈদ্য ও তাঁহার পুত্র গোপাল বৈদ্য কবিরাজী চিকিৎসায় সেকালে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। আজুড়িয়ার সেনগুপ্তবংশও জাতবৈদ্য। গোপালবৈদ্যের খ্যাতি বর্ধমানরাজপ্রাসাদ অবধি ছিল।

উল্লিখিত চিকিৎসক ও চিকিৎসাপদ্ধতি ছাড়াও মহকুমার বেশ কিছু গ্রামাঞ্চলে হাতুড়ে চিকিৎসা বা জড়িবটী অথবা মন্ত্রতন্ত্র তুকতাকের দ্বারাও

অনেক চিকিৎসা করা হয়। গ্রামাঞ্চলের কিছু কিছু লোকের ইহার প্রতি এখনও বিশ্বাস বা আস্থা লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই বিষয়ে তাঁহারা অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতারিত হইলেও অনেকের এই তুক্‌তাক্ মন্ত্রের উপর বা হাতুড়ে চিকিৎসার প্রতি বিশ্বাস লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। সাপে কামড়াইলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মন্ত্রের দ্বারা 'গুণিন্' নামে চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করেন। অনেক সময় রোগীকে কলাগাছের খোলের রস খাইতে দেওয়া হয় বা পিঠে থালা বসাইয়া মন্ত্র পড়িয়া চিকিৎসা করা হয়। কুকুরে কামড়াইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ করা হয় এবং আলকুশীজাতীয় এক ধরণের কুট্‌কুটে বন্য ফল খাইতে দেওয়া হয়। ইহার ফলে কোন কোন রোগ আশ্চর্যরকমে কমিয়া যাইতে দেখা যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিষাক্ত সাপের দংশন হইতে ইহার দ্বারা রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। অবশ্য, এই ব্যবস্থার প্রতি লোকের আস্থা ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে এবং সর্পদংশন নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসায় নিরাময় হইতেছে। তবে দেশীয় ক্ষত চিকিৎসার গোছাতির (দাসপুর) মান্নাবংশ, ভূতার শেখযাদু ও তৎপুত্র শেখ সেকেন্দার, বরদা পরগণার জয়নগরের ভব মান্না ও তাতারপুরের (চন্দ্রকোণা) ভুবন মণ্ডল ঐ চিকিৎসা-পদ্ধতি কোনরকমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

হাতুড়ে চিকিৎসা

বর্তমানে রাজ্যের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই মহকুমায়ও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা ক্রমশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে এবং এই অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ইহার ক্ষেত্র প্রশস্ত হইতেছে। দাসপুর থানার চেতুয়া-বাসুদেবপুরের নরনারায়ণ ঘোষ ও রাজনগরের আশুতোষ চৌধুরী প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ছিলেন। এই থানার ক্ষেপুতের হরিপ্রসন্ন ঘোষ ও মন্মথনাথ নাগও মেদিনীপুর শহরে ঐ চিকিৎসায় খ্যাত ছিলেন। ঘাটালের শ্রীহরেন্দ্রনাথ দোলুই ঐ চিকিৎসায় মহকুমার মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং বহু দুরারোগ্য ও জটিল রোগ নিরাময় করিয়া থাকেন।

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা

বিদ্যুৎ-সরবরাহ ঃ

এই মহকুমায় আগের তুলনায় বিদ্যুৎ-সরবরাহব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎসরবরাহের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার ফলে এই মহকুমারও অনেক গ্রামে বিদ্যুতীকরণ কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কতগুলি গ্রামে বিদ্যুতীকরণ হইয়াছে

তাহার সঠিক পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায় নাই। ঘাটাল ও এই মহকুমার পূর্বোক্ত আরও চারটি শহরে এবং তার আসপাশের কিছু কিছু স্থানে আগে হইতেই বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। দাসপুর বিদ্যুতীকরণের ব্যাপারে একেবারে অবহেলিত ছিলই বলা যায়। সাম্প্রতিক পরিকল্পনায় দাসপুর এবং দাসপুর থানার কিছু কিছু গ্রামে বিদ্যুতীকরণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং ঐসব গ্রামের রাস্তাঘাট আলোকিত করার জন্য খুঁটি ও বৈদ্যুতিক তার প্রভৃতি বসানো হইয়াছে। তবে, কোন কোন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছিলেও দেশের বেশিরভাগ স্থানেই এখনও ইহা পৌঁছে নাই। আবার যে সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছিয়াছে, সেই সব গ্রামের খুব অল্পস্থানেই বিদ্যুৎসরবরাহের ব্যবস্থাদির জন্য খুঁটি বা তার আছে। বিদ্যুতের সাহায্যে গভীর নলকূপের দ্বারা সেচকার্যের ব্যবস্থায় দাসপুর, ক্ষীরপাই, বীরসিংহ প্রভৃতি স্থানে কৃষিকার্যের কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

১৯৭১ সালের আদমসুমারীর রিপোর্টে মহকুমার চন্দ্রকোণা থানার বেশির ভাগ মৌজায়ই বিদ্যুৎসরবরাহ নাই বলিয়া প্রধানত উল্লেখ করা হইলেও এখন ঐ থানার কিছু কিছু গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। চন্দ্রকোণা শহরে বিদ্যুৎ-কানেকশন ডোমেষ্টিক ৪৩, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ৭ এবং কমারশিয়্যাল ৫০টি আছে। ক্ষীরপাইয়ে ডোমেষ্টিক্, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ও কমারশিয়্যাল কানেকশন যথাক্রমে ১৭, ৫ ও ৩৩টি এবং রোড্ লাইটিং পয়েন্ট্ ৩১টি। রামজীবনপুরে ডোমেষ্টিক্, ইনডাষ্ট্রিয়াল ও কমারশিয়্যাল কানেকশন যথাক্রমে ৫৭, ১ ও ২২ এবং রোড্ লাইটিং পয়েন্ট্ ৩৩টি আছে।

ঘাটাল থানার কয়েকটি মৌজায় বিদ্যুৎ-সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে যেমন, বীরসিংহ, কাঞ্চিয়া, শ্যামসুন্দরপুর, জলসরা ও রাধানগর। ঘাটাল শহরে রোড্ লাইটিং পয়েন্ট্ ৮৯টি এবং অন্যান্য পয়েন্ট্ ১০টি বর্তমান। খড়ারে ডোমেষ্টিক্ ২৯, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ৩, কমারশিয়্যাল ৬৩ এবং অন্যান্য ২টি কানেকশন বা পয়েন্ট্ আছে।

ঘাটাল-পাঁশকুড়া পাকা রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণমুখী নিমতলা, বেলিয়াঘাটা, দাসপুর প্রভৃতি স্থানে বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার বসিয়াছে এবং বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহও হইতেছে। বর্তমানে দাসপুর, মামুদপুর প্রভৃতি স্থান কতকটা শহরাঞ্চলে পরিণত হওয়ায় এখানে ও আসপাশের কোন কোন স্থানে বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা বেশ চালু হইয়াছে। এই থানার বৈকুণ্ঠপুর, বাসুদেবপুর, গৌরা, খুকুড়দহ প্রভৃতি স্থানেও বিদ্যুৎব্যবস্থা হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেলার বহুগ্রামে বিদ্যুতীকরণ এবং বিদ্যুৎ-সরবরাহ ব্যবস্থা সাম্প্রতিককালে চালু হইয়াছে, তবে ঘাটাল মহকুমার বহু গ্রামে এখনও এই নাগরিক সুবিধাটির প্রসার হয় নাই।

উল্লেখযোগ্য গ্রাম ও শহর ঃ

ঘাটাল মহকুমার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম ও শহরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হইল ঃ

(১) **দাসপুর ঃ**

ইহা দাসপুর থানার হেড্কোয়ার্টার। ঘাটাল-পাঁশকুড়া পাকা রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। মহকুমাশহর ঘাটাল ইহার ৮ কিলোমিটার উত্তরে। নিকটবর্তী রেলষ্টেশন পাঁশকুড়া। এখানে যানবাহনের খুব সুবিধা আছে। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি প্রভৃতি ঘাটাল, পাঁশকুড়া ও দূরবর্তী স্থানসমূহে যাতায়াত করে। দাসপুর সম্প্রতি একটি আধা শহরে পরিণত হইয়াছে। বিজলী আলো, বাজার, দোকান-পাট, হাট, নলকূপ ও গভীর নলকূপ প্রভৃতি এখানে অনেক সুযোগসুবিধা আছে। সরকারি কার্যালয়গুলির মধ্যে থানা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়াও দাসপুর ১নং ব্লক অফিস, সাব্রেজিষ্ট্রী, জে. এল. আর. ও-কার্যালয় একটি সাব্পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, নাড়াজোল ও সোনাখালি সার্কেলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অবর পরিদর্শকের কার্যালয়, স্যানিটারী ইনস্পেক্টারের কার্যালয় এখানে বর্তমান। কয়েকবৎসর আগে ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার একটি শাখাকেন্দ্রও এইস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। এখানে একটি ছাপাখানা ও অন্যান্য ষ্টেশনারি দোকান আছে। স্থানটি পূর্বে বেশির ভাগ জঙ্গলাবৃত ছিল এবং সরকারি অফিস বলিতে একটি অতি ক্ষুদ্র সরকারি চিকিৎসালয় ছিল।

কিন্তু ইহার বহু আগে দাসপুর একটি খুবই সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। ১৯১১ সালে প্রকাশিত ও'ম্যালী সাহেবের মেদিনীপুর জেলা গেজেটিয়ারে দাসপুরকে"The home of a number of artisan families"অর্থাৎ 'কিছুসংখ্যক শিল্পিপরিবারের বাসস্থান' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 'দাসপুর' নামটি এই থানার বেশ কিছু সংখ্যক অধিবাসী কলিকাতায় গৃহভৃত্যের কাজ করিতেন বলিয়া হইয়াছে, ও'ম্যালী সাহেব ইহাও বলিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবত তাহা নহে। শব্দটি হয়তো আদিতে 'দাশপুর' ছিল অর্থাৎ দাশ=ধীবর বা জেলে। এই স্থানে তাঁহাদের বহু পূর্বে অধিকসংখ্যায় বাস ছিল। সেকারণেই হয়তো

'দাশপুর' নামটি উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। পরে শব্দটি উচ্চারণের ফলে 'দাসপুর' এই নামে অভিহিত হয়। দাসপুর থানায় বহু খাল-বিল আছে। ধীবর জাতিরা এইস্থানে অধিক সংখ্যায় থাকিতেন এবং এখনও বেশ কিছুসংখ্যক ধীবর এই অঞ্চলে আছেন। দাসপুর গ্রামটি খুবই ছোট, ইহার আয়তন মাত্র ২০১ একর এবং লোকসংখ্যা (১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী) মাত্র ৯১৫। ইহার পার্শ্ববর্তী গ্রাম মামুদপুরও দাসপুর নামে পরিচিত হইয়াছে। এই স্থান ও পার্শ্ববর্তী স্থানে যে পরিমাণে লোকের বাস ও সৌধাদি নির্মিত হইতেছে তাহাতে অচিরেই ইহা একটি শহরে পরিণত হইবে। এইস্থানে একটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ও আছে এবং সরকারি কার্যোপলক্ষে বাহিরের বহু লোক এখানে বাস করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, রেনেল সাহেবের মেদিনীপুরের মানচিত্রে (১৭৬৭-১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) দাসপুর গ্রামের নাম নাই। দাসপুর ২২°৩৬'২০" উত্তর অক্ষাংশ ৮৭°৪৫'৫০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

(২) **নাড়াজোল ঃ**

নাড়াজোল এখন প্রায়পরিত্যক্ত একটি আধা শহর। পূর্বে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল এবং প্রাচীন নাড়াজোল পরগণার হেড্‌কোয়ার্টার ছিল। ১৮৭২ সালের সেন্সাস অনুযায়ী এই পরগণার আয়তন ছিল ৮৯৯৭ একর বা ১৪.০৫ বর্গমাইল। মোট ৭১টি গ্রাম লইয়া পরগণাটি গঠিত ছিল। সেইসময় এখানকার জনসংখ্যা ছিল ৭৭০৫।

বর্তমানে কিস্মৎ নাড়াজোল (মৌজা নং ১৬, দাসপুর থানা) এবং নিজনাড়াজোল (মৌজা নং ১৭, থানা ঐ) দুটি পাশাপাশি গ্রাম। আয়তন যথাক্রমে ৪৩৪ ও ৬৯৪ একর এবং জনসংখ্যা যথাক্রমে ৪৮৮ ও ১,৮৯২। নিজনাড়াজোল গ্রামে প্রাচীন নাড়াজোলরাজপরিবারের গড় ও অট্টালিকা অবস্থিত। প্রাচীন মন্দির ও নাড়াজোলরাজপরিবারের কয়েকটি সমাধি এখানে আছে। কাছাকাছি লঙ্কাগড় দীঘিটি সুপ্রসিদ্ধ রাজা মোহনলাল খাঁন প্রতিষ্ঠিত। রাজা মোহনলালের একটি বিশিষ্ট রীতির সমাধিমন্দির এই দীঘিটির দক্ষিণে পাকা রাস্তার ধারে অবস্থিত। গড়মধ্যে রাজপ্রাসাদে বর্তমানে নাড়াজোল রাজকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নাড়াজোলের উত্তরে শিলাই নদী এবং দক্ষিণে পলাশপাই খাল এই স্থানকে প্রায় পরিবেষ্টিত করিয়াছে। ইহা ২২°৩৪'৪" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭°৩৯'৪" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। হান্টার সাহেবের মতে ইহা এক সময় সূতিবস্ত্র উৎপাদনের বৃহৎ কেন্দ্র ছিল।

(৩) **ঘাটাল ঃ**

ইহা মহকুমার প্রধান শহর ও হেড্‌কোয়ার্টার। ইহা ২২°৪০'১০" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭°৪৫'৫০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। শিলাই নদীর উভয়তীরে অবস্থিত এই শহরটির বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। শহর ও তাহার আশপাশের কয়েকটি এলাকা ঘাটাল পুরসভার অন্তর্গত। শহর ও পুরসভা এলাকার মোট জনসংখ্যা ২৭,৫৭০। ১৯৬১ সালের সেন্সাসে জনসংখ্যা ছিল ২১,০৬২। ঘাটাল পুরসভাটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্বে ঘাটাল পৌর এলাকা এ, বি, সি, ডি, এই চারটি ওয়ার্ডে গঠিত ছিল এবং চারিটি ওয়ার্ড ১০টি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। ১৯৫৯ সাল হইতে সমগ্র পৌর এলাকাকে ১৭টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হইয়াছে। আগে বাংলার গবর্ণরের দ্বারা পুরসভার সদস্যগণ মনোনীত হইতেন। সেই সময় ইহার সদস্যসংখ্যা কখনও ৯ কখনও বা ১০ ছিল। পরে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গ পৌর আইনে'র তৃতীয় খণ্ডের ১৩নং ধারা অনুসারে এখানকার পুরসভার জন্য ১০ জন সদস্য নির্বাচিত এবং ৫ জন মনোনীত হইতেন। ইহার ফলে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পৌরপতি নির্বাচিত হন ১৮৮৮ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে নারায়ণপ্রসাদ দত্ত। গত ১৯৬৯ সালে ঘাটাল পুরসভার শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সেই সময় ইহার পৌরপতি ছিলেন ডাঃ স্বদেশভূষণ চৌধুরী। তাঁহার এবং আরও অনেকের চেষ্টায় ঘাটাল পুরসভার একটি তথ্যবহুল শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা ঘাটাল পুরসভা সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থরূপে পরিগণনযোগ্য।

ঘাটাল শহরের শিলাই নদীর উপর ভাসমান পুলটি পূর্বে রেশমকুঠির সাহেবরাই শুধু ব্যবহার করিতেন। পরে Bengal Ferries Act 1885 এর ৬নং ধারা অনুসারে ১৯০৪ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে পুলটি সাধারণের ব্যবহারযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। বর্তমান 'শিলাবতী সেতু' নামে পাকার পুলটি এই ভাসাপুলের দক্ষিণে কোন্নগর ও কৃষ্ণনগর পল্লী দুটির সংযোগস্থল এবং ঘাটাল-পাঁশকুড়া ও ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রোড্‌কে যুক্ত করিয়াছে। এখনকার ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রোড্‌ রাস্তাটি পূর্বে ঘাটাল-রামগড় রোড্‌ নামে পরিচিত ছিল। ওয়াট্‌সন কোম্পানীর ঘাটাল-রাধানগর রেশম কুঠির ম্যানেজার মিঃ টার্নবুল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ রাস্তাটি নির্মাণ করান। কিন্তু রেনেল সাহেবের মেদিনীপুর জেলার এই অঞ্চলের মানচিত্রে (১৭৬৭-১৭৭৪ খ্রীঃ) ঘাটাল হইতে

চন্দ্রকোণা পর্যন্ত একটি পাকারাস্তা চিহ্নিত আছে দেখা যায়। এই শহরে মহকুমার সদর কার্যালয় ফৌজদারী আদালতটি পূর্বে রেশমকুঠির মালিক ইংরেজ বণিক ওয়াট্‌সন সাহেবের বাসস্থান ছিল। বর্তমানে পরিত্যক্ত মহকুমা হাসপাতালটি তাঁহার অতিথিশালা এবং বাজারটি ছিল তাঁহার রেশমকুঠি। ঐস্থানে পূর্বতন রেশমকুঠির ইটের তৈয়ারি চিম্‌নিটি এখনও বর্তমান। এই শহর সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

(৪) **বরদা ঃ**

পূর্বে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য পরগণা ছিল। রেনেলের মানচিত্রে এই স্থানটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত আছে। কিন্তু 'আইন-ই-আকবরী'তে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্থানটি বর্তমানে ঘাটাল শহরের প্রায় ১ মাইল পশ্চিমে ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পাকারাস্তার ধারে অবস্থিত। বর্তমানে ইহা নেহাতই একটি গ্রাম। কিন্তু বিদ্রোহী জমিদার শোভাসিংহের সময়ে (১৬৯৫ খ্রীঃ) ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। শোভাসিংহের অনেক আগে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বরদা একটি নগর ছিল এবং এইস্থানে দলপত্‌ নামে এক রাজা ছিলেন। 'বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী'তে এই দলপতের নাম আছে। খড়ারের পার্শ্ববর্তী বর্তমান দলপতিপুর গ্রামটি এই রাজার স্মৃতিবাহক। বরদাগ্রামের গড়ে শোভাসিংহের বিরাট্ অট্টালিকা ছিল। চেতুয়া পরগণার রাজনগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। বর্তমানে বরদার সেই গড়ের প্রাসাদ প্রভৃতি নিশ্চিহ্ন। ইহা একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান।

(৫) **খড়ার ঃ**

ঘাটাল থানার অন্তর্গত ইহা একটি প্রাচীন শহর। এখানের পুরসভাটি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমে উদয়গঞ্জ ও দক্ষিণপূর্বে দলপতিপুর পর্যন্ত ইহার এলাকা। ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুসারে এখানের জনসংখ্যা ৭,২৬২। ১৯৬১তে ছিল ৫,৯০৯। এই শহর সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে এবং পরবর্তী কোন কোন পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইবে।

(৬) **রাধানগর ঃ**

ঘাটাল থানার অন্তর্গত ইহা একটি মৌজা (নং ৭৮)। ১৯৭১ এর সেন্সাস অনুযায়ী লোকসংখ্যা ২,৭০৯। ১৯৬১ তে লোকসংখ্যা ছিল ১,৯৮২। আয়তন ৯২২ একর। ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রোড্ এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। স্থানটি সেকালে খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল সন্দেহ নাই। পূর্বে সুতি ও রেশম বস্ত্রের একটি

উল্লেখযোগ্য বাজার এখানে ছিল। এখানের তৈরি রেশমী রুমাল খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। রাধানগরের রেশমের কাপড় ১৭ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নিম্নবঙ্গে যে যে দ্রব্য বিখ্যাত ছিল তাহাদের মধ্যে অন্যতম ছিল। ১৮ শতকের গোড়ার দিকে ক্যাপ্টেন আলেক্‌জাণ্ডার হ্যামিলটন লিখিয়াছেন: "On the west side there is a river that runs by the back of Hughly Island which leads upto Radonagar, famous for manufacturing cotton cloth and silk Romals or handkerchiefs." রেনেলের মানচিত্রে রাধানগর (Radanagur) বিশেষভাবে চিহ্নিত আছে।

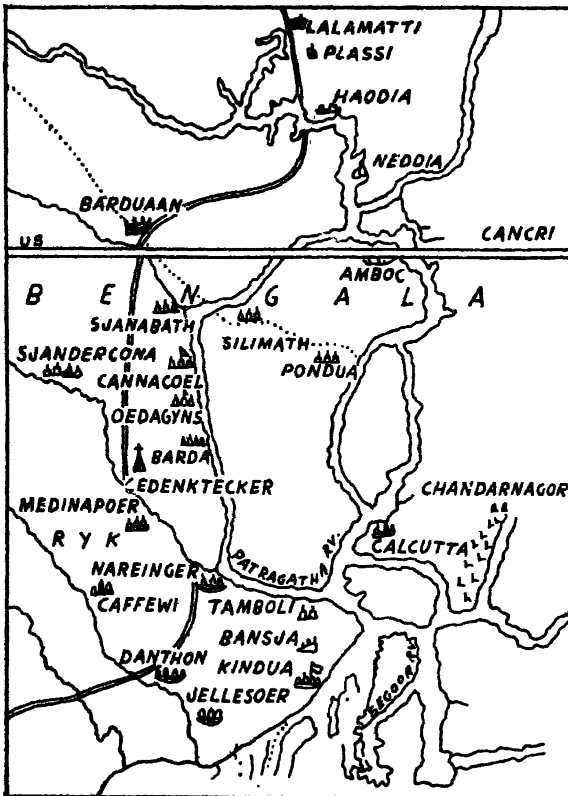
(৭) **ক্ষীরপাই :**

রাধানগরের প্রায় ৫।৬ মাইল পশ্চিমে এবং চন্দ্রকোণার ৭ মাইল পূর্বে ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রাস্তার ধারে ইহা অবস্থিত। পূর্বে ইহা একটি খ্যাতিমান্ বাণিজ্যিক শহররূপে পরিচিত ছিল। সুতি বা তাঁতবস্ত্র এখানকার প্রধান শিল্প ছিল। ১৮ শতকে ইংরেজদের এখানে একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক কুঠি ছিল। ওলন্দাজেরা এখানকার পণ্য ক্রয় করিবার জন্য তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইত। ফরাসীদেরও এখানে একটি কারখানা ছিল। ক্ষীরপাইয়ের নিকটবর্তী কাশীগঞ্জে রেশম ও নীলকুঠি ছিল।

ক্ষীরপাই পুরসভাটি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। শহরের ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী জনসংখ্যা ৭,০৭৫। ১৯৬১তে ছিল ৫,৮০৩। এই শহর সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহা চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত। রেনেলের ম্যাপে এই স্থানটির নাম 'Keerpoy'। প্রাচীন বর্ধমান-উড়িষ্যা রাস্তা ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

(৮) **চন্দ্রকোণা :**

ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর এই চন্দ্রকোণা। বর্তমান চন্দ্রকোণা থানার হেড্ কোয়ার্টার। ইহা ২২° ৪৪′ ২০″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭° ৩৩′ ২০″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। হান্টার সাহেবের মতে ইহা (১৮৭২ সালে) মেদিনীপুর জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ছিল। তখন ইহার মোট জনসংখ্যা ছিল ২১,৩১১। পূর্বে ইহা হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোম্পানির আমলে এখানকার তাঁতবস্ত্র খুবই প্রসিদ্ধ ছিল এবং তন্তুবায়েরা এখানে বেশি সংখ্যায় বাস করিতেন। পরে এই অঞ্চলে যখন বিলাতী কলের কাপড় আমদানী হইতে লাগিল এবং কোম্পানিও তাহাদের কারবার গুটাইয়া লইলেন তখন তন্তুবায়েরা



ফান ডোন ব্লোক-অঙ্কিত
বাংলার মানচিত্রের একাংশ
(১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ)

এই মানচিত্রে মেদিনীপুর, চন্দ্রকোণা, বরদা, খানাকুল, জাহানাবাদ প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ আছে।

তাঁহাদের পৈতৃক পেশা ছাড়িয়া দিয়া কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। আজ হইতে ১০০ বছর আগেও চন্দ্রকোণায় ব্যবসায়-বাণিজ্য বেশ চলিত। কিন্তু পরে নানা কারণে তাহার অবনতি হইতে থাকে।

শহরের পুরসভাটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুসারে লোকসংখ্যা পূর্বের তুলনায় খুবই কম দেখা যায়। মাত্র ৯,৮১১। ১৯৬১ তে ছিল ৭,৩৮৩।

১৭ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এইস্থান বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। ফান ডোন ব্রুকের মানচিত্রে (১৬৬০ খ্রীঃ) ইহাকে অজ্ঞাতনামা নদীতীরবর্তী (শিলাই) একটি বড় গ্রামরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে, নাম "Sjanderoona"। তাঁত ছাড়াও এখানকার চিনি ও মট্‌কী ঘি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯ শতক হইতে এই সব শিল্পের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া মহামারী হয় তাহাতে এই স্থানের জনসংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছিল।

'আইন-ই-আকবরী'তে চন্দ্রকোণার কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবত তখন ইহা বিস্তীর্ণ মহাল হাবেলী মাদারুণের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দের বন্দোবস্তে ইহা বর্ধমান জমিদারীর একটি অন্যতম তালুকরূপে পরিগণিত হয়। ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইহা বর্ধমান জেলার অংশ ছিল। পরে রাজস্বের জন্য ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলা গঠিত হইলে চন্দ্রকোণা ঐ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা হুগলিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেইসময় ইহা পাকাপাকি-ভাবে মেদিনীপুর জেলার আওতায় আসে।

চন্দ্রকোণার প্রাচীন ইতিহাস খুবই গৌরব সমৃদ্ধ। 'ইতিহাস অধ্যায়ে' ইহার আলোচনা করা হইয়াছে।

(৯) রামজীবনপুর ঃ

চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা হইতে ৯ মাইল উত্তর-পূর্বে বর্ধমান-উড়িষ্যা রাস্তার উপর অবস্থিত। ইহাও একটি প্রাচীন শহর। ভানরাজা হরিনারায়ণের দেওয়ান রামজীবন মুখোপাধ্যায়ের (তিনি রামজী নামে পরিচিত ছিলেন) নামে সম্ভবত এই শহরের নামকরণ হইয়াছিল। ইহা আগে বস্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং তামা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতু ঢালাইয়ের কাজও এখানে হইত।

রামজীবনপুর পুরসভা ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুসারে এখানকার লোকসংখ্যা ছিল ১০,৩৬৪। ১৯৬১ তে ছিল ৭,৬২১ এবং

১৯০১ এ ছিল ১০,২৬৪। ১৮৭২ সালের সেন্সাসে লোকসংখ্যা ছিল ১১,১৬৬। এখানে বহু প্রাচীন মন্দির-দেবালয় আছে। রামজীবনপুর পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত বাণপুর, বাহাদুরপুর, ঘোলা, পাণ্ডুয়া, রামেশ্বরপুর, বাক্চা, গোবিন্দপুর, সর্বসুখ, রাজনা, দেপুর মৌজাগুলি আছে।

(১০) জাড়া ঃ

চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত ১৫২ নং মৌজা জাড়া ক্ষীরপাই-রামজীবনপুর রাস্তার উপর অবস্থিত। ১৯৭১ সালের সেন্সাসে এখানের লোকসংখ্যা ছিল ৩,৭৮৭ এবং ১৯৬১ সালে ছিল ৩,১৫৮। জাড়ার আয়তন ১,৬০৫ একর। এইস্থানে জাড়ার রায়বাবুরা এককালে প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বহু মন্দির এখনও বর্তমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

W. W. Hunter : A Statistical Account of Bengal, Vol III (1876)

L. S. S. O'Malley : Midnapore District Gazetteer (1911)

H. V. Bayley : Memorandum on Midnapur (1852)

G. A. Grierson : Linguistic Survey of India, Vol V, Part I (1903)

District Census Handbook, Midnapore District, Series 22, West Bengal, Census 1971

Centenary Souvenir, Ghatal Municipality, 1869—1969

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যাসমাজ ঃ সেকাল-একাল

মেদিনীপুর জেলা তথা সমগ্র বাংলায় ইংরেজ-অধিকারের পূর্বে এমনকি কিছুদিন পর্যন্ত ইংরেজ আমলের চতুষ্পাঠী বা টোলের মাধ্যমে আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হইত। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও প্রভাবে ক্রমে এই শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি ঘটে। মোগল আমলে বাংলার এক লক্ষ গ্রামে আশি হাজার টোল ছিল বলিয়া জানা যায়। ঐ সমস্ত টোলে সংস্কৃত ভাষাই ছিল পঠনীয় বিষয় এবং এই ভাষায় লিখিত বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থে ছাত্রগণ জ্ঞান অর্জন করিতেন। সংস্কৃতের সঙ্গে পরবর্তীকালে মাতৃভাষা বাংলা, গণিত, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ও পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয় এবং গুরুমহাশয়ের 'পাঠশালা' নামক স্থানের জন্ম হইতে থাকে। ঘাটালের তথা বাংলার বরেণ্য সন্তান পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি কয়েকটি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মহকুমার দুয়েকটি স্থানে ঐ সময় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজও বর্তমান আছে। ক্রমে ক্রমে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য অঞ্চলের মত ঘাটাল অঞ্চলেও এই শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং বর্তমানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এইখানে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সেকালের টোল ও সংস্কৃত চর্চা ঃ

এই অঞ্চলে সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা কীরূপ ছিল তাহা জানিতে হইলে প্রথমে 'টোল' বা চতুষ্পাঠী সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। নিম্নের আলোচনায় জানিতে পারা যাইবে যে সেকালে সংস্কৃত শিক্ষা টোলের মাধ্যমে এই অঞ্চলে কতদূর প্রসারিত হইয়াছিল। টোল-শিক্ষার আলোচনার সঙ্গে সেসময় সামাজিক অবস্থারও বেশ চিত্তাকর্ষক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এইদেশে সেকালে প্রায় প্রতি গ্রামে বা শহরে এক বা একাধিক টোল থাকিত। যে সকল গ্রামে স্থানীয় অধ্যাপকবৃন্দ বহু টোল পরিচালনা করিতেন সেই সকল গ্রাম 'বিদ্যাস্থান'রূপে পরিগণিত হইত। এই মহকুমায় এইরূপ বহুসংখ্যক 'বিদ্যাস্থান' ছিল। বিদ্যাস্থানগুলির কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখযোগ্য—শ্রীবরা, বাসুদেবপুর, গোকুলনগর, বৃন্দাবনপুর—গ্রামগুলি দাসপুর থানায় অবস্থিত ; ঘাটাল থানার বরদা এবং চন্দ্রকোণা থানার পাইকমাজিটা ও

চন্দ্রকোণা। ইহা ছাড়া নিম্নোক্ত গ্রামগুলিতে উল্লেখযোগ্য চতুষ্পাঠী ছিল— দাসপুর থানায় ক্ষেপুত, চাঁদপুর, বলিহারপুর, সেকেন্দারী, রসিকগঞ্জ, গাদিঘাট, ধানখাল, নাড়াজোল, রাজনগর, আনন্দগড়, বৈকুণ্ঠপুর ও মহেশপুর ; ঘাটাল থানার অন্তর্গত মহারাজপুর, খড়ার, কুরান, বীরসিংহ, কাটান, প্রতাপপুর, রাধানগর, ইড়পালা ও যদুপুর এবং চন্দ্রকোণা থানার ক্ষীরপাই, আমড়াপাট, বোনা, মঙ্গরুল, যদুপুর, জাড়া, মাধবপুর (জে. এল. নং ৯৪), রামজীবনপুর প্রভৃতি।

রাজা রাধাকান্ত দেব-সঙ্কলিত 'শব্দকল্পদ্রুমে' চতুষ্পাঠী শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, 'যেখানে চার বেদের পাঠ হয়'। চলিত ভাষায় ইহার নাম 'চৌপাড়ী'। আবার শুধুমাত্র এখানে বেদশিক্ষা ও শিক্ষণ না হইয়া আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যা, ত্রয়ী বা বেদবিদ্যা, বার্তা বা কৃষি ও বাণিজ্যবিদ্যা ও দণ্ডনীতি বা রাষ্ট্রনীতিও টোলে শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া বেদাঙ্গের অন্তর্গত শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এবং কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতিও টোলে পড়ানো হইত। টোলের অধ্যাপক ছিলেন প্রায়শঃ ষট্‌কর্মী ব্রাহ্মণ। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহকে ষট্‌কর্ম বলে। বহু অধ্যাপক তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতেন। নিজের উপার্জিত ধনে ছাত্রগণকে অন্নদান করিয়া ও নিজগৃহে রাখিয়া যিনি অধ্যাপনা করিতেন তিনিই অধ্যাপক সমাজে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা পাইতেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার যিনি কাহারও নিকট হইতে কোন দান বা প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিতেন না তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ইহা হইতে সেকালে অধ্যাপক-সমাজ সমাজে কতদূর মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মাননীয় ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

রাজা বা জমিদারের দেওয়া নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি অথবা বার্ষিক বা মাসিক বৃত্তি, নৈমিত্তিক কর্ম উপলক্ষ্যে অধ্যাপকবিদায়, তৈলবট, গ্রাম্যবাব্‌ এবং যাজনকর্ম হইতে অর্থ অথবা পরগণার দান (যেমন জলদান, তৈজসদান, স্বর্ণদান প্রভৃতি) হইতে প্রায়ই চতুষ্পাঠীর খরচ চলিত। অধ্যাপকের সরল আদর্শ জীবনযাপন ও সংযত আচরণের প্রভাবে ছাত্রগণও নৈতিকশক্তিসম্পন্ন আদর্শ নাগরিকরূপে গঠিত হইতেন। কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত অধ্যাপক-সভায় ছাত্রবিদায় হইতেও তাহাদের খরচ-খরচা চলিত। সেকালে সমাজের সকল শ্রেণীর গৃহেই নৈমিত্তিক উৎসবে ছাত্রসমেত অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইতেন এবং মর্যাদানুসারে মালা, তৈজসপত্র, ভোজ্যাদি দ্রব্য ও দক্ষিণা বিদায় পাইতেন। অধ্যাপক-সভায় যে শাস্ত্র আলোচনা হইত তাহাতে

ছাত্র ও উপস্থিত সাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধি হইত। সেকালে টোলের পাঠক্রম এইভাবে হইত—প্রথমে অধ্যাপক টোলে কয়েকজন বুদ্ধিমান্ ছাত্রকে বিশেষরূপে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। ঐ সকল ছাত্র উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া নবাগত বা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার ভার লইতেন। এইভাবে শিক্ষা ও শিক্ষণ যুগপৎ পরম্পরাক্রমে অগ্রসর হইত। ছাত্রগণ পরস্পর আলোচনার দ্বারা অধীত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। আলোচনায় যে সব বিষয় অমীমাংসিত থাকিত তাহার সমাধান করিয়া দিতেন অধ্যাপক স্বয়ং। এই পদ্ধতিতে একটি টোলে প্রতিটি ছাত্রের উপর ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখার ফলে বিদ্যাদান সমান ফলপ্রসূ হইত—কোন বিশেষ বিদ্যায় কোন ছাত্রের প্রবণতা অনুযায়ী সেই ছাত্র সেই বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হইতে পারিতেন। তখন মুদ্রণযন্ত্র বা 'প্রেস্' ছিল না। তাই ছাত্রেরা নিজেদের পাঠ্যপুস্তক নিজেরাই লিখিয়া লইতেন। এইভাবে পুঁথিসমূহ রচিত হইত। ইহার আর একটি সুফল, হস্তাক্ষর সুন্দর হইত এবং পাঠ্য বিষয় সহজেই মুখস্থ হইয়া যাইত। অধ্যাপনার সহিত শিক্ষক মূল গ্রন্থ এবং তাহার টীকা-টিপ্পনী, পত্রিকা প্রভৃতিও রচনা করিতেন।

ঘাটাল অঞ্চলে সেকালে টোলে প্রথমে সংস্কৃত-ব্যাকরণ হইতে শিক্ষা সুরু হইত। সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনির পঠন-পাঠন এদেশে তেমন ছিল না। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের পাঠই বেশি হইত। কোন কোন টোলে মুগ্ধবোধের পাঠও হইত। কিন্তু ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের জুমরনন্দী বৃত্তি ও গোয়ীচন্দ্রের টীকা ব্যাপকভাবে অধীত হইত। ইহার সঙ্গে অমরকোষ কণ্ঠস্থ করা রীতি ছিল। এইভাবে শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলে মহাকাব্য, দৃশ্যকাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি আর কোন কোন স্থলে জ্যোতিষ ছিল পাঠ্য বিষয়। ন্যায়শাস্ত্রে কাণাদী ভাষারত্ন ছিল এদেশে ন্যায়ের প্রথম পাঠ্যগ্রন্থ। এদেশের সকল সমাজই ছিল খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের অধীন। কণাদ তর্কবাগীশ ছিলেন ঐ সমাজের আদি নৈয়ায়িক। তিনি নবদ্বীপের জানকী চূড়ামণির ছাত্র ছিলেন। কণাদের বংশধরগণ এখনও খানাকুলে আছেন। কণাদের ভাষারত্ন ছাড়া স্মার্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব চতুষ্পাঠীসমূহে পাঠ্য ছিল। তাহা ছাড়া বাস্তুবিদ্যা, শাকুনশাস্ত্রও আলোচিত হইত। দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে সাংখ্য, গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র ও বেদান্তের পাঠও কোনও কোনও চতুষ্পাঠীতে চলিত। কিন্তু বেদের আলোচনা এই অঞ্চলে তেমন ছিল বলিয়া মনে হয় না।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম হইতে উঠিয়া ছাত্রগণ পঠিত বিষয় আবৃত্তি করিতেন।

পরে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া শৌচ ও স্নানান্তে সন্ধ্যাদি সম্পন্ন করিয়া অধ্যাপকের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেন। পাঠশেষে পূজা ও তর্পণ এবং জলযোগ। পরে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা শেষ করিয়া দুপুরের খাওয়া হইত। বৈকালে আবার পঠিত বিষয়ের আলোচনা হইত। সন্ধ্যায় সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া কিছুক্ষণ আবার পাঠ চলিত। এইভাবে টোলের ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবন নির্বাহিত হইত। কিন্তু অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম এবং ভোজনের পর বিশ্রামকালে পুঁথি নকল করা রীতি ছিল। পরিবারভুক্ত সন্তানের মতই ছাত্রগণ অধ্যাপক-গৃহে আদৃত হইতেন। ইহার ফলে নিজগৃহ ছাড়িয়া আসার দুঃখ তাঁহাদের থাকিত না। কর্তব্যপরায়ণ ও সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছাত্রসমাজ ভবিষ্যৎ জীবনে গৃহস্থের কর্তব্যকর্মসমূহও আয়ত্ত করিয়া লইতেন। অধ্যাপক ও তৎপত্নী তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ পিতামাতার মত পালন করিতেন। অনেক নৈষ্ঠিক স্বাবলম্বী অধ্যাপক ঘরের কাজ বা মাঠে চাষের কাজ করিতে করিতেই ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। সাধারণত একটি আলাদা বড় ঘর ছাত্রদের আবাসের জন্য দেওয়া হইত। এইভাবে ছাত্র-অধ্যাপকের অবিচ্ছিন্ন সংসর্গের ফলে ছাত্রগণ আদর্শবান্, কর্তব্যনিষ্ঠ ও প্রকৃত বিদ্বান্ হইয়া উঠিতেন।

পর্ব বা উৎসব উপলক্ষ্যে এই অঞ্চলে অধ্যাপক ও ছাত্রবিদায় সেকালে নিত্যকার ব্যাপার ছিল। শোনা যায়, গৌড়ের বাদশাহের প্রধান অমাত্য গুণরাজ খাঁন এই প্রথা প্রবর্তন করেন। ক্রমে উহা চতুর্দিকে চলিত হয়। শ্রাদ্ধ, পূজা-পার্বণ, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে কৃতী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-দ্বারা তুলটকাগজে সংস্কৃত-ভাষায় নিমন্ত্রণপত্র রচনা করাইতেন। পত্রে প্রহেলিকার মাধ্যমে তারিখ, মাস ও বারের উল্লেখ করা থাকিত। ভাটব্রাহ্মণ দ্বারা ঐ পত্রগুলি 'বিদ্যাস্থান' ও গ্রামের টোলসমূহে পাঠান হইত। এখন কলিকাতার কিছু কিছু স্থান ছাড়া ভাটদ্বারা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইবার রীতি নাই। নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া অধ্যাপক ছাত্র ও ভৃত্যসহ নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইতেন। নানা অঞ্চল হইতে বহু অধ্যাপকের সমাগমে কৃতীর বাড়ীর বৈঠকখানায় জায়গা কুলাইত না এবং তখন প্রতিবেশীর বৈঠকখানা অথবা খুব বেশি সংখ্যা হইলে গ্রামের এ ধরণের অনেক বৈঠকখানা বা পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের আরও কয়েকটি বৈঠকখানা লওয়া হইত। কৃতী প্রত্যেককে বিছানা, খাদ্য ও রাঁধিবার তৈজসপত্রসমূহ এবং অন্যান্য উপকরণ দিতেন। কাজের দিন অধ্যাপকগণ ছাত্র ও ভৃত্য সঙ্গে লইয়া অনুষ্ঠানমণ্ডপে পৌঁছিয়া নানা শাস্ত্রীয় আলোচনা সুরু করিতেন। বহু তর্ক-বিতর্ক হইত এবং পরে

বিচার্য-বিষয়ের নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। সভা-শেষে কৃতী প্রত্যেককে ভালোভাবে খাওয়াইয়া মর্যাদা অনুসারে নগদ টাকা, তৈজসপত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি দান করিতেন এবং ছাত্র ও ভৃত্যদিগকেও উপযুক্ত বিদায় ও পাথেয় দিতেন। এই বিশাল অধ্যাপক-সমাবেশে দূরদূরান্তের অধ্যাপকগণ পরস্পর পরিচিত হইতেন। এই সভার অধ্যক্ষতা করিতেন কৃতীর পুরোহিত বা সভাপণ্ডিত অথবা কোন খ্যাতনামা অধ্যাপক।

নাড়াজোল-রাজবাটীতে দানসাগরশ্রাদ্ধে প্রায়ই বহু অধ্যাপকের সমাবেশ ঘটিত এবং বারাণসী ও দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ হইতেও অনেকে এইস্থানে মিলিত হইতেন। সন ১২৭৭ সালে চেতুয়া-বাসুদেবপুরে কৃষ্ণকান্ত রায়ের দানসাগর শ্রাদ্ধেও এইরূপ বিরাট্ পণ্ডিত-সমাবেশ হইয়াছিল। লছিপুরের (ঘাটাল) একটি বিদায়-সভায় ভাটেদের গানে এদেশের অনেক বড় বড় কাজের বর্ণনা শোনা গিয়াছিল। নিমতলার গুঁইবংশ, গড়ের পালবংশ, ইড়পালার রুদ্রবংশ, নাড়াজোলের রাজবংশ ও নন্দনপুরের বহু সদ্‌গোপবংশে পুরুষানুক্রমে অধ্যাপক-বিদায়ের রীতি ছিল।

বহু আগে এই অঞ্চলের অধ্যাপক-সমাজের অবস্থা কীরূপ ছিল তাহার কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। এই মহকুমার দাসপুর থানার আনন্দগড়ের (জে. এল. নং ৩৭) গ্রহরাজবংশের আদিপুরুষ কল্যাণ বাচস্পতি সুপণ্ডিত ও সাধক ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে তিনি তৎকালীন আনন্দগড়ের রাজার সভাপণ্ডিতরূপে বর্তমান ছিলেন এবং নিজের অলৌকিক ক্ষমতাবলে রাজাকে অমাবস্যায় চাঁদ দেখাইয়াছিলেন। ইঁহার বর্তমান বংশধর শ্রীত্রিপুরানন্দ গোস্বামী ব্যাকরণতীর্থ বৃন্দাবনচক গ্রামে (পাঁশকুড়া) বাস করেন এবং ইঁহার একটি টোল এখনও আছে।

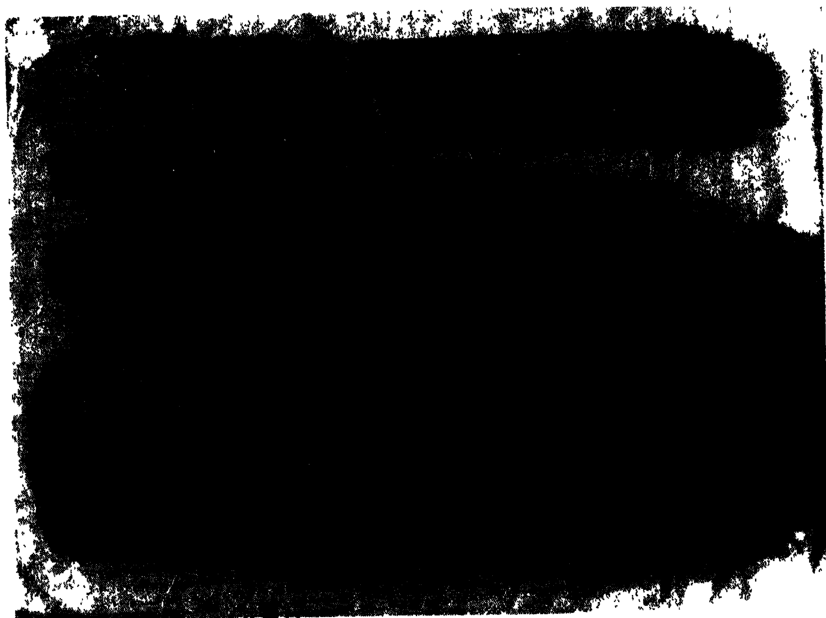
চন্দ্রকোণা থানার যদুপুর (জে. এল. নং ১২১) বিখ্যাত পণ্ডিত ও টীকাকার গোপাল চক্রবর্তীর জন্মস্থান। তাঁহার বংশধরগণও বর্তমানে ঐ গ্রামে বাস করেন। ইনি একজন সাধকও ছিলেন। সম্ভবত ১৬০০ হইতে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে গোপালের জন্ম হয়। ক্ষীরপাই গ্রামে সেকালে মহেশ পঞ্চানন নামে এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। চেতুয়া-বরদার রাজা শোভাসিংহ তাঁহাকে বরদা পরগণায় বাষট্টি বিঘা জমি দান করেন। সন ১২০৯ সালের ৬৪৫০ নং তায়দাদে উক্ত জমির দখলকাররূপে তাঁহার প্রপৌত্র গদাধর ভট্টাচার্যের নাম আছে। তিনি বিদ্যাসাগরের শ্বশুরবংশের পূর্বপুরুষ। এই গ্রামে শিবনারায়ণ মঙ্গল নামেও এক অধ্যাপক ছিলেন। এই থানায়

শিরোমণিপুর (জে. এল. নং ৮২) কোন প্রাচীন অধ্যাপকের স্মৃতি-বিজড়িত মনে হয়। ইঁহার বিষয় বিস্মৃতির অতলগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে।

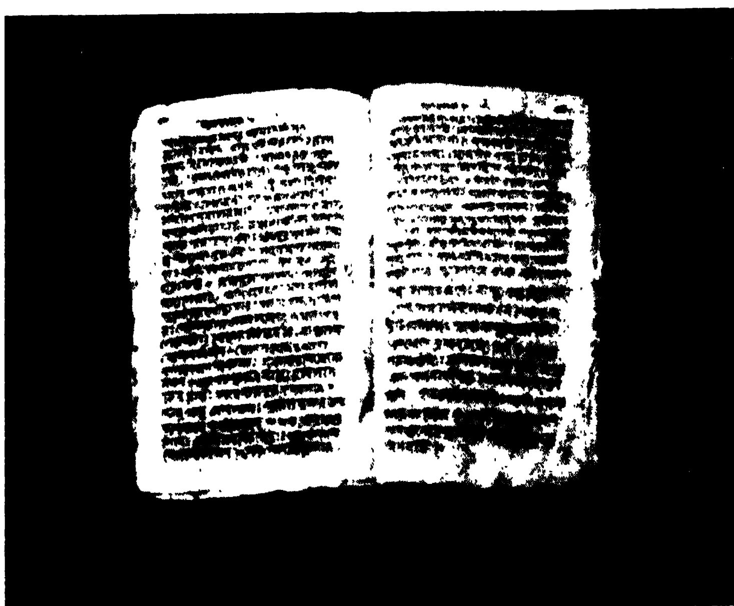
দাসপুর থানার অধ্যাপক বৃন্দ :

দাসপুর থানার শ্রীবরা (জে. এল. নং ২৪৭)-সম্পর্কে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'A Report on the Tols of Bengal' নামক গ্রন্থে লেখা আছে—"Sribara—old seat of learning is now in dilapidated condition". কিন্তু বহু আগে শ্রীবরার বিদ্যাসমাজ খুবই গৌরবময় ছিল। কাশ্যপ ভট্টাচার্য-বংশের আদিপুরুষ নারায়ণ সিদ্ধান্ত হইতেই শ্রীবরার গৌরব আরম্ভ। ইনি সাধক, সুপণ্ডিত এবং নবদ্বীপের বাসুদেব সার্বভৌমের আত্মীয় ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। সভায় প্রথম মাল্য এই বংশের প্রাপ্য ছিল। দুইবার ইহার ব্যতিক্রম হয়। একবার চেতুয়া-বাসুদেবপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের পুত্র সুরনাথ চূড়ামণি বংশগৌরব ও পাণ্ডিত্যের জন্য ক্ষেপুতের একটি অধ্যাপকসভায় প্রথম মাল্য পান। দ্বিতীয়বার পান ব্রাহ্মণভূমরাজবংশের বৈকুণ্ঠনাথ দেব। নারায়ণ সিদ্ধান্ত মহাশয় প্রায় তিনশ বছর আগে বর্তমান ছিলেন। শ্রীবরা গ্রামের অপরাপর অধ্যাপক ছিলেন ভবানন্দ ভট্টাচার্য, রামকুমার বা রামেশ্বর ন্যায়রত্ন, ছকুলাল ভট্টাচার্য, চন্দ্রভূষণ তর্কালংকার, রাজকৃষ্ণ তর্কচূড়ামণি, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি। এই গ্রামটি দাসপুর থানার পূর্বসীমান্তে কাঁসাই-শাখানদী দ্বারা পরিবেষ্টিত।

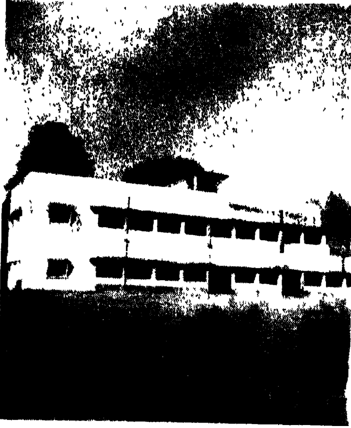
চেতুয়া-বাসুদেবপুরে (জে. এল. নং ৬৩) পূর্বে অনেকগুলি টোল ছিল। এই গ্রামের প্রাচীন ভট্টাচার্যবংশের বীরেশ্বর, দিবাকর ও প্রভাকর ভট্টাচার্য টোল পরিচালনা করিতেন। ইঁহারা তান্ত্রিক সাধকও ছিলেন। বরদা পরগণার 'জলদান' ও চেতুয়া পরগণার 'অন্নদান' ইঁহাদের ও তদ্বংশীয়দের প্রাপ্য ছিল। এই গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং তাঁহার দুইভাই তর্কবাগীশ ও ন্যায়বাগীশ অধ্যাপক ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সাংখ্যদর্শনের অধ্যাপক ও নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, কোন এক সময় সালিখার চৌধুরীদের এক রেকাবী গিনিদান তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। গ্রামে বিদ্যাবাগীশের নামে বর্তমানে একটি পাড়াও আছে। আঠার শতকের শেষদিকে ইনি বর্তমান ছিলেন। বিদ্যাবাগীশের বংশে রামধন শিরোমণি নামে এক পণ্ডিতও ছিলেন। বাসুদেবপুর গ্রামে বৃহস্পতির বেড় নামক স্থানে রামানন্দ বৃহস্পতি এবং উড়িয়া-পাড়ার ভবানন্দ ভট্টাচার্যের সম্ভবত একটি টোল ছিল। ইঁহাদের একটি বিরাট্ পুঁথিশালা ছিল। ঐ পুঁথিসমূহের মধ্যে ভবানন্দ-রচিত একটি ব্যাকরণ,



১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত 'ভট্টিকাব্য' সংস্কৃত পুথির পাতা



নবাবিষ্কৃত 'জীবনতারা' পুথির দুটি পৃষ্ঠা



ভগবতী বিদ্যালয়, বীরসিংহ



ভগবতী বিদ্যালয়ের সম্মুখে স্মারকস্তম্ভ

প্রবোধ সরকারের 'শালফুল' উপন্যাসের দুটি পৃষ্ঠা

যাত্রা ও দুর্গোৎসবতত্ত্ব নামক কয়েকটি অপ্রকাশিত পুঁথি ছিল। শংকরপুর ও দক্ষিণপাড়া ভট্টাচার্য-বংশের শত্রুঘ্ন ন্যায়বাগীশ, চক্রবর্তী বংশের বাঞ্ছারাম বিদ্যানিধি, রামলোচন ন্যায়রত্ন, খনিয়ার চাটুতি-বংশীয় গৌরীকান্ত বিদ্যালংকার এই গ্রামের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। গৌরীকান্ত একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। কাব্য, ন্যায়, অলংকার, স্মৃতি, ও শাকুন প্রভৃতি শাস্ত্রেও ইনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি বর্ধমান জেলার প্রতাপপুর হইতে আসিয়া এই গ্রামে বসতি করেন। মহকুমার বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক ইঁহার ছাত্র ছিলেন।

বাসুদেবপুরেব সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা অধ্যাপক উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ উনিশ-শতকের একেবারে গোড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার গৃহে একটি বড়ো টোল ছিল। ইনি সম্পূর্ণ নিজ খরচে রোজ বারো জন ছাত্রকে অন্নদান করিয়া শিক্ষা দিতেন এবং নিজে কোদালদ্বারা জমি প্রস্তুত করিয়া চাষ আবাদ করিতেন। নবদ্বীপ-টোলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ন্যায়ভূষণ উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন রচিত পূর্বকথিত A report on the Tols of Bengal, Appendix, Page LTV. SL. No. 716-তে কল্মিজোড়ের (দাসপুর) অধ্যাপক লক্ষ্মণচন্দ্র শিরোমণির গুরুরূপে ইঁহার নাম আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহ আন্দোলন সুরু করেন তখন দেশের বিভিন্ন পণ্ডিত-অধ্যাপকদের এবিষয়ে মতামত জানিবার জন্য বহুস্থানে সভাসমিতির আয়োজন করিয়াছিলন। বাসুদেবপুর একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যাসমাজ হওয়ায় তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রামের পণ্ডিত-অধ্যাপকদের সভায় বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য রাখেন। উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার তর্কযুদ্ধ চলে। বিদ্যাসাগর তাঁহার তর্ক ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া বাসুদেবপুরে একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ন্যায়ভূষণের যে তর্ক হইয়াছিল তাহা খড়ার-আমড়াপাঠের রামদয়াল স্মৃতিরত্ন একটি পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ন্যায়ভূষণের বিশাল পুঁথিসংগ্রহ ছিল, কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় তাহার বহু পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ন্যায়ভূষণের পূর্বপুরুষ ছিলেন কবি কৃত্তিবাস ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়।

দাসপুর থানার গোকুলনগরে (জে. এল. নং ২৮) সেকালে কয়েকটি টোল ছিল। এই গ্রাম মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-প্রধান। বিক্রম ভট্টাচার্য এই গ্রামের

খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন এবং বর্ধমানরাজের আনুকূল্যলাভ করিতেন। শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ইঁহার বংশধর। এই স্থানের অপরাপর অধ্যাপক ছিলেন —রামকমল শিরোমণি, ধর্মদাস ন্যায়রত্ন, পেলারাম ন্যায়ভূষণ বা ন্যায়বাগীশ, দুর্গাপ্রসাদ চূড়ামণি, দুঃখীশ্যাম বিদ্যাভূষণ ও ঈশানচন্দ্র বিদ্যালংকার। ঈশানচন্দ্র নাড়াজোল-রাজপণ্ডিত ছিলেন। এই থানার বৃন্দাবনপুর (জে. এল. নং ১২৭) গৌড়াদ্যবৈদিক শ্রেণীর সমাজ। এখানে আটটি টোল ছিল। এখানকার কাশ্যপগোত্রীয় রামকল্প তর্কপঞ্চানন সাধক ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। হাওড়া জুজারসাহের মান্নাবংশে অষ্টাদশ পুরাণপাঠে ইনি সদস্য নির্বাচিত হইয়া উপস্থিত সকলের ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। বিচারে নিজের গাড়ুকে উত্তরদানে নিযুক্ত করিয়া ইনি সমাগত সকল অধ্যাপককে বিস্মিত করেন। এই গ্রামে এখনও কিছু প্রাচীন পুঁথি আছে।

ক্ষেপুত গ্রামে (দাসপুর থানার উত্তরবাড় ও দক্ষিণবাড়ের মিলিত নাম ক্ষেপুত (জে. এল. নং ২২২ ও ২২৪) সেকালে অনেকগুলি টোল ছিল। এখানে শান্তিরাম আগমবাগীশ, সার্থকরাম তর্কভূষণ, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালংকার এবং রামচন্দ্র ন্যায়ভূষণ অধ্যাপক ছিলেন। বিখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পিতামহ ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর এখানকার খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে শ্রীবালানন্দ কাব্যব্যাকরণতীর্থ এই গ্রামের অধ্যাপক। এই থানার চাঁদপুর গ্রামে (জে. এল. নং ৩৩) রামলোচন ন্যায়ালংকার ও রামনারায়ণ বাচস্পতি নামে দুইজন অধ্যাপক ছিলেন এবং পরমানন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন বহু পুঁথির লিপিকার। তাঁহার লিখিত দুর্গাপূজাবিষয়ক একটি পুঁথি ছিল। অক্ষয়রাম বিদ্যাভূষণ এই গ্রামের অপর একজন অধ্যাপক। বলিহারপুরের (জে. এল. নং ৫৮) বাণীভূষণ ভট্টাচার্য ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। তিনি নিজ বাটীতে আঠার হাত দুর্গার পূজা প্রচলন করেন। তাঁহার বংশীয় সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ দুইভাই সুপণ্ডিত ছিলেন। রামব্রহ্ম সার্বভৌম এখানকার অধ্যাপক ছিলেন। এই গ্রামের আনন্দরাম বিদ্যালংকার ছিলেন ব্যাকরণের টীকাকার। অপরাপর অধ্যাপকবৃন্দ—রামচরণ ন্যায়ালংকার, পার্বতী চরণ বিদ্যাভূষণ, তারাচাঁদ বিদ্যালংকার ও করুণাময় ন্যায়রত্ন। সেকেন্দারী গ্রামে (জে. এল নং ১০১) যদুনাথ ন্যায়রত্ন এবং সরবেড়িয়ায় (জে. এল নং ১০৪) নিত্যানন্দ বাচস্পতির নাম পাওয়া যায়। গাদিঘাটে (২০১) রামদাস পঞ্চানন, অক্ষয়কুমার তর্কালংকার (স্মার্ত ছিলেন) ও আশুতোষ বিদ্যারত্ন নামে পণ্ডিত-অধ্যাপক ছিলেন। এখানেদুটি টোল ছিল। গাদিঘাট মৌজার অন্তর্ভুক্ত পার্শ্ববর্তী

গ্রাম রসিকগঞ্জের (শিলাই নদী তীরবর্তী) ঠাকুরদাস চূড়ামণি এই অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা বৈয়াকরণ ও অধ্যাপক ছিলেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার পুত্র উদয়চন্দ্র শিরোমণি ও তাঁহার পুত্র শম্ভুনাথ স্মৃতিভূষণ পণ্ডিত ছিলেন। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের পূর্বকথিত টোলের বিবরণীতে কয়েকস্থানে চূড়ামণি মহাশয়ের ও একস্থানে তাঁর পুত্র শিরোমণি মহাশয়ের নাম আছে। উমাচরণ তর্করত্ন ঐ গ্রামের অপর অধ্যাপক ছিলেন। শম্ভুনাথ স্মৃতিভূষণের পুত্র শ্রীতারানাথ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ নবদ্বীপে বাস করেন। রসিকগঞ্জে ঠাকুরদাস চূড়ামণির একটি বড়ো টোল ছিল। বর্তমানে সেই স্থানে একটি গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উত্তর ধানখালের (১২৩) গৌড়াদ্যবৈদিকশ্রেণীয় রামকানাই তর্কভূষণ 'কৃষিসম্ভবম্' নামে এক মহাকাব্য রচনা করেন। এই কাব্যটি আজও অপ্রকাশিত। এই বংশে গঙ্গানারায়ণ সার্বভৌম নামে এক অধ্যাপক ছিলেন। চেতুয়া-রাজনগর গ্রামে (২৫) সিদ্ধান্ত বংশের আদিপুরুষ নীলাম্বর তর্কসিদ্ধান্ত বর্ধমানরাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশে রামভদ্র সার্বভৌম, রামনারায়ণ ন্যায়বাগীশ, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালংকার, রাঘব পঞ্চানন, মাধব তর্কবাগীশ প্রভৃতি অধ্যাপক ছিলেন। চট্টোপাধ্যায়-বংশীয় অধ্যাপক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ। নাড়াজোলরাজের প্রতিষ্ঠিত টোলে বহু ছাত্র অন্নদান পাইয়া অধ্যয়ন করিতেন। নবীন মহেশপুরের (১৩৫) গৌড়াদ্যবৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশেও কয়েকজন অধ্যাপক ছিলেন।

দাসপুর থানার অপরাপর অধ্যাপকবৃন্দ : ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন (দাসপুর), বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন, রামব্রহ্ম শিরোমণি, পার্বতীচরণ ন্যায়রত্ন ও রামরূপ তর্কালংকার (নলদহ), লক্ষ্মণ তর্কভূষণ (কল্মিজোড়), [শেষোক্ত দুইজনের নাম টোলের বিবরণীতে আছে।] এবং ত্রৈলোক্যনাথ ন্যায়ভূষণ (পল্তাবেড়িয়া) ও রামচাঁদ তর্কবাগীশ (সামাট)।

সেকালে ব্রাহ্মণ ছাড়া এদেশে অন্য জাতীয়ও সংস্কৃতচর্চা এবং টোল পরিচালনা করিতেন। বৈদ্য, দত্ত ও শর্মা বংশ প্রায় দুশ বছর আগে ত্রিবেণী হইতে উঠিয়া আসিয়া আজুড়িয়া গ্রামে (দাসপুর) বাস করেন। এই বংশের ভুবনমোহন দত্তশর্মা বিদ্যাভূষণ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের অধ্যাপক ও বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। বাড়ীতেও টোল ছিল। কবিরাজ শীতলচন্দ্র কাব্যতীর্থ মুগ্ধবোধের পণ্ডিত ও একটি আয়ুর্বেদ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার

রচিত নাটক ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ আছে। ধানখাল ও ধোবাখালির দাস-বৈদ্যগণের অনেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং আয়ুর্বেদে পণ্ডিত ছিলেন।

ঘাটাল থানার অধ্যাপক সমাজ ঃ

ঘাটাল থানার বরদা গ্রাম রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের একটি সমাজ। এখানে বাচস্পতিবংশের ও রাজসভাপণ্ডিত ভট্টাচার্য বংশের আদিপুরুষ অধ্যাপক ছিলেন। ভট্টাচার্য-বংশের সুন্দর ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্র এখনও আছে। বরদা প্রাচীন স্থান। ব্রহ্মখণ্ডে আছে ঃ 'তাম্রলিপ্তং কর্ণদুর্গং বরদা-ভূমিকং তথা'। কিন্তু 'আইন-ই-আকবরী'তে বরদার নাম নাই। খড়ার গ্রামে আঠার শতকের শেষদিকে কয়েকটি টোল ও সংস্কৃতচর্চার একটি কেন্দ্র ছিল। এখানকার কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কাশীতে পড়াশুনা করিয়া কৃতবিদ্য হন। ইঁহার বিশাল পুঁথি-সংগ্রহ ছিল। এদেশে সম্ভবত তিনিই একমাত্র বেদান্তজ্ঞ ছিলেন। বীরসিংহের (৪৮) খ্যাতনামা অধ্যাপক উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ ছিলেন। মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ দাতা ও ধনী চন্দ্রশেখর ঘোষের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত অধ্যাপকগণের মধ্যে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি উমাপতির ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হন এবং সমবেত সকলের নিকট খুব প্রশংসা করেন। উমাপতির তৃতীয়কন্যা দুর্গাদেবীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের বিবাহ হয়। এই সূত্রে রামজয় বীরসিংহগ্রামে বসতি করেন। বিদ্যাসাগরের দুই ভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নও অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থও আছে। শ্রীসতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ এখানকার বর্তমান অধ্যাপক। খড়ার গ্রামে শ্রীরমণীমোহন কাব্যতীর্থ থাকেন।

এই থানার কুরান (৪৬) গ্রামে গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের বাস। ইড়পালার (১৭) শশিভূষণ রুদ্র-প্রতিষ্ঠিত একটি টোল আছে। শ্রীকৃষ্ণপদ কাব্যস্মৃতিতীর্থ এখানকার অধ্যাপক। কিসমৎ দীর্ঘলগ্রামের (৩৮) ভবতারণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ অধ্যাপক হন। দুটি সংস্কৃত নাটক ইনি রচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পাঠকালে ইঁহার অকালমৃত্যু হয়। রাধানগরে (৭৮) গুরুপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ ন্যায়তীর্থ অধ্যাপক ছিলেন। এখানকার প্রাচীন অধ্যাপকগণের নাম আজ আর জানার কোন উপায় নাই। তবে এককালে এখানে বহু অধ্যাপক বাস করিতেন বলিয়া জানা যায়। শ্যামসুন্দরপুরে (৬৩) অধ্যাপক মণীন্দ্র স্মৃতিতীর্থের বাস। যদুপুর (৪১) বিখ্যাত কবি রামেশ্বর চক্রবর্তীর জন্মস্থান। ইনি সতের শতকের শেষদিকে আবির্ভূত হন। ইনি পুরাণ পাঠক ও

তান্ত্রিক সাধকও ছিলেন। ঘাটাল শহরের গম্ভীরনগর, কোন্নগর প্রভৃতি পল্লীতে এককালে বহু পণ্ডিত-অধ্যাপকের বাস ছিল। গম্ভীরনগরে নবকুমার ন্যায়রত্ন ও রামলোচন তর্কালংকার এবং শ্রীকৃষ্ণবিহারী জ্যোতিস্তীর্থ পণ্ডিত ও অধ্যাপক। জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় পি. এম. বাগ্‌চি পঞ্জিকার গণক। কাটানে দীনবন্ধু বিদ্যাসাগর এই অঞ্চলে সুপরিচিত ছিলেন। এই গ্রামে আগে কয়েকটি টোল ছিল। বর্তমানে গণ্ডীদের একটি টোল আছে। দীনবন্ধু বিদ্যাসাগরের বংশে জীবনকৃষ্ণ ন্যায়শাস্ত্রী কাশীতে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশীতে পরলোক গমন করেন। এখন ঐ বংশের শ্রীবিজয়চন্দ্র কাব্যব্যাকরণবেদ-স্মৃতিতীর্থ বর্তমান। কোণ্ডরনগর ঘাটালের অন্তর্গত। এখানে বিখ্যাত 'পুরোহিত-দর্পণ' গ্রন্থপ্রণেতা সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বাস করিতেন। প্রতাপপুরে (১৫২) গৌড়াদ্যবৈদিকশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ হরকালী কাব্যতীর্থ খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন।

রাধানগরের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে শ্যামপুরে (৬৬) একঘর বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। ঐ বংশে পূর্বে বহু অধ্যাপক ছিলেন। শ্রীগোলোক কাব্যতীর্থ ঐ বংশের সন্তান। শিলাই-তীরবর্তী ভাঙ্গাদহ গ্রামের পণ্ডিতবর্গের নাম অনন্তদেব কবিভূষণ, চণ্ডীচরণ কাব্যভূষণ, রামধন সামাধ্যায়ী, জুনপুয়ায় জগমোহন বিদ্যালংকার, চাউলির যোগেন্দ্র তর্কালংকার, মহারাজপুরের শ্রীনাথ ভট্টাচার্য ও জয়কৃষ্ণপুরের বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্নের নাম জানা যায়। ইহা ছাড়া বেউড়গ্রাম, দ্বন্দীপুর (৬২), গোবিন্দপুর (১৯) প্রভৃতি গ্রামে বহু অধ্যাপকের বাস ও টোল ছিল। গোবিন্দপুরের তিনকড়ি পঞ্চতীর্থ ঘাটালে টোল পরিচালনা করিতেন। বর্তমানে ভূতাগ্রামের (দাসপুর থানা) শ্রীশীতলচন্দ্র কাব্যপুরাণ সাংখ্যতীর্থ ইহা পরিচালনা করিতেছেন।

ইংরাজী ১৮৯২ সালের ২রা জুন মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন স্বীয় গুরু ঠাকুরদাস চূড়ামণির সম্মানে শিলাই নদীর পূর্বতীরবর্তী নিমতলা গ্রামে একটি সংস্কৃত-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় এইটি সারা জেলার একমাত্র সমিতি ছিল। বহু সম্পন্ন ও রাজপরিবারের অর্থসাহায্যে ইহা পুষ্ট হয় এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির শাখারূপে ইহা আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার কেন্দ্ররূপে দীর্ঘকাল কাজ করিতে থাকে। বর্তমানে ইহার অবস্থা খুবই শোচনীয়। পূর্বে সমিতির পক্ষ হইতে পরীক্ষার্থী ও অধ্যাপকগণকে ভোজ্য দান করা হইত। পরীক্ষাশেষে সমিতির একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হইত। পূর্বে কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে পুরস্কারও দেওয়া হইত।

নিমতলায় সংস্কৃত সমিতি প্রতিষ্ঠা

এই সমিতির মাধ্যমে আয়ুর্বেদ ও পৌরোহিত্যে উপাধি দান করা হইত। নিমতলার চন্দ্রকুমার গুঁই সমিতির সম্পাদকরূপে বারো বছর কাজ করিবার পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভাই ভূপতিলাল গুঁই ছয় বৎসর সম্পাদক থাকেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শিরোমণি সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদকরূপে কাজ করিয়া ১৯৩২ সালে কাশীতে পরলোক গমন করেন। মোহান্ত গোরাচাঁদ গোস্বামী প্রভৃতি দুর্দিনে সমিতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইহার অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে।

চন্দ্রকোণা থানার পণ্ডিত অধ্যাপক ঃ

চন্দ্রকোণা থানার পাইকমাজিটা (৮) পূর্বে একটি বিখ্যাত বিদ্যাস্থান ছিল। এখানে একসময় আটটি টোল ছিল। এখানকার ঘোষাল বংশ বর্তমানে শিল্দা পরগণার ভ্যাংঘাইডিহায় উঠিয়া গিয়াছেন। ঐ বংশ প্রাচীন এবং অনেকেই পণ্ডিত-অধ্যাপক ছিলেন। অবসথি চট্টোপাধ্যায় তেকুড়ের সন্তানগণ অনেকেই ছাত্রদের অন্নদান করিয়া টোল পরিচালনা করিতেন। ঐসব অধ্যাপকের নাম যথাক্রমে ঃ গুরুপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, দেবীচরণ তর্কালংকার (নৈয়ায়িক ও স্মার্ত), চতুর্ভুজ ন্যায়ালংকার (বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িক) শ্রীধর তর্কভূষণ (স্মার্ত), ত্রিলোচন তর্করত্ন (কাব্য, ব্যাকরণ ও ন্যায়ের অধ্যাপক), বেচারাম ন্যায়ভূষণ (নৈয়ায়িক ও স্মার্ত), রাজেন্দ্রনাথ স্মৃতিভূষণ (স্মার্ত), আশুতোষ কাব্যতীর্থ স্মৃতিভূষণ (কাব্য ও স্মৃতির অধ্যাপক), রামপদ স্মৃতিতীর্থ (কাব্য ও স্মৃতির অধ্যাপক), রামরাম তর্কালংকার (নৈয়ায়িক), রামনিধি শিরোমণি (বৈয়াকরণ), রামব্রহ্ম ঘোষাল ন্যায়ালংকার (বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িক), কালিদাস শিরোমণি (ক্রিয়াকর্মে দক্ষ), শ্রীকান্ত চূড়ামণি, গোপাল চূড়ামণি (কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতির অধ্যাপক), শ্রীপতি স্মৃতিভূষণ (কাব্য ও স্মৃতির পণ্ডিত), সুরেন্দ্রনাথ ভাগবততীর্থ (কাব্য ও ভাগবতের পণ্ডিত), ধরণীধর শিরোমণি (কাব্য ও স্মৃতিব পণ্ডিত), রঘুপতি কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ ও নবীনচন্দ্র চূড়ামণি প্রভৃতি।

চন্দ্রকোণার (১০৩) প্রাচীন অধ্যাপকগণের নাম বিস্মৃতির অতলে লীন। প্রাচীন শহর চন্দ্রকোণায় প্রাচীন কাল হইতে যে বহু পণ্ডিত-অধ্যাপক বাস করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। একসময় এই স্থান সংস্কৃতচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। চন্দ্রকোণার 'বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি'তে সেকালে বহু টোলে নানা শাস্ত্র আলোচিত হইত। ভানরাজাদের আমলে টোলের পঠন-পাঠন

খুবই উন্নতমানের ছিল তাহা অনুমান করা যায়। ভানরাজ হরিনারায়ণের মহিষীপ্রতিষ্ঠিত গিরিধারীলালের নবরত্ন মন্দিরটি ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। বিধ্বস্ত মন্দিরটির সংস্কৃত শিলালিপিটির রচয়িতা সম্ভবত পৌরাণিক মোহন চক্রবর্তী ছিলেন। শিলালিপিতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। চন্দ্রকোণা ছাড়া বোনা (১০৬), বৈকুণ্ঠপুর (১১৯) প্রভৃতি গ্রামে সেকালে অনেকগুলি টোল ও বহু পণ্ডিত-অধ্যাপক ছিলেন।

জাড়াগ্রামও (১৫২) পূর্বে সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং এখানে বহু টোল ছিল। এখানকার রামধন ন্যায়ভূষণ নৈয়ায়িক ও স্মার্ত ছিলেন। এখানে খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কালংকারের একটি টোল ছিল। ইঁহার পুত্র আশুতোষ ন্যায়রত্ন। মঙ্গকুলেও(১৭৬) পণ্ডিত-অধ্যাপকের বাস ছিল। চন্দ্রকোণার মাধবপুর (৯৪) মাধব নামক কোন অধ্যাপকের নাম ঘোষণা করিতেছে বলিয়া জানা যায়। কঙ্কাবতী গ্রামের (১৮৯) চট্টোপাধ্যায়-বংশে জানকীনাথ শাস্ত্রী ও অজিত কাব্যতীর্থ বি.এ. পণ্ডিত-অধ্যাপক, বেলাদণ্ডে ভূদেব কাব্যতীর্থ। বাহুল্যভয়ে মহকুমার আরও বহু পণ্ডিত-অধ্যাপক ও টোলের নাম বাদ দিতে হইল।

Report on the Tols of Bengal (1892) এর সিরিয়াল নাম্বার ৬৬৭—৭২২ এর মধ্যে মেদিনীপুর জেলার সে সময়ের পণ্ডিত-অধ্যাপকগণের নাম আছে। ইং ১৯৩০ সালে ইংরেজ সরকার বাংলাদেশের টোলের যে তালিকা প্রণয়ন করেন তাহাতে দেখা যায় মেদিনীপুরে তখন প্রায় চারশ টোল ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনবার টোল ও তাহার অধ্যাপক-গণের তালিকা তৈয়ারি করিয়াছেন। ইংরাজী ১৯৫৭ সালের তালিকায় মেদিনীপুরে ৩৯৩ জন অধ্যাপক ও টোলের উল্লেখ আছে। উহার মধ্যে ঘাটাল মহকুমার চব্বিশ জন পণ্ডিতের নাম নিম্নে দেওয়া হইল:

ক্রমিক সংখ্যা	অধ্যাপকের নাম	টোলের নাম
(৪)	অজিত কুমার স্মৃতিতীর্থ	সিদ্ধেশ্বরী-চতুষ্পাঠী, পাণ্ডুয়া, রামজীবনপুর
(২৪)	আশুতোষ কাব্যতীর্থ	রাধাময়ী-চতুষ্পাঠী, সালিখা, রাধানগর
(৩০)	কমলাকান্ত কাব্যতীর্থ	অমূল্যরতন চতুষ্পাঠী, মাধবপুর, গোয়ালডাঙ্গা
(৫০)	কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষতীর্থ	জ্যোতিঃপ্রকাশ চতুষ্পাঠী- গম্ভীরনগর, ঘাটাল
(৫৫)	কৃষ্ণপদ কাব্য স্মৃতিতীর্থ	শিবানী টোল, ইড়পালা
(৮৫)	গোলোকবিহারী গোস্বামী কাব্যতীর্থ, নাড়াজোল	

ক্রমিক সংখ্যা	অধ্যাপকের নাম	টোলের নাম
(১৪৪)	নলিনীকান্ত চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ,	সারদা-চতুষ্পাঠী, পোঃ—দীর্ঘগ্রাম
(১৫৫)	পঞ্চানন কাব্যতীর্থ,	ন্যায়ভূষণ-চতুষ্পাঠী, বাসুদেবপুর, ন্যায়ভূষণ-পাড়া পোঃ—শঙ্করপুর
(১৬৬)	পিনাকীমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ,	রাধাময়ী-চতুষ্পাঠী, সালিখা, রাধানগর
(১৮৪)	বঙ্কিমচন্দ্র শাসমল কাব্যতীর্থ,	কৃত্তিবাস ,, সয়লা, সোনাখালি
(২০০)	বালানন্দ কাব্যতীর্থ,	খেপুত ,, পোঃ—খেপুত
(২০২)	বিজয়কৃষ্ণ কাব্যব্যাকরণ-স্মৃতিবেদতীর্থ,	কাটান বিদ্যাসাগর টোল, নিমতলা
(২১৭)	ব্যোম্‌কেশ কাব্যতীর্থ,	শিবানী-চতুষ্পাঠী, ইড়পালা
(২৪০)	মনোরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ,	তীর্থনাম-চতুষ্পাঠী, পাইকমাজিটা
(২৪১)	মনোরঞ্জন কাব্যতীর্থ,	বলিহারপুর, পোঃ দাসপুর
(২৯১)	রামশরণ কাব্যতীর্থ,	রামকৃষ্ণ-চতুষ্পাঠী, রামজীবনপুর
(২৯২)	রামশরণ কাব্যতীর্থ,	ইড়পালা, পোঃ ইড়পালা
(৩২০)	শীতলচন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ,	খেপুত, পোঃ খেপুত
(৩২১)	শীতলচন্দ্র কাব্যসাংখ্য-পুরাণতীর্থ,	সাধারণ টোল, ঘাটাল
(৩৪৩)	সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ,	নিস্তারিণী-চতুষ্পাঠী, বীরসিংহ
(৩৪৪)	সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ,	শঙ্করাচার্য-চতুষ্পাঠী, বলিহারপুর, দাসপুর
(৩৭০)	হরিজীবন কাব্যস্মৃতিতীর্থ,	রামকৃষ্ণপুর, রামজীবনপুর
(৩৭৬)	হরিসাধন কাব্যতীর্থ,	” ”
(৩৮২)	হরেন্দ্রনাথ মিশ্র কাব্যতীর্থ,	বেণীমাধব চতুষ্পাঠী, পোঃ—দীর্ঘগ্রাম

উপরিলিখিত আলোচনায় বুঝিতে পারা যায় সেকালে তো বটেই, একালেও সংস্কৃত-চর্চার অবলুপ্তি এখনও ঘটে নি। তবে বর্তমানে এই শিক্ষা যে ক্রমবিলীয়মান, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন টোলপদ্ধতির লোপ হইয়া বর্তমানে বহু বিদ্যালয় (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) মহকুমার নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কয়েকটি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিক্ষার বিস্তার করিতেছে। সাম্প্রতিককালে সমাজের প্রায় সর্বশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটিতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই নবযুগের সূত্রপাত করেন। নিম্নে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার এই দেশে সূত্রপাত হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইহা কীরূপে সমাজের সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করা যাইতেছে।



পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম ঃ	মৃত্যু ঃ
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২০	২৯শে জুলাই, ১৮৯১
১২ই আশ্বিন, ১২২৭	১৩ই শ্রাবণ, ১২৯৮

কোম্পানির আমলের গোড়ার দিক পর্যন্ত এদেশে সংস্কৃত বিদ্যার বেশ প্রসার ছিল। টোলসমূহে নানা শাস্ত্রের পঠন-পাঠন চলিত একথা আগেই বলা হইয়াছে। এমন কি উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও সংস্কৃতই ছিল প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। ধীরে ধীরে বাংলা পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের জন্ম হইতে থাকে। অবশ্য তার আগেও যে গ্রাম-গ্রামান্তরে দুচারটি 'গুরুমহাশয়ে'র বাংলা পাঠশালা ছিল না, এমন নয়, তবে সংস্কৃত টোলের তুলনায় তা অতি নগণ্যমাত্র। ১৮১১ সালে শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ড্ সাহেব ও ১৮৩৫ সালে উইলিয়াম অ্যাডাম সাহেব বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার যে বিবরণ লেখেন তাহা হইতে সেকালে কোন্ কোন্ অঞ্চলে কতগুলি পাঠশালা বা বিদ্যালয় ছিল তাহার এক হিসাব জানা যায়। অ্যাডাম সাহেবের ১৮৩৫ সালের বিবরণী হইতে ঘাটাল অঞ্চলে বিদ্যালয় কতগুলি ছিল তা জানা যায়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৮৩৫ সাল বা তার আগে ঘাটাল নামে কোন মহকুমা ছিল না। অ্যাডাম সাহেবের বিবরণীতে প্রতিটি থানায় বাংলা, উড়িয়া, ফারসী বিদ্যালয়ের এক পরিসংখ্যান জানা যায়। দাসপুরের বদলে সে সময় ছিল কল্‌মিজোল থানা। বর্তমানে ঐটি দাসপুর থানার অন্তর্ভুক্ত একটি মৌজা জে. এল. নং ৬৫। অ্যাডাম সাহেবের ১৮৩৫-১৮৩৮এর Report on the State of Education in Bengal (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৪১ সালে প্রকাশিত) নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠা ২২১-২২২ এ আছে—কল্‌মিজোল থানায় তখন বাংলা স্কুল ছিল ১২১ এবং ফারসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত এমন স্কুল ছিল ৫, উড়িয়া ভাষা শিক্ষা দেওয়ার কোন স্কুল ছিল না। কাশীগঞ্জ নামে আর একটি থানা ছিল, সম্ভবত তাহা চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্ভুক্ত বর্তমানের কাশীগঞ্জ মৌজা জে. এল নং ২১৩। কাশীগঞ্জ থানায় মোট ৭৮টি বাংলা বিদ্যালয়, ২টি উড়িয়া বিদ্যালয় এবং ৫টি ফারসী বিদ্যালয় ছিল। অ্যাডামের এই প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হইয়াছে —'প্রতিটি গ্রামেই বাংলাভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় আছে, কিন্তু ছেলেদের শিক্ষা মোটেই ভালো নয়।' উল্লেখ্য, প্রতিবেদনে ঘাটাল থানার কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতে সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বাংলা ও ইংরেজী স্কুলের সূত্রপাত—অ্যাডাম সাহেবের প্রতিবেদন

অ্যাডামের প্রতিবেদন ও মহকুমার কয়েকটি স্থানের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সাবেকী প্রথার সংস্কারে যত্নবান্ হইলেন। জন্মভূমি বীরসিংহের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্রের সর্বাগ্রে মাতৃভূমির শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্যদশা দৃষ্টি

আকর্ষণ করিয়াছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সে সময় (১৮৫১—১৮৫৮) অধ্যক্ষ থাকাকালীন বাংলার বিদ্যালয় সমূহের বিভাগীয় পরিদর্শকরূপে তিনি মেদিনীপুর জেলায় যে ছয়টি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার দুইটি স্থাপিত হয় ঘাটাল মহকুমায়। উহাদের প্রথমটি বর্তমান দাসপুর থানার চেতুয়া-বাসুদেবপুর গ্রামে (জে. এল. নং ৬৩—বর্তমান লোকসংখ্যা ১৫৩৯; ১৯৭১এর লোকগণনা অনুযায়ী) এবং দ্বিতীয়টি স্থাপিত হয় চন্দ্রকোণা থানার ক্ষীরপাইয়ে (জে. এল. নং ২১৪)। ক্ষীরপাইয়ের বিদ্যালয়টি পরে দ্বন্দ্বীপুরে স্থানান্তরিত হয়। ইং ১৮৫৩ সালে বীরসিংহে তিনি যে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন তাহা উঠিয়া যায়। বর্তমান ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ইং ১৮৯০ সালে। শ্রীপার্বতীচরণ চক্রবর্তী দীর্ঘকাল ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ঘাটালের বিদ্যালয়টি বিদ্যাসাগরের ঐ সময়ের কিছু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অভ্যুদয় এবং এদেশে শিক্ষা সংস্কারের নবযুগ

কিভাবে চেতুয়া-বাসুদেবপুরে বিদ্যাসাগর মহাশয় মডেল স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস এই পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে চেতুয়া-বাসুদেবপুরের পণ্ডিত-সমাজ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। ইং ১৮৫৫ সালের ১লা অক্টোবর বাং ১২৬২, ১৬ই আশ্বিন শকাব্দ ১৭৭৭ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। চন্দ্রকোণা থানার পাইকমাজিটার পণ্ডিত ত্রিলোচন তর্করত্ন ইহার প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ হইলেও আধুনিক বিষয়সমূহ আয়ত্ত করিয়া শিক্ষা দিতেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে এই গ্রামের পার্বতীচরণ মান্না ইং ১৮৭১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম্. এ. ও ইং ১৮৭৩ সালে বি,এল, পাশ করেন। নরনারায়ণ ঘোষ ইং ১৮৬৫ সালে দ্বিতীয় বিভাগে, যোগেন্দ্রনাথ সেন ইং ১৮৬৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে, অক্ষয়কুমার পাইন ইং ১৮৬৯ সালে প্রথম বিভাগে ও রামচরণ চক্রবর্তী ইং ১৮৭০ সালে এণ্ট্রান্স্ পাশ করেন। ইঁহারা সকলেই মেদিনীপুর স্কুল হইতে ঐ পরীক্ষা দেন। পার্বতীচরণ, যোগেন্দ্র ও রামচরণ উকিল হন। অক্ষয়কুমার ইং ১৮৭৬ সালে এল. এম. এস্ পাশ করিয়া সরকারী ডাক্তার হন। ঐ বিদ্যালয়ের ত্রিলোচনের পরবর্তী প্রধান পণ্ডিতগণ : রামোত্তম শিরোমণি, ভূপতি সর্বাধিকারী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র দাস, সতীশচন্দ্র রায় ইত্যাদি। প্রিয়নাথ এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। তিনি নর্ম্যাল পরীক্ষায় সমগ্র বঙ্গে প্রথম হইয়া পদক প্রাপ্ত হন।

বাসুদেবপুর বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও ইহার সে সময়ের কৃতীছাত্রবৃন্দ

সতীশচন্দ্রের আমলে জেলাশাসক গৌরলে সাহেব জনসাধারণকর্তৃক মাসিক দশ টাকা চাঁদা প্রদত্ত না হইলে স্কুল লোপ করিবার সুপারিশ করিয়া যান। সতীশচন্দ্র ঐ চাঁদা সংগ্রহের জন্য স্থানীয় অধিবাসিগণের দ্বারস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়টি রক্ষা করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এইভাবে বিদ্যালয়ের পক্ষে একটি গণজাগরণ হইয়া উহাকে সেই সঙ্কটমুহূর্তে রক্ষা করে এবং ইহার পর স্কুলটির উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে। সতীশচন্দ্রের আমলে কয়েকজন ছাত্র ঐ স্কুল হইতে বৃত্তি পান।. এই সময়কার বিদ্যালয়ের ছাত্র বাসুদেব রায় কলিকাতা ও লণ্ডন হইতে এম্. এস্-সি পাশ করেন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর ও শিল্পী মুকুল দে সতীশচন্দ্রের সময়ে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়টি বর্তমানে 'বাসুদেবপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়' নামে প্রথমে মাধ্যমিক ও পরে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। গত ১৯৫৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী বিদ্যালয়ের তদানীন্তন সম্পাদক ডাঃ ভজহরি সামন্ত এবং অন্যান্যের চেষ্টায় স্কুলটির শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানটি নানা কারণে বিলম্বিত হয়। মহকুমার দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি চন্দ্রকোণার জিরাট-মুণ্ডমালা পল্লীতে (জে. এল. নং ১০৫) ইং ১৮৫৬, ১লা ফেব্রুয়ারি উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ইহা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। ১৮৭১ সালে ইহা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর স্কুলের ভার ন্যস্ত থাকে। তিনি বিদ্যালয়ের সম্পাদক থাকিয়া বার্ষিক এক হাজার টাকায় ইহার সমুহ ব্যয়ভার বহন করিতেন। এই বিদ্যালয় বহু কৃতী পুরুষের স্রষ্টা। 'শালফুল' উপন্যাসের রচয়িতা প্রবোধচন্দ্র সরকার, হাইকোর্টের বিচারপতি ও মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি গোপেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি এই বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বিদ্যালয় ১৮৫৬ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত।

ঘাটালের বিদ্যালয়টি ইং ১৮৮২ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঁচশত টাকা ও অন্যান্য দানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বর্তমানে মহকুমার অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়। এখানকার প্রধান শিক্ষক পার্বতীচরণ ঘোষ ১৯১০ সালে 'শোকগাথা' নামক একটি করুণরসাত্মক কাব্য প্রকাশ করেন। এই বিদ্যালয়ের আর একজন খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক ছিলেন সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত, আবার ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত

ঘাটাল বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে এই বিদ্যালয়টির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। ১৯৫৭ সালে এইটি উচ্চতর মাধ্যমিক সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টি আবার দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় হইতে বহু কৃতী ছাত্র পরবর্তী কালে জীবনের নানা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ঘাটাল শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। বিদ্যালয়টির বিল্ডিং সুদৃশ্য। শিলাই নদীর পূর্বতীরে মনোরম পরিবেশে ইহা অবস্থিত। বিদ্যালয়ের বর্তমান সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ঘাটাল পুরসভার অধ্যক্ষ ডাঃ স্বদেশভূষণ চৌধুরী।

ইং ১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘাটালের মহকুমা শাসক বজলল করিম-কর্তৃক সোনাখালিতে (দাসপুর, জে. এল. নং ১৭২) একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঘাটালের কোন্নগর পল্লীর প্রসন্নকুমার নন্দীগ্রামী মহাশয় প্রতিষ্ঠাকালেই স্কুলটির প্রধান শিক্ষক হইয়াছিলেন। ইং ১৯২০ সালে ইহা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। ইহা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। কলাইকুণ্ড গ্রামের (দাসপুর) বিপ্রদাস পাঁজা স্কুলটির উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার সময়ে অকাতরে অর্থ সাহায্য করেন। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়টি দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে।

সোনাখালি উচ্চ বিদ্যালয়

১৯০১ সালের ৫ই ডিসেম্বর শশিভূষণ রুদ্র মহাশয়ের বিরাট দানে ইড়পালা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নাড়াজোল বিদ্যালয় ইং ১৮৯৪ সালে স্থাপিত হইয়াছিল এবং ১৯২৭ এ উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। উহারা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। জাড়া হাইস্কুল ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত ও ঐ সময়েই হাইস্কুলে পরিণত।

ইড়পালা (ঘাটাল), জাড়া ও নাড়াজোল (দাসপুর) বিদ্যালয়

ইংরাজী ১৮৫৮ অথবা ১৮৫৯ সালে দাসপুর থানার ক্ষেপুত গ্রামের চক্রবর্তী বংশের সাহায্যে ঐ স্থানে একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঐ সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বহস্তে রাজ্য গ্রহণের বৎসর। বিজনবিহারী চক্রবর্তীর যত্নে ইং ১৯৩৯ সালে উহা হাইস্কুলে পরিণত হয়। গোপেশ্বর রায় মহাশয় সেই সময় ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

ক্ষেপুতের প্রাচীন বিদ্যালয়

উনিশ শতকের অষ্টম দশকের কোন সময়ে রাজনগরে (দাসপুর, বর্তমান লোকসংখ্যা ২৬০৮) একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হাইকোর্টের উকিলসভার প্রাক্তন সভাপতি অমরেন্দ্রনাথ বসু তখন এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়টি পরে উঠিয়া গিয়া আবার স্থাপিত হয়। ইং ১৯৫০ সালে ইহা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। পরে উচ্চতর মাধ্যমিকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। রাজনগরের বিখ্যাত বসুবংশের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টির উন্নতি সাধিত হয়।

চেতুয়া-রাজনগর বিদ্যালয়

ইং ১৮৫৫ সালে সবরবেড়িয়ায় (দাসপুর, জে. এল. নং ১০৪ ; বর্তমান লোকসংখ্যা ৪৯৯) মহকুমার প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মহকুমার নানা স্থানে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাদের একটি পরিসংখ্যান এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলির আরও কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই পরিচ্ছেদের শেষ দিকে সন্নিবিষ্ট করা হইবে। এই মহকুমার মহাবিদ্যালয়গুলি-সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইবে।

মহকুমার প্রাচীনতম প্রাথমিক বিদ্যালয়

স্বাধীনতালাভের পূর্বে এদেশে স্বল্পসংখ্যক বিদ্যালয় ছিল স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সেই সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় আজ বেশির ভাগ গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যাও কম নয়। উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতে আবার কলা বা মানবিক বিদ্যা (Humanities), বিজ্ঞান (Science), বাণিজ্যবিদ্যা (Commerce), যন্ত্রবিদ্যা (Technical), কৃষিবিদ্যা (Agriculture) প্রভৃতির পঠন-পাঠন হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত। অতএব সেকাল অপেক্ষা একালে যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আগের তুলনায় শিক্ষকমণ্ডলীও উচ্চ উপাধিসম্পন্ন এবং কোন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিদ্যালয়সমূহের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। পূর্বে যেখানে এই অঞ্চলে খড়ের ঘরে বিদ্যালয় বসিত আজ সেখানে বিরাট দালান তৈয়ারী হইয়াছে। শিক্ষা দেওয়ার জন্য নানা যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম, গবেষণাগার প্রভৃতিও কমবেশি উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কয়েকটি নমুনা

কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখিতে হইবে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার মানের কতটা উন্নতি হইয়াছে? ইহা সত্য, আধুনিক যুগে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় চলে না। তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভেরও বিশেষ প্রয়োজন

থাকে। অত্যাধুনিক বিষয়সমূহ যেমন খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞানলাভের প্রয়োজন। ইহার সহিত দৈহিক চর্চা ও শারীরবিদ্যায় জ্ঞানার্জনও প্রয়োজন। কিন্তু সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে জ্ঞানলাভ ও তাহার মান কতটা উঁচু। তাহা না হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য। প্রশ্নপত্রের উত্তরদানের মধ্যে ছাত্রদের জ্ঞানের পরীক্ষা হইয়া থাকে এবং সেই প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করা দরকার যাহাতে শুধুমাত্র মুখস্থবিদ্যায় না চলে। সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার (অর্থাৎ বর্তমান ষষ্ঠশ্রেণীর সমতুল্য পরীক্ষা) কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল:

প্রশ্নগুলি বাংলা, অংক, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের এবং এইগুলি ইংরেজি ১৮৯১-৯২ সালের Western Circle-এর Middle Scholarship Examination এর জন্য রচিত হইয়াছিল--

Bengali Language 75 Morning. নয়টি কঠিন প্রশ্ন ছিল।

৬ নং প্রশ্ন—"...উল্লিখিত বাক্যের ব্যাখ্যা কর এবং উহাতে যদি কোন অলঙ্কার থাকে বল। 'অমাবস্যা'-শব্দের ব্যুৎপত্তি কি?"

Geography 75 Morning.

৮ নং প্রশ্ন—"একদিনে একস্থানে দুইবার জোয়ার হয় কেন? ভূমিকম্পের কারণ কি? পর্বত থাকাতে আমাদের কি উপকার হইতেছে? শিশির জমিবার কারণ কি?"

Native and Easy European Arithmetic—75 Afternoon.

১ নং প্রশ্ন—"পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ১১২ বৎসর ও অন্তর ৩২ বৎসর। পিতা ও পুত্রের বয়স কত?"

History—75 Morning.

৪ নং প্রশ্ন—"প্রাচীন রোমরাজ্যের শাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল?" ৬

৪ " " (খ)—"আর্যদের জাতি, ধর্ম ও বিদ্যা সম্বন্ধে কি জান লিখ।" ৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:—ট্রয়, ধর্মপত্নী, সালামিস, লিউকট্রা ও জামা।

অন্য প্রশ্নে—আকবর বাদশা, লর্ড্ মেয়ো, তিতুমিয়ার লড়াই প্রভৃতি।

Euclid and Mensuration—100

দশটি প্রশ্ন ছিল। ৫নং প্রশ্ন—"কোন ত্রিভুজের একটি বাহু, সন্নিহিত এক কোণ ও অন্য দুইটি বাহুর অন্তর নির্দিষ্ট আছে। ত্রিভুজটি অঙ্কিত কর।"

Science—100

স্বাস্থ্যরক্ষা—২নং প্রশ্ন—"বায়ু বিশোধিত করিবার নৈসর্গিক উপায় থাকাতে উহার অবস্থা সচরাচর মন্দ থাকে না" সেই নৈসর্গিক উপায়গুলি কি কি?"

পদার্থ-বিদ্যা—১নং প্রশ্ন—"উদাহরণস্বরূপ ব্যাখ্যা কর :—মূল পদার্থ, অণু, নিশ্চেষ্টত্ব, সংসক্তি ও কৈশকতা।"

রসায়ন—৩নং প্রশ্ন—"দীপশিখা কয়ভাগে বিভক্ত? একটি চিত্রদ্বারা উহার প্রত্যেক ভাগের গঠন বুঝাইয়া দাও।"

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—৪নং প্রশ্ন—"কাণ্ডের কার্য কয় প্রকার ও কি কি?"

৫নং প্রশ্ন—"পত্রের কার্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।"

European Arithmetic—75

"১নং প্রশ্ন (খ) ·০৭ এবং ·০৫ এর বিয়োগফলকে ·০০৭ দিয়া ভাগ কর।"

Bengali Grammar and Composition—75

৪নং প্রশ্নের একাংশ। "এমন একটি শব্দ লিখ যাহা অন্-ভাগান্ত হইলেও স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারান্ত হইবে না।"

১৮৯২-৯৩ সালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ইতিহাসে রোম ও গ্রীসের ইতিহাস বিষয়ে ৫টি প্রশ্ন ছিল। জগতের ইতিহাসে ৫টি প্রশ্ন ছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ৫টি প্রশ্ন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১০টি প্রশ্ন। নিম্নে জগতের ইতিহাসের ৪নং প্রশ্নটি উদ্ধৃত করা হইল :

"নিম্নলিখিত সালগুলি ইতিহাসের স্মরণীয় কেন?

৫০০, ৩৩৮, ২৫০ খৃঃ পূঃ। ৪৭৬, ১৪৫৩, ১৭৮৯, ১৮৫৯ খৃঃ

পলাশীর যুদ্ধের প্রায় শত বৎসর পরে শিক্ষাধারার গতিপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময় পশ্চিমী শিক্ষাধারার প্রতি আকর্ষণ বাড়িতে থাকে। বৃত্তি বা জীবিকা নির্বাহের জন্য টোলের শিক্ষায় সাধারণের আকর্ষণ কমিয়া গিয়া বর্তমান শতকের প্রথম দশকের পর পশ্চিমী শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে কতকটা পোষাকী আকারে সংস্কৃত শিক্ষার অস্তিত্ব রহিয়াছে। ঠিক ঐ সময় হইতেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে রবীন্দ্রযুগের সূচনা। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, গায়ক, বক্তা, চিত্রকর, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধলেখক, অভিনেতা, গীতিকার ও সুরকার। তাঁহার ঐ গুণগুলি অনুকরণের স্পৃহা যুবসমাজে ক্রমশঃ বাড়িতে

সাবেকী শিক্ষাব্যবস্থার গতিপরিবর্তন ও রবীন্দ্রযুগ

থাকে। ক্রমে ক্রমে এই দেশে বিশ্বভারতীর আদর্শে কিছু কিছু পরীক্ষাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। চেতুয়া-বাসুদেবপুর, ঘাটাল, নাড়াজোল ও গোকুলনগরে এই ধরণের পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরে সোনাখালি, ক্ষেপুত ও চন্দ্রকোণায় বিশ্বভারতীর কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়াছে জানা যায়। কিছু কিছু ছাত্র এইসব পরীক্ষাকেন্দ্র হইতে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং কেন্দ্রসমূহের অনেকগুলিই এখন আর টিকিয়া নাই। তবে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায় এবং স্থানে স্থানে সংগীতবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় রবীন্দ্রসংগীত ও অন্যান্য সংগীত শিক্ষা প্রসার লাভ করিতেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দী স্বীকৃত হওয়ায় এদেশে ক্ষেপুত প্রভৃতি গ্রামে ঐ ভাষার পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে শিক্ষাদানও কতগুলি শিক্ষালয়ের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী পাঠ্যক্রম চালু হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইং ১৯০৩ সালে নিমতলায় গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সম্প্রতি দাসপুর থানার মকারামপুরে (জে. এল. নং ১২৫) প্রাথমিক শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। মহকুমার আরও কয়েকটি স্থানে এইরূপ শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় আছে। স্থানাভাবে এগুলির বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। চন্দ্রকোণার গোবিন্দপুর মহল্লায় গঠনমূলক 'কল্যাণশ্রী' স্থাপিত হইয়াছে। শিল্প-শিক্ষার বিশদ কার্যসূচী ইহার অন্তর্ভুক্ত।

বুনিয়াদী-পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ বিদ্যালয়

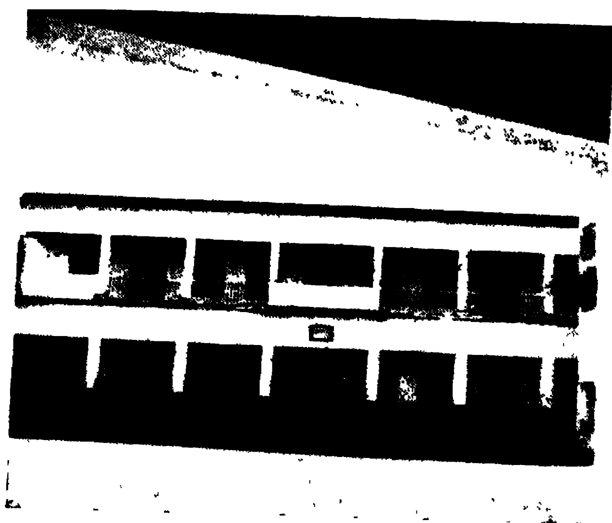
মহকুমায় প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের তুলনায় মহাবিদ্যালয় বর্তমানে মাত্র দুইটি আছে। (১) নাড়াজোলরাজ মহাবিদ্যালয় এবং (২) ঘাটাল রবীন্দ্রশতবার্ষিকীমহাবিদ্যালয়। নাড়াজোলরাজ মহাবিদ্যালয় নাড়াজোলরাজের গড়মধ্যস্থ অট্টালিকায় অবস্থিত। প্রধানতঃ নাড়াজোলরাজের আনুকূল্যে ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় উক্ত মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের বিশেষ সুবিধা না থাকায় উক্ত মহাবিদ্যালয়টি আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারিতেছে না। তাহা হইলেও দুরপল্লী ও কেশপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষায় প্রয়োজন এই মহাবিদ্যালয় হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহাবিদ্যালয়ে বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

মহাবিদ্যালয়

নাড়াজোল রাজকলেজ



ঘাটাল বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মুখভাগ



নবনির্মিত ঘাটাল বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়

তুলট কাগজে লেখা প্রাচীন বাংলা পুথির একটি পাতা (অকিঞ্চন চক্রবর্তীর 'গঙ্গাবন্দনা')

ঘাটাল রবীন্দ্রশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়টি কবিগুরুর শতবর্ষপূর্ত্তি উৎসব উপলক্ষে শহরের পূর্বপ্রান্তে ঘাটাল-পাঁশকুড়া পাকা রাস্তার পাশে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। ইং ১৯৬১ সালের ২৪শে জুলাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক মহাবিদ্যালয়টি অনুমোদিত হয়। স্থানীয় জনসাধারণ, শিক্ষাবিদ্, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী ও শাসকবৃন্দের আনুকূল্য ও সহযোগিতায় কলেজপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও সরকারী অনুদানে এবং কলেজকর্তৃপক্ষ ও পরিচালকমণ্ডলীর সুযোগ্য পরিচালনায় এবং নানা উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থাগম ও ছাত্রদের বেতনের দ্বারা কলেজের আর্থিক সঙ্কট কতকটা স্তিমিত। সর্বাপেক্ষা রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের সুবিধার জন্য কলেজের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলেজে বর্তমানে মানবিক ও বাণিজ্য বিদ্যার ডিগ্রিকোর্স চালু আছে এবং কয়েকটি বিষয়ে অনার্সও পড়ানো হয়। দূর দূরান্তের বহু ছাত্র এই কলেজে অধ্যয়ন করেন। মহাবিদ্যালয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণী (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) বর্তমানে খুলিয়াছে।

ঘাটাল রবীন্দ্রশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

আগে বীরসিংহ গ্রামে একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে তাহা উঠিয়া যায়। মহকুমার মোট ৬৯২টি মৌজার মোট জনসংখ্যা ৫৪৪,১৫৩। ইহাদের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা বিদ্যালয়প্রসারের ফলে বর্তমানে কম নয়। সকলে উচ্চ শিক্ষার জন্য না আসিলেও মহকুমায় মাত্র এই দুটি কলেজ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তাই এই অঞ্চলের বহু ছাত্রকে বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানপাঠেচ্ছু ছাত্রদের বাহিরে পাঠের জন্য যাইতে হয়। কারণ, এই দুইটি কলেজের কোনটিতেই বিজ্ঞানপাঠের সুযোগ নাই।

প্রাচীন টোলপদ্ধতির ন্যায় মুসলমানসমাজে মৌলবীগণ বাড়ীতে সেকালে ছাত্রগণকে আহার ও বাসস্থান দিয়া আরবী ও ফারসী ভাষার বিবিধ বিষয়বস্তু শিক্ষা দিতেন। ডিহিচেতুয়ার (দাসপুর, জে. এল. নং ৪৮) কাজির ডাঙ্গা নামক স্থানে মুসলমানদের 'বিদ্যাসাগর' নামে পরিচিত ওবেদুল্লা সারওয়ার্দি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ ভারত ও পাকিস্তানে খ্যাত। এই বংশের হাসান সুরাবর্দি অবিভক্ত বাংলার ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ডিহিচেতুয়ার মীরবংশে ও খাটবাড়ইয়ের (দাসপুর, জে. এল. নং ৬৬) খোন্দকারবংশে ইসলামীয় সংস্কৃতির চর্চা ছিল। এই মহকুমার কয়েকটি 'মক্তব' আজ প্রায় অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। ভরতপুর গ্রামে (দাসপুর, জে. এল. নং ১৯৫) আজও

মহকুমার কয়েকটি সাবেকী মক্তব

একটি মক্তব আছে। সম্ভবতঃ ইহাদের পরীক্ষাগুলি পূর্বে কলিকাতা মাদ্রাসা বা হুগলি মাদ্রাসার দ্বারা পরিচালিত হইত। কোম্পানির আমলে ইং ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের সার্ভেতে পাওয়া যায় যে তখন বাংলায় মোট ৮০,০০০ টোল ও ২১,০০০ মক্তব ছিল। মেদিনীপুর জেলায় মক্তবের সংখ্যাও কম ছিল না।

ইংরেজ আমলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সরকারের খাসতত্ত্বাবধানে আসে। পরে উহা জেলা বোর্ডের অধীনে আসে। কিন্তু পরে তাহা আবার সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। তাহার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির আর্থিক দায়িত্ব সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে। শিক্ষকমণ্ডলী এখন সরাসরি সরকারের নিকট হইতে মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন এবং বর্তমানে প্রতিটি সার্কেলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি একজন সাব্‌ ইন্‌স্‌পেক্টর অব্‌ স্কুলস্‌ তত্ত্বাবধান করেন। কেবলমাত্র পুরসভার এলাকাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট্‌ অনুসারে চলে।

সাম্প্রতিক কালে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শিক্ষাকে অধিকতর কর্মমুখী করিবার জন্য পাঠ্যপদ্ধতির আমূল সংস্কার করা হইতেছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই শিক্ষাব্যবস্থায় যে অনিশ্চয়তা ও নৈরাজ্য দেখা দিয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের দূরদর্শিতা ও সুবিবেচনার ফলে তাহা কতকটা দূরীভূত হইতেছে। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের আমূল সংস্কার, নূতন নূতন পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন, সাম্প্রতিক কালে আকর্ষণীয় কয়েকটি বিষয়ের পাঠক্রমের সন্নিবেশ এই যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। খেলাধূলা, স্বাস্থ্যচর্চা, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে পাঠক্রম চালু হওয়ায় শিক্ষা ছাত্রদের নিকট আজ আর নীরস বস্তু নয়। উপরন্তু উচ্চমানের বিদ্যালয়সমূহে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী প্রবর্তিত হওয়ায় বিদ্যালয়গুলির মর্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কলেজী শিক্ষার আংশিক বিকেন্দ্রীকরণ কিছু কিছু বিদ্যালয়ে বর্তাইয়াছে। মহকুমার মাধ্যমিক ও নূতন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে এই নূতন পাঠক্রম ১৯৭৬ সাল হইতে চালু হওয়ায় শিক্ষার উচ্চ মান আবার ফিরিয়া আসিবে মনে হয়। উপরন্তু এই বৎসর (১৯৭৬) প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের নূতনত্ব ছাত্রদের পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বন হইতে বিরত করিতে সমর্থ হইয়াছে। মহকুমার প্রধান প্রধান বিদ্যালয়, যেমন—ঘাটাল, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, সোনাখালি, সাগরপুর, নাড়াজোল, জোতঘনশ্যাম প্রভৃতি বিদ্যালয়ে এই নূতন পাঠক্রম

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সাম্প্রতিক পাঠ্যপদ্ধতি

মোটামুটি চালু হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে অপরাপর বিদ্যালয়সমূহেও এই নূতন পাঠক্রম চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা পূর্বের ন্যায় ফলপ্রসূ হইতে পারে।

নিম্নে মহকুমার কিছু কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং জুনিয়র সেকেণ্ডারি বা মিড্‌ল স্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির একটি মোটামুটি পরিসংখ্যান প্রদত্ত হইল: বাহুল্যভয়ে সবগুলির উল্লেখ সম্ভবপর নয়। যে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচয় পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে তাদের প্রসঙ্গ এক্ষণে বাদ দেওয়া গেল।

মহকুমার কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

(প্রতিষ্ঠাকালের তারিখ অনুযায়ী ক্রমসংখ্যা নির্দিষ্ট হইল। ব্র্যাকেটে থানার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্ক মৌজা সংখ্যা। পরের অঙ্ক ১৯৭১ এর আদমসুমারী অনুযায়ী লোকসংখ্যা।)

(১) চাঁইপাট হাইস্কুল (দাসপুর, ২১৬ ; ৯৫৬৮):

প্রতিষ্ঠাকাল ইং ১৯১০। সে সময় ইহা মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল। ১৯৫০-৫৮ পর্যন্ত জুনিয়র হাইস্কুল রূপে থাকিবার পর ১৯৫৯ সালে হাইস্কুল রূপে মঞ্জুরী পাইয়াছে। এই গ্রামে ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।

(২) নন্দনপুর বিদ্যালয় (দাসপুর, [illegible]৬ ; ৩০২):

১৯১২ সালে মধ্য ইংরাজি, ১৯৪৪ সালে উচ্চ বিদ্যালয়রূপায়ণে প্রচেষ্টা, ১৯৪৫ এ সপ্তম, ১৯৪৬ এ অষ্টম, ১৯৪৭ এ নবম ও ১৯৪৮ এ দশম শ্রেণী। ১৯৪৯ এ মঞ্জুরী প্রাপ্তি।

(৩) শ্রীবরা হাইস্কুল (দাসপুর ; ২৪৭, ২৬২৬):

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা চন্দ্রকুমারের নামে ইং ১৯২১ সালে ২১শে আগস্ট মধ্য ইংরাজি রূপে প্রতিষ্ঠা। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত স্থানে ইং ১৯৪৬ সালে হাইস্কুলে পরিণত। নিবারণ রায় মধ্য ইংরাজির প্রথম সম্পাদক ছিলেন। শ্রীবরায় দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। প্রথম সম্পাদক শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রধান শিক্ষক কালীপদ জানা।

(৪) জোতঘনশ্যাম নীলমণি উচ্চ বিদ্যালয় (দাসপুর, ২৪[illegible] ; ৯,০৪৬):

১৯২২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠা। কলিকাতার চিরুণী ব্যবসায়ী আবদুল হামিদের অর্থসাহায্যে ১৯২৮ সালে মধ্য ইংরাজিতে

রূপান্তরিত হয়। ১৯৩৮ সালে নীলমণি হুদাইতের ছয় হাজার টাকা দানে উচ্চ ইংরাজি রূপ পায়। অন্যান্য দাতা—বিনোদচন্দ্র মাইতি ৬০০০ টাকা, কুমুদচন্দ্র বেরা ৩০০০ টাকা, নিভাননী মান্না ১০০০ টাকা ইত্যাদি। এই বিদ্যালয় হইতে ১৯৫৯ সালের পরীক্ষায় জনৈক ছাত্র জেলাবৃত্তি লাভ করে। স্কুলটি বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। এখানে ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

(৫) রামজীবনপুর বাবুলাল ইনষ্টিটিউশন (চন্দ্রকোণা, ১৬ ; ১০,৩৬৪) :

কলিকাতার বিখ্যাত লৌহকটাই ব্যবসায়ী সতীশচন্দ্র সিংহের দানে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। সিংহবংশের বাস রামজীবনপুর সহরের উপকণ্ঠে পাণ্ডুয়া পল্লীতে। স্কুলের সুদৃশ্য বিল্ডিং ও তৎসন্নিকটে ছাত্রাবাস আছে।

(৬) ঝাকরা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (চন্দ্রকোণা, ২৩৫ ; ২৪০৪) :

১৯২৬ সালে মধ্য ইংরাজি রূপে স্থাপিত হয়। ১৯৪৬ সালে হাইস্কুল আরম্ভ —১৯৪৯ এ স্বীকৃতি পায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নেতা। বিদ্যালয়টি এখন দ্বাদশ শ্রেণীতে (উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা) উন্নীত বলিয়া জানা গিয়াছে।

(৭) দেশপ্রাণ উচ্চ বিদ্যালয়, রাণীচক (দাসপুর, ২১৩ ; ৪৬১৬)

১৯৩৭ সালে মধ্য ইংরাজি আকারে স্থাপিত, ১৯৪৫ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত। ১৯৪৭ সালে মঞ্জুরী লাভ। এখানে ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

(৮) খুকুড়দহ ঈশ্বরচন্দ্র মাজী স্মৃতি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (দাসপুর, ১৫০ ; ২৩১১)

দাতা অমরেন্দ্র মাজী মহাশয়ের সাহায্যে ১৯৩৯ সালে মধ্য ইংরাজি। ১৯৪৬ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণতি। ১৯৫৯ সালে উচ্চতর রূপগ্রহণ। খুকুড়দহ গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

(৯) সাগরপুর স্যার আশুতোষ হাইস্কুল (দাসপুর, ১৯২ ; ১৯৮১) :

স্থাপিত ১৯৪৬। উচ্চতর বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত। বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। স্যার আশুতোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এখানে আসিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের গৃহ উত্তম। পরিবেশ সুন্দর। সাগরপুর গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

(১০) রামপুর মানুয়া কে. কে. আই. আর. আর. ইনষ্টিটিউশন (দাসপুর, ৮১ ; ১৫১১)

স্থাপিত ১৯৪৯। কৃত্তিবাস ভৌমিকমহাশয়ের অর্থসাহায্যে প্রধানত ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। রামপুর গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

(১১) ক্ষীরপাই হাইস্কুল (চন্দ্রকোণা, ২১৪ ; ৭,০৭৫):

১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী স্থাপিত এবং ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী স্বীকৃত। তাহার আগে ইহা মধ্য ইংরাজি ছিল। বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত।

(১২) নতুক বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির (ঘাটাল, ৮৫ ; ১০৮২):

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ও ১৯৪৮ সালে ৫ই মার্চ হাইস্কুল মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে। এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এখন দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত।

(১৩) চৌকা (ঘাটাল, ১০৯ ; ৯০১) (১৪) মহারাজপুর (ঘাটাল, ১৩৫ ; ১৭২১), (১৫) লছিপুর (ঘাটাল, ৯৬ ; ৬৩৪), (১৬) রথিপুর (ঘাটাল, ৬০ ; ১৩৭২) (১৭) খড়ার (ঘাটাল, ৪৪ ; ৭২৬২) (১৮) আড়গোড়া (ঘাটাল, ৬৫ ; ঘাটাল পুরসভার অন্তর্ভুক্ত) (১৯) রসিকগঞ্জ (দাসপুর, গাদিঘাট মৌজার অন্তর্ভুক্ত) (২০) খাজ্ঞাপুর (দাসপুর, ২০৫ ; ২৩৪৪) (২১) কেশবচক (দাসপুর) (২২) ঘনশ্যামবাটী (দাসপুর, ১৮৮ ; ১৬৫৮) (২৩) মানুয়া (দাসপুর) (২৪) ব্রাহ্মণবসান (দাসপুর, ১১১ ; ৬২৭) (২৫) উত্তর ধানখাল (দাসপুর, ১২৩ ; ৫১৫) (২৬) পাঁচবেড়িয়া (দাসপুর, ১৬৫ ; ৯৯৬) গ্রামে জুনিয়র হাই, উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

(২৭) মনসুখা এল. এন. হাইস্কুল (ঘাটাল, ২৫ ; ৪৮৬০):

এই উচ্চ বিদ্যালয়টি ছাড়াও এখানে পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

(২৮) দাসপুর বিবেকানন্দ বিদ্যালয় (দাসপুর, ৬০ ; ৯১৫ (.৯৭১)—১০৪০ (১৯৬১)):

বিদ্যালয়টি দাসপুর বাজারের অদূরেই অবস্থিত। ইহা একটি স্বীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত। পূর্বে ইহা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, পরে জুনিয়র হাই ও হাইস্কুলে রূপান্তরিত হইয়াছে। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও দাসপুরে আছে।

(২৯) বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়, বীরসিংহ (ঘাটাল, ৪৮ ; ১৬১৯):

এটি পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহের তথা মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় স্কুলটি তাঁহারই প্রচেষ্টা ও অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মনোরম পরিবেশে বিদ্যাসাগরজননী

পুণ্যশ্লোকা ভগবতী দেবীর নামাঙ্কিত এই বিদ্যালয়টি গভর্ণমেণ্ট-স্পনসর্ড্। বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে এখানে কৃষি-বিজ্ঞান উল্লেখযোগ্য।

(৩০) জাড়া হাইস্কুল, জাড়া (চন্দ্রকোণা ১৫২ ; ৩৭৮৭) :

এই স্কুলটি বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত। দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠক্রমে XYZ তিনটি কোর্সই চালু করার অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

নিম্নে মহকুমার তিনটি থানার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের মোটামুটি এক পরিসংখ্যান দেওয়া যাইতেছে। পরিসংখ্যানগুলি ১৯৭১ সালের সেন্সাস-রিপোর্ট্ অনুযায়ী প্রদত্ত হইল। যে যে মৌজায় মাধ্যমিক বা জুনিয়র হাইস্কুল আছে কেবলমাত্র সেই সেই মৌজার নাম এখানে উল্লিখিত হইবে। প্রথম বন্ধনীমধ্যস্থ প্রথম অঙ্কটি মৌজা সংখ্যা ও দ্বিতীয়টি জনসংখ্যা বুঝাইবে। বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী অঙ্কটি মোট সংখ্যা নির্দেশক। পরিশেষে প্রতিটি থানার প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের মোট সংখ্যা উল্লিখিত থাকিবে।

সংকেত :—প্রা=প্রাথমিক, জু=জুনিয়র হাই, উচ্চ=উচ্চ বিদ্যালয়।

দাসপুর থানা :

সুপাপুড়সুড়ি	(১ ; ১৭০৫) :	প্রাথমিক ১ জুনিয়র হাই ১	
সিমানা	(৩ ; ৩৫৩) :	প্রা ১ জু ১	
কাঁটাদরজা	(৪ ; ৭৫৩) :	প্রা ১ জু ১	
নিজনাড়াজোল	(১৭ ; ১৮৯২) :	প্রা ১,	উচ্চ মাধ্যমিক ১, মহাবিদ্যালয় ১
রাজনগর	(২৫ ; ২৬০৮) :	প্রা ২	উচ্চ মাধ্যমিক ১
দাদপুর	(৩১ ; ১১১৭) :	প্রা ১ জু ১	
ধর্মাপুর	(৪৫ ; ২০১) :	প্রা ১	উচ্চ ১
দাসপুর	(৬০ ; ৯১৫) :	প্রা ১	উচ্চ ১
বাসুদেবপুর	(৬৩ ; ১৫৩৯) :	প্রা ১	উচ্চ ১
কলড়া	(৭২ ; ১২৩০) :	প্রা ১	উচ্চ ১
গোবিন্দনগর	(৭৮ ; ১১৩৪) :	প্রা ১ জু ১	
রামপুর	(৮১ ; ১৫১১) :	প্রা ১	উচ্চ ১
সোনামুই	(৮৬ ; ৭৯৫) :	প্রা ১	উচ্চ ১
পার্বতীপুর	(৮৭ ; ১১৩৩) :	প্রা ১ জু ১	

জয়কৃষ্ণপুর	(১০২ ; ৫২৫) :	প্রা ১ উচ্চ ১
সরবেড়িয়া	(১০৪ ; ৪৯৯) :	প্রা ১ উচ্চ ১
ব্রাহ্মণবসান	(১১১ ; ৬২৭) :	প্রা ১ উচ্চ ১
উত্তরধানখাল	(১২৩ ; ৫১৫) :	প্রা ১ উচ্চ ১
কৃষ্ণনগর	(১৩৩ ; ৬৭১) :	জু ১
সাহাপুর	(১৪৭ ; ৭০৬) :	প্রা ১ উচ্চ ১
তিওরবেড়িয়া	(১৪৮ ; ৫৩৭) :	প্রা ১ উচ্চ ১
খুকুড়দহ	(১৫০ ; ২৩৫১) :	প্রা ১ উচ্চ ১
লক্ষ্যাকুণ্ডু	(১৫২ ; ১৫৬৩) :	প্রা ৩ জু ১
নবীন মান্নুয়া	(১৫৫ ; ১৭০৮) :	প্রা ১ জু ১
পলাশপাই	(১৫৬ ; ২৯৬৯) :	প্রা ২ জু ১
পাঁচগেছিয়া	(১৫৮ ; ৭৯২) :	প্রা ১ উচ্চ ১
পাঁচবেড়িয়া	(১৬৫ ; ৯৯৬) :	প্রা ১ উচ্চ ১
সোনাখালি	(১৭২ ; ১০২২) :	প্রা ১ জু ১ উচ্চ ১
ভূতা	(১৮৭ ; ২৬৩৯) :	প্রা ২ উচ্চ ১
বিষ্ণুপুর	(১৮৯ ; ১৫৯৯) :	প্রা ১ জু ১
সাগরপুর	(১৯২ ; ১৯৮১) :	প্রা ১ উচ্চ ১
গোপালপুর	(১৯৯ ; ১৪২৩) :	প্রা ১ জু ১
গাদিঘাট	(২০১ ; ৮৬১) :	প্রা ১ জু ১
খাঞ্জাপুর	(২০৫ ; ২৩৪৪) :	প্রা ৩ উচ্চ ১
জোতকানুরামগড়	(২১২ ; ৩৮৫৭) :	প্রা ৪ জু ১
রাণীচক	(২১৩ ; ৪৬১৬) :	প্রা ৪ উচ্চ ১
দোরি অযোধ্যা	(২১৪ ; ১৬৯১) :	প্রা ২ জু ১
চাঁইপাট	(২১৬ ; ৯৫৬৮) :	প্রা ৮ উচ্চ ১
কৈজুড়ি	(২১৮ ; ২৪৯৬) :	প্রা ২ জু ১
আরিট	(২২০ ; ১৪১১) :	প্রা ১ উচ্চ ১
দক্ষিণবাড়	(২২৪ ; ২৪৭৭) :	প্রা ২ জু ১ উচ্চ ১
ভগবানচক	(২৩৪ ; ৬৩৩) :	প্রা ১ জু ১
কাশীনাথপুর	(২৩৬ ; ২৪৫৮) :	প্রা ১ উচ্চ ১
গোমকপোতা	(২৩৭ ; ১৫৪৪) :	প্রা ১ জু ১
জোতঘনশ্যাম	(২৪০ ; ৯০৪৬) :	প্রা ৬ উচ্চ ১

কুলটিকরি (২৪১ ; ৩৩০৯) : প্রা ২ জু ১

শ্রীবরা (২৪৭ ; ২৬২৬) : প্রা ২, জু ১, উচ্চ ১

দাসপুর থানায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা : ২৪১

দাসপুর থানার মোট মৌজা সংখ্যা : ২৪৮

উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা : ২৮

বি. দ্র. :—১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে এই থানার ৫টি মৌজার প্রাথমিক, মিড্‌ল ও উচ্চ বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয়নি। ইহার পরেও কিছু বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দাসপুর থানায় দুয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোনাখালিতে আলাদাভাবে বালিকাদের বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে।

বালিকা বিদ্যালয়

ক্ষেপুত গ্রামে কালীপদ পাল ও ডাঃ জয়কৃষ্ণ নাগের চেষ্টায় ১৯৫৮ সালে বালিকাদের জুনিয়র হাইস্কুল স্থাপিত হয়। ১৯৫৯ সালে ইহা স্বীকৃতি পাইয়াছে। রাধাকান্তপুর গ্রামে (৬৭ : ১২৮৪) টালিভাটায় সম্প্রতি একটি জুনিয়র হাই বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। থানায় আরও দুয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় থাকিতে পারে। এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগৃহীত হয় নাই। পলাশপাইয়েও (১৫৬ : ২৯৬৯) একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে।

থানার কয়েকটি জুনিয়র বেসিক

প্রাথমিক স্কুলগুলির মধ্যে পূর্ব উল্লিখিতগুলি ছাড়াও দুয়েকটি জুনিয়র বেসিক আছে। যেমন, কইগেড়িয়া জুনিয়র বেসিক (জে. এল. নং ২০৮, লোকসংখ্যা ৭৮৪), রামনগর জুনিয়র বেসিক (জে. এল. নং ১২৭, লোকসংখ্যা ৪৩২) এবং বাসুদেবপুর পার্ট্ বেসিক। আরও কয়েকটি জুনিয়র বেসিক আছে।

ঘাটাল থানা : এই থানার কয়েকটি মৌজার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হইল। ঘাটাল পুরসভার অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইবে। সর্বশেষে থানার প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির মোট সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেওয়া হইবে :

(ক) স্থলতানপুর (৫ : ২১০৯) : প্রা ২ জু ১

খাসবার (১৫ : ১১৬০) : প্রা ১ জু ১।

ইড়পালা (১৭ : ২৯০১) : প্রা ৩, জু ১, উচ্চ ১।

মনস্থখা (২৫ : ৪৮৬০) : প্রা ৫, উচ্চ ১।

চাউলি সিংহপুর (২৭ : ৩০৪০) : প্রা ১, জু ১।

বীরসিংহ (৪৮ : ১৬১৯) : প্রা ১, উচ্চ ১।

রথিপুর (৬০ : ১৩৭২) : প্রা ২, উচ্চ ১।

বলরামগড় (৭০ : ৩৬১) : জু ১।

জগসরা (৭৩ : ৯৯১) : প্রা ১, জু ১।

আলুই (৮৩ : ৮৭৭) : প্রা ১, জু ১।

নতুক জয়কৃষ্ণপুর (৮৫ : ১০৮২) : প্রা ১, উচ্চ ১।

হরিনাগেড়িয়া (৮৮ : ২৩৯) : প্রা ১, জু ১।

লছিপুর (৯৬ : ৬৩৪) : প্রা ১, জু ১।

চৌকা (১০৯ : ৯০১) : প্রা ১, উচ্চ ১।

বাড়গোবিন্দ (১১৫ : ৩৭২) : জু ১।

পান্না (১২০ : ১৮০৫) : প্রা ১, জু ১।

জয়নগর (১৪০ : ২৯৪) : প্রা ১, জু ১

প্রতাপপুর (১৫২ : ৩১৩৮) : প্রা ১, জু ১।

রত্নেশ্বরবাটী (১৫৩ : ২৩৩৬) : প্রা ১, জু ১।

শ্যামসুন্দরপুর (১৫৬ :) : প্রা ২, জু ১।

ঘাটাল থানার মোট মৌজা সংখ্যা : ১৫৭।

এই থানায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় :

[ঘাটাল ও খড়ার পুরসভার অধীন বিদ্যালয়গুলি সহ] : ১৫১

(ঘাটাল ২১ খড়ার ৮)।

এই থানার উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা : ১৫।

(ঘাটাল ৭ খড়ার ২)।

সম্ভবত কোন কোন জুনিয়র বিদ্যালয় বর্তমানে উচ্চবিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

বিঃ দ্রঃ—১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে এই থানার ৮টি মৌজার বিদ্যালয় সম্পর্কে কোন পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয় নি।

ঘাটাল পুরসভার (Municipality) অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির একটি পরিসংখ্যান নিয়ে দেওয়া হইল। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিসংখ্যান ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত ঘাটাল পুরসভার শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থের এম. মাইতির তথ্যবহুল একটি প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঐই পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। ঐ সময় পুরসভার মোট ১৭টি ওয়ার্ডে ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে আরও কয়েকটি হইয়াছে।

(১) আড়গোড়া (২) শুকচন্দ্রপুর (৩) যোগদা সৎসঙ্গ (৪) আলমগঞ্জ (৫) কৃষ্ণনগর (৬) গম্ভীরনগর (শীতলা) প্রাথমিক (৭) গম্ভীরনগর (গান্ধী) (৮) চাউলি (৯) রামচন্দ্রপুর (১০) সিন্দুর (১১) পাঁচঘরা (১২) গড় প্রতাপনগর (১৩) বারুইপাড়া (১৪) নিশ্চিন্দীপুর জুনিয়র বেসিক (১৫) শ্রীরামপুর (১৬) পরেশনগর (১৭) কোন্নগর কৃতার্থময়ী (১৮) প্রসন্নময়ী গার্লস্ জুনিয়র বেসিক (১৯) কোন্নগর গোয়ালাপাড়া (২০) কুশপাতা (২১) গোবিন্দপুর।

এই বিদ্যালয়গুলি মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট্ অনুসারে পরিচালিত হয় এবং নিজস্ব গৃহ বা পল্লীর আটচালায় বসে। •

পূর্বকথিত ঘাটাল উচ্চ বিদ্যালয়টি ছাড়া বসন্তকুমারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, যোগদা সৎসঙ্গ শ্রীযুক্তেশ্বর বিদ্যাপীঠ (উচ্চ বিদ্যালয়) প্রভৃতি বিদ্যালয়গুলিও আছে।

(খ) ঘাটাল পুরসভা এলাকায় কয়েকটি সংস্কৃত টোল ঃ

(১) **'ঘাটাল দর্শন টোল'** বগড়ি-কৃষ্ণনগর নিবাসী রামহৃদয় বিদ্যাভূষণ-কর্তৃক কালীবাজারের একটি ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(২) **'জ্যোতিঃপ্রকাশ চতুষ্পাঠী'**র প্রতিষ্ঠা করেন পণ্ডিত মন্মথনাথ জ্যোতিঃশেখর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রামেশ্বর মল্লিক মহাশয়ের আলমগঞ্জের গৃহের দ্বিতলে এইটি পরিচালনা করিতেন জ্যোতিঃশেখর মহাশয়। তাঁহার বহু ছাত্র উক্ত টোলে অধ্যয়ন করিতেন। এই টোল আজও বর্তমান। গম্ভীরনগরনিবাসী পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষতীর্থ ইহার কাজ পরিচালনা করেন এবং ঘাটাল পুরসভা চতুষ্পাঠীকে নিয়মিত সাহায্য করেন।

(৩) **ঘাটাল সাধারণ টোল ঃ** নিশ্চিন্দিপুর-নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ দাস অধিকারীমহাশয়ের চেষ্টায় ব্রাহ্মণাদি সমস্ত জাতির সংস্কৃতশিক্ষার জন্য প্রথমে বকুলতলা নামক স্থানে উক্ত টোল প্রতিষ্ঠিত হয়। টোলের প্রথম অধ্যাপক থড়ার-গোবিন্দপুর নিবাসী তিনকড়ি পঞ্চতীর্থ। জনসাধারণের ও পৌরকর্তৃপক্ষের অর্থসাহায্যে টোলটির সমৃদ্ধি হয়। পরে টোলগৃহ ঘাটাল নিবাসী গোবর্ধন দাস মহাশয়ের কোন্নগরপল্লীর একটি বাড়ির দ্বিতলের কয়েকটি কক্ষে স্থানান্তরিত হয়। টোল হইতে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম ছাত্রদ্বয় শ্রীহরকালী কাব্যতীর্থ ও শ্রীশীতলচন্দ্র ভৌমিক কাব্যতীর্থ। তিনকড়ি পঞ্চতীর্থের পর টোলের পরবর্তী অধ্যাপক হন জন্দীপুরনিবাসী মণীন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ। পরবর্তী অধ্যাপক থলপপুরনিবাসী পণ্ডিত হরিসাধন শাস্ত্রী। তিনি উক্ত টোলে প্রায় ১২ বৎসর অধ্যাপনা করেন। এই সময় টোল হইতে ৪জন

উপাধি পরীক্ষায় পাশ করেন। বর্তমানে পণ্ডিত শ্রীশীতলচন্দ্র কাব্যসাংখ্য-পুরাণতীর্থ (দাসপুর থানার ভূতাগ্রামনিবাসী) বেদান্তশাস্ত্রীমহাশয় ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে এই টোলে অধ্যাপনা করিতেছেন। বেশ কয়েকজন ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া উপাধি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত টোল পুরসভার প্রদত্ত ভূমিতে সরকারী সাহায্যে নির্মিত নিজস্ব ভবনে চলিতেছে। টোলটি বেশ সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে।

(৪) **কাটান বিদ্যাসাগর-চতুষ্পাঠী ঃ** ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কাটানের বিখ্যাত পণ্ডিত দীনবন্ধু বিদ্যাসাগর এই চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। পরে তাঁহার পুত্র জানকীনাথ স্মৃতিরত্ন ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত টোল পরিচালনা করেন। পরে তাঁহার মৃত্যুতে টোলটি কিছুকাল বন্ধ থাকে। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পুত্র পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ কাব্যব্যাকরণ-স্মৃতি-বেদতীর্থ কাটান বিদ্যাসাগর টোল পুনরায় চালু করেন। টোলটিতে বর্তমানে বেশ কিছু ছাত্র অধ্যয়ন করেন। ইহা কিছু সরকারী সাহায্যও লাভ করিয়া থাকে।

চন্দ্রকোণা থানা ঃ নিম্নে চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত কয়েকটি মৌজার প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হইল ঃ

[১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী এই পরিসংখ্যান দেওয়া হইয়াছে, তবে সেন্সাসে সব গ্রামের পরিসংখ্যান (বিদ্যালয় বিষয়ে) না থাকায় এই পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নয়।]

জগন্নাথপুর (১ ঃ ১৪৩৬) ঃ প্রা ২, জু ১
গুচুড়ে (৭ ঃ ৩৯৭) ঃ প্রা ১, জু ১
কৃষ্ণপুর (৩৫ ঃ ১৯৫২) ঃ প্রা ১, জু ১
মেতেলা (৫৬ ঃ ৩৭৬) প্রা ১, উচ্চ ১
রামপুর (৭৮ ঃ ৪৮২) ঃ প্রা ১, জু ১
কলাকড়ি (১৪৮ ঃ ৫৮০) ঃ প্রা ১, জু ১
মাণিককুণ্ডু (১৫১ ঃ ১৫৫৮) ঃ প্রা ২, জু ১
জাড়া (১৫২ ঃ ৩৭৮৭) ঃ প্রা ৩ জু ১ উ ১
তাতারপুর (১৬৫ ঃ ৯৮৪) ঃ প্রা ১, জু ১
মঙ্গরুল (১৭৬ ঃ ২৯১১) ঃ প্রা ২, উচ্চ ১
আগর (১৮০ ঃ ৭১২) ঃ প্রা ১, জু ১
গোহালভাঙ্গা (১৯৯ ঃ ৪৩৩) ঃ প্রা ১ উ ১

হেমতপুর (২০৯ : ৫৭০) : প্রা ১, জু ১
গোপালপুর (২১৯ : ২৬৩) প্রা ১, জু ১
বাগ্‌পোতা (২১২ : ১০৮৫) প্রা ১, উচ্চ ১
তেনপুর (২৩০ : ৫১৪) : প্রা ১ উচ্চ ১
বলা (২৩৯ :২৩৭৪) : প্রা ১, জু ১
কুয়াপুর (২৪২ : ১৪৩২) প্রা ১, জু ১
পিঙ্‌লাস (২৪৮ : ৬১৯) : প্রা ১, জু ১
বন্দীপুর (২৫৮ : ১৪২৮) : প্রা ১, জু ১
চান্দুর (২৬২ : ১৩৮৮) : প্রা ১, উ ১
ধান্যগাছি (২৬৩ : ১৫৬২) : প্রা ১, উ ১
পাণ্ডুয়া (২৭৩ : ৩৮৬) : প্রা ১, জু ১
খানপুর (২৭৪ : ৪৬৬) : প্রা ১, উচ্চ ১
গোপালপুর (২৮২ : ৪৩৫) : প্রা ১ জু ১
মনোহরপুর (২৮৬ : ১৪৭৪) : প্রা১, জু ১

এই থানায় মৌজার মোট সংখ্যা : ২৮৭

[১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ২১টি মৌজার প্রাথমিক, উচ্চ ও মিড্‌ল বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয় নি ।]

থানার ৩টি পুরসভার (ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর ও চন্দ্রকোণার) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা : ২৪

থানার অন্যান্য মৌজার প্রাথমিক বিদ্যালয়সংখ্যা : ১৭৯

তিনটি পুরসভা-এলাকার উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা : ৯

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অন্যান্য মৌজার উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা : ৯

১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে মহকুমার পাঁচটি পুরসভা এলাকার বিদ্যালয় সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

১। ঘাটাল পুরসভা :

মহাবিদ্যালয়	শর্টহ্যাণ্ড ইত্যাদি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্বীকৃত)	মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক	জু. হাই	প্রাথমিক	অন্যান্য
কলাবিভাগীয় মহাবিদ্যালয় ১	২	৩	×	১৯	২

২। খড়ার পুরসভা :

মহাবিদ্যালয়	বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্বীকৃত)	মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক	জু. হাই	প্রাথমিক	অন্যান্য
×	×	২	×	৪	×

৩। ক্ষীরপাই পুরসভা :

মহাবিদ্যালয়	স্বীকৃত বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান	মাধ্যমিক/ উঃ মাধ্যমিক	জু. হাই	প্রাথমিক	অন্যান্য
×	রিপোর্টে সংখ্যা অস্পষ্ট	১	১	৫	১

৪। রামজীবনপুর পুরসভা :

মহাবিদ্যালয়	স্বীকৃত বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান	মাধ্যমিক/ উঃ মাধ্যমিক	জু.হাই	প্রাথমিক	অন্যান্য
×	×	১	১	১১	×

৫। চন্দ্রকোণা পুরসভা :

মহাবিদ্যালয়	স্বীকৃত বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মাধ্যমিক/ উঃ মাধ্যমিক	জু. হাই	প্রাথমিক	অন্যান্য
×	×	২	×	১৩	১

বিঃ দ্রঃ—উপরিউক্ত সমস্ত পরিসংখ্যান—যেমন, লোকসংখ্যা, বিদ্যালয় সংখ্যা প্রভৃতি ১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট্ অনুসারে গৃহীত হইয়াছে। সেন্সাস্ রিপোর্টে উল্লিখিত কোন কোন মৌজার 'মিড্ল স্কুল'গুলি বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারে। রিপোর্টে উচ্চ বিদ্যালয়গুলি শুধুমাত্র 'সেকেণ্ডারী স্কুল' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য

প্রধানত কৃষিনির্ভর মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ঘাটাল মহকুমার বেশির ভাগ জমির কৃষিকার্যই বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। অল্প জমিরই চাষবাস সেচব্যবস্থার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। অবশ্য বর্তমানে মহকুমার কিছু কিছু স্থানে অগভীর নলকূপ বসানো হইয়াছে, কোন কোন স্থানে আবার দুএকটি গভীর নলকূপও বসিয়াছে। আবার কোথাও কোথাও পাম্পিং মেসিনের সাহায্যে নদী হইতে জলসেচের দ্বারাও চাষ আবাদ চলিতেছে।

মহকুমার কৃষিকার্য ও সেচব্যবস্থা

তাহার ফলে আগের তুলনায় বর্তমানে কৃষিকার্যের যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তবে এইগুলির সাহায্যে সেচব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য, একথা বলা বাহুল্য। কোন কোন স্থানে দীঘি ও বৃহৎ পুষ্করিণীর সাহায্যেও চাষ-আবাদ চলে। কিন্তু অধিকাংশ প্রাচীন দীঘি সংস্কারের অভাবে মজিয়া যাওয়ায় এই সব দীঘির জল কৃষিকার্যের খুব সামান্যই উপকার করিয়া থাকে। সেচবিহীন এলাকার জমিগুলি বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে বলিয়া বৎসরে একাধিক ফসল ফলাইবার ক্ষমতা তাহাদের থাকে না। আবার বেশি বৃষ্টি হইলে এইসব এলাকার জমির চাষবাসের খুবই ক্ষতি হয় এবং কখনও কখনও বন্যার তাণ্ডবে ফসল, গৃহ ও প্রাণীর খুবই অনিষ্ট হইয়া থাকে। দাসপুর, ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানার কিছু কিছু অঞ্চল প্রায়ই বন্যা কবলিত হওয়ার ফলে খারিফ শস্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সেচের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের প্রভূত উন্নতি হওয়ার ফলে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন উচ্চ ফলনশীল ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনকরা সম্ভবপর হইয়াছে। বহু গ্রামে দীঘি, পুষ্করিণী, নদী বা খাল হইতে এইসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে গ্রীষ্ম ও শীতকালের ফসলগুলি উৎপন্ন হইয়া থাকে—পূর্বে যাহা আদৌ হইত না। ইহার ফলে প্রধান শস্য ধান্যের উৎপাদন এই মহকুমায় কম নয়।

বর্তমানে দেশব্যাপী কৃষিবিপ্লবের সূচীমুখে সাবেককালের আমন, আউশ ও বোরো ধান আজ শুধুমাত্র উৎপাদ্য দ্রব্য নয়, সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনায় নানা জাতের ধানের বীজ কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভবপর হওয়ায় এই তিনটিধান আজ শুধু নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে এবং ইহাদের ফলনও অধিক ফলনশীল

ধানের তুলনায় খুবই কম। তবুও সাধারণ কৃষকদের মধ্যে এই তিন শ্রেণীর ধান উৎপাদন করিবার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে এই দেশে কতপ্রকার ধান্যের চাষ হইত তাহার একটি তালিকা বাসুদেবপুর নিবাসী জনৈক গঙ্গারামের একটি পদ্য হইতে জানিতে পারা যায়। বলাবাহুল্য তালিকায় উক্ত এইসব শ্রেণীর ধান উচ্চমানের ছিল। আজ তাহাদের উৎপাদন একেবারেই লোপ পাইয়াছে এবং জমির উর্বরা শক্তিও বেশ খর্ব হওয়ায় তাহাদের ফলন আজ আর সম্ভব নয় এবং লাভজনকও নয়। কৃষকেরা পর্যন্ত এই সব ধানের নাম খুব কমই জানেন। গঙ্গারামরচিত সেকালের ধান্যের এই নামাবলীটি সাধারণের গোচরে আনিবার জন্য নিম্নে উদ্ধার করা হইল :

সেকালের নানা জাতের ধান ও ধান্যনামের তালিকা

"হরিশংকর হইল ধান হাত পাঁজর হুড়ো।
হরকুলি হাতনাদ হিঞ্চে হলুদগুঁড়ো॥
কেলে কানু কেলেজিরে কালিকে কার্তিকে।
কয়া কর্জা কাশীফুল কপটকন্টিকে॥
কালিন্দী-কোটিতে কুসুম শাল কনেকচুর।
দুধরাজ দুনাভোগ পক্ষে ধেহুস্তর॥
কৃষ্ণশাল কমলভোগ কমলপূর্ণিমে।
কলমিলতা কনকলতা কামদগরিমে॥
খাজুরথুবি খয়েরশাল ক্ষেমা গঙ্গাজল।
গয়াবালি গোপাল গৌরী কাজল॥
গন্ধমালতী গুয়াথুপি গুণকর।
চামরঢোল চন্দনশাল হইল তারপর॥
চিত্রশাল জটাশাল জগন্নাথভোগ।
জামাইনাড়ু জলারঙ্গি জীবনসংযোগ॥
পাচ্চাভোগ পায়রাবশ পরম সুন্দর।
তেলাবরি তিলসাগরী হইল তারপর॥
পরাঙ্গি পর্বতজিরে আর পেশোয়ারী।
পানবোটা পরমান্নশাল পূদি আদি করি॥
... ...
রায়কেলে পিঁপড়েকেলে বোর বক্কেশ্বর।
চন্দ্রমণি পালাজোড় শঙ্করশাল আর॥

রাজভোগ রক্তমণি রাহুনী পাগল।
মধুমাধব মক্কেশ্বর ভুবন উজ্জ্বল ॥
হরগৌরী হইল ধান দেখিতে সুন্দর।
অর্ধ অঙ্গ ধবল অর্ধ অঙ্গ লাল কলেবর ॥
হরহরি হইল ধান্য অতি সুনির্মল
অর্ধ অঙ্গ কাল তার অর্ধেক ধবল ॥
অতি রং রতি রং কত লব নাম।
সংক্ষেপেতে কিঞ্চিৎ কহিল গঙ্গারাম ॥"

এই তালিকা খুবই দীর্ঘ। বাহুল্যভয়ে অতি সংক্ষেপে সেকালের ধান্যের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা উদ্ধৃত করা হইল। ইহা ছাড়া গঙ্গারামের এই তালিকায় কামিনী, দুধেশোমরা, দাদখানি, ময়নাগুঁড়ো, পার্বতীশাল, কেশবশাল, বাঁকচুর, সূর্যমণি, সীতাভোগ, মণিভোগ, বাঁকতুলসী, বাঁশগজাল, ক্ষীরশঙ্কর, ক্ষীরপুলি, শিবজটা, শঙ্করজটা, শ্যামা, রামবাণ, আগুনবাণ, ধামাইশাল, নন্দনশাল, লক্ষ্মীভোগ, মুক্তঝুরি, কাটারীভোগ, গোবিন্দভোগ, কদমঝুরি, শশাবীচি, পাথরকুচি, ঘিশাল, বাঁশফুল প্রভৃতি আরও অনেক শ্রেণীর ধানের নাম জানা যায়।

বাঁশচাল

কাঁটা বাঁশঝাড়ে কোন কোন বৎসর ফুল হয়। উহা হইতে বাঁশচাল জন্মে, কিন্তু উহা দুর্লক্ষণের পরিচায়ক বলিয়া প্রবাদ। বাঁশচাল হইলে ঐ বৎসর দুর্ভিক্ষ হইতে পারে। বাঁশঝাড়ের তলা হইতে লোকে ঐগুলি কুড়াইয়া লইয়া মাড়িয়া চাউল বাহির করে। উহাতে পিঠা হয়, কিন্তু খাইলে দারুণ জল পিপাসা হয়।

গম ও পাট

প্রধান ফসল ধানের পরে গমের চাষ বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া এই দেশের বহু স্থানে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে ধানের পরে ইহা সর্বাধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ দোঁয়াশ ও কালাজমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। বর্তমানে সরকারি প্রচেষ্টায় কৃষকদের মধ্যে উন্নতমানের গমবীজ সরবরাহের ফলে গমের উৎপাদন বেশ বাড়িয়াছে এবং চালের পরে ইহা প্রধান আহার্যবস্তুতে পরিণত হইয়াছে। আজ হইতে কুড়ি বৎসর পূর্বেও গমের চাষ এত জনপ্রিয় ছিল না। বর্ষার শেষে ও শীতের পূর্বে ইহার চাষ হইয়া থাকে। পাটও এইদেশে একটি কৃষিজ দ্রব্য। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ধানক্ষেতে পাটবীজ রোপণ করা হয় এবং আষাঢ়ের শেষ বা শ্রাবণের প্রথম দিকে পাটকাটা হয়, পরে সেই ক্ষেতে ধান্য রোপণ করা হইয়া

থাকে। এই মহকুমার গ্রামাঞ্চলের কোন কোন স্থানে উন্নতজাতের পাটচাষ হয় এবং তাহা হইতে কৃষকদের বেশ লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাট পচাইবার সুব্যবস্থা না থাকায় পাটের মান অনেক নীচে থাকিয়া যায় এবং তাহার ফলে মূল্যমানের তারতম্য ঘটে। আখও এই অঞ্চলের একটি বিশেষ কৃষিজদ্রব্য। আখ হইতে রস এবং তাহা হইতে গুড় হয় এবং এই গুড় বাইরে বহু জায়গায় চালান যায়।

শাক-সব্‌জি

তরিতরকারি বহুলভাবে উৎপন্ন হয় দাসপুর থানায়, ঘাটালের মনসুখা অঞ্চলে এবং চন্দ্রকোণার পালংপুরে। মাণিককুণ্ডুর (চন্দ্রকোণা, ১৫১) মূলা ও কচু প্রসিদ্ধ। ভোলা ময়রার প্রসিদ্ধ কবিগানে মাণিককুণ্ডুর মূলার সুখ্যাতি আছে: "মাণিককুণ্ডুর মূলো ভালো চন্দ্রকোণার ঘিয়ে"। এদেশে পটলের উৎপাদন খুব বেশি নহে। আলু, রাঙালু, সাদা আলু, থামালু প্রায় সর্বত্র জন্মে। মান এবং ওলের ব্যাপক চাষ হয় না। এঁদো পুকুরের ধারে কিংবা পতিত জমিতে অনেক সময় এই দুইটি সব্জী আপনা আপনি হয়। নদীতীরে কিছু তামাক হয়। চেতুয়া-রাজনগর অঞ্চলে (দাসপুর) কাগ্‌জি ও পাতিনেবুর বেশ চাষ হয়। বাতাবি, জামির, গোঁড়ানেবু সর্বত্র অল্পবিস্তর হয়। নাড়াজোল অঞ্চল আম প্রভৃতি ফলের জন্য পরিচিত। সরবেড়িয়ায় (দাসপুর) ও শিলাই নদীর চরে চরে বাঁধা, ফুল এবং ওলকপি, 'তোরই' নামে গোলঝিঙা, ভারাপটল, খেঁড়ো, কুমড়া, আলু প্রভৃতি সব্‌জী প্রচুর জন্মে। বীট্, গাজর প্রভৃতির উৎপাদন কম। মনসুখা (ঘাটাল), গদাইপুর (দাসপুর) ও বনপুর (চন্দ্রকোণা) বেগুনের জন্য বিখ্যাত। থেটে, পুঁই. পালং. লাউ, কুমড়া, পিড়িং, থস্‌লা, চাঁপানটে, নটে, পাট প্রভৃতি শাকের ব্যাপক চাষ হয়। উত্তরাঞ্চলে প্রবাদ—"থেটে নটে আড়াইয়ে সজনে বারো-মাস।" হিঞ্চে, শুষনী ও কল্‌মি খালে-বিলে আপনিই হয়। সজ্‌না ও নাজ্‌না ভেদে খাড়া দুরকম। প্রথমটি বারোমেসে। ভারা পটল, দু'জাতের কুঁদরি, 'তোরই' নামে গোল ঝিঙে, চিচিঙ্গে, পুরুল সাময়িক সব্‌জি। শটীগাছকে এই দেশে 'কোব্‌রা' বলে। হলুদ গাছের মত এই গাছগুলি বনে-বাদাড়ে আপনিই হয়। আদার মত ইহার মূল শিলে ঘষিয়া জলে দিয়া শটী তৈরী হয়। ধূপ প্রস্তুতেও ইহা লাগে। শটীর পালো একপ্রকার খাদ্য। ইহা কৃমি রোগেরও একটি ঔষধ।

নাড়াজোল প্রভৃতি স্থানে পানের বোরোজ আছে। গাছপান নামে এক জাতীয় পানগাছের লতা আমগাছ বা কোন শক্তগাছকে আশ্রয় করিয়া উঠে।

সুপারি এদেশে খুব কম। মশলার মধ্যে লঙ্কা, হলুদ, আমআদা, ধনে ও মৌরি স্থানে স্থানে হয়। খেঁসারি, বিরি, কালোমুগ এদেশের প্রধান ডাল।

পান, মশলা ও ডাল

বরবটী, রমা, টমর, মসুর, ছোলা বেশ কিছু স্থানে হয়। তিসি, সরগোঁজা, লালতিল ও কিছু কালোতিলের চাষও হয়। রেড়ি আপনাআপনিই জন্মে। এদেশে উহার নাম 'গাব'। যব ও কুসুম বীজের চাষ নগণ্য। ভুট্টার উৎপাদনও কম। বড়দানা কিছু কিছু হয়।

বর্ষায় বনাঞ্চলে নানা শ্রেণীর ছাতু আগে বেশ হইত। ক্রমশঃ বনাঞ্চল পরিষ্কার হওয়ায় ছাতুর ফলন কমিয়া যাইতেছে। ইহাদের কোন কোন জাতের

ছাতু

স্বাদ মাংসের মত। খড়ের গাদায় 'পোয়াল', মাটিতে আশ্বিন-কার্তিকে 'পার্বণ', বেলে মাটিতে 'বালিছাতু' ও উইঢিবিতে 'উইছাতু' হয়। এই উইছাতু খুবই উৎকৃষ্ট। উহা আষাঢ়মাসে হয়।

এই মহকুমায় নানা শ্রেণীর জঙ্গল ও আগাছার নাম : আস্সেওড়া, সেওড়া, আঁকড়, কাঁটাঝাঁটি, ভূতভৈরবী বৈঁউচ, সিয়াকুল, নাটা প্রভৃতি। পুকুরে টোকা, ইঁদুরকানি, নৌকা, ক্ষুদি ও গয়াবালি পানা জন্মিয়া জল দূষিত করে। ভাসা গেঁড়ি, ক্ষুদি ও গয়াবালি পানা খাইয়া ফেলে। জলজন্তুগণ এক পুকুর হইতে অন্য পুকুরে এই সকল পানা সঞ্চারিত করে। কচুরিপানার নামান্তর এদেশে নৌকাপানা। উহা ইংরাজি ১৮৮৫ সালে একজন ইংরাজ মহিলার দ্বারা এদেশে আনীত হয়। পরে তাহা সারা ভারতের খালে-বিলে ছড়াইয়া পড়িয়া এক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। কয়েক জাতির গাঁজও পুকুরকে আবর্জনায় পূর্ণ করে।

এদেশে তিন রকমের তুলাগাছ হয়। দীর্ঘ তুলাগাছের নাম অল্লাকাপাস। মাঝারি আকারের তুলাগাছ ছাড়া ছোট আকারের আর এক রকমের তুলাগাছ

তুলা চাষ

শন ও পাটের মত চাষ করা হয়। তাহার ফল বেশ বড়। তুলাও প্রচুর হয়। সর্বত্রই দেশী ও বিদেশী শিমুল গাছ হইতে বালিশের তুলা সংগ্রহ করা হয়। তিতো ও মিঠা পাট ও মেস্তার চাষও বহু স্থানে হইতেছে। সেকালে রেশম পোকার জন্য তুঁতগাছের প্রচুর চাষ হইত। এখন তাহার চাষ খুব কম। নীলের চাষও আর হয় না।

এই মহকুমায় নানা শ্রেণীর ফল ও তাহাদের চাষ অল্পবিস্তর সব স্থানেই হইয়া থাকে। নানা জাতির আম, যেমন, সিঁদুরে, বৈশাখী, বোম্বাই ছাড়া দেশি আমের আরও কয়েকটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। তবে বেশির ভাগ আমই

টকজাতীয়। আজকাল ল্যাংড়া, ফজলি, তোতাপুলি প্রভৃতি ভালো জাতের আমের চাষও হইতেছে। তবে হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া মালদহ প্রভৃতি জেলার নানা স্থানে যেমন প্রথম শ্রেণীর আম উৎপন্ন হয়, এদেশে সে ধরণের আমের চাষ নাই বলিলেই চলে। আম ছাড়া দুই জাতির জাম, কাঁঠাল, আমড়া, লিচু, আতা, আমলকী, করমচা, মাদার বা ডেঁপল, তেঁতুল, চালতা, শিল আমড়া, কামরাঙা, নানা জাতির পেয়ারা, জামরুল, গোলাপজাম, পেঁপে, কয়েক প্রকারের কলা, যেমন কাঁঠালে, মর্তমান, বিচে, কাঁচা ও কাবুলীকলা, কোথাও কোথাও লালকলা ও চাঁপাকলাও উৎপন্ন হয়। সর্বত্র তাল, খেজুর, কোন কোন স্থানে নারিকেল এবং দেশি ও সিঙ্গাপুরী আনারসও হইয়া থাকে। ঋতুকালীন ফলগুলি চৈতা, বর্ষালি ও শীতের শশা, শাঁকালু, কাঁকুড়, নদীতীরে কোথাও কোথাও তরমুজ, আদা ও সামান্য চীনা বাদামের চাষও হয়। পাণিফলই একমাত্র জলজ ফল। এখানে ইহার দুইটি জাতি—ছোট ও বড়। সর্বত্র কয়েক জাতের আখের চাষ হয়। ইহাদের মধ্যে 'রামশাড়া' ও 'শ্যামশাড়া' আখই উৎকৃষ্ট জাতীয়।

ফল

ঠিক চাষ বলিতে যাহা বোঝায় এদেশে ফুলের চাষ সেইরূপ হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফুলগাছগুলি দেবপূজা ও সৌখীন ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিবিশেষকর্তৃক লাগানো হইলেও কোন কোন স্থানে ব্যবসায়ের জন্যও ফুল চাষ হয়। এদেশে নানা কাজে ব্যবহৃত ফুলগুলির নাম: চাঁপা, নাগকেশর, সাদা ও লাল বক বা বাক্‌সনা, অশোক; সাদা, ফ্যাকাসে ও লাল জবার ছোট, বড় ও মাঝারি ভেদে তিন শ্রেণী; স্থলপদ্মের গোলাপী ও সাদা জাতি, তিন রকমের টগর, ঝুমকো ও কাঁটা জবা, সাদা, লাল ও হলদে কলকে, সাদা ও লাল গুলঞ্চ, কামিনী, মোহনচূড়া, লাল ও হলদে কৃষ্ণচূড়া, বড় ও ছোট গন্ধরাজ, সাদা, নীল ও হলদে ঝাঁটি, সাদা ও লাল করবীর বড় ও ছোট শ্রেণী, দুই জাতির রজনীগন্ধা, নানা জাতির গোলাপ, মল্লিকা, যুঁই, জাতি, কুন্দ, শিউলি, সাদা, নীল ও বেগুনি অপরাজিতার ছোট বড় ভেদ, সাদা ও লাল সাম্‌সোহাগী, মালতী, মধুমালতী, তালফুল (সাদা, সন্ধ্যায় ফুটে), নানা রঙের সন্ধ্যামণি, সাদা ও লাল সূর্যমণি, গাঁদা ও দোপাটি প্রভৃতি সাময়িক পুষ্প। কুড়চি ও কাঠমল্লিকা বনফুল। ইহারা বর্ষায় ফুটে, সাদা, লাল ও ফ্যাকাসে লাল জলপদ্ম, সাদা, লাল, ফ্যাকাসে লাল ও নীল শালুক এবং পানশিউলি জলে জন্মে। কামিনী ও কেয়াফুল বর্ষায় ফুটে।

ফুলের চাষ

কৃষিজাত দ্রব্যগুলি সাধারণত গ্রামের হাটগুলিতে বিক্রয়ের জন্য কৃষকেরা

আনিয়া থাকেন। গ্রামের অধিবাসিগণ উহার খুচরা ক্রেতা। কিন্তু বিক্রেতারা অনেক সময় পাইকার বা পাঁজারীদের একসঙ্গে সব মাল বিক্রয় করায় খুচরা ক্রেতাসাধারণের খুবই অসুবিধা হয়। সম্প্রতি পাইকার বা পাঁজারীদের দৌরাত্ম্য কিছুটা কম হইলেও তা খুবই সামান্য। পূর্বে হাটের মালিকগণ নগদ পয়সা বা দ্রব্যে যে কর বিক্রেতাদের কাছ হইতে আদায় করিতেন, তাহার নাম 'তোলা'। এখনও বেশ কিছু হাটে এই 'তোলা' আদায় হইয়া থাকে। সেকালের হাটের প্রতিষ্ঠাতা কোন জমিদার বা রাজা প্রথম প্রথম হাটের অবিক্রীত মালগুলি ক্রয় করিয়া লইয়া অথবা ব্রাহ্মণাদি ক্রেতাগণকে প্রতি হাটবারে মর্যাদার অনুরূপ অর্থদান করিয়া হাট চলিবার ব্যবস্থা করিতেন। চেতুয়া-বাসুদেবপুর হাটের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত রায় প্রতি হাটবারে পুরোহিত দ্বারা পয়সা উৎসর্গ করাইয়া গ্রামবাসিগণকে দান করিতেন।

কৃষিজ পণ্যের হাট

এই মহকুমার তিনটি থানায় অনেকগুলি হাট আছে। তাহারা সপ্তাহে এক, দুই বা তিন-চারদিন বসিয়া থাকে। নিম্নে তাহাদের একটি সমীক্ষা প্রদত্ত হইল :

চন্দ্রকোণা থানা :

রামজীবনপুর : দৈনিক
রামজীবনপুর পুরাতন হাট : শনি ও মঙ্গলবার
লাহিড়ীগঞ্জ : বুধবার
কৃষ্ণপুর : বুধবার
ঠাকুরবাটী : দৈনিক
সুরার হাট : সোম ও বৃহস্পতি ছাড়া সব দিন
রামগঞ্জ : সোম
জয়ন্তীপুর : বৃহস্পতি
জাড়া : দৈনিক
ক্ষীরপাই : সোম, বৃহস্পতি ও শনি
ঝাকরা : মঙ্গল ও শনি
মনোহরপুর : সোম ও শুক্র
মহেশপুর : মঙ্গল ও শুক্র
নেকরবাগ : শনি ও রবি
নিচ্‌না : মঙ্গল ও শুক্র
ডিঙ্গাল : রবি ও বুধ

ঘাটাল থানা :

সুলতানপুর : মঙ্গল ও শনি
খাসবাড় : রবি ও বুধ
ইড়পালা : সোম, বুধ ও শুক্র
মহারাজপুর : রবি ও বুধ
বেঙরাল-মুগুরাল : রবি ও বৃহস্পতি
গোপমহল ওরফে মনোহরপুর : প্রত্যহ

বনহরিসিংহপুর : সোম ও বৃহস্পতি
বৃন্দাবনচক : সোম ও বৃহস্পতি
ইয়াকুবপুর : সোম ও বুধ
ঘোলশাহী : মঙ্গল ও শনি
খড়ার : বুধ ও রবি
নিশ্চিন্তপুর : বুধ ও রবি
কাজির হাট : রবি ও বৃহস্পতি
ঘাটাল : দৈনিক বাজার

দাসপুর থানা :

খুকুড়দহ : সোম ও শুক্র
সোনাখালি : বৃহস্পতি ও রবি
রাণীচক : দৈনিক
কামালপুর : সোম ও শুক্র
চাঁইপাট : মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও শনি
আজুড়িয়া : সোম ও শুক্র
গোপীগঞ্জ : সোম ও বৃহস্পতি
গোপীগঞ্জবাজার : দৈনিক
দুধকামরা : রবি ও বুধ
জোতঘনশ্যাম : মঙ্গল ও শুক্র
লঙ্কাগড় : বুধ ও রবি
রাজনগর : সোম ও শুক্র
হরিরামপুর বাবুরহাট : মঙ্গল ও শনি
সররেড়িয়া : বৃহস্পতি ও রবি
কাকদাঁড়ি : সোম ও শুক্র
চেঁচুয়া : মঙ্গল ও শনি
জয়কৃষ্ণপুর : সোম ও শুক্র
বাসুদেবপুর : বুধ ও শনি, (শনিবারের হাট তেমন বসে না)
কল্মিজোড় : বৃহস্পতি ও রবি
রাধাকান্তপুর : সোম ও শুক্র
দাসপুর : সোম ও শুক্র, বর্তমানে দৈনিক বাজার
সাগরপুর : মঙ্গল ও শনি
বলিহারপুর : রবি ও বৃহস্পতি
মাহুয়া : রবি ও বৃহস্পতি
বাগানের হাট : এখন বসে না
কলাইকুণ্ডু : বুধ ও শনি
দাদপুর : রবি ও বৃহস্পতি
রামদাসপুর : রবি ও বুধ
নিজনাড়াজোল : দৈনিক বাজার
খাড় রাধাকৃষ্ণপুর : বুধ ও শনি
গৌরা : রবি ও বুধ, দৈনিকও বসে
সোনামুই : সোম ও বৃহস্পতি
পার্বতীপুর : সোম ও বৃহস্পতি
কৃষ্ণনগর : সোম ও শুক্র
শ্রীপুর : মঙ্গল ও শুক্র
নবীনমাহুয়া : রবি ও বৃহস্পতি
পলাশপাই : বুধ
পাঁচগেছিয়া : রবি ও বুধ
ভূতা : বুধ ও শুক্র
জোতকানুরামগড় : মঙ্গল, বুধ ও শনি
উদয়চক : সোম ও শুক্র
নৈহাটি : মঙ্গল ও শুক্র
উত্তরবাড় : বৃহস্পতি ও রবি
দক্ষিণবাড় : রবি ও মঙ্গল
আদমপুর : সোম ও মঙ্গল

কল্মিজোড়ে আগে দৈনিক বাজার বসিত। নিমতলা ও রসিকগঞ্জে দৈনিক বাজার বসে। শ্যামগঞ্জের হাট উঠিয়া গিয়াছে। সোনামুই, গৌরা ও গঙ্গামাড়োতলা ও টালিভাটার হাট নূতন। গৌরায় উহা দৈনিক বসে। দুধকামরা, আড্ডা ও লঙ্কাগড়ের হাট খুব পুরাতন নহে, কিন্তু ইহারা দাসপুর থানার বৃহত্তম পাইকারি হাট। দুধকামরা হইতে কলিকাতায় ও লঙ্কাগড় হইতে মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচুর আনাজ প্রভৃতি চালান যায়। দাসপুর থানার হাটের সংখ্যাধিক্য হইতে এ অঞ্চলে উৎপন্ন আনাজ প্রভৃতির পরিমাণ অনুমান করা যায়।

এই মহকুমার বহু কৃষক কলিকাতার উপকণ্ঠে চাষ করেন ও কলিকাতার প্রায় সকল বাজারেই সব্‌জী প্রভৃতি বিক্রয় করেন। দাসপুর থানার ৬নং ইউনিয়নের অনেকে বাগ্‌বাজারে খড়ের কারবার করেন। প্রধানত দাসপুর থানার বহু কৃষক কলিকাতার ধাপা প্রভৃতি স্থানে ও উপকণ্ঠে চাষ-আবাদ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্য কলিকাতার বাজারে দৈনিক বিক্রয় করেন। এই থানার কেলেগোদা নিবাসী রাধানাথ মাইতি হগ্‌মার্কেটে কপি ব্যয়সায় করিয়া 'Cabbage King' নামে পরিচিত ছিলেন। কলিকাতা লেকের কাছে তিনি দেড়শত বিঘা জমি চাষ করিতেন। তিনি পত্নী রাইমণির নামে সোনাখালিতে আরোগ্যশালা ও গোপীগঞ্জ পর্যন্ত রাইমণি রোড্ নামে পথ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। জোতঘনশ্যামের নীলমণি হুদাই কলিকাতায় সব্‌জী ব্যবসায়ে খ্যাত ছিলেন। রামপুরের মণ্ডলবংশের বরানগর অঞ্চলে বহু চাষের জমি আছে। এই মহকুমার প্রসিদ্ধ ধান্য-উৎপাদনকারী ছিলেন চন্দ্রকোণা তাতারপুরের হরিদাস মণ্ডল। হাসপাতাল ও দেবকীর্তিতে তাঁহার দান আছে। দাসপুর থানার ৩নং ইউনিয়নের নারায়ণচন্দ্র পাল প্রথম জীবনে সামান্য দিন-মজুরীতে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। পরে তিনি একজন বিশিষ্ট কৃষিজদ্রব্য-উৎপাদনকারীরূপে খ্যাত হন। বর্তমানে সকল শ্রেণীর লোকই অল্প-বিস্তর কৃষিকর্ম করিয়া থাকেন।

কলিকাতায় এই মহকুমার সব্‌জি-ব্যবসায়ী

শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য

কৃষিপ্রধান এই মহকুমায় এখন শিল্পের অগ্রগতি অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে। সেকালের ন্যায় একালে তাঁত ও রেশমের কাপড়, কাঁসার ও পেতলের বাসন, মস্‌লিন প্রভৃতি আর তেমন উৎপন্ন হয় না। আগে এইসব

শিল্পজাত দ্রব্যের বাইরে খুব চাহিদা ছিল। তাহার ফলে আর্মেণীয়, ডাচ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশীয়রা নানাস্থানে তাঁহাদের কুঠি নির্মাণ করিয়া এই শিল্পগুলির একচেটিয়া পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। অপরপক্ষে, স্থানীয় বহু কারিগর ও ব্যবসায়ী এইসব শিল্প আশ্রয় করিয়া ধনবান্ হইয়া উঠিতেন। এই মহকুমার সেকালের এই শিল্পগুলি সম্পর্কে তাই কিছু আলোচনা প্রয়োজন। মূলত এইগুলি ছিল কুটীর শিল্প এবং গ্রামে গ্রামে এই কুটীর শিল্পগুলির অভ্যুদয়ের ফলে শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থাও উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতোর, মালাকার, কাঁসারি, শাঁখারি, সোনার গহনার কারিগর, চামার প্রভৃতি শিল্পিসম্প্রদায় ঘরে ঘরে কুটির শিল্পজাত নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া খোলা বাজার বা হাটে এবং বাইরে নানা স্থানে চালান দিতেন। অবশ্য সেই সময় বড় বড় ব্যবসায়ীও এইসব শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিয়া খুব ধনী হইয়া উঠিতেন। চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, খাসবাড়, খড়ার, ঘাটাল, রাধানগর, ক্ষীরপাই, নিমতলা, দাসপুর প্রভৃতি স্থান সেকালে খুবই শিল্পসমৃদ্ধ ছিল এবং এইসব স্থানে তাঁত ও রেশম বস্ত্রের ফলাও কারবার ছিল। বণিক-সম্প্রদায় এইসব কারবার করিয়া বড়লোক হইতেন। তাঁহাদের সেই সমৃদ্ধির চিহ্ন আজও এইসব স্থানে লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রকোণার সে সময়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী গুরুদাস দত্তের বস্ত্রব্যবসায় খুবই সমৃদ্ধ ছিল। শোনা যায়, তাঁহার কারখানা হইতে রোজ দুহাজার জোড়া কাপড় নামিত। চন্দ্রকোণার উৎকৃষ্ট বস্ত্র ছাড়াও 'মট্‌কী ঘি', চিনি প্রভৃতির কারবার খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার তাঁতে তৈরি সুতা এতই সূক্ষ্ম ছিল যে, সেযুগেও এক টাকায় আড়াই তোলা সুতা বাজারে বিক্রয় হইত। সতের শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে আঠার শতকের শেষ পর্যন্ত এইসব কারবারের দ্বারা চন্দ্রকোণা খুবই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

সেকালের কুটীরশিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

শিল্পসমৃদ্ধ চন্দ্রকোণা

'বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি'র শহর এই চন্দ্রকোণা। উল্লিখিত তিনটি দ্রব্যের ব্যবসায়ে এখানকার বণিকসম্প্রদায় দেশ-বিদেশে প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ অর্জন করিয়াছিলেন। এই সহরের মৎস্য-জীবিগণ কলিকাতার জেলিয়া পাড়া, বাঁকুড়া ও চব্বিশ পরগণার 'চন্দ্রকোণা'য় উঠিয়া গিয়াছেন। শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ এই শহর চন্দ্রকোণায় লোকসংখ্যাও প্রচুর ছিল। ইং ১৮৭২ সাল হইতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই একশ বছরের মধ্যে চন্দ্রকোণার লোকসংখ্যার

চন্দ্রকোণার গত একশ বছরের লোকসংখ্যা

একটি পরিসংখ্যান হইতে জানা যাইবে ১৮৭২ সালের লোকসংখ্যার অনুপাতে পরবর্তী আশি বছরের মধ্যে লোকসংখ্যার কিভাবে ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে। শিল্পের অবনতির ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা-বিপর্যয় এবং অনুষঙ্গ হিসাবে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রকোপে এই স্থানে লোকবসতি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল।

সাল	জনসংখ্যা	সাল	জনসংখ্যা
১৮৭২	২১৩১১	১৯৩১	৬০১৬
১৮৮১	১২২৫৭	১৯৪১	৬৪১১
১৮৯১	১১৩০৯	১৯৫১	৫৭১৭
১৯০১	৯৩০৯	১৯৬১	৭৩৮৩
১৯১১	৮১২১	১৯৭১	৯৮১১
১৯২১	৬৪৭০		

বর্তমানে চন্দ্রকোণার লোকবসতি ও জনসংখ্যা আবার বাড়িতেছে এবং নূতন শিল্পসম্ভাবনায় এই স্থান আবার সমৃদ্ধিশালী হইতেছে।

চন্দ্রকোণার নিকটবর্তী ক্ষীরপাই ও তৎপার্শ্ববর্তী রাধানগর (ঘাটাল থানা) সেকালে সুতি ও রেশম বস্ত্রের কারবারের উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি ছিল। ক্ষীরপাই ছিল তখন হুগলি জেলার একটি মহকুমা সহর। হালদারগণ এই স্থানের সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। ইংরেজ ও ফরাসীরা এইখানে কুঠি তৈরি করিয়া সুতি ও রেশম বস্ত্রের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন। এই স্থানের 'ফরাসডাঙ্গা' নামক পল্লীটি ফরাসীদের সহিত এখানের সম্বন্ধ এখনও ঘোষণা করিতেছে। ডাচেরা এখান হইতে কাপড় কিনিতেন। প্রতিদিন ছয়টি মুটের মাথায় এখানকার কাপড় উড়িষ্যার কটক শহরের চাঁদনীচক বাজারে চালান যাইত। চাল-ডালের ঢালাও ব্যবসায় এখানে ছিল। 'চাউল-কাঁটা' নামক স্থানটি তাহার পরিচায়ক। এক অথবা দুজন রেসিডেন্ট্ সাহেব এখানের কুঠিতে থাকিতেন। এড্ওয়ার্ড বাবর ঐরূপ একজন রেসিডেন্ট ছিলেন। বর্গীর আক্রমণের সময় তিনি এখানের অধিবাসীদের রক্ষা করেন। বর্গীরা শ্যামদেব নামক পুকুরের পাড়ে ও নিকটবর্তী একস্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। বাবর

ক্ষীরপাইয়ের প্রাচীন সুতি ও রেশম শিল্প

সাহেবের নামে ক্ষীরপাইয়ের এক প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন 'বাবরশা'র উদ্ভব হয়। পরাণ আটা নামক জনৈক ময়রা ইহার উদ্ভাবক। এই মিষ্টান্নটি পাশাপাশি অনেক স্থানে এবং দূরবর্তী স্থানেও বিশেষ

'বাবরশা' মিষ্টান্ন

জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা বর্তমানে ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, খড়ার, ঘাটাল প্রভৃতি স্থানে এবং ঝাড়গ্রাম মহকুমার লালগড়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাশীগঞ্জের নিকট বেড়াবেড়িতে কুঠিয়াল ও অন্যান্য সাহেবদের অনেকগুলি সমাধি এখনও আছে। কাশীগঞ্জে নীল ও রেশম কুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এখানে পূর্বে কয়েকটি রেশম ও নীলকুঠি ছিল। কাশীগঞ্জের ফাদার ষ্টিফেন কুঠিয়ালদের অত্যাচার দূর করেন। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকর্তৃক তাঁতশিল্পের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে এই শিল্পের বিশেষ প্রসার ও উন্নতি হয়, কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি কারখানা উঠিয়া যাইলে এবং বিলাতী কলে তৈয়ারি কাপড়ের আমদানী হইলে এই শিল্পের অবনতি হইতে থাকে।

ক্ষীরপাইয়ের মতো রাধানগরও বস্ত্র-ব্যবসায়ের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানকার বস্ত্র ও রেশম শিল্প বেশ প্রাচীন ছিল মনে হয়। এই অঞ্চলে ইংরেজ ও ফরাসীদের আসার আগে সম্ভবত আর্মেণীয়গণ ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে বসবাস করিতেন। এইস্থানে জনৈক আর্মেণীয়ের দুটি সমাধি ফলক পাওয়া গিয়াছে। সমাধি-ফলক দুটি আর্মাণী লিপিতে ক্ষোদিত। তাহাদের একটি লিপির ইংরাজি অনুবাদ 'পুরাকীর্তি' পরিচ্ছেদে দেওয়া হইবে। শোনা যায়, বাদশাহ ঔরঙ্গজেব রাধানগর হইতে তাঁহার 'হারেমে'র জন্য রেশম ও মস্লিনের রুমাল সংগ্রহ করিতেন। এখানে একটি প্রাচীন কুঠির ধ্বংসাবশেষ আছে।

রাধানগরের বস্ত্র ও রেশম শিল্প

রামজীবনপুরও সেকালে কাপড়ের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। সে সময় এখানকার তৈরি কাপড়ে প্রধানত হাওড়ার হাট চলিত। তামা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতু ঢালাইয়ের কাজও এখানে হইত। চাল, গম, ভুট্টা ও আখের ব্যবসায়ও ছিল।

প্রাচীন ব্যবসায়কেন্দ্র চন্দ্রকোণা, কাশীগঞ্জ ও রাধানগরের পতন হইবার পর মহকুমার প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র ঘাটাল গড়িয়া উঠে। পরে দুধকামরা দ্বিতীয় ব্যবসায়কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। কাশীগঞ্জের ব্যবসায়কেন্দ্র ঘাটালে স্থানান্তরিত হয়। ইংরেজ ও ডাচদিগের বাণিজ্য কুঠি এখানে ছিল। তিনজন রেসিডেন্টও এখানে ছিলেন। ডাচ্দিগের কুঠিতে কাছারী ও ইংরেজদের কুঠিতে বাজার হইয়াছে। সেকালের রেশমের বিস্তৃত ব্যবসায়ও এখন লুপ্ত। কাপড়, হাঁড়ি ও ধাতু ঢালাইয়ের ব্যবসায় এখনও চালু আছে। প্রস্তুতকারকগণের অধিকাংশই সহরের বাইরে থাকেন।

শিল্পে ঘাটালের অভ্যুদয়

দুধ ও দইয়ের ব্যবসায়ও এখানে বেশ ছিল। এখন আরও নানাপ্রকার বস্তুর ব্যবসায় চলিতেছে। শিলাইনদীপথে এবং ঘাটাল-পাঁশকুড়া রোড্ দিয়া মাল যাতায়াত করে। বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও মাল আমদানী হয়।

শিলাই নদীর দুই কূলে অবস্থিত ঘাটাল এককালে ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। শিলাই এই শহর হইতে প্রায় ছয় মাইল পূর্বদক্ষিণে রূপনারায়ণের সহিত মিলিত হইয়াছে। ১৯১১ সালে প্রকাশিত ও'ম্যালীর 'মেদিনীপুর জেলা গেজেটিয়ারে' ঘাটালকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানকার প্রধান শিল্প সুতি ও তসর সিল্কবস্ত্র, পিতলের ও কাঁসার বাসনপত্র এবং মাটির হাঁড়িকুড়ি। এখানকার মাটির বাসন-কোসন ও হাঁড়ি এত মজবুত ও সুন্দর ছিল যে কলিকাতাতেও তাহা চালান যাইত— "The earthen pots of Ghatal are highly esteemed on account of their being able to stand the heat of the fire without injury and are largely exported to Calcutta. Recently the manufacture of bell metal utensils chiefly badnās (water vessels), has been started." (District Gazetteer, Midnapore : O'Malley, 1911, pp 180—181)

ঘাটাল থানার অন্তর্গত খড়ার ও খাঞ্জা-মনোহরপুরে সুন্দর সুন্দর পিতল-কাঁসার বাসন তৈয়ারি হয় এবং সেগুলি অনেক সময় ঘাটালে চালান আসে। ঐ সকল পিতল-কাঁসার বাসনপত্র প্রথমে ঘাটালের পাইকারী বিক্রেতাদের হাতে জমা হইয়া পরে নদী বা স্থলপথে বিদেশে চালান হইয়া থাকে। পূর্বে তাঁতের ও রেশমের উৎকৃষ্ট কাপড় তৈয়ারি হইত শহরের কিছু দক্ষিণে শিলাই-তীরবর্তী নিমতলা গ্রামে। আগে এখানে একটি রেশম কুঠিও ছিল। কুঠির ভগ্নাবশেষ ও চিম্নি এবং কুঠিপুকুর এখনও বিদ্যমান। অবশ্য, বর্তমানে নিমতলায় কিছু পরিমাণে উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড় তৈয়ারি হইতেছে। ইংরেজ আমলে ঘাটাল বাজারে রেশমের কাপড় তৈয়ারি হইত। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর ঘাটালে রেশমের কাপড় তৈয়ারি বন্ধ হয়। ঘাটালের দুগ্ধজাতীয় খাদ্যের যথেষ্ট সুনাম আছে। এখানকার ছানা, মাখন, দই, রসগোল্লা, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্নের বাইরে খুব চাহিদা আছে। তরি-তরকারি ও নানা শাক-সব্জিও এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে চালান হইয়া থাকে।

খড়ার বাসনশিল্পের জন্য সেকালে একটি বিখ্যাত গঞ্জ ছিল। কার্মিংসাহেবের রিপোর্টে জানা যায় যে, সারা বাংলার মধ্যে যে সকল স্থানে কাঁসা-পিতলের

বাসন প্রস্তুত হয় তার মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় এই ব্যবসায়টি বেশ শৃঙ্খলা ও সুপ্রণালীর সঙ্গে পরিচালিত হয়। এইস্থানের ব্যবসায়িগণ বিশেষ সঙ্গতিপন্ন। তাঁহারা স্ট্রেট্‌স সেটেলমেণ্ট, জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে টিন, তামা ইত্যাদি ধাতু সম্ভবমত সুলভ দরে প্রচুর পরিমাণে কিনিয়া এই ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান্ হন। বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে তাঁহারা এই ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া থাকেন। এক একজন ব্যবসায়ীর কারখানায় শতাধিক লোক কাজ করিয়া থাকে। খড়ারের বর্তমান লোকসংখ্যা (১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুসারে) ৭২৬২। তাহার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি লোক এই ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। কামিংসাহেব লিখিয়াছেন যে, খড়ার কাঁসার থালা ও ঘাটাল গাড়ুর জন্য বিখ্যাত। খড়ারে সেকালে রোজ একশতেরও অধিক মণ থালা প্রস্তুত হইত। এখানে সেই সময়ের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর নাম, তাঁহাদের কারখানার স্থান ও দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

খড়ারের বাসনশিল্প

নাম	কারখানার স্থান	দৈনিক উৎপাদন ও চালান
ব্রজ মাঝি	খড়ার রাণীর বাজার	১৫—১৬ মণ
ঈশান কবিরাজ	খড়ার	১২—১৪ মণ
রামলাল চক্রবর্তী	খড়ার, দলপতিপুর শ্যামসুন্দরপুর, সুলতানপুর	১২—১৪ মণ
রমানাথ ঘোষ	খড়ার	৮—১০ মণ
হৃদয় কমিলা	খড়ার	৮—১০ মণ
হরি বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১০—১২ মণ
নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
প্রিয়নাথ ভাণ্ডারী	ঐ	৪—৫ মণ
কালী বর্ধন	উদয়গঞ্জ	ঐ
সূর্য হাতি	খড়ার	২—৩ মণ
পাঁচকড়ি পান	ঐ	ঐ

ইহাদের অনেকেরই এখন ব্যবসায় নাই। কলিকাতা কাঁসারীপটির অমৃতলাল কুণ্ডু, সাহেবরাম কুণ্ডু, তারকনাথ প্রামাণিক, হীরালাল দাস প্রভৃতি মহাজনগণ রাং ও তামা সরবরাহ করিয়া ও মণ প্রতি ১৫ টাকা হইতে ৩০ টাকা হারে বাণী দিয়া মাল লইতেন। নিম্নে মালপ্রস্তুতকারক মজুরদের উপাধি,

কাজ, দৈনিক মজুরী এবং জনপ্রতি দাদনের সেকালের এক পরিসংখ্যান দেওয়া হইল।

উপাধি	কাজ	রোজ মজুরী	জনপ্রতি দাদন
আউট্‌দার	গালাই	১০—১২ আনা	২০০৲—২৫০৲
গড়নদার	গঠন	৩৫ সের মাল গড়িলে ২॥০	১০০০৲—১৫০০৲
পিটাইদার (মাঝের, পাশের, ভেতার)	পিটানো	৭টি পর্যন্ত থালা ৸৵—১৲	৫০০৲—৬০০৲
মাঠিয়ে	আকার ঠিক করা	১।০	১৫০৲—২০০৲
চাঁচিয়ে	চাঁচিয়া কুঁদে চড়ানোর যোগ্য করা	সের করা চার পয়সা হইতে ছয় পয়সা	৩০০৲—৪০০৲
কুঁদিয়ে	কুঁদে বাসন সাফ	সাড়ে বারো সেরে দশ আনা	৫০৲—৬০৲
মাঝিয়ে	বাসন পালিশ করা	একজন সাড়ে বারো সেরে ছয় আনা	দাদন নাই
ঝালিয়ে	ঝাল দেওয়া	শতকরা ৬।০	দাদন নাই
ব্যাপারী বা বোঝাইদার	গোরুর গাড়িতে ঘাটালে পৌঁছান	মণপ্রতি চার আনা	দাদন নাই

বাসনগড়নের জন্য যন্ত্রগুলির নাম : (১) লেই বা লেহাই (২) সাঁড়াশি (৩) কাঁসারিগুত্তো (৪) হাতুড়ি (৫) পাড়ন (৬) যাঁতা (৭) খেড়ে বা খোড়া (৮) আছু। বর্তমানে মেশিনেই বেশি কাজ হয়। সেকালে খড়ারে পিতলের বড় জালা হইত।

রপ্তানী মালের উপর মণ করা চার আনা বৃত্তি নির্ধারিত ছিল। ঐ অর্থে প্রায় ত্রিশ হাত উচ্চ কালীমূর্তি, অন্যান্য পৌরাণিক দেবতা এবং সামাজিক ঘটনার পুত্তলিকা তৈয়ারি হইত।

দাসপুর-অঞ্চলের কয়েকটি শিল্প

দাসপুর থানার রাজনগর, ফকিরবাজার, সাহাবাজার, সামাট, গোকুলনগর, নাড়াজোল প্রভৃতি স্থানে দেড়শ ঘর তাঁতির বাস ছিল। এখনও কোন কোন স্থানে ২০০ বা তদূর্ধ্ব নম্বর সুতায় বা রেশমে উত্তম নক্‌শার ধুতি ও শাড়ী বোনা হয়। দক্ষ কারিগরগণ : রাখালচন্দ্র প্রামাণিক, যোগেন্দ্র চন্দ্র পণ্ডিত, ভূতনাথ দোগড়ি, শরৎ পাল, সতীশ কোলে, গৌরহরি প্রামাণিক প্রভৃতি। তন্তুবায়গণের মাধ্যমে বোম্বাই ও কলিকাতায় ইঁহাদের বস্ত্র চালান যাইত। Midnapur Trade

Export সম্বন্ধে Rev. J. Long-এর Selections from Unpublished Records of Government (1869) ২৬, সেপ্টেম্বর ১৭৬৬ এর একটি তালিকায় কুড়ি হইতে পঞ্চাশ হাত লম্বা ও প্রায় দুই হাত বহরের বিভিন্ন শ্রেণীর ৯২২০ খণ্ড বস্ত্রের উল্লেখ আছে। ঐগুলি সবই তাঁতে তৈয়ারি। দাসপুর থানার আজুড়্যা, সোনাখালি, ক্ষেপুত, শ্রীবরা, ধানখাল, দাদপুর, মাছগেড়্যা, সেকেন্দারী, জালালপুর, নাড়াজোল, গৌরা, খুকুড়দহ, রাণীচক, খাঞ্জাপুর, সাগরপুর, কুঞ্জপুর, দাসপুর, বৈকুণ্ঠপুর, দুবরাজপুর, কামালপুর, জোতকেশব প্রভৃতি স্থানের কামারেরা লোহা, তামা, পিতল ও কাঁসার কাজ করিয়া থাকেন। ইঁহারা থালা, ঘটি, গাড়ু, বদনা, জগ, ডাবর, গ্লাস, পিলসুজ, হাঁড়ি, ভৃঙ্গার এবং চাহিদামত অন্যান্য বাসন, পিতলের ছোট কামান ও দেবমূর্তি প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে পারেন। আজুড়্যার পিতলের তিজল হাঁড়ি বিখ্যাত। সেকালে এখানে কামান, বন্দুক, তলোয়ার ও মুদ্রা প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। কর্মকারগোষ্ঠীর আর এক দল কোদাল, কুড়াল, শাবল, কাটারি, বঁটি, কাস্তে, কাতান, ক্ষুর, কাঁচি, সুচ, তালা, চাবি ও লোহার অন্যান্য ছোটবড়ো জিনিষ তৈয়ারি করেন। আজুড়্যার ঢালাই কাজ এবং সাগরপুরের ক্ষুর, কাঁচি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এই স্থানের কাঁসা-পিতল শিল্প প্রায় দু'শ বছরের পুরানো। দক্ষ শিল্পী ছিলেন নারায়ণচন্দ্র রায় ও হরি রায়। মহাদেব দাসের পিতাও খুব দক্ষ শিল্পী ছিলেন। লক্ষ্মণ দাস ও বিপিন প্রামাণিক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। পূর্বে এই স্থানের কর্মকারপল্লীর মধ্যস্থিত পুকুরের চারি পাড়ে চারিটি কালীপূজা হইত। দুবরাজপুরের শ্রীতারাপদ কর্মকার এখনও পিতল, ভরণ ও জার্মাণ সিলভারের কাজ করিয়া থাকেন এবং অন্যান্য কয়েকজন কামার লোহার কাজ করেন।

কামার ও তাঁহাদের প্রস্তুত দ্রব্য

দাসপুর থানার আজুড়্যা, কুলটিকরি, দুধকামরা, সামাটবেড়িয়া, কল্মিজোড়, বেলচা, সুজানগর, কলাইকুণ্ডু প্রভৃতি স্থানে কুমোরদের বাস। তাঁহারা চাক ও হাত পিট্‌নার সাহায্যে নানা রকমের হাঁড়ি, নাদা, ডাবা, জালা, ম্যাচ্‌লা, সরা, মালসা, গেলাস, খুরি, কল্‌কে, প্রদীপ, দেরখো, ধুনাচুর, ভাঁড়, টাঁঠি, দোয়াত, পেটোভাঁড়, ঘোড়া, হাতি, নল প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। প্রধানত নদীতীরবর্তী অঞ্চলেই ইঁহাদের বাস। হাঁড়িতে রং করিবার জন্য এলামাটীর প্রয়োজন। উহার খনি চন্দ্রকোণার নিকটে আছে। ডালিমা বাড়ীর মতি কুশারী ও প্যাঁকালে হরিসিংপুরের কৃত্তিবাস বেরা এলামাটির ব্যবসায়ী ছিলেন। কুমোরদের প্রধান যন্ত্র চাক।

মৃৎশিল্প

ইহা কাঠ বা বাখারির দ্বারা চক্রাকারে প্রস্তুত করিয়া পরে তাহার উপরে মাটি ধরানো হয়। 'বল্যে' নামক একটি প্রস্তরখণ্ড ঐ কাঁচা হাঁড়ির ভিতর দিয়া পিটনার দ্বারা পিটিয়া হাঁড়ি চৌরস করা হয়। পরে ঐ হাঁড়ি এবং অন্যান্য কাঁচা মাটির বাসন 'পুয়ান' নামক উনানে এক থাক পুরানো মাটির কলসীর উপর সাজাইয়া সকলের উপর খড় ও মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। পাতার জ্বালে পোড়াইয়া ঐ সকল জিনিষকে কঠিন ও লাল করা হয়।

দাসপুর, কল্‌মিজোড়, গৌরা প্রভৃতি স্থানে পূর্বে দেড়শয়েরও বেশি ছুতারের বাস ছিল। তাঁহারা দেবমূর্তি-নির্মাণ, মন্দির ও প্রাসাদ-গঠন, কাঠের কাজ এবং চিত্রাঙ্কনে নিপুণ ছিলেন। বর্তমানে দাসপুর, কল্‌মিজোড়, জোতঘনশ্যাম ও আজুড়িয়ায় কয়েক ঘর মাত্র ছুতার বাস করেন। পূর্বে এই ছুতারদের পূর্বপুরুষেরা মন্দির নির্মাণে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। বর্তমানে ছুতারদের সেই পূর্ব কারুকলার উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

দাসপুর থানার দক্ষিণ-পূর্বাংশ চিরুণি-ব্যবসায়ের ঘাঁটি। ইহার প্রধান কেন্দ্র জোতঘনশ্যাম। এখানে যে সমবায়-সমিতি আছে তাহার এলাকা ১২-নম্বর ইউনিয়নের কুলটকরি, গুমুকপোতা, মাগুরিয়া, ডোঙ্গাভাঙ্গা, নারায়ণচক, সাতপোতা, গৌরীচক। ৫-নং ইউনিয়নের কাশীনাথপুর, সীতাপুর, গুলিচক। ১১-নং ইউনিয়নের গোপীগঞ্জ, ক্ষেপুত, মহিষঘাটা, চাঁইপাট, নিশ্চিন্দীপুর। কোন বিশেষ জাতি এই ব্যবসায় করেন না। দেড়শ বছর আগেও এদেশে এই ব্যবসায়ের অস্তিত্ব ছিল। মাদ্রাজ, বিহার, আসাম ও দার্জিলিঙ্‌ হইতে কলিকাতায় শিঙ্‌ আমদানী হয়। গুণানুসারে ইহার মণ ৩০ টাকা হইতে ৫০ টাকা। এখন দাম আরও বাড়িয়াছে। মহাজনগণ শিঙ্‌ আনিয়া কারিগরদিগকে ধারে দাদন দেন। করিগরগণ চিরুণি প্রস্তুত করিয়া মহাজনদিগকে বিক্রয় করেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই অঞ্চলই একমাত্র চিরুণির এলাকা। আসাম ও উড়িষ্যায় বেশি, অন্যত্র কম চিরুণি রপ্তানী হয়। এখানকার চিরুণিতে যশোরের ছাপ দেওয়া হয়।

জোতঘনশ্যামের চিরুণি-শিল্প

বাইশটি বিভিন্ন যন্ত্রে চিরুণি প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি সরকারি শিক্ষণকেন্দ্রের প্রভাবে নানাপ্রকার সৌখীন জিনিষ ও জীবজন্তুর মূর্তি ইত্যাদি নির্মিত হইতেছে। একমণ শিঙ্‌ হইতে বারো সের চিরুণি হয়। বাকি অংশ সারের জন্য ব্যবহৃত হয়। সকলপ্রকার ফসলে ঐ সার লাগে। শিঙের চিরুণি স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। ডজন ও গ্রোস হিসাবে চিরুণি বিক্রয় হয়। মূল্য বেশ কিছুকাল

আগে বারো আনা হইতে আঠার টাকা ডজন ছিল। এখন সম্ভবত আরও দাম বাড়িয়াছে। প্রত্যেক শিল্পী ১৪ হইতে ১৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করেন। মজুরী পূর্বে সাতসিকা হইতে দু'টাকা ছিল। মাসে গড়ে কুড়ি দিন কাজ হয়। শিক্ষাকেন্দ্রে প্রথম বৎসর বারো জন ও দ্বিতীয় বৎসর পঁচিশজন শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহা এখন উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত।

শিঙজাত দ্রব্য ও চিরুণি-শিল্প

জোতঘনশ্যামের বল্লভচন্দ্র দাস ও সজনী সামন্ত চিরুণি বিশেষজ্ঞ। খেলনা নির্মাণে পারদর্শী গুণধর বেরা, শ্যাম আদক ও মধুদাস। ইং ১৯৫৪ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে সমবায়-সমিতি রেজেস্ট্রী হয়। প্রথম বৎসরের সরকারি সাহায্য ৫০০ টাকা, পরে বর্ধিত হইয়া ১৫০০ টাকা হয়। ১৯৫৭ সালে ইহা ১৫০০০ টাকা হইয়াছিল। প্রস্তুতকারকগণই সমবায়-সমিতির সভ্য থাকেন। ১৯৫৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সমিতির সভ্য সংখ্যা ছিল ১৫৪ জন, মূলধন ২০০০০ টাকার মত।

দাসপুর থানার প্রধান রপ্তানী দ্রব্যগুলি : শাক-সব্‌জি, ফল, ক্ষীর, গুড়, দই, মাখন, মাটির বাসন-হাঁড়িকুড়ি ও চিরুণি প্রভৃতি। অবশ্য মাটির বাসন ও দই, মাখন প্রধানত ঘাটাল হইতেই অন্যত্র চালান যায়। রোজ নানাস্থান হইতে খোয়াক্ষীর আসিয়া গোপীগঞ্জে জমা হয়। রাজনগর, সোনাখালি,

দাসপুর থানায় খোয়া ক্ষীরের ব্যবসায়

সরবেড়িয়া, বলিহারপুর, তিওরবেড়িয়া, আজুড়্যা, যদুপুর, মসরপুর, দুঃশাসপুর, বালিপাতা, জালালপুর, গৌরা, পলসপাই, বেনাই, নিশ্চিন্দীপুর, কাঁটাদরজা এবং ঘাটাল-থানার দিগলগ্রাম এবং চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানের গোয়ালারা খোয়াক্ষীর তৈয়ারি করিয়া চালান দেন। এইসব স্থানের অনেকের কলিকাতায় খোয়াক্ষীরের দোকান আছে। গোছাতির অনুকূল ঘোষ ও অতুলচন্দ্র ঘোষ খোয়াক্ষীর-উৎপাদন ও ব্যবসায় করিতেন। তাঁহাদের কারখানা আজুড়্যা বাংলোর নিকটে। আগে এখান হইতে রোজ প্রায় দেড়মণ দুধের ক্ষীর হইত। মণে দশসের খোয়া হইত। আদমপুর, মাঝের গ্রাম, কুমারচক, বিষ্ণুপুর, ভূতা, চাঁইপাট ও রবিদাসপুরেও খোয়াক্ষীর হয়। পাররাকুসীর ক্ষীরোদপ্রসাদ পাল এইসব ক্ষীরের পাইকারী খরিদ্দার ছিলেন। গোপীগঞ্জ হইতে রাত দশটায় নৌকা ছাড়িয়া তীরের ধার দিয়া চলিত। ক্ষীরের খুচরা সের পূর্বে পাঁচ টাকা ছিল। এখন বেশ দাম বাড়িয়াছে। এই মহকুমার বহু লোক কলিকাতায় ঘি এবং মাখনের ব্যবসায়ও করেন।

কাশীনাথপুর, মুগুরিয়া, মামুদা, সীতাপুর প্রভৃতি গ্রামে তালগুড় ও

পাটালি উৎপন্ন হইয়া প্রধানত আঞ্চলিক চাহিদা পূরণ করে। সদ্গোপপ্রধান নন্দনপুরের বহু পরিবার আবগারী ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া নানা দেশে বাস করেন। পূর্বে এই গ্রামের হরিমণ্ডলের গাঁজার চাষ ছিল। নন্দনপুরে তাঁহার বিরাট অট্টালিকা বিদ্যমান। কলিকাতা চেতলার প্রসিদ্ধ কুঞ্জবিহারী ঘোষ-কোম্পানির মালিকদের বাড়ি এই গ্রামে। তাঁহারা গঙ্গাসাগরের মেলা ইজারা লইতেন। পূর্বে কিশোরপুরে উৎকৃষ্ট মাদুর ও মসলন্দী তৈয়ারি হইত। একটি মসলন্দীর দাম দেড়শত টাকা পর্যন্ত ছিল। তাহার উপর দিয়া সাপও চলিয়া যাইতে পারিত না। এই ব্যবসায়টি লোপ পাওয়ায় 'বাইতি'গণ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

অন্যান্য ব্যবসায়

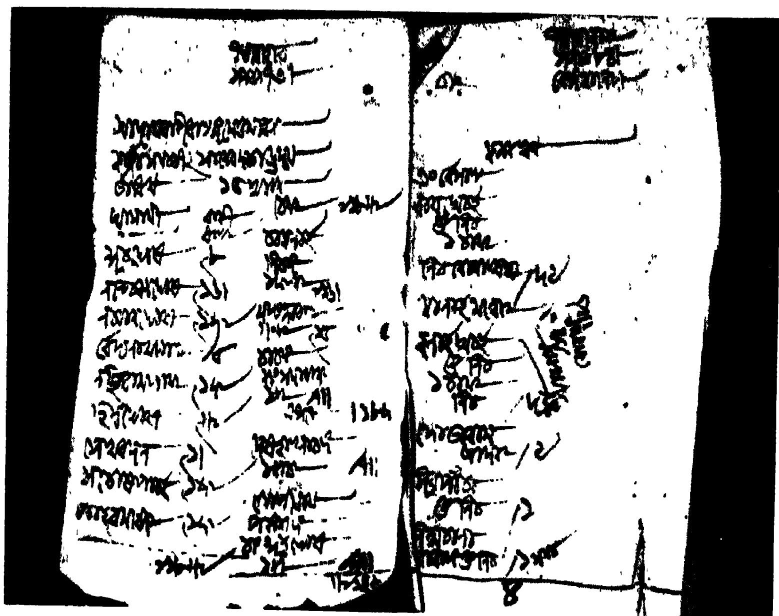
সেকালে মহকুমার নানাস্থানে রেশম ও রেশমজাত বস্ত্রের ব্যবসায় প্রধান ছিল ইহা আগেই বলা হইয়াছে। ক্ষীরপাই, ঘোলশাই, কাশীগঞ্জ, রাধানগর, ঘাটাল, গুঁড়লি, সুরতপুর, নিমতলা, ধানখাল, শ্যামগঞ্জ, দুর্গাপুর, আজুড়্যা, বাড়জালালপুর, মহেশপুর ও বাঁশখাল গ্রামগুলিতে সাহেবদের তৈয়ারি রেশমকুঠিগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। ঘাটালের কুঠিবাজার বৃহত্তম রেশম উৎপাদন-কেন্দ্র ছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ী Watson & Co ইহার মালিক ছিলেন। সাড়ে তিনশ 'ঘরা'র কর্তা ছিলেন পরেশচন্দ্র ভুঁইয়া। তাঁহার জ্ঞাতিগণ এখন চেঁচুয়া-গোবিন্দনগরে বাস করেন। ঘাটালের কুঠি পরে রাজপুতানাবাসী রামজীদাস সুরেখা প্রায় দেড়লক্ষ টাকায় ক্রয় করেন। বর্তমানে তাঁহার বংশধরগণ ঘাটালের কুঠিবাজারের মালিক। আগে ঘাটালে ডাচ্‌দের যে কুঠি ছিল তাহাতেই এখন মহকুমার কাছারী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তিনজন বাণিজ্যিক রেসিডেণ্ট ঘাটালে ছিলেন। পূর্বে 'হরমিলার এণ্ড কোম্পানি'র ষ্টীমার সার্ভিস ঘাটাল হইতে শিলাই ও রূপনারায়ণ নদীর উপর দিয়া কোলাঘাটের দিকে চলিত।

প্রাচীন রেশম-শিল্প ও সাহেবদের রেশম-কুঠির ধ্বংসাবশেষ

গুঁড়লি ও সুরতপুর কুঠির মালিক ছিলেন Louis Pyne & Co of Lyons। নিমতলার কুঠির মালিক ছিলেন চন্দ্রকুমার গুঁই ও তাঁহার ভাইয়েরা। বাড়জালালপুরের কুঠি ছিল নলদহের পীতাম্বর সেনের সম্পত্তি। পরে বিপ্রদাস পাঁজা তাহা কিনিয়া লন। নকল রেশম আবিষ্কার হওয়ায় ঐ ব্যবসায়ের পতন ঘটে।



গুড়্‌লির (দাসপুর) প্রাচীন রেশমকুঠির
চিমনি



১১৭৩ ও ১১৮৪ সালের দুটি জমাখরচের হিসাব



ক্ষীরপাইয়ের 'বাবরশা' ও
বাবরশা তৈরির ছাঁচ



খড়ারের পিতল-কাঁসার কাজ

পূর্বে এই মহকুমার নানাস্থানে নীল চাষ ও নীলের ব্যবসায়ও খুব হইত। কুঞ্জপুর, ঘোলশাই, ক্ষীরপাই, কাশীগঞ্জ এবং আজুড়িয়ায় নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ আছে। রেশমের ন্যায় নকল নীল বাহির হওয়ার ফলে এদেশে নীলের ব্যবসায়েরও পতন ঘটিয়াছিল।

নীল চাষ

অন্যান্য কুটির-শিল্পের ন্যায় এদেশে শঙ্খ-শিল্পও এককালে খুব উন্নত ছিল। চন্দ্রকোণা শহরের শঙ্খবণিক সম্প্রদায় প্রায় লুপ্ত। রামজীবনপুর, ঘাটাল, ভুবরাজপুর, শ্রীবরা, কল্মিজোড়, রাধাকান্তপুর ও বাসুদেবপুরে শঙ্খবণিকেরা এখনও কিছু কিছু আছেন। আগে ইঁহারা খুব মোটা ও চওড়া শাঁখা তৈয়ারি করিতেন। ঢাকার অনুকরণে এদেশে সৌখিন শাঁখা প্রথম প্রবর্তন করেন দাসপুর থানার রাধাকান্তপুরের কৈলাসচন্দ্র দত্ত। মহিষাদল রাজবাটী হইতে ইনি বহুবার পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীবরার কার্তিকচন্দ্র নন্দী ও রাধাকান্তপুরের বিপিনচন্দ্র দত্ত শ্রেষ্ঠ শঙ্খ শিল্পী। বাজাইবার শঙ্খ, পাণিশঙ্খ, বালা, চুড়ি, আংটি, পদক, মাদুলি, শাঁখের চরখা, কৌটা, মালা, ফুল, কানের ট্যাপ প্রভৃতি ইঁহারা তৈয়ারি করেন। বর্ধমান দীননাথপুরে তৈয়ারি বড় করাত দ্বারা আগে শাঁখা কাটা হইত। এখন ইহার জন্য মেসিন ব্যবহার করা হয়। দাঁড়া, উগো, বাটালি, শিল, ছোট ও বড় হাতুড়ি, সাঁড়াশি প্রভৃতি যন্ত্র এই কাজে লাগে। আগুনে পোড়াইয়া নাইট্রিক অ্যাসিডে ডুবাইলে শাঁখার পালিশ হয়। গালা, হরিতাল, হিঙ্গুল প্রভৃতির দ্বারা আগে শাঁখার রঙ হইত। এখন কেবল সাদা ও ফিকে রঙই চলে। আগে এদেশের সঙ্গে অন্য দেশের শাঁখারির চলন ছিল না। এখন সকলে এক। শাঁখের পোঁটা প্লীহানাশক। গুঁড়ায় ব্লটিংয়ের কাজ হয়। ইহা ছুলি ও ব্রণ উপশম করে। শাঁখের বাতিল অংশ পুড়াইয়া খাইবার চুন হয়। এদেশে প্রচুর ঘুসুম আছে। ঐগুলি পোড়াইয়া চুনের বিস্তৃত ব্যবসায়ও হইতে পারে।

শঙ্খ-শিল্প

তেলি জাতি এই দেশে পূর্বে লবণের ব্যবসায় করিতেন। তেলিদের পেশা ছিল ঘনায় তেল প্রস্তুত করা। তেলীর ঘনায় দুই ও কলুর ঘনায় এক বলদ। এখন তাঁহাদের জাতীয় ব্যবসায় অচলপ্রায়। নানাস্থানে স্বর্ণকার বা স্যাঁকরারাও বাস করেন। তাঁহারা অঞ্চলের প্রয়োজনানুরূপ গহনা তৈয়ারি করেন। পোদ্দার ও অন্যান্য জাতিও এখন সোনারূপার ব্যবসায় করেন। সহর ও বিভিন্ন গ্রামে চর্মকারগণ পাদুকাশিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া বর্তমানে কোনরকমে সংসার চালান। সরবেড়িয়া, হরিরামপুর, গোপীনাথপুর, চাঁইপাট প্রভৃতি গ্রামে ইহাদের বাস আছে।

তৈল, স্বর্ণ ও চর্ম-শিল্প

মালাকারদের সোলার সাজ এককালে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এই মহকুমার দাসপুর, বাসুদেবপুর, ঘাটাল, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর ও চন্দ্রকোণায় বিশেষ করিয়া এবং প্রায় প্রতিটি সামাজিক গ্রামেই মালাকার জাতি বাস করেন। দেবপূজা ও দশকর্মে ফুল, চাঁদমালা, ঝারা প্রভৃতি সরবরাহ ইহাদের পেশা। রাস, ঝুলনাদি উৎসবে নানা প্রকার সজ্জা প্রস্তুত ও সজ্জাবিধান, বিবাহের শোভাযাত্রার ফুলছড়ি ও 'খাসগেলাস' তৈয়ারি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর চিতায় সোলার সমাধি-নির্মাণ ইহাদের কাজ। অনেকে ডাকের ও সোলার সুন্দর সুন্দর গয়নাও তৈয়ারি করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ দেবদেবীর মন্দিরগুলিতে পূজার আয়োজনে ফুলমালা দিয়া নিত্য সাহায্য করিবার ব্যবস্থাও অনেকের আছে। ব্যবসায়ের জন্য ইহারা প্রচুর সোলা সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

সোলা ও ডাকের সাজ

মহকুমার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ঃ

এই মহকুমার কয়েকজন ব্যবসায়ী সেকালে নানা জিনিসের ব্যবসায় করিয়া ধনী হইয়াছিলেন। লবণের ব্যবসায়ে রাধানগর-শালিখার চৌধুরীবংশ ও চেতুয়া-বাসুদেবপুরের মাসান্তবংশ ধনী হন। শালিখার চৌধুরীগণের একটি শাখা পরে ডেবরা থানার মলিঘাটী গ্রামে কংসাবতীতীরে প্রাসাদাদি তৈয়ারি করাইয়া বাস করেন। চৌধুরী-বংশের বৈদ্যনাথ চৌধুরী পুরীধামে 'সুনিয়া চৌধুরী-মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত কোণারকের সূর্যমন্দির ইঁহাদের জমিদারীভুক্ত ছিল। চেতুয়া-বাসুদেবপুরের মাসান্তবংশের যজ্ঞেশ্বর মাসান্ত নানা গঞ্জে ও কলিকাতার হাটখোলায় লবণের আড়ত করিয়া ধনী হন। এই গ্রামে তাঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া ধনী হন। তাঁহার দৃষ্টান্তে স্বগ্রাম বীরসিংহের সিদ্ধেশ্বর পানও ঐ ব্যবসায়ে কৃতী হইয়াছিলেন। ইড়পালার কৃষ্ণমোহন রুদ্রের দ্বিতীয় পুত্র শশিভূষণ রুদ্র পিতৃদত্ত পাঁচ হাজার টাকা মূলধন লইয়া বিকানীর হইতে রামজীদাস সুরেখাকে সংগ্রহ করেন। পরে জ্ঞাতি হীরালাল রুদ্র আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দেন। ইহাদের সাহায্যে শশিভূষণ বড়বাজারে কাপড়, তেল ও মশলার বিরাট ব্যবসায় গড়িয়া তোলেন। ইড়পালা-নিবাসী উমাচরণ রক্ষিতের সঙ্গে টাইপ ঢালাইয়ের কার্যও করিতে আরম্ভ করেন। পরে পৃথক্‌ভাবে কলিকাতা, ঢাকা ও গৌহাটিতে ঢালাই ব্যবসায় করিয়া স্বগ্রামে ও

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবসায়ে সিদ্ধি

ঝাড়গ্রামের বেলিয়া মৌজায় বহু জমি এবং কলিকাতায় অট্টালিকা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। ইড়পালায় কৃষ্ণমোহন ইনষ্টিটিউশন নামক উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩৫০০০ টাকা ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২৫০০০ টাকা, শিবানী টোলে ১০০০০ টাকা, ঘাটাল প্রসন্নময়ী বালিকা-বিদ্যালয়ে ২৭০০০ টাকা দান করেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠান তাঁহারই স্থাপিত। গ্রামে দেবসেবা প্রভৃতির জন্যও তাঁহার দান ছিল। ইড়পালার বাবুরাম রায়, হীরালাল রুদ্র, নটবর মিত্র, প্রভাসচন্দ্র নন্দী এবং সতীশচন্দ্র পালও ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র পালের ঝাড়গ্রাম মহকুমার সরডিহাতেও ব্যবসায় আছে।

রামজীবনপুরের বাবুলাল সিংহ ও সতীশচন্দ্র সিংহ কলিকাতায় লৌহ ঢালাইয়ের ব্যবসায়ে ধনী হইয়া রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীটে সিংহগড় নামক বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। রামজীবনপুর হাইস্কুল, স্বগ্রাম পাণ্ডুয়ায় দেবালয় প্রভৃতি তাঁহাদের কীর্তি। রাণীচকগড়ের পালগণ খিদিরপুরে ব্যবসায় করিয়া বহু লক্ষ টাকার মালিক হন। ইঁহারা স্বগ্রামে আসিয়া অনেক বৃহৎ কর্ম করিয়াছেন। পূর্বোক্ত নন্দনপুরের (দাসপুর) কিশোরীমোহন ঘোষ পারঘাট ইজারা এবং আরও নানা ব্যবসায় করিতেন। বিষ্ণুপুরের অবিনাশ ঘোষ খিদিরপুরে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ে ধনী হন। খিদিরপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিশ হাজারেরও বেশি টাকা দেন।

মামুয়ার (দাসপুর) কৃত্তিবাস ভৌমিক কাষ্ঠ-ব্যবসায়ে ধনী হইয়া গ্রামে দেবকীর্তি, উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি করেন। ঐ গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মাল, খুকুড়দহের অমরনাথ মাজি প্রভৃতিও ব্যবসায়ী। ঘাটালের রামেশ্বর মল্লিক নিজের চেষ্টায় মুদ্রাযন্ত্র এবং ঔষধের ব্যবসায় করিয়া বিশেষ ধনী হন। ঘাটালে তিনিই ঐ দুটি ব্যবসায়ের প্রবর্তক। নিজে উড়িয়া ভাষা শিখিয়া মলিঘাটী জমিদারীর দাখিলা ছাপাইতেন। বহু পুস্তক ও "ঘাটাল পত্রিকা"ও ইনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ক্ষেপুতের শ্যামাপদ পাল গোপীগঞ্জ ও দুধকামরায় ভুষিমালের বিরাট কারবার গড়িয়া তোলেন। অনেক সৎকার্যে তাঁহার দান আছে। গণেশ ভকতেরও ঐ দুইস্থানে ব্যবসায় আছে। বহু সাধু উদ্যোগে তিনি আনুকূল্য করেন। ঘাটালের সুধীরকুমার পাল ঘাটাল ও দুধকামরায় Ghatal Trading Co নামে ব্যবসায় পরিচালনা করিতেন। চাঁদপুরের (দাসপুর) গৌরীসেনের কলিকাতায় চুনসুরকির ব্যবসায় ছিল। মাকালপোতার বিহারীলাল মণ্ডলের সুরকির কল ছিল। সীতাপুরের নগেন্দ্রনাথ নায়েক বিস্তৃত ব্যবসায় পরিচালনা

করিতেন। লছিপুরের রায়সাহেব শ্রীচরণবাগের ঘাটালে ধানের ব্যবসায় ছিল। এই সহরের দাস, বেরা, হাজরা প্রভৃতিও ব্যবসায়ী। হৃদয় পোড়ের ইষ্টক ব্যবসায় বেশ পুরাণো। সত্যেন রায়, পূর্ণদাস ও মদন দাসের ইটভাটা আছে। সুলতাননগরবাসী (দাসপুর) মতিলাল বেরার খাড় রাধাকৃষ্টপুরে টালির ভাটা ও কারবার আছে।

নিমতলার বৈকুণ্ঠনাথ গুঁই কলিকাতায় বিস্তৃত ব্যবসায় করিতেন। স্বগ্রামে তাঁহার বহু সৎকীর্তি আছে। ঐ গ্রামের অন্যান্য গুঁই, দালাল ও দাস বংশের অনেকের কলিকাতা, ঢাকাপটি, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের ব্যবসায় আছে। এই মহকুমায় অনেকে কলিকাতার নানাস্থানে মশারীর ব্যবসায়ও করেন। পদমপুরের (দাসপুর) নদীয়ার চাঁদ গুঁইয়ের ব্যবসায় বোম্বাই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খড়ার অঞ্চলের জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় কাশীতে বাসনের দোকান করিয়া ধনী হন। ঘাটালের সীতারাম কুণ্ডু ও গোবর্ধন দাস মহাশয়ও প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সব ব্যবসায়ীর কোন কোন বংশধর এখনও তাঁহাদের পৈতৃক ব্যবসায় চালাইতেছেন। পূর্বোক্ত ব্যবসায়িগণ ছাড়া মহকুমায় আরও বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন বা এখনও আছেন।

কয়েকটি কুটিরশিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তাঁত—পূর্বকথিত কুটীরশিল্পগুলির মধ্যে প্রথমে তাঁতের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। সেকালে ঘরে ঘরে তৈরি সুতায় তাঁতিরা কাপড় বুনিতেন। এদেশের ছুতার দ্বারা তৈয়ারি তাঁতগুলির মোটামুটি অংশগুলির পারিভাষিক নামঃ স্তুতি নরাজ, কোল নরাজ, দক্তি, কাঁটাসিজ, জুয়াকাঠি, সানা, ব ও বয়ের কাঠ, নাচনী পাখী, বাঁখিল, ডানখিল, টিপনী, মাকু, ললি, গাছপুতলা, চাপনা, মেচকা।

'সুতিনরাজ বা লরাজ' তালকাঠের তৈয়ারি পাঁচফুট লম্বা ও একফুট পরিধি-বিশিষ্ট। ইহাতে সুতা গুটানো হয়। 'কোল নরাজ' ঐরূপ লম্বা ও নয় ইঞ্চি মোটা। কাপড় বোনার সময় তাঁতির কোলের দিকে থাকিয়া বোনা কাপড় গুটায়। 'দক্তি' দুটি পাতলা তালকাঠ। ইহারা 'সানা' ধরিয়া রাখিয়া বোনায় সাহায্য করে। 'সানা' চিরুণির মত, সরু কাঠ দিয়া তৈয়ারি। ইহার ভিতর সুতা গলাইয়া বোনা হয়। 'ব' সুতায় তৈয়ারি। ইহা দিয়া কাপড় বোনা সুতার 'ঝাঁপ' প্রস্তুত হয়। 'ঝাঁপ' অর্থে বোনা সুতা দুভাগ হওয়া। ইহার

ভিতর দিয়া 'মাকু' যাতায়াত করে। ঝাঁপের সাহায্যে মাকু দিয়া কাপড় বোনা হয়। কাঠি অর্থাৎ 'ব' তুলা কাঠি বাঁশের বাতা দিয়া তৈয়ারি। ইহা তাঁতের অনেক কাজে লাগে। 'মাকু' বাঁশের সরু পাবের তৈয়ারি। পাবের মাঝখানটি ডোঙ্গার মত কুরা থাকে। 'মেচকা' স্থতার পাক ছাড়াইবার ও সানার ভিতর দিয়া স্থতা গলাইবার যন্ত্র। 'টিপনী' দুটি কাঠি একটি 'ব' ধরিয়া থাকে এবং পায়ের সাহায্যে ঝাঁপ তোলা হয়। 'পটী' বা 'ললি' সরু বাঁশ কঞ্চি, প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা। ইহাতে স্থতা গুটাইয়া মাকুর ভিতর দিয়া বোনা হয়। 'থিল' একহাত লম্বা বাঁকা কাঠের যন্ত্র। 'নরাজ' যাহাতে না ঘুরে তাহার জন্য ইহার ব্যবস্থা। 'পাখী' দুটি 'ব' ধরিয়া থাকে ও উঠানামা করে। তুলোর গাছ প্রধানত তিন রকম ছিল: অল্লা বা রামকাপাস, মাঝারি বা ছোট কাপাস। শেষেরটি হইতেই বেশির ভাগ স্থতা তৈয়ারি হইত।

রেশম ও নীল: রেশম-শিল্পে এই মহকুমার খ্যাতি ছিল ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রচলিত 'কুলা' হইতে 'ভিন্ন কুলা' নামক একপ্রকার 'চাঁচ' যন্ত্রে তুঁতপাতার উপর এক জাতের পতঙ্গ পালন করা হইত। তাহাদের ডিমগুলিকে ফিঙ্ যন্ত্রে তুঁত পাতার উপর রাখিলে উহারা গুটিতে পরিণত হইত। পরে গরম জলে গুটি ডুবাইয়া পোকাগুলিকে মারিয়া 'তুন্দুল' নামে গোলঘরে গুটিগুলি রাখিয়া 'বানক' নামক যন্ত্রসাহায্যে গুটিগুলি হইতে স্থতা বাহির করা হইত। এই রেশম স্থতার দ্বারাই তাঁতে কাপড়, চাদর প্রভৃতি বোনার রীতি ছিল। বহু গৃহে কুটীরশিল্প হিসাবে এই রেশম উৎপাদন চলিত, পরে বিদেশী ও দেশী অনেক কোম্পানি কুঠি নির্মাণ করিয়া ব্যাপকভাবে ঐ ব্যবসায় পরিচালনা করিতেন। রাধানগরে রেশমের সূক্ষ্ম থান ও মসলিন তৈয়ারি হইত। এই শিল্পের দৌলতে কেহ বেকার ছিলেন না। ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট কৃষিজীবিগণ তুঁতগাছের চাষ করিতেন। তুঁতের জমির খাজনা ছিল অধিক। ঘোলশাই (ঘাটাল থানা, মৌজা নং ১০০) ও কুঞ্জপুরে (দাসপুর থানা, মৌজা নং ৭০) নীল উৎপাদনের চৌবাচ্চাগুলি এখনও দেখা যায়—ঐ ব্যবসায়ও এখন আর নাই। কল্মিজোড়েও (দাসপুর থানা, মৌজা নং ৬৫) একটি নীলকুঠি ছিল। এই স্থানে ইংরেজদের কয়েকটি সমাধির মধ্যে একটিতে Mrs. Holliers এর নাম ও ইং ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ লিখিত ছিল। বর্তমানে সেগুলি প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে।

মাদুর, মসলন্দি ও ঝাঁ্যাতলা: দাসপুর থানার রাধানগর (জে. এল

নং ১১০) ও কিশোরপুর অঞ্চলে উৎকৃষ্ট মাদুর ও মসলন্দী তৈয়ারি হইত। এক একটি মসলন্দীর দাম সেকালের বাজারেও দেড়শ টাকা পর্যন্ত ছিল। ঐগুলি এমন মসৃণ হইত যে উহাদের উপর দিয়া সাপ যাইতে পারিত না। একটি প্রমাণ আকারের মসলন্দীকে গুটাইয়া একটি বাঁশের চোঙায় পুরিয়া রাখা যাইত। অতএব কত সূক্ষ্ম বোনা হইত তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। 'বাইতি' নামে একটি জাতি এই মসলন্দী প্রস্তুত করিতেন। একটি চারকোণা কাঠের ফ্রেমে লম্বালম্বি সুতার বা অধিক শৌখিন করিবার জন্য সূক্ষ্ম রেশম সুতার 'টানা', প্রস্থের সানাকৃতি কাঠ দুইটির ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হইত। সূক্ষ্মাকার মাদুরকাঠি একটি 'টানা'র উপর ও পরেরটি নীচে দিয়া লইয়া গিয়া মসলন্দী বা মাদুর বোনার পদ্ধতি ছিল। পুকুর বা জলার ধারে বা কালা জমিতে মাদুর কাঠির চাষ হইত। ঝাঁ্যাত্‌লা নামক মাদুর বোনার পদ্ধতি অন্য। মসলন্দী শিল্প এদেশে এখন লুপ্ত। বাইতিরা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। তবে মাদুরশিল্প এখনও কিছু বর্তমান আছে। হোগ্‌লার ছই নানাস্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয়। এদেশে কোন এক স্থানে পনের-ষোল হাত মাটির নীচে একটি লুপ্ত নদীখাতে মাদুর পাওয়া গিয়াছিল।

ধাতুশিল্প : কামারদের একটি শাখা পিতল প্রভৃতি ধাতু গলাইয়া বাসন-ঢালাই বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। যে বস্তুটি ঢালাই করিতে হইবে তাহার একটি মাটির ছাঁচ ও ধাতু গলাইবার মুছি গঠন করিয়া ছাঁচটি উপরে ও মুছি নীচে রাখিয়া পুয়ানের আগুনে রাখা হয়। ধাতু গলিয়া গেলে ছাঁচটিকে উল্টাইয়া নীচের দিকে দিলে মুছির গলিত ধাতু ছাঁচে গিয়া বস্তুটির রূপ দান করে। সেকালে কামান, বন্দুক, তলোয়ার প্রভৃতিও এই শ্রেণীর কামারেরা করিতেন। কামান ও গোলা ঢালাই করিয়া প্রস্তুত করার রীতি ছিল। বরদাগড়ের কোন পুকুরে নিমগ্ন একটি বৃহৎ লৌহখণ্ড আছে। আজুড়্যা ছিল এই শ্রেণীর কামারদের পট্টি, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখানে কৃত্রিম মুদ্রাও প্রস্তুত হইত।

তেল ও ঘানি : তৈল-উৎপাদক যন্ত্র ঘানি প্রায় সব সমৃদ্ধ গ্রামেই ছিল। তিল, সরিষা ও নারিকেল ঐ যন্ত্রে পেষণ করিয়া তৈল উৎপন্ন হইত। মোটা তেঁতুল গাছ ঘানির উপযোগী। তাহার ভিতর কুরিয়া সেই গর্তে পেষণদণ্ড বসানো হইত। ইহার নাম ছিল 'লাট'। ইহার সহিত সংযুক্ত কাষ্ঠদণ্ড গোরুর কাঁধের জুয়ালে স্পর্শ করিত। দুটি বা একটি গোরুর দ্বারা ঐ পেষণযন্ত্র ঘুরাইলে তৈল বাহির হইত। কলুর ঘানির তৈল ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিত।

এবং তেলির ঘানির খোল কাপড়ে নিংড়াইয়া লইতে হইত। রেড়ি, করঞ্জা ও কঁচড়া বাটিয়া একটি কড়ায় দিয়া জ্বাল দিলে একপ্রকার তৈল পাওয়া যাইত। ঐ ব্যবস্থা প্রতি ঘরেই ছিল। ঘানির ঘরটি হইত গোল। ইহার নাম 'শাল'। কলুর ঘানির তেল কাঁচা এবং তেলির ঘানির তেল পাকা ছিল।

গুড় ও মিষ্টান্ন শিল্পঃ মহকুমার প্রায় সর্বত্র আখচাষের ফলে প্রচুর গুড় এদেশে তৈয়ারি হয়। আখমাড়াই কলে প্রথমে আখ হইতে রস বাহির করিয়া পরে বড় বড় উনানে মাটির বড় বড় জ্বালায় সেই রস ঢালিয়া ও জ্বাল দিয়া উৎকৃষ্টমানের গুড় এখনও তৈয়ারি হইয়া থাকে। বহু স্থানে এই গুড় চালান যায়। কলসি বা নাদায় এই গুড় রাখা হয়। সিউলি বা হাড়ি জাতীয়গণ এক বিশেষ ধরনের কাটারির সাহায্যে খেজুর গাছ চাঁছিয়া শীতকালে রস বাহির করিয়া পুয়ানে বড় বড় জ্বালায় করিয়া অতি সুগন্ধি গুড় ও পাটালি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এখন এই ধরনের খেজুর গুড় ও পাটালি কমিয়া গিয়াছে।

এদেশে নানান্ জাতের মিষ্টান্ন চলিত আছে। নাড়াজোলের মুগের জিলাপি এককালে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও নাড়াজোল ও রাজনগরে এই জিলাপি তৈয়ারি হইয়া থাকে। কল্‌মিজোড় ও চাঁইপাটের বড় বড় বাতাসা খুবই প্রসিদ্ধ। চাঁইপাটের বাতাসার আকার অদ্ভুত রকমের হয়। একসেরেরও বেশি ওজনের এবং গোল বড় বগি থালার মতো এক একখানি বাতাসা তৈয়ারি হয়। পূর্বে সাহেবের টুপির মতো বাতাসা হইত। ঘাটালের রসগোল্লা, সন্দেশ, ছানার গজা প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও ক্ষীরপাইয়ের 'বাবরশা' এককালে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। দাসপুর থানার বাড়জালালপুর, সরবেড়িয়া ও রাজনগরের দই এককালে খুবই উৎকৃষ্ট ছিল। এখন উৎকর্ষ অনেকটা কমিয়া গেলেও রাজনগর তাহার ঐতিহ্য কিছুটা বজায় রাখিয়াছে। ক্ষীরপাইয়ের বাবরশার এখন আর তেমন প্রসিদ্ধি নাই, পরিবর্তে ঘাটাল ও খড়ারে ভালো বাবরশা তৈয়ারি হয়। চেতুয়া ও বৈকুণ্ঠপুর নিম্বার্ক মঠে ঝুলন ইত্যাদি নৈমিত্তিক পূজাপার্বণে এককালে 'মথুনা' নামে ক্ষুদবাটার সঙ্গে জোয়ান মিশাইয়া একপ্রকার ঘিয়েভাজা পিঠা ও 'পনঝুরি' নামে শুকনো আটা ও চিনির ঘিয়েভাজা এবং মালপোয়া ও 'তোকমাই' নামে উৎকৃষ্ট পায়স তৈয়ারি হইত। নারিকেল ও চিনির মিশ্রণে প্রস্তুত 'রসকরা'ও দাসপুর ও ঘাটালের নানা অঞ্চলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। চন্দ্রকোণার চাঁদশাহী খাজা, বুটের মিঠাই, মালপোয়া এবং জাড়ার জিলাপিও সুপরিচিত।

মিষ্টান্ন-শিল্প

মাছধরার সাজ-সরঞ্জাম: মাছ ধরিবার জন্য ঘুনি, মুগ্‌রি, পাও, ঝেঁপো, হালুক, ঘণ্ডা, চ্যাটাকল, হাঁড়িকল এবং নানারকমের জাল, ছিপ, টাঙাবড়শি, কুঁড়োজালি ব্যবহৃত হয়। ভোঙ্গাকলে জলসেচনের ব্যবস্থা আছে। ঘাটগাঁতি ও মকুলাগাঁতি এদেশের বিশেষ জাল।

উপরি উল্লিখিত কুটিরশিল্পগুলি ছাড়া আরও কয়েকপ্রকার কুটিরশিল্পের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

বর্তমানে এই সব শিল্পের বেশির ভাগই লুপ্ত এবং তৎপরিবর্তে আধুনিক নানাপ্রকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়াছে। সেকালের সমৃদ্ধিশালী এই শিল্পগুলির কোন কোনটি একপ্রকার জীবন্মৃত অবস্থায় বর্তমানে অবস্থান করিতেছে। বর্তমানে বহুস্থানে ধান, চাল, পাট, আলু, গুড় প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের গুদাম ও পাইকারী কেনাবেচার আড়ৎ তৈয়ার হওয়ায় কৃষকেরা তাঁহাদের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ আড়ৎদারদের কাছে কমমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। সম্প্রতি সরকার-কর্তৃক কোন কোন কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্দিষ্ট হওয়ায় আড়ৎদারদের দৌরাত্ম্য একটু কমিলেও সবস্থানে সরকার-নির্দিষ্ট মূল্যে মাল কেনাবেচা হয় না।

বর্তমান শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থা

ইহা ছাড়া গ্রামের বনজসম্পদ্, যেমন, বড় বড় গাছ, বাঁশ প্রভৃতি পল্লী অঞ্চলের অনেক দরিদ্র জনসাধারণ স্বল্পমূল্যে পাইকারী খরিদ্দারদের কাছে বিক্রয় করিয়া দেওয়ায় পল্লী অঞ্চলের গাছপালা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে কাঠের কল ও কাঠব্যবসায়ের কিছু কিছু কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই মহকুমায় মাঝারী শিল্পের প্রসার একপ্রকার হয় নাই বলিলেই চলে। আগের কুটিরশিল্পের কোন কোনটি ব্যবসায়ীদের দ্বারা নবীকৃত হইয়াছে। মহকুমায় আলুসংরক্ষণের জন্য দু'একটি হিমঘরও স্থাপিত হইয়াছে। চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর ও ঘাটালে কৃষির উন্নতির জন্য এগ্রিকালচার‍্যাল ক্রেডিট্ সোস্থাইটিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের মাধ্যমে এবং কোন কোন ব্যাঙ্কের মারফৎ কৃষকদের ঋণদান দ্বারা কৃষিকার্যের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু বেশির ভাগ স্থানে উপযুক্ত সেচব্যবস্থা ও অতিরিক্ত জলনিকাশের অভাবে কৃষিকার্যের যতটা উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয় নাই। এইসব কারণে মহকুমায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি পূর্বাপেক্ষা অনেকটা জোর কদমে চলিলেও জিনিষপত্রের মূল্য আদৌ কমে নাই, বরং

বেশ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি কিরূপ তাহার এক পরিচয় মহকুমার পাঁচটি শহরের শিল্প ও বাণিজ্যের নিম্নকথিত এক সমীক্ষা হইতে জানা যাইবে :

(১) **চন্দ্রকোণা :**

(১) শিল্পজাত তিনটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য	(২) রপ্তানী (তিনটি)	(৩) আমদানী (তিনটি)	(৪) ব্যাঙ্ক (সংখ্যা)	(৫) এগ্রিকালচার্যাল ক্রেঃ সোসাইটি
বিড়ি, রুটি-বিস্কুট, কাঠের জিনিষ	পাট, চাল ও আলু	কয়লা, মশলা ও কাঠ	নাই	১

(২) **ঘাটাল :**

আইসক্রীম, 'বেকারি'-জাতদ্রব্য ও পেতল-কাঁসার জিনিষপত্র	পাট, আলু ও পিতল-কাঁসার জিনিষ	ধান, মুদিখানার দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি	৫	৩

(৩) **খড়ার :**

পিতল-কাঁসার বাসন, চাল ও ময়দা	পাট, আলু ও পিতল-কাঁসার বাসন	তামার পাত, মশলা ও ডাল	নাই	নাই

(৪) **ক্ষীরপাই :**

মাটির বাসনপত্র, লোহার যন্ত্রপাতি, কাঠের কাজ	ধান, পাট ও আলু	ডাল, মশলা ও কাপড়	নাই	নাই

(৫) **রামজীবনপুর :**

তুলাজাতদ্রব্য, শঙ্খ-অলংকার, পিতলের বাসনপত্র	শঙ্খ-অলঙ্কার, কাপড় ও পিতলের বাসনপত্র	পিতলের পাত, সুতা ও শঙ্খ	নাই	১

এই পাঁচটি শহরের মধ্যে নন-এগ্রিকালচার্যাল ক্রেডিট্ সোস্থাইটি ঘাটালে ছয়টি ও খড়ারে একটি আছে। ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা ও রামজীবনপুরে এই সোস্থাইটি নাই। উপরিউক্ত সমীক্ষা ১৯৭১ সালের Midnapur District Census Hand book হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ঃ পূজা-পার্বণ-মেলা

উপনিষদে আছে, "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি"—অর্থাৎ আনন্দ হইতেই প্রাণীদিগের জন্ম আর আনন্দেই তাহারা বাঁচিয়া থাকে। গতানুগতিক জীবনে আনন্দ বিনা মানুষ জীবন্মৃত। উৎসব এই আনন্দ পরিবেশন করে। তাই নানা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান এবং পূজা-পার্বণ-মেলায় উৎসবের সমারোহে এই আনন্দের প্রকাশ ঘটে।

উৎসব-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য

এই উৎসব প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—নিত্য ও নৈমিত্তিক। নিত্য উৎসব তীর্থস্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহেই পরিলক্ষিত হয়। তীর্থস্থান এই দেশে নাই। আছে উহার অনুকল্প ঠাকুরবাটীসমূহ। নানাস্থানের যাত্রিসমাগম ও দেবতার দৈনন্দিন ভোগরাগের ব্যবস্থায় ঐ সকল স্থানে নিত্য মহোৎসব লাগিয়া থাকে। পল্লীর নৈশ নাম সংকীর্তন ও গান-বাজনার আখড়া কতকটা নিত্য উৎসবের মতো। নানাপ্রকার খেলাধূলাও উৎসবের আবহাওয়া সৃষ্টি করে। নৈমিত্তিক উৎসবের শ্রেণী তিনটি—ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ধর্মীয়। এইগুলি অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ উপলক্ষে ও কালে। কোন ব্যক্তিগত আনন্দের কারণ ঘটিলে যে ভোজ প্রভৃতির আয়োজন হয় তাহাই ব্যক্তিগত উৎসব। সন্তানলাভ, পরীক্ষায় পাশ, চাকুরীর উন্নতি, পুরস্কারপ্রাপ্তি, অভীষ্টসিদ্ধি প্রভৃতিকে উপলক্ষ করিয়া এই ব্যক্তিগত উৎসবের অনুষ্ঠান চলে। এইজন্য স্বজন ও বন্ধুগণই প্রধানত আমন্ত্রিত হইয়া আয়োজিত ভোজ, গীত-বাদ্য-ক্রীড়া প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেন। উপহারদানেরও প্রথা আছে।

সামাজিক উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হয় প্রধানত স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত দশকর্মকে অবলম্বন করিয়া এবং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করিয়া—গর্ভাধান, পুংসবন, জাতকর্ম, সূতিকা ষষ্ঠীপূজা, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসবানুষ্ঠান হইয়া থাকে।

অনুষ্ঠান ও আচার

বিবাহের পর কন্যা প্রথম পুষ্পবতী হইলে এদেশে গর্ভাধান অনুষ্ঠিত হয়। কলার মোচার এক একটি লাল খোলায় সাতটি অর্ঘ্য সাজান হয়। স্বামীর সম্মুখে স্ত্রী পা ফেলিতে ফেলিতে একত্র অর্ঘ্য দান করেন। অনুষ্ঠানশেষে প্রীতিভোজ হয়। জাতকর্ম ও পুংসবন-অনুষ্ঠান আজকাল আর তেমন হয় না। সেকালে বিশেষভাবে হইত। সন্তানজন্মের

ষষ্ঠ রাত্রিতে শাস্ত্রানুসারে সূতিকা ষষ্ঠী পূজা হয়। দেওয়ালে গোময় ও কড়ির পুতুল তৈরী করিয়া এবং জিমড়া ষষ্ঠী নামক গোমুণ্ডস্থাপন এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা আর অন্যান্যকে মিষ্টান্ন দ্বারা তৃপ্ত করা হয়। এই রাত্রিতে বিধাতাপুরুষ জাতকের ললাটে ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেন বলিয়া বিশ্বাস করা সাধারণের মধ্যে চলিত আছে। ইহার পর অষ্টম রাত্রির অনুষ্ঠান "আটকড়াইয়ে" অর্থাৎ হলুদমাখা চাল ও আটরকম কড়াইভাজা বালকদিগকে দেওয়া হয়। তাহারা কুলা বাজাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছড়া আওড়ায়। একুশদিনের দিন ষষ্ঠীপূজার পর একুশটি 'পালি'তে মুড়কি-মিঠাই বালকদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়া থাকে। আমাদের এই মহকুমায় এই অনুষ্ঠানগুলি আজও কমবেশি হইয়া থাকে।

নামকরণ ও অন্নপ্রাশন প্রায়ই একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। শিশুর ছয়মাস বয়স হইলে শাস্ত্রবিধি অনুসারে এই অনুষ্ঠান হয়। মাতুলালয়-প্রদত্ত তৈজসপাত্র-যোগে শিশুকে অন্নভোজন করানো হয়। পরে আত্মীয়কুটুম্বের দেওয়া টাকা, দোয়াতকলম, ধানশীষ প্রভৃতি তাহাকে ধরিতে দেওয়া হয়। শিশু যাহা ধরে তাহা দেখিয়া তাহার মানসিক প্রবণতা অনুমান করা হয়। পরে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান চলিতে থাকে। মাতুলকর্তৃক শিশুর মুখে অন্ন দেওয়া রীতি। পরে শিশুর ভুক্তাবশিষ্ট ব্যঞ্জনাদি মাতুলই খাইয়া থাকেন। অন্য কাহারও এই অন্ন খাইতে নাই।

চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্তন অনুষ্ঠানগুলি ব্রাহ্মণজাতীয়দের ক্ষেত্রে প্রায়ই একই দিনে হয়। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য জাতির এদেশে এই অনুষ্ঠান-গুলি হয় না। উপনয়নে দীক্ষিত ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষাদান করা রীতি। ব্রহ্মচারী উপনয়নের পর তিন দিন তিন রাত্রি একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে আবদ্ধ থাকে। এই সময়ে তাহার সূর্যদর্শন করা নিষেধ। তাহাকে এই সময়ে রোজ তিনবার সন্ধ্যানুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রহ্মচারীর ভিক্ষামা যদি ব্রাহ্মণজাতীয়া হন তাহা হইলে তিনি চতুর্থ দিনে সূর্যদর্শন করান। এই দিন ভোজনাদি উৎসব অনুষ্ঠান হয়।

এই দেশে বিবাহ উপলক্ষে কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। প্রথমে বিবাহ পাকাপাকি স্থির হইলে কন্যাপক্ষে পিতা বা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি পাত্রকে স্বর্ণালংকার বা মুদ্রা দিয়া আশীর্বাদ করেন। পরে পাত্রপক্ষের অনুরূপ ব্যক্তি পাত্রীকে ঐভাবে আশীর্বাদ করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম "পাকা দেখা"। "পাকা দেখা" হইলে বর ও কনে পরস্পর বাগ্‌দত্তা হয়। বিবাহের পূর্বদিনে

বর ও বাগ্‌দত্তা কন্যাকে পরস্পরের গৃহে যে আহার করানো হয় তাঁহার নাম 'আইবুড়ো ভাত' বা 'আয়ুর্বৃদ্ধ্যন্ন'। বর ও কন্যাপক্ষের মত লইয়া কন্যাকর্তা বিবাহের রাত্রিতে কন্যাকে শাস্ত্রীয়বিধানে পাত্রস্থ করেন। প্রথমে বরকে বরণ করা হয়। পরে স্ত্রী-আচারের অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে সধবারা ('এয়োস্ত্রী') বরকে হুলুধ্বনি দিয়া বরণ করেন। ইহার পর কন্যাকে সাতবার বর প্রদক্ষিণ করানো হয়। সাধারণত ইহা মাতুলের কাজ। সাতাশটি ক্যাঠিতে আগুন জ্বালাইয়া বরকন্যার চতুর্দিকে ঘুরানোর পর পরস্পরের শুভদৃষ্টি হইলে বিধিমত কন্যাদান করা হয়। পরে এয়োস্ত্রী ও যুবতীরা 'বাসরঘরে' বরকন্যাকে গানবাজনা ও আমোদপ্রমোদে মাতাইয়া রাখেন। এই রাত্রিতে বরকন্যার নিদ্রা না যাওয়াই রীতি। কোন কোন স্থানে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের দুই নাপিতের মধ্যে সেকালের কবিয়ালদের মতো ছড়ার মাধ্যমে কথা-কাটাকাটি বা বচসাও হইয়া থাকে। এই কথা-কাটাকাটি সাধারণত বিবাহের পূর্বে আচার-অনুষ্ঠানের সময় হইয়া থাকে। যে পক্ষের নাপিত জিতে সে সকলের প্রশংসা ও পুরস্কার পাইয়া থাকে।

বিবাহে আচার

পরের দিন সকালে বা কোন কোন স্থানে বিবাহের রাত্রিশেষে 'কুশণ্ডিকা' নামে এক দীর্ঘ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠান শেষ হইলেই প্রকৃতপক্ষে বিবাহ সম্পূর্ণ হইল। ইহার পর পরিণীতা বধূ শ্বশুরালয়ে গমন করেন। এই দিবস রাত্রিতে বর ও বধূর পরস্পর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। ইহার নাম 'কালরাত্রি'। পরের দিন বধূর শ্বশুরালয়ে 'পাকস্পর্শ' নামক প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হয়। ইহার চলিত নাম 'বৌভাত'। এই অনুষ্ঠানে বধূ অন্ন স্পর্শ করিয়া স্বয়ং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে পরিবেশন করেন। অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি ভোজ্যের দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করা হয়। এই দিন রাত্রে 'ফুলশয্যা' বা 'ফুলসজ্জা'র অনুষ্ঠান হয়। ফুলের গহনায় বধুকে সাজানো হয় এবং বর-বধূর বিছানায় ফুল দেওয়া হয়।

বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও উপনয়নের পূর্বদিন তৈল ও হরিদ্রার দ্বারা 'গায়েহলুদ' নামে এক আচার-অনুষ্ঠান এই দেশে চলিত আছে। নবজাতকের স্থতিকাষষ্ঠী-পূজার রাত্রি ও দিবার পূর্বভাগে কোন কোন স্থানে এই অনুষ্ঠান হয়। পরামাণিক বা নাপিত পাড়া-প্রতিবাসীদের সধবা ও যুবতীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। সধবা নারীদের পায়ে নাপিতানী আল্‌তা পরাইয়া দেয়। সকলের গায়ে তেল হলুদ মাখাইয়া দেওয়া হয়। সধবাদের মাথায় নারিকেল তৈল ও সিঁথিতে সিন্দুর দেওয়া হয়। ঐ সময়

গায়েহলুদ

প্রতিবেশিনী বধূগণ বর বা কন্যাকে অথবা যাহার উপনয়ন হইবে সেই বালককে বৈকালে বা সন্ধ্যায় খাওয়াইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। কোন কোন স্থানে বাজনা ও পাল্‌কি করিয়া নিমন্ত্রণে যাওয়া হয়।

এই মহকুমার কোন কোন স্থানে গায়েহলুদের দিন কুলীন ব্রাহ্মণদের ঘরে আনন্দনাড়ু তৈরি হয়। এটি একটি মিষ্টান্নবিশেষ। ইহাতে চালগুঁড়ি, তিলচূর্ণ ও গুড় প্রধান উপাদান। নাড়ু গড়িয়া তেল বা ঘিয়ে ভাজা হয়। কলিকাতার ঠাকুরবংশেও ইহা পূর্বে হইত। গায়েহলুদের রাত্রিতে এয়োস্ত্রীরা বাজনার ঘটা করিয়া মন্দির-দেবালয়ে ও প্রতিবেশীদের গৃহে গৃহে 'জলসই'তে যান। সেখানে তাঁহারা গান করেন। তেল, গোটা হলুদ, গোটাসুপারি, পান, নাড়ু ও মুড়কি তাঁহারা প্রতিবেশীদের বিতরণ করেন। মন্দির-দেবালয়ে আল্‌পনা দিয়া পান-সুপারি রাখা হয়।

সেকালে কোন কোন বিবাহে বা উৎসবে আতসবাজির ঘটা ও মালাকারের তৈরি 'খাসগেলাসে'র* রোশনাই হইত। চন্দ্রকোণার গুরুদাস করের বাড়ীর এক বিবাহে চন্দ্রকোণা হইতে ক্ষীরপাই পর্যন্ত চারিক্রোশ রাস্তার উপর চালা বাঁধা হইয়াছিল। দাসপুর থানার চেতুয়া বাসুদেবপুরের কুমুদনাথ দত্তের বাড়ীর এক বিবাহে গোপীগঞ্জ পর্যন্ত চারি ক্রোশ পথে 'বাঁধা রোশনাই'য়ের** ব্যবস্থা হইয়াছিল। গ্যাসপোষ্টের মত সারাপথ আলো ধরিয়া মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিয়া এই বাঁধা রোশনাইয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল। কলিকাতায় রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ছেলে শরদিন্দু ঠাকুরের বিবাহে ইহা চলিত হয়। ইহার দূরত্ব ছিল মাত্র এক মাইল। কলিকাতার ধনী নৃসিংহ মল্লিক খাসগেলাসের প্রবর্তক। ইহাতে একটি ছড়ির উপর অভ্রের ফানুসে একটি বাতি থাকে।

সেকালের বিবাহে জাঁকজমকের ঘটনা

পিতামহ বা প্রপিতামহ পর্যায়ের কাহারও মৃত্যু ঘটিলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আনন্দোৎসবের পরিবেশ ঘটে। অবস্থা ভালো হইলে দানসাগর, বৃষোৎসর্গ বা চন্দনধেনু শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হয়। নাড়াজোলের রাজবাড়ী বা জাড়ার রায়বাড়ী প্রভৃতি ধনিবংশে দানসাগরশ্রাদ্ধ সাধারণ ব্যবস্থা ছিল। ইহাতে ভূম্যাদি ষোলটি দান ষোল দফা দিতে হয়। অধ্যাপক-বিদায়, ব্রাহ্মণাদিভোজন, কাঙালী-বিদায় প্রভৃতি ইহার অঙ্গ। কয়েক দিন ধরিয়া ভোজপর্ব চলে। তৃতীয় দিবসে বাদ্য ও কীর্তন যোগে কোন দেব-স্থানাদিতে বৃষকাষ্ঠ পুতিয়া দিয়া সেইখানে কাদায় গড়াগড়ি দেওয়া হয়। মৃতের নাতিরা আনন্দ করে। ধনি-বংশের দানসাগরাদি শ্রাদ্ধে ভাটগণ আসেন।

শ্রাদ্ধ

ভাটেদের একটি গানে নাড়াজোলের রাজা মোহনলাল খাঁনের শ্রাদ্ধবিবরণ আছে। চেতুয়া বাসুদেবপুর গ্রামে বাং ১২৭৮ সালের বৈশাখে স্বর্গত কৃষ্ণকান্ত রায়ের দানসাগর শ্রাদ্ধ হয়। এই শ্রাদ্ধে দ্রাবিড়, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের এই গ্রামে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় পার্শ্ববর্তী চাঁদপুর, রাধাকান্তপুর, বলিহারপুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে বাসা দেওয়া হয়। উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত সিধা সরবরাহ, নগদমুদ্রা, তৈজসপত্র, পাথেয় ও সোনারূপা বিদায় দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত অধ্যাপকবৃন্দ বাসুদেবপুরের বিশিষ্ট পণ্ডিত সুরনাথ রায়কে 'চূড়ামণি' উপাধি দান করেন। কাঙালীভোজনের মুড়ি-মুড়কি সারা পথ পরিব্যাপ্ত করে।

এই দেশে ধর্মীয় উৎসবগুলি সাধারণত দেবপূজা, ব্রত, প্রতিষ্ঠাকর্ম ও যাগযজ্ঞাদিকে অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। পৌরাণিক ও লৌকিক ভেদে হিন্দুর দেবদেবী প্রধানত দুইশ্রেণীর। আদিবাসীদের দেবদেবী এবং মুসলমান-সম্প্রদায়ের পীরদের উদ্দেশ্যে উৎসবাদি হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া মহরম, ইদুজ্জোহা প্রভৃতি উৎসবও সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। পৌরাণিক দেবদেবীর উৎসব হয় মন্দিরে বা মণ্ডপে। বৃক্ষতলে আসীন লৌকিক দেব-দেবীরও পূজাপার্বণাদি হয়। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ষষ্ঠীদেবী বটবৃক্ষতলে পূজিতা হন। জামাই-ষষ্ঠীর দিনই তাঁহার বিশেষ পূজা হয়। ভাদ্র মাসে মন্থন ষষ্ঠীর পূজা দধিমন্থনদণ্ডে পুকুরঘাটে হয়। মাঘ বা ফাল্গুনে সরস্বতী পূজার পরদিন শীতলষষ্ঠী পূজায় পান্তাভাত ও বাসি ব্যঞ্জনাদি নিবেদিত হয়। একটি বাটনাবাটা শিলে সিঁদুরের পুতুল আঁকিয়া এই ষষ্ঠীর পূজা করা হয়। পূজার পর ভোজপর্ব। ভোজ্যদ্রব্য সব কিছুই বাসি।

মনসাপূজা বৎসরে দুইবার হয়। দশহরা ও খইঢেরার দিন মনসা বা সিঁজগাছের নীচে এই পূজা হয়। এই দিনগুলিতে ফলার করাই রীতি। ইহা ছাড়া শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে বা ভাদ্রের শনি বা মঙ্গলবারে এই দেশের কোন কোন স্থানে মনসাপূজা উপলক্ষে 'অরন্ধন' উৎসব পালিত হয়। উৎসব-দিনের পূর্বরাত্রিতে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করা হয় এবং উৎসবদিনে সিঁজগাছে মনসা পূজা করিয়া এইসব ভোজ্য নিবেদন করা হয়। কয়েকটি বিশেষ ব্যঞ্জনের মধ্যে থাকে 'নারিকেল কুমড়ি', কচুশাকঘণ্ট, নারিকেল ভাজা, সজিনাশাক ভাজা, ওলভাজা, জমাটবাঁধা ডাল ও ইলিশমাছ ভাজা। এই অরন্ধন উৎসব বাংলার বহু অঞ্চলে সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়।

শীতলা এক বিশিষ্ট গ্রাম্যদেবী। মহকুমার প্রায় সব গ্রামেই এই দেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই দেবীর বার্ষিক পূজা মহাসমারোহে হয়। পরে গ্রামের কোন প্রাচীন বট বা অশ্বত্থবৃক্ষতলে যোগিনীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হরির লুট বা হরিপূজা হয় তুলসীতলায়। বিল্ববৃক্ষতলে দুর্গাদেবীর শারদীয় বোধন হয়। দাসপুর থানার ক্ষেপুতগ্রামের বটতলায় পঞ্চানন্দ বা বটুকভৈরব, জোতঘনশ্যাম ও জয়রামচকের শেওড়াতলায় দক্ষিণরায়ের পূজা ও বনভোজন হয়। জোতঘনশ্যামের দক্ষিণরায়কে গাঁজা মানসিক করিলে হারানো জিনিস পাওয়া যায়। সম্ভবত ভূরশিটরাজবংশের দক্ষিণরায় ব্রাহ্মণভূম রাজবংশের বাঁকুড়া রায়ের মতই দেবতায় পরিণত হইয়াছেন। ইনি ব্যাঘ্রের দেবতা। চন্দ্রকোণার গাছশীতলামাড়োয় গাছশীতলামাতা, ক্ষীরপাই-কাশীগঞ্জে ও জাড়ায় সেওড়াতলে ভাণ্ডারচণ্ডীমাতার পূজা হয়। রাধানগর ও ক্ষীরপাইয়ের মাঝামাঝি ব্রজমোহনপুর গ্রামে পাকা রাস্তার ধারে বৃক্ষতলে ক্ষেত্রপাল দেবতা আছেন। এই স্থানে সিন্দূরলিপ্ত মাকড়াপাথরের কতকগুলি খণ্ড ক্ষেত্রপাল দেবতারূপে পূজিত হন। ইনি এক স্থানীয় জাগ্রত দেবতা। যাত্রিসাধারণ মানসিক পূরণের জন্য ইঁহার নিকট মানত করেন এবং পয়সা প্রভৃতি দেবস্থানে নিঃক্ষেপ করেন। দাসপুর থানার রানীচকের চক্রবর্তীবাটীতে ক্ষেত্রপাল নামে শিলা পূজিত হন।

মকরসংক্রান্তি বা মাঘের প্রথম দিনে বৃক্ষতলে বড়াম বা গরাম পূজায় পারাবতাদি বলি হয়। পূজক খেঁড়ে জাতীয়। তিনিই বলি দেন। কোন মন্ত্র বলেন না। এই অনুষ্ঠানে নাচ-গান-বাজনাও হয়। চন্দ্রকোণা থানার ক্ষীরপাই ও দাসপুর থানার সরবেড়িয়া গ্রামে বড়াম ঠাকুর আছেন। ঘাটালের বড়ামতলার দেবতা শিব। তাঁহার গাজন প্রভৃতি হয়।

ধর্মঠাকুর

ধর্মপূজা ঘাটালের বহু গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রচলিত আছে। এই মহকুমার তিনটি থানার মধ্যে ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানায় ধর্মের বহু প্রস্তর-আসন ও কূর্মমূর্তি আছে। দাসপুর থানারও বহু গ্রামে ধর্মের মন্দির আছে। ঘাটাল থানার বীরসিংহের নিকটবর্তী একটি ধর্মমন্দিরে বহু ধর্মঠাকুরের সংগ্রহ আছে। অনেকগুলির কূর্মমূর্তি। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ একটি 'রেপ্লিকা' বা প্রতিকৃতি মন্দিরও এই স্থানে আছে। এখানে বাঁকুড়া রায়, জঙ্গালি, ক্ষুদিরায়, কালুরায়, দলুরায়, যাত্রাসিদ্ধি প্রভৃতি বারোটি ধর্মঠাকুর আছেন। রায়বাঘিনী, কালীবুড়ী ইহার ধর্মকামিন্যা। কালীবুড়ী স্বপ্ন দিয়া আসেন। পূজক বাগ্‌দী। ইহাদের

ঝিউড়িরূপে কামিন্‌খ্যাদের স্থিতি। এখানে অক্ষয় তৃতীয়ায় গ্রহবরণ উৎসব সুরু এবং প্রতিপদে শেষ হয়। রাসপূর্ণিমার পর কৃষ্ণানবমীতে রাস আর দোলপূর্ণিমার পর কৃষ্ণানবমীতে দোল হয়। গ্রহবরণ উৎসবে পাঁঠাবলি হয়। একটি পাঁঠাকে পরবর্তী উৎসবে বলির জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার নাম লুয়ে বা লুইধর। কবি রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকায় মৈত্রায়ণী সংহিতোক্ত লুয়ে পাঁঠার উল্লেখ আছে। উদয়গঞ্জ-খড়ার পথের ধারে একটি মাটির মন্দিরে যাত্রাসিদ্ধি ধর্ম, কাঞ্চনী কামিন্‌খ্যা এবং অন্যান্য বহু ধর্মমূর্তি ও দেবী আছেন। পূজক বাগ্‌দী পণ্ডিত। বারুণীতে উৎসব ও বৈশাখী পূর্ণিমায় গাজন হয়।

চন্দ্রকোণা-গোবিন্দপুরের 'চাঁদনী' মন্দিরে চারটি চৌকির আকৃতির ধর্ম আছেন। এখানে অন্যত্র কলকলি ধর্মমন্দিরে মেয়েরা জ্যৈষ্ঠ মাসে মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করেন। কলকলি ধর্ম কয়েকটি কূর্মমূর্তি। ধর্মের চৌকি বা আসন এখানে আছে। মিত্রসেনপুর ও মল্লেশ্বরপুরের দুটি মন্দিরেও কলকলি ধর্মের আসন আছে।

ভাদ্রমাসের জিতাষ্টমীর জীমূতবাহন পূজাও ধর্মপূজা। একটি খাদ বা গর্তে কলাগাছ পুঁতিয়া রাত্রিকালে পূজা হয়। প্রধান নৈবেদ্য কড়াইভিজা। পরদিন পুঁইশাক, শসা, কচু, বেগুন, ঘুসোমাছ ও ভিজা কড়াই দিয়া একটি তরকারি করিয়া খাওয়া হয়। ভাদ্রের সংক্রান্তিতে ধর্মের উৎসব ও মেলা হয়। ঘুনি, মুগ্‌রি, জাল, ছিপ প্রভৃতি এই মেলায় বিক্রয় হয়। দাসপুর থানার বলিহারপুরে ও রামপুর-মানুয়ার হাটে এই মেলা বসে। চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত জাড়ার সন্নিহিত বারাগ্রামের ধর্ম কালু্ রায়। পাথরের চৌকির উপর দুইটি স্তরের উপরেরটিতে বৃত্ত বা শূন্য। চৌকির তলায় ধর্মচক্র। পৈতা বা আংটিধারী ডোমপণ্ডিত পূজা করেন। ধবল ও কুষ্ঠের ঔষধ এখানে পাওয়া যায়। ইহা খাইতে ও মাখিতে হয়। ভাদ্র-সংক্রান্তিতে উৎসব ও বৈশাখে গাজন হয়।

দাসপুর থানার গোপালপুরে কাঁকড়াবিছা ধর্মের স্থানে বাতের ঔষধ পাওয়া যায়। দুর্গোৎসববিধানে ইহার পূজা হয়। ইহার মাহাত্ম্য এই অঞ্চলে সুবিদিত। ঘাটাল শহরের নানাস্থানে কোন্নগর, গম্ভীরনগর, রথতলা প্রভৃতি এলাকায় কয়েকটি ধর্মমন্দিরে বহু ধর্মঠাকুর আছেন। এইসব স্থানে বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে ধর্মের বিশেষ পূজা, উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে খুব ভোরে কোন কোন স্থানে ধানজমিতে আগুন জ্বালানো হয়। এই দিনে ব্যবসায়ীদের নূতন খাতা বা হালখাতা হয়।



'শীতলামঙ্গল' গান



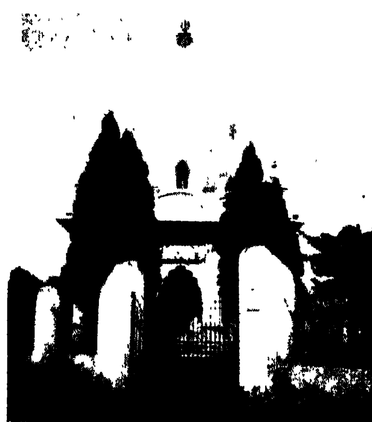
'চণ্ডীমঙ্গল' গান



চেতুয়া-বাসদেবপুরের (দাসপুর) শ্মশানকালীর প্রতিমা



জনৈক ব্রজবাসীর মূর্তি,
চৈতন্যমঠ, নিমতলা



নয়াগঞ্জ বড় অস্থলের নবনিমিত
দেবালয়, চন্দ্রকোণা

পূর্বে জমিদারের এই দিনে 'পুণ্যাহ' হইত। সকালে পূজা হোমাদির পর ক্রেতা ও প্রজাগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া জমিদারের কাছারীতে টাকা জমা দিতেন। চাউলগুঁড়ার একপ্রকার মিষ্টান্নের দ্বারা ইহাদের আপ্যায়ন হইত। ভাজা চাউল গুঁড়া ও গুড়ের ঐরূপ মিষ্টান্ন এখন লুপ্ত। উহা 'চালের নাড়ু' নামে পরিচিত ছিল। মেদিনীপুরের মল্লিকদের কুঞ্জপুর কাছারীতে ঐদিন ব্রাহ্মণদের পক্কান্নাদি খাওয়ানো হইত। এদেশে বহু স্থানে এইদিন গঙ্গাপূজা হয়। মকরবাহিনী গঙ্গার মূর্তিপূজা নদীতীরবর্তী বহু স্থানে হয়। দাসপুর থানার ডুধকামরার হাটে ইনি বারোয়ারীরূপে অর্চিতা হন। পূজায় আড়ম্বরও হয়। মকরসংক্রান্তির দিন ঘাটাল শহর ও আরও কয়েকটি স্থানে এই পূজা উপলক্ষে মেলা হয়। বারুণীর সময় দাসপুর থানার কল্‌মিজোড় ও আরও কয়েকটি স্থানে গঙ্গাপূজা ও মেলা হয়। এই থানার গৌরাগ্রামের প্রাচীন গঙ্গামন্দিরে (বর্তমানে নবকলেবর প্রাপ্ত) কাষ্ঠ-নির্মিত মকরবাহিনী গঙ্গার বার্ষিক পূজা ও মেলা বারুণীতে অনুষ্ঠিত হয়। এখন সর্বত্র উৎসব ও মেলায় ভাটা পড়িয়াছে। দশহরাতেও মহকুমার নানাস্থানে গঙ্গাপূজার প্রচলন আছে।

বাংলা নববর্ষের উৎসব

গোপজাতি-অধ্যুষিত দাসপুর থানার সরবেড়িয়া, চেতুয়া-রাজনগর, নির্ভয়পুর ও বলিহারপুর এবং ঘাটাল প্রভৃতি স্থানে পয়লা বৈশাখে চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী ও ভগবতীর মহাপূজা হয়। তিনদিন ধরিয়া পূজা চলে। মাঙ্‌রুল গ্রামে (চন্দ্রকোণা থানা) বিখ্যাত ভগবতী-মেলা হয়। প্রায় সর্বত্রই এই অনুষ্ঠানে গাভীসমূহকে স্নান করাইয়া পূজা করা হয়। কর্‌জা-জাতীয় ব্যক্তিরাও এই পূজা ও উৎসব করেন। কৈগেড়ের (দাসপুর) মধ্বাচার্যমঠে প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে পয়লা বৈশাখ বহু বৈষ্ণব বাউলের সমাবেশ হয়। উৎসবে দেবতাকে ভোগনিবেদনের পর ভোজন ও নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ক্ষেপুত, সরবেড়িয়া, ঘাটাল, ক্ষীরপাই প্রভৃতি স্থানে গন্ধবণিকগণ ব্যক্তিগত বা বারোয়ারী গন্ধাসুরঘাতিনী সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা গন্ধেশ্বরী দেবীর পূজা করেন। এই উপলক্ষে উৎসবে সমারোহ হয়। সারা বৈশাখ মাস ধরিয়া অশ্বত্থ ও তুলসীবৃক্ষে জল দেওয়ার প্রথা আছে। ঐ দুই গাছে ও শিবলিঙ্গে এবং শালগ্রামশিলায় 'বসুধারা' দিতে হয়। অক্ষয় তৃতীয়া ও বৈশাখী সংক্রান্তিতে কেহ কেহ নূতন খাতা করেন। ঘটোৎসর্গও হয়। কুম্ভকারগণের চাকপূজাও এই দিনগুলিতে হয়। সারা মাস ধরিয়া তাহাদের কোন 'পুয়ান' জ্বালানো হয় না।

বাসুদেবপুরে (দাসপুর) বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর রথযাত্রা ও মেলা হয়। নিকটবর্তী কামারনালার কাছে প্রাচীন প্রশস্ত রথতলা দিয়া এই রথ চলে এবং অষ্টম প্রহর ও মালসাভোগ বিতরণাদি হয়। পূর্বে এই সময় গ্রামের বারোয়ারীর আটচালায়ও অষ্টম প্রহর হইত। পুরাতন রথ নষ্ট হইবার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আবার নূতন রথ নির্মিত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে এই মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে কেহ কেহ জলসত্রও দেন। অশ্বত্থাদিবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাও হয়।

নিমতলার (ঘাটাল) হেমন্তনাথ. শিবের গাজন বৈশাখ মাসের শেষ দিকে সুরু হইয়া সংক্রান্তিতে শেষ হয়। ইহা ছাড়া নানা গ্রামে বহু শিব ও ধর্মমন্দিরে বৈশাখী গাজন হয়। এই সময় গাজনের প্রথম রাত্রিতে মাগুর মাছ কাটা হয়। এইজন্য বহু মন্দিরে তরবারি থাকে। ভক্তগণ সন্ন্যাস লইয়া ধুনাসেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেন। বাজনা বাজাইতে বাজাইতে দেউলবাঁশ কোন কোন গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। গৃহস্থগণ বাঁশে কাপড় বা গামছা বাঁধিয়া দেন। চাউল ও দক্ষিণাদিও দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও শিবায়ন গানও হয়।

চৈত্রী গাজন চৈত্র মাসের শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া সংক্রান্তিতে শেষ হয়। গ্রাম-গ্রামান্তরের বহু শিবমন্দির পাঁচভোগ, সাতভোগ ও নয়ভোগের মাড়ো নামে পরিচিত। পাঁচভোগ মাস শেষ হওয়ার পাঁচ দিন, সাতভোগ সাতদিন ও নয়ভোগ নয়দিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়।

বারো মাসে তেরো পার্বণ

বৈশাখ মাসে পঞ্জিকানির্দিষ্ট ধ্বজারোপণ, ষট্‌পঞ্চমী, সীতানবমী, পিপীতকী ও রুক্মিণী দ্বাদশী, নৃসিংহ চতুর্দশী, বলরামজীউর উৎসব, শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল প্রভৃতি ব্রত ও উৎসব স্থানে স্থানে হয়। মেয়েরা ফলদান, পুণ্যিপুকুর, গোকুল ব্রত প্রভৃতি করেন। গোস্বামি-মতে কেশবব্রতও হয়। অনেক স্থলে অষ্টম প্রহর, চব্বিশ প্রহর, নবকুঞ্জ, চৌদ্দমাদল প্রভৃতি নামযজ্ঞ এই মাসেই হয়। চন্দ্রকোণায় নবকুঞ্জ স্থান আছে। ইহা চন্দ্রকোণা গোঁসাই বাজারে প্রেমসুখী গোস্বামীর সমাধির নিকটবর্তী। এখানে ফাল্গুন মাসে নবকুঞ্জ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

জ্যৈষ্ঠের প্রতি মঙ্গলবার নারীগণ মঙ্গলব্রত করেন। প্রতি নারীর জন্য ষোলটি কাঁঠালপাতা ও বেলপাতার ডিঙা পাতিয়া উহাতে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হয়। ব্রতকারিণীরা ঐদিন অন্নভোজন করেন না। জামাই-ষষ্ঠীর দিন ষষ্ঠী পূজার পর জামাতাকে নানাভাবে আপ্যায়ন করিয়া মেয়েরা আনন্দ করেন। সাবিত্রী চতুর্দশীর রাত্রিতে কোন কোন নারী অবৈধব্য কামনায় সাবিত্রীব্রত ও

ও আনুষঙ্গিক ভোজনাদি করান। এই চতুর্দশীর রাত্রিতে সুরতপুরে (দাসপুর) মহাসমারোহে বারোয়ারী শ্মশানকালী পূজা হয়।

বৈশাখী অমাবস্যার দিবাভাগে শ্মশানকালীর পূজা এদেশের একটি প্রধান উৎসব। চেতুয়া-বাসুদেবপুরের (দাসপুর) শ্মশানকালী পূজা এইদিন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সন ১২৪০ সালে এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দিলে ইহার প্রতিকারকল্পে গ্রামবাসীরা এই পূজার ব্যবস্থা করেন। গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ ও স্থানীয় বিশিষ্ট অধ্যাপক উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের মতানুসারে এই পূজা প্রবর্তিত হয়। মহাকালের বক্ষে দণ্ডায়মানা দ্বিভুজা শ্মশানকালী বিকটাকৃতি। তাঁহার বামহস্তে কারণপাত্র ও দক্ষিণহস্তে সদ্য কর্তিত নৃমুণ্ড।

দেবীর ধ্যান :

ওঁ অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতিভৈরবাম্॥
পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণং সমাংসকম্।
সদ্যঃপূর্ণ শিরোক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্॥
স্মিতবক্ত্রাং সদাচাম-মাংসচর্বণতৎপরাম্।
নানালঙ্কারভূষাঙ্গীং নগ্নাং মত্তাং সদাসবৈঃ॥

দুই পাশে জয়া ও বিজয়া। বহু প্রকার ফল, পক্বান্ন, মিষ্টান্নাদি নৈবেদ্য। কুমড়া, ছাগ-মেষ-মহিষবলি, চণ্ডীমঙ্গল-গান, বাজনা, নাচ প্রভৃতির মাধ্যমে এই পূজা মহাসমারোহে হয়। পূজার পূর্বদিন গ্রাম্যদেবদেবী শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ ও জয়চণ্ডীরও ছাগ-মেষ-মহিষ বলি দিয়া পূজা হয় এবং শীতলামঙ্গল গানও হইয়া থাকে। এই গান ও চণ্ডীমঙ্গল গানের পূর্ব রাত্রিতে 'জাগরণ' হয়। পূজার দিন ধর্ম প্রভৃতি অন্যান্য গ্রাম্য দেবদেবীর নিকট পূজা পাঠানো হয়।

বৈশাখী অমাবস্যার এই শ্মশানকালী পূজা একই দিনে সেকেন্দারী ও ঢোলে এবং জয়কৃষ্ণপুর, রসিকগঞ্জ ও লাওদা গ্রামেও (দাসপুর) হয়। কিন্তু বাসুদেবপুরের মত এত সমারোহ হয় না। ইহা ছাড়া দাসপুর, রাধাকান্তপুর, চাঁদপুর, বলিহারপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহেও এই ধরণের শ্মশানকালী পূজা ও উৎসব-অনুষ্ঠান হয়। তবে পূজা অমাবস্যায় হয় না। মনোহরপুরে (দাসপুর) এই পূজা রাত্রিকালে হয়। ক্ষেপুতে দীর্ঘকাল পরে পরে এই পূজা হয়। ব্রাহ্মণবসানে (দাসপুর) পূর্বে এই পূজা হইত। এখন আর হয় না। ক্ষীরপাই ও রামজীবনপুরে (চন্দ্রকোণা) অনিয়মিতভাবে পূজা হয়। ক্ষীরপাইয়ের পূজা আগে চাউলকাঁটায় হইত, এখন কাছারীবাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখানে

প্রধান দেবীমূর্তির সহিত নানাবিধ পুত্তলও হইত। রামজীবনপুরে ছয় বৎসর পরে পরে রক্ষাকালী পূজা হয়। প্রবাদ, ঠাকুরমণ্ডপে জনৈক নাপিত-জাতীয় ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইলে গ্রামস্থ সকলে বাদ্যভাণ্ড-সহযোগে গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের মাঠে উপস্থিত হন। তারপর যেখানে পাঁচটি শঙ্খচিল উড়িতেছে দেখা গেল সেই স্থানের মাটি লইয়া মূর্তি গঠন করা হইল। জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়ের প্রথম কৃষ্ণা চতুর্দশীতে এই পূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। দশটি গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এই পূজায় নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। পূজাশেষে পরদিন সকালে তাঁহাদিগকে ফল ও মিষ্টান্ন ভোজন করানো হয়। একদিন কাঙালী-ভোজনও হয়।

সর্বাপেক্ষা বেশি সমারোহ দেখা যায় খড়ারের পূজায়। প্রধান দেবী কালীমাতার উচ্চতা পূর্বে ত্রিশ হাত হইত। পৌরাণিক ও সামাজিক কাহিনীর বহু পুত্তলিকা গঠিত হইয়া চার মাস বর্তমান থাকিত। ছড়া ও গানে পূজার বিবরণ ছাপা হইত। ভূরিভোজন ও বস্ত্র লাভ করিয়া কাঙালীরা তৃপ্ত হইত। তিন সপ্তাহ ধরিয়া থিয়েটার, যাত্রা, নাচ-গান প্রভৃতি চলিত। প্রতিদিন বহু দর্শক আসিতেন।

আষাঢ়ের প্রধান উৎসব রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা পঞ্জিকানির্দিষ্ট দিনে হয়। তিওরবেড়িয়ার (দাসপুর) পিতলের নবরত্ন রথ এদেশে বিশেষ পরিচিত। ঐ গ্রামের অবিনাশ সামন্ত কলিকাতায় ব্যবসায়ে ধনী হইয়া গৃহদেবতাগণের মন্দির ও রথ নির্মাণ করান। রথযাত্রা উপলক্ষে এইখানে বড় মেলা হয়। খাঞ্জাপুর (দাসপুর) ও চন্দ্রকোণার রথ ও মেলা প্রসিদ্ধ। বৈকুণ্ঠপুর (দাসপুর) নিম্বার্কমঠের পিতলের একরত্ন রথ ছোট ও অলংকরণযুক্ত। রথযাত্রা ও তদুপলক্ষে মেলা এদেশের নানাস্থানে হয়।

আষাঢ়ের গোড়ার দিকে অম্বুবাচীতে কোন অনুষ্ঠান হয় না। মাত্র পাঁচদিন অম্বুবাচী থাকে। এই সময় আম ও কাঁচা দুধ খাওয়া নিয়ম। মাটি খোঁড়া বারণ। এই মাসের কোন শনি ও মঙ্গলবারে ব্যাপকভাবে বিপত্তারিণী পূজার অনুষ্ঠান হয়। নানা উপচারে পূজা, বিপত্তারিণীর মাহাত্ম্য-শ্রবণ ও লালসুতার ডুরি বাঁধা হয়। এই মাসের শুক্লা পঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী বলে। এই দিন মনসা গাছে অষ্টনাগের পূজা ও অরন্ধন অনুষ্ঠান হয়। অবশ্য বিবস্বৎ-সপ্তমীতে সূর্য-পূজা কমই হয়। বৃষ্টি না হইলে কোথাও কোথাও ইন্দ্রপূজা হয়। গ্রাম্য দেবতাগণের বার্ষিক পূজা চৈত্রে অনুষ্ঠিত না হইলে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যেই করিতে হয়। গিন্নীরা আষাঢ় মাসের কোন শনি ও মঙ্গলবারে গ্রামের শীতলাতলায় গিন্নীফলার করেন। শুক্লপক্ষেই ইহা হয়।

নিম্বার্কমঠে শয়নৈকাদশীতে হরিশয়ন অনুষ্ঠান হয়। ইহার পর কলমিশাক খাইতে নাই।

শ্রাবণের প্রধান উৎসব ঝুলনযাত্রা। বৈকুণ্ঠপুর নিম্বার্কমঠে (দাসপুর) তেরদিন ধরিয়া শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই ঝুলন উৎসব আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়। ঐ সময় মঠের বিহারীলাল জীউ প্রভৃতি দেবতাগণ নিত্য নব নব বেশে সজ্জিত হন। গান-বাজনা, যাত্রা, মেলা প্রভৃতি হইয়া থাকে। দেবগণকে দোলায় চড়াইয়া দোল দেওয়া হয়। অন্যত্র একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ব্যাপকভাবে এই উৎসব হয়। শুক্লা ষষ্ঠীতে হয় লুণ্ঠন ষষ্ঠী-পূজা। শনি বা মঙ্গলবারে মনসাগাছে মনসা পূজা করিয়া 'খইঢেরা' উৎসব হয়।

ভাদ্রের প্রধান উৎসব জন্মাষ্টমী। এদেশের মঠে-মন্দিরে এই উৎসব বিশেষভাবে চলে। মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কল্পনা করিয়া পূজাদি অনুষ্ঠান হয়। চাউল-কড়াই প্রভৃতি নানা প্রকারের ভাজা, মিষ্টান্ন, পিষ্টকাদি নিবেদন ও ব্রতকথা পাঠ করা হয়। পরদিন সকালে দাই, ধোপা প্রভৃতি প্রসাদ লাভের আশায় আসে। গৌণভাদ্রের এই অনুষ্ঠান কখনও কখনও শ্রাবণেও হয়। এই মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর চাঁদ দেখিতে নাই। কোথাও কোথাও এই রাত্রিতে চুরি, মারামারি প্রভৃতি হয়। পরদিন স্যমন্তক উপাখ্যান শুনিয়া "সিংহপ্রসেনজিৎ" ইত্যাদি মন্ত্রপড়া জল খাইতে হয়। জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসবে কীর্তন ও দধিকর্দমে কাদায় গড়াগড়ি দেওয়া হয়। নাড়াজোলের (দাসপুর) মদনমোহন জীউর অস্থলের দ্বারা পরিচালিত জন্মাষ্টমীর পরবর্তী চতুর্দশী ও অমাবস্যায় কালীয়দমন নামক উৎসবে নিকটবর্তী কাঁসাইনদীতে নৌবিহার ও বাচ্‌খেলা তিনদিন ধরিয়া চলে। প্রথম দিন নীচের দিকে দুঃশাসপুর বাংলো পর্যন্ত, দ্বিতীয় দিন উপর দিকে মগরা পর্যন্ত মদনমোহন জীউসহ নাম সংকীর্তন করিতে করিতে পাঁচখানি হইতে কুড়িখানি পর্যন্ত নৌকার শোভাযাত্রা চলে। এই সময় বহু টাকা প্রণামী আদায় হয়। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান হয় নাড়াজোল বাজারে। মদনমোহনজীউ অস্থলটি গোপীবল্লভপুর পাটের একটি শাখা।

এই মাসের শুক্লপক্ষকে ব্রতপক্ষ বলে। কৌশী অমাবস্যায় কুশচয়ন একটি প্রাচীন প্রথা। ঐ তিথিতে অনেকে আলোকামাবস্যা ব্রত করিয়া থাকেন। শুক্লা তৃতীয়ায় হরিতালিকা, চতুর্থীতে কৃষ্ণকলঙ্কিনী, পঞ্চমীতে ষট্‌পঞ্চমী, ষষ্ঠীতে মন্থন বা চর্পটা ষষ্ঠী, সপ্তমীতে ললিতা ও কুক্কুটী সপ্তমী, অষ্টমীতে দূর্বাষ্টমী ও

রাধাষ্টমী, নবমীতে তালনবমী, একাদশীতে হরির পার্শ্বপরিবর্তন, দ্বাদশীতে শ্রবণা ও বামন দ্বাদশী ও শক্রোত্থান, চতুর্দশীতে অনন্তচতুর্দশীর ব্রতগুলি অনুষ্ঠিত হয়। দূর্বাষ্টমীর দিন গোয়ালে ভগবতী পূজা করিয়া একটি ঝিঙা বা শসা বলি হয়। সমগ্র কৃষ্ণপক্ষ ধরিয়া পিতৃতর্পণ ও শ্রাদ্ধ চলে। কেহ কেহ মহালয়ায় পার্বণশ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান। বৈকুণ্ঠপুর-নিম্বার্ক মঠে এইদিন পাদুকাপার্বণ হয়।

জিতাষ্টমীর কথা আগেই বলা হইয়াছে। পরদিন কৃষ্ণানবমীতে দুর্গাদেবীর বোধন আরম্ভ হইয়া শুক্লাদশমী পর্যন্ত প্রতিদিন দুইবেলা পূজারতি চলে। প্রাতঃকালে চণ্ডীপাঠ হয়। ধান্যস্তূপে লক্ষ্মীপূজা এই মাসের বিশেষ অনুষ্ঠান। এই মাসের শনিবার বা মঙ্গলবার কিংবা সংক্রান্তিতে 'অরন্ধন' অনুষ্ঠান হয়। ইহার বিষয় আগেই বলা হইয়াছে। ভাদ্র-সংক্রান্তিতে শিল্পি-সম্প্রদায়েরা বিশ্বকর্মা পূজার অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে হস্তিবাহন বিশ্বকর্মা মূর্তির পূজা হয়। শাঁখারিরা এই দিন মহাসমারোহে অগস্ত্যমুনির প্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন। কয়েকদিন ধরিয়া উৎসব চলে। কল্‌মিজোড় গ্রামে (দাসপুর) কাঁসাই নদীর উত্তর তীরে সূত্রধর-গৃহে (ছুতোর) বিশ্বকর্মার মূর্তি এবং নদীর পরপারে শাঁখারিদের বারোয়ারী অগস্ত্যমুনি পূজা হয়।

আশ্বিনের বিরাট্ উৎসব দুর্গাপূজা। এদেশে চতুর্ভুজা কাত্যায়নী, জয়চণ্ডী, দশভুজা, অষ্টাদশভুজা এবং বৃষবাহনা শিবদুর্গার পূজা হয়। গন্ধবণিকগণই শিবদুর্গার পূজা করেন। ক্ষীরপাইয়ের (চন্দ্রকোণা) হালদারবংশে ঐরূপ পূজা হয়। গ্রামের শীতলা, বিশালাক্ষী প্রভৃতি দেবীরও দুর্গোৎসব বিধানে পূজা হয়। কোন কোন স্থানে মাত্র নবমী ও দশমীতে 'ঘটে' অথবা মঙ্গলচণ্ডীর ঘটে পূজা হয়। দাসপুরের সন্নিহিত নলদহ গ্রামের চক্রবর্তীবংশে ও নিমতলার (ঘাটাল) তাম্বুলীবংশে চতুর্ভুজা কাত্যায়নী দুর্গার পূজা হইত। চেতুয়া-বাসুদেবপুরের মালাকারদের বাড়িতে অষ্টভুজা জয়চণ্ডী দুর্গা আছেন। ইহার নিত্য পূজা হয়। দুর্গাপূজার সময় বিশেষ পূজা চলে। বলিহারপুরের (দাসপুর) বাণীভূষণ ভট্টাচার্যের বংশে ও হাটগেছিয়ার (দাসপুর) হরিতকীতলার চক্রবর্তী বংশে আঠার হাত দুর্গার নবম্যাদিকল্পাত্মক পূজা-অনুষ্ঠানে বলিদান প্রভৃতি হয়। প্রতিমায় কার্তিক-গণেশ উপরে এবং নীচে লক্ষ্মী-সরস্বতী থাকেন।

এদেশের দুর্গোৎসব

ক্ষীরপাইয়ের হালদারবংশ ছাড়া অন্যান্য সমৃদ্ধ গন্ধবণিক বংশে শিবদুর্গার পূজা হয়। দশভুজা দুর্গার মূর্তিই এইদেশে বেশি। দাসপুরের চৌধুরী,

বলিহারপুর ও চেতুয়া-বাসুদেবপুরের রায়, (বর্তমানে এই পূজা আর হয় না), রাধাকান্তপুরের তালুকদার বসু ও সয়লার (দাসপুর) সিংহবংশের পূজা প্রাচীন। এইসব বংশের প্রতিমায় কার্ত্তিক-গণেশের মূর্তি লক্ষ্মী-সরস্বতী মূর্ত্তির উপরে স্থাপিত থাকাই রীতি।

দুর্গাপূজায় সন্ধিপূজা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় সব স্থানেই উপযুক্ত গাম্ভীর্য রক্ষা করা হয়। অষ্টমীর শেষ ও নবমীর আরম্ভকাল 'সন্ধি'। সময়-নির্ণয়ের জন্য বনেদী পরিবারের পূজায় 'তাঁবি' বসানো প্রথা পূর্বে ছিল। এক দণ্ডনির্ণায়ক একটি গোল তামার বাটির নীচে ছোট ছিদ্র থাকে। একটি মাটির হাঁড়িতে জল ভর্তি করিয়া জলের উপর বাটিটি ভাসাইতে হয়। বাটিটি সম্পূর্ণ ডুবিতে যে সময় লাগে তাহাতে একদণ্ড হয়। এইভাবে দণ্ডনির্ণয় করিয়া সন্ধিক্ষণ স্থির হয়। সন্ধিক্ষণে বাদ্যধ্বনি করা হয় এবং তাহা শুনিয়া ঐ গ্রামের ও কাছাকাছি আরও কয়েকটি গ্রামের সন্ধিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। আগে বাসুদেবপুরের রায়েদের পূজার বাদ্যধ্বনি শুনিয়া ঐ গ্রামের জয়চণ্ডীর আরতি হইত। এই ধ্বনি শুনিয়া পার্শ্ববর্তী বেথুয়াবাটী গ্রামের কালীমন্দিরে বলিদান ও তোপধ্বনি হইত এবং সেই তোপধ্বনি শুনিয়া কাছাকাছি রাধাকান্তপুর হইতে সয়লা পর্যন্ত সকল গ্রামের পূজা হইত।

এই সন্ধিপূজায় ক্ষেপুত গ্রামের ক্ষেপুতেশ্বরী ও বরদার (ঘাটাল) বিশালাক্ষী-মন্দিরে পাশাপাশি রাখা দুটি প্রদীপের শিখা সম্মিলিত হইয়া পূজার সময় নির্দেশ করিত। নাড়াজোলরাজের ও বরদার বিশালাক্ষীর পূজাস্থান হইতেও পূর্বে তোপধ্বনি হইত। উহার দ্বারাও দূর দূরান্তের পূজা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারিত।

দুর্গাপূজায় নবমীর রাত্রিতে কোন কোন স্থানে শিবাভোগের প্রথা পূর্বে ছিল। পায়স রাঁধিয়া বনে শৃগালের জন্য রাখিয়া আসা হইত। দশমীর বিসর্জনের পর পরিবারের জ্যেষ্ঠক্রমে সকলের হাতে অপরাজিতা লতা বাঁধিয়া দিয়া গুরুজনদের প্রণাম ও প্রীতি-আলিঙ্গনাদি এখনও চলে। বাসুদেবপুরে পূর্বে বিজয়া দশমীর জোর মেলা হইত। গ্রামের একত্রিশখানি প্রতিমা শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামস্থ জয়চণ্ডীর দীঘিতে ভাসানো হইত। পূর্ণিমায় দেবীপক্ষ শেষ হয়। এইদিন কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হয়। প্রায় প্রতি ঘরেই দেবীকে চিঁড়া, নারিকেল ও গুড় নিবেদন করা হয়। আশ্বিন-সংক্রান্তিতে বাগ্‌দি জাতীয় কোন কোন পরিবারে রাত্রিতে মনসাপূজা হয়। বাগ্‌দিরা সম্মিলিতভাবে মনসার বারোয়ারি পূজাও করেন। পরের দিন নানা গুণিন্, ওস্তাদ্ প্রভৃতিরা সাপ লইয়া

ঝাঁপান খেলা দেখান। মনসামঙ্গল গানও এইসময় হয়। এইদিন ধানজমিতে নলবাঁধা নিয়ম।

কার্ত্তিকমাসের বিশেষ পার্বণ কালী, জগদ্ধাত্রী ও কার্ত্তিক পূজা। কালীপূজার পূর্বদিন ভূতচতুর্দশীতে ওল, কেঁউ প্রভৃতি চৌদ্দশাক এইদেশে প্রায় ঘরে ঘরে খাওয়া হয়। ঐ শাক ধোওয়া জলে পিটুলি গুলিয়া দেওয়ালে চৌদ্দ ফোঁটা দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় চৌদ্দ প্রদীপ দেওয়ার রীতি। কার্ত্তিকের প্রথম দিন হইতেই কোন কোন গৃহ, মঠ ও মন্দিরে আকাশপ্রদীপ দেওয়া হয়। চতুর্দশীর সন্ধ্যায় কলাগাছের খোলায় পিটুলির লক্ষ্মীনারায়ণ ও কুবেরের মূর্তি গড়িয়া ঘরে ঘরে পূজা হয়। এই পূজা আরম্ভ হওয়ার আগে ষাঁড়ের গোবরে অলক্ষ্মী মূর্তি গড়িয়া ও তাহাতে ছেঁড়া চুল দিয়া বাঁ হাতে পূজা করিয়া কুলো বাজাইতে বাজাইতে পাটকাঠি জ্বালিয়া কোন পরিত্যক্তস্থানে বিদায় করা হয়। ছেলেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে যায়—

অলক্ষ্মী বিদায় হ'
ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আয়।

পরের দিন অমাবস্যায় মধ্যরাত্রে দক্ষিণাকালীর পূজা হয়। পূর্বে চেতুয়া-বাসুদেবপুর গ্রামে পাঁচটি পূজা হইত। এখন দুএকটি হয়। নাড়াজোলের কাছাকাছি সামাট গ্রামের কালীমন্দিরে এইদিন সাড়ম্বরে পূজা হয়। শ্রীবরা, ক্ষেপুত, ক্ষীরপাই ও চন্দ্রকোণার মিত্রসেনপুরে ধুমধাম করিয়া পূজার অনুষ্ঠান হয়। পরের দিন প্রতিপদের রাত্রিতে মেয়েরা গোরুর মাথায় সিঁদুর ও গলায় মালা দিয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া পূজা করেন। এই দিন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্থল বা মঠে অন্নকূট উৎসব। পূর্বে এইসব মঠে নানা তরিতরকারি ও মিষ্টান্ন, পায়স প্রভৃতির দ্বারা দেবতাদের ভোগ হইত এবং অভ্যাগতবৃন্দকে সেই প্রসাদ বিতরণ করা হইত। বৈকুণ্ঠপুরের নিম্বার্কমঠের প্রসাদী মালপোয়া পূর্বে গ্রামস্থ অধ্যাপকপণ্ডিতদের গৃহে এবং নাড়াজোল রাজবাড়ীতে পাঠান হইত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব ঘরে ঘরে হয়। ক্ষেপুতের নাগপরিবারের মন্মথনাথ নাগ এইদিন চিত্রগুপ্তমূর্তির পূজা করিয়া কায়স্থসভার আয়োজন করিতেন। পরবর্তী নবমীতে জগদ্ধাত্রীর পূজা উৎসব হয়। সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় তিনবার বলিদান, ভোগারতি প্রভৃতির দ্বারা দেবীর পূজা করা হয়। পলতাবেড়িয়া গ্রামে (দাসপুর) পূর্বে একটি বারোয়ারী জগদ্ধাত্রীপূজা ধূমধামের সঙ্গে হইত। এখানে দেবীকে বিরিকড়াইয়ের খিচুড়ির ভোগ দেওয়া হইত। জনশ্রুতি, প্রায় দু'শ বছর আগে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্ন দেখিয়া বাংলাদেশে এই পূজার প্রবর্তন করেন।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাসযাত্রা হয়। চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানের ঠাকুরবাড়ী, জমিদার ও বনেদীপরিবারের গৃহদেবতাদের রাসযাত্রা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমার বহুগ্রামে প্রাচীন রাসমঞ্চ আছে। চন্দ্রকোণার নানকমঠে নানকের জন্মোৎসব হয়। ক্ষীরপাই ও পার্শ্ববর্তী অনেক স্থানে ভোজনাদি ও যাত্রাভিনয় আগে হইত। কার্ত্তিকসংক্রান্তির রাত্রিতে চারিপ্রহরে চারিবার নানাপ্রকার খেলনা ও মুড়কি প্রভৃতি উপচার দিয়া কার্ত্তিকের পূজা হয়। গ্রামবাসীদের কেহ কেহ পূর্ব্বরাত্রে অপুত্রকগণের বাড়ীতে গোপনে কার্ত্তিকমূর্ত্তি রাখিয়া আসেন। মূর্ত্তির হাতে বৃহৎ ফর্দ থাকে। অপুত্রকগণ পূজা করিতে বাধ্য হন। এই দিন একটি মাটির সরায় কাদার উপর ধান, যব প্রভৃতি গাছ এবং কল্‌মি প্রভৃতি দুয়েকটি লতাগুল্ম রাখিয়া সারা অগ্রহায়ণ মাস ইতু ঠাকুরের পূজা হয়। কেহ কেহ এই মাসের প্রতি রবিবার এই পূজা করেন। এই মাসের সংক্রান্তিতে ইতুঠাকুরের শেষ পূজা। ঐদিন রাত্রিতে চালগুঁড়ি, তালআঁটি ও নারিকেলের দ্বারা আঁসকে পিঠে করা নিয়ম। পূজার পর ইতুর কথা শোনান হয়। পরদিন খুব ভোরে বিসর্জন হয়।

ষট্‌পঞ্চমী, গুহষষ্ঠী, মিত্রসপ্তমী, অখণ্ডদানদ্বাদশী, পাষাণচতুর্দশী অগ্রহায়ণ মাসের অন্যান্য ব্রত। প্রতি বৃহস্পতিবার বহু গৃহে লক্ষ্মীপূজা হয়। চারি বারে চারিপ্রকার কড়াইভিজা এই পূজার নৈবেদ্য। বড়ির বিবাহ এই মাসের একটি উৎসব। একটি বড়ির মাথায় সিঁদুর ও আর একটি বড়ির মাথায় দূর্ব্বা দিয়া শাঁখ বাজাইয়া উৎসব স্থরু হয়। পরে নানা প্রকার জিলাপি ও গহনাবড়ি প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে।

পৌষ এদেশে প্রধান পার্ব্বণের মাস। পূর্ব্বপ্রথায় এই মাসের চার বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা তো হয়ই, অধিকন্তু, সংক্রান্তির আগের দিন হইতে দুই দিন ও পয়লা মাঘের সন্ধ্যায় বাহির লক্ষ্মীর পূজা হয়। লক্ষ্মীপূজার এই তিন দিন ঘরে ঘরে বেশ সমারোহ হয়। সাধারণভাবে এই তিন দিনের উৎসবকে বলা হয় 'পৌষপার্ব্বণ'। পার্ব্বণের প্রথম দিন রাত্রিতে খড়ের পাকানো দড়ির সঙ্গে একটি আমপাতা যুক্ত করা হয়। উহা 'বাউনি'। গৃহস্থের ঘরের দরজার কড়ায় এই বাউনি বাঁধা হয়। বাউনি বাঁধার মন্ত্র এই—

পৌষ-পার্ব্বণ

আউনি বাউনি
তিন দিন ধরে ঘরে বসে পিঠে ভাত খাউনি,
দূর দেশ না যেয়ো—
তিন দিন ধরে ঘরে বসে পিঠেভাত খেয়ো।

এই তিন দিন নানা রকমের ফলমূল ও আলোচালের নৈবেদ্য দিয়া পূজার পর ভাত, নানা তরিতরকারি, পায়স ও পিঠা ভোগ দেওয়া হয়। পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হয়। রাত্রিতে নারিকেলকুরা পুর দিয়া পুরপিঠা বা পুলিপিঠা অল্পবিস্তর ঘরে ঘরে হয়। নারিকেলের বদলে ডালের পুরও দেওয়া হয়। ক্ষীরপাইয়ে পূর্বে এই সময় আলুর পিঠা হইত। পৌষ-সংক্রান্তির দিন ভোরে নদী বা দীঘিতে স্নান করিয়া লক্ষ্মীপূজার দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান হয়। এই দিনের বিশেষ নৈবেদ্য 'মকর' বা নবান্ন। এই দিনের উৎসবকে নবান্ন উৎসবও বলে। মকরের উপকরণ নূতন আতপ চাল, দুধ, গুড় ও নানা রকমের ফল এবং সম্ভব হইলে ঘি, কিশ্‌মিশ্‌, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি। এইগুলি একত্র মিশাইয়া নিবেদন করা হয়। গ্রামের দেবমন্দির, মঠ ও বনেদীপরিবারে এই মকর প্রচুর-পরিমাণে তৈরি হয় এবং ঠাকুরপ্রসাদ সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অনেকে ঘরে ঘরে মকর চাহিতে যান।

পুষ্যাপূর্ণিমায় পূর্বে চন্দ্রকোণায় রথযাত্রা হইত। ষট্‌পঞ্চমী, দধিসংক্রান্তি এই মাসের ব্রত। পৌষসংক্রান্তিতে জাড়ায় সিদ্ধেশ্বরী পুকুরের কাছে সেওড়াতলায় ভাণ্ডারচণ্ডীর পূজা ও ঘটপরিবর্তন হয়। পৌষের কৃষ্ণাচতুর্দশী মাঘে পড়িলে সেই রাত্রিতে রটন্তী কালীর পূজা হয়। মাঘের প্রথম সন্ধ্যায় বাহিরলক্ষ্মী পূজার পর শৃগাল ডাকিলে 'সাধ' ধরা হয়—অর্থাৎ জলধারা দিয়া তিনবার ধান্যস্তূপ প্রদক্ষিণ করিয়া বেতের তৈরি ধানমাপা কঁচার উল্টোদিক দিয়া ধান মাপিতে হয়। ঐ সময় একজন জিজ্ঞাসা করে, "কত হ'ল"? যিনি মাপ করেন তিনি উত্তর দেন, "আড়া বত্রিশ"।

বাহির লক্ষ্মী পূজার একটি প্রাচীন প্রথা

মাঘের শুক্লা চতুর্থীতে গণেশপূজা। এই দেশে এই পূজা বেশ হয়। পরের দিন শুক্লা পঞ্চমীতে ঘরে ঘরে সরস্বতীর পূজা হয়। কোথাও প্রতিমায় কোথাও বা বই ও দোয়াতকলমে এই পূজা চলে। এই দিন প্রথম কুল খাওয়া নিয়ম। পূজার ভোগে ও পরের দিন ষষ্ঠীপূজার জন্য বহুরকমের সব্‌জী গোটাসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। নুন, তেল ও লঙ্কার সঙ্গে এই 'গোটাসিদ্ধ' মাখিয়া সেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই গোটাসিদ্ধ খুবই রুচিকর। পরের দিন একটি বাটনাবাটা শিলে সিঁদুরের পুতুল আঁকিয়া শীতলা-ষষ্ঠীর পূজা প্রায় প্রতিঘরেই হইয়া থাকে। পান্তা ভাত, তরকারি, গোটাসিদ্ধ ষষ্ঠীর ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয়। মাঘের শুক্লা চতুর্থী, পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতিথিগুলি ফাল্গুনে পড়িলে ঐ সময়ই গণেশ, সরস্বতী প্রভৃতির পূজা হইয়া থাকে।

ভীমপূজা এদেশের একটি প্রসিদ্ধ উৎসব। ভীম একাদশীর রাত্রিতে এই পূজার অনুষ্ঠান বহুস্থানে সাড়ম্বরে হইয়া থাকে। রাস্তার ধারে কোন গাছতলায় বা চৌকানে অথবা নদীর ধারের কোন চওড়া জায়গায় বেশ বড় বড় ভীমের প্রতিমা তৈরি হয়। এক একটি প্রতিমার আকার দশবারো হাত পর্যন্ত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে মেলাও অনেক স্থানে হয়। চেতুয়া-রাজনগর, রাধাকান্তপুর (দাসপুর), ঘাটাল প্রভৃতি স্থানে সাড়ম্বরে ভীমপুজা ও মেলা হইয়া থাকে। আরও বহু গ্রামে এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভীমপূজার পর মাঘী পূর্ণিমায় চেঁচুয়া ও গৌরায় (দাসপুর) রথযাত্রা উপলক্ষে পূর্বে খুব সমারোহ হইত। এখন সমারোহ কম বা নাই বলিলেই চলে।

ভীমপূজা

মাঘের কৃষ্ণাচতুর্দশী সাধারণত ফাল্গুনে পড়ে। শিবমাড়োগুলিতে এই রাত্রিতে শিবরাত্রির উৎসব চলে। এই উপলক্ষে ভক্তগণ দিনরাত উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করেন। প্রহরে প্রহরে চারবার শিবপূজা হয়। শিবদুর্গার মূর্তি গড়িয়াও বহুস্থানে পূজাপাঠ হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে কোন কোন স্থানে সারারাত মেলাও হয়।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্বরাত্রিতে নানা স্থানে চাঁচর ও পরদিন পূর্ণিমায় দোল উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। একটি লম্বা বাঁশের গাঁটে গাঁটে শুকনা তালপাতা গাঁথিয়া মাটিতে বাঁশটি পুঁতিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। গ্রামে গ্রামে চাঁচরের সময় বাদ্যঘণ্টা ও শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি ও শালগ্রাম শিলাকে ছোট ডুলিতে চাঁচর স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। এইদিন কৃষ্ণের বিশেষ পূজা হয়, পরে প্রথমে একটি বিশাল চাঁচরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। পরে পরে অন্যসব চাঁচরে আগুন জ্বালান হয়।

চাঁচর উৎসব

চন্দ্রকোণা থানার তাতারপুরে (জে. এল. নং ১৬৫) বিশালাক্ষীর চাঁচরে খুব সমারোহ দেখা যায়। এই চাঁচরের দুইদিন আগে হইতে মেলা বসে। সারারাত্রি আতসবাজিও পোড়ান হয়। দেবীর কৃপায় চক্ষুরোগ সারিয়া যায় ও আতস বাজিতে কাহারও কোন ক্ষতি হয় না বলিয়া শোনা যায়। কাহারও মনে কোন দুরভিসন্ধি থাকিলে সেই কেবল আগুনে পুড়িয়া আহত হয় বলিয়া প্রবাদ। কিন্তু দেবীর ফুলচন্দনের ছোঁয়ায় ক্ষত শীঘ্র সারিয়া যায়।

পূর্ণিমা হইতে একপক্ষ ধরিয়া দোলউৎসব বহুস্থানে হয় এবং সর্বত্রই আনন্দের বন্যা বহিয়া যায়। তবে কোন কোন স্থানে জোর করিয়া রং দেওয়া ও পথচারীদের বেশভূষা নোংরা করাও যে হয় না, এমন নহে। এই দেশের

বহু অস্থলে দেবতার পূজাদি, ভোগরাগ ও প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

ফাল্গুনের সংক্রান্তিতে ঘেঁটুপূজার অনুষ্ঠান আর একটি বিশেষ উৎসব। এই দিন সকালে একটি পুরান হাঁড়ির উপর ঘেঁটুফুল দিয়া মেয়েরা পূজা করেন। পরে একজন লাঠির বাড়ি মারিয়া ঐ হাঁড়ি ভাঙিয়া ফেলে। অনেক গ্রামে রাস্তার চৌমাথায় এই পূজা হয়। কোন কোন ঘরে দেওয়ালে মাটির পুতুল গড়িয়া কড়ির দ্বারা মূর্তির মুখ, নাক, চোখ করা হয় এবং হলুদে ছোবানো ন্যাকড়া দিয়া চাদর ও কাপড় করিয়া ঘেঁটু ফুলের দ্বারা মূর্তির পূজা করা হয়। ইহাব বিশুদ্ধ নাম ঘণ্টাকর্ণ। ঘেঁটুপাতায় কাজল করিয়া ছেলেমেয়েদের চোখে দেওয়া হয়।

ঘেঁটুপূজা

বৎসরের শেষমাস চৈত্র। পূজা-পার্বণেরও শেষ এইমাসে। গ্রাম্য দেবতা শীতলা, মনসা ও পঞ্চানন্দের বার্ষিক পূজা এইমাসের কোন শনি বা মঙ্গলবারে হয়। পূজার আগের দিন রাত্রিতে শীতলামঙ্গল গানের 'জাগরণ' বসে। পূজার দিনও মঙ্গলগান হয়। পূজার অঙ্গরূপে কোন নির্দিষ্ট বটগাছে যোগিনী পূজাও হয়। গ্রামের বধূরা খই ছড়াইয়া ঐ গাছ প্রদক্ষিণ করেন। ছাগল ও ভেড়া শীতলাতলায় বলি দেওয়া হয়। বাজনা, নাচ প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রাম উৎসবের বন্যায় ডুবিয়া যায়। যাত্রার অনুষ্ঠানও অনেক স্থানে হইয়া থাকে। কাদিলপুরের (দাসপুর) শীতলাপূজায় ত্রিলোচনপুরের (ডেবরা) তালান্দময়ীর থান হইতে অনুমতি আনাইতে হয়। সন ১২৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জাড়ার বাবুপাড়ায় শীতলামায়ের দেশপূজায় চন্দ্রকোণার প্রসিদ্ধ কবিয়াল যজ্ঞেশ্বর বা জগা এবং ঘাটালের হরিবোল দাসের মধ্যে 'কবির লড়াই' হইয়াছিল। জগা বা যজ্ঞেশ্বর ধোপা জাতীয় ছিলেন। আসল কবিগানের বিষয় ছিল গোষ্ঠপালা। এই গানশেষে যজ্ঞেশ্বর ও হরিবোল দাস জাড়ার বাবুদের কাছারীতে 'পূরণ' লইতে গেলে বাবু শম্ভুচন্দ্র রায় ও অন্যান্য বাবুরা জাড়া সম্পর্কে তাঁহাদের একটি কবিগান করিতে বলায় জগা ধোপা প্রথমে গান করেন। পরে উত্তর-প্রত্যুত্তর হয়। নিম্নে তাঁহাদের দুইজনের গান উদ্ধার করা হইল—

জাড়ার প্রসিদ্ধ 'কবির লড়াই'

প্রথমে, জগা ধোপা জাড়ার প্রশংসা করিয়া বলিলেন :

"জাড়া গোলোক বৃন্দাবন
জাড়ার পরব্রহ্ম বাবুগণ
যেমন গোলোক হতে গোকুলেতে অবতীর্ণ গোবর্ধন।

গোলোকের ভাব দেখি গোকুলে
জাড়া-গোলোক আলো করেন 'বাবু' সকলে।
যেমন, সহস্রপীঠ কমলদলে রে গোবিন্দজী বিরাজমান।
দ্বাদশ বিপিন তিরিশ উপবন
কুঞ্জে কুঞ্জে গোষ্ঠে ঘাটে পূর্ণ বৃন্দাবন
সাত সরোবর গিরিগোবর্ধন রে,
জাড়াতে এসব বর্তমান ॥
দ্বাদশ রাখাল দেওয়ান কারকুন
নায়েব গোমস্তা আদি সবে সুনিপুণ,
তাই, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন রে,
এই রামরাজ্যে হয় সুশাসন।
রম্য ধামের মনোহর লীলা
দুঃখ দূর করিতে বাবুদের খেলা,
তাই, হাট হোটেল অতিথি শালারে
তুলেছে যশের নিশান।
কল্পতরু বাবুমণ্ডলী
ধনে মানে কুলে শীলে খ্যাত সকলি
তাই, জগা বলে পরাণ খুলে রে
জাড়া জড়তানাশন ॥"

হরিবোল দাস ইহার পর উত্তর দিতে অসম্মত হন। কিন্তু বাবুরা অভয় দিলে গান ধরেন— "কি করে বললি জগা জাড়া গোলোক বৃন্দাবন,
যেথায় বামুন রাজা চাষী প্রজা চারিদিকে তার বাঁশের বন।
কোথায় রে তোর শ্যামকুণ্ডু, কোথায় রে তোর রাধাকুণ্ডু
সামনে আছে মানিককুণ্ডু করগে মুলা দরশন।
তুই বাজিয়ে যাবি ঢুলির ঢোল,
কেন রে তোর গণ্ডগোল
তুই কবি গাইবি, পয়সা নিবি, খোসামুদির কি কারণ?"

ইহার পর গান জমিয়া গেল। সকলে যজ্ঞেশ্বরকে জবাব দিবার জন্য ধরিলেন। যজ্ঞেশ্বর আবার গাহিলেন—

তুই হরিবোল নয়, হয়বোলা, কিসে তোর গাত্রজ্বালা
কিসে তুই ঝালপালারে করগে (ঘাটালে) নারিকেলভক্ষণ ;

হে হরে কুঁড়ে হরিকুণ্ডু রে, শ্যামকুণ্ডু সে নিদর্শন।
তোকে দেখতে দিনু শ্রীগোবিন্দ তুই বন্দভরে হলি অন্ধ
বুঝবো রে তোর রঙ্গব্যঙ্গ, দিস্ না ভাঙ্গরে অঞ্জনা হৃদিরঞ্জন।
বামুনের কি গুণ জানবে রে, তোর মত পোড়ারমুখো হনুমান।

জাড্যদোষনাশের আশে, পূর্ণ জাড়া বামন-বাসে,
তোর মত হনু হাসে রে, সকলেতে তুচ্ছজ্ঞান—
কোথা তোর চৌদিকে বাঁশ রে (হ'রে)
এই আঝুড়া তার প্রমাণ।

নিন্দুকেরই গুণের ধারা, কুচ্ছ নিন্দে রঙ্গ করা,
কেউ টেরা কেউ বাঁকা খোঁড়া রে
তুই বুঝি রূপে গুণেতে সমান।
জগা আর বলবে কত রে, হরি হরি বল মন ॥"

জগার প্রত্যুত্তর সত্ত্বেও হরিবোল দাসের গানটিই অমর হইয়া যায়। উহার একটি ইংরাজি অনুবাদও হয়। 'অ্যান্টনি কবিয়াল' ছায়াচিত্রে মূলগানটি গৃহীত হইয়াছিল। হরিবোল দাসের গানটির ইংরাজি অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল :

How do you call Jagā Jārā Heaven's Compound
Where Brahmin King peasant tenants
Bamboo-bush all around ?
Where is your Shyāmkundu ?
Where is your Rādhākundu ?
Look near Mānikkundu
(Where) Radish-roots all abound.
Go on beating the drum
Need not be noisesome
Poetry make money take
Flattery on what ground ?

চৈত্রের শেষ উৎসব গাজন। ইহা মাসের প্রায় শেষ পনের দিন ধরিয়া চলে। মহকুমার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাড়োতলায় গাজন ও চড়ক উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। লাওদার (দাসপুর) ভূতনাথমন্দিরে ও জোতঘনশ্যামের (দাসপুর)

মধু মাইতির মাড়োতলায়, ক্ষীরপাই এর পার্শ্ববর্তী গঙ্গাদাসপুরের উমাপতিশিবের মন্দিরে এবং অন্যান্য বহু শিবের থান ও মাড়োয় গাজন ও চড়ক হয়। গাজনের অঙ্গ 'কাঁটা গড়্যান' ও চড়ক। শেষ দিনে সংযাত্রা হয়। কলিকাতার জেলেপাড়ার সং চন্দ্রকোণা হইতে উঠিয়া গিয়া কলিকাতায় বসবাসকারী জেলেদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে।

ঘাটালে এখনও নানা রকম সংএর অনুষ্ঠান হয়। বাসুদেবপুরে (দাসপুর) সন ১৩৩৬ সালের চৈত্রসংক্রান্তির সঙে প্রথমে ছিল শিবতাণ্ডব। "জটাটবী" ইত্যাদি স্তোত্রসমেত নাচ। দ্বিতীয় সঙে পাকস্পর্শ। ইহা একটি সামাজিক ঘটনার ছোট নাটক। প্রথমে নাগর-নাগরীর প্রবেশ—পাকস্পর্শের গান। নিম্নে কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল :

নাগর—আয় নাগরী ভাবনা তোর আর নাই
রাখব তোরে আপন ঘরে, করব কে বড়াই।

নাগরী—কেউ যদি না আসেন ঘরে, কেউ যদি না পাড়েন পাত।

নাগর—ষোল আনা খাইয়ে দিয়ে বাঁচাবো মোর জাত
পাকস্পর্শ সবার হর্ষ তার বাড়া আর কাজ কি ভাই।
(আয় নাগরী ইত্যাদি)

পাগল ঠাকুর বিধান দিলেন ষোল আনার মত
মানতে হবে নইলে আমার পড়বে নাকে খত
কাজের নজির চাষীঠাকুর শুনবি যদি আয় জানাই

নাগরী—বামুন চাষা কাজ খাসা তার সদাই হউক জয়
সবাই বাঁধা তার দুয়ারে আর কি আমার ভয়।

[নাগর-নাগরী উভয়ে]
মোরা নজিরে কাজ করব বজায়
সমাজকে আর ভয় না পাই।

তৃতীয় সঙের বিষয় ছিল, স্বদেশ উদ্ধার।
এ নব আহবে চল দেশবাসী তুচ্ছ করিয়া প্রাণ
লক্ষ মিলিত কণ্ঠে গাহিয়া উন্মাদ রণগান।
দীনা জননীর মুখপানে চাহি নিখিল বিশ্বে প্লাবন বাহি
জীমূতমন্দ্রে সঙ্গীত গাহি পথে হও আগুয়ান।

চরণে মরণে মর্দিত করি স্মরি হৃদে ভগবান্
সম্মুখে রিপু দুর্জয় হেরি'
অন্ধকালিমা পিছে আসে ঘেরি
বধির শ্রবণ বাজে শত ভেরি
ঝঙ্কৃত খরশান
প্রলয় মোদের প্রাণের বন্ধু, মৃত্যু আশীষ দান।
অস্ত্র মোদের নহে প্রতিঘাত
প্রেমভরা বুকে কবির আঘাত
রুদ্র সমরে প্রীতি আঁখিপাত, হিংসাবিহীন বাণ
সত্য ধরমে সফল হউক আমাদের অভিযান ॥

এই ধরণের আরও বহুগান ঐ সঙে গান করা হইয়াছিল।

রামনবমী এইদেশে আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্বণ। এইদিন নাড়াজোলে বিরাট মেলা হয়। চৈত্রমাসে দিন দেখিয়া লক্ষ্মীপূজাও হয়। কেহ কেহ 'মেল' বা নীলের দিন (চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব দিন) লক্ষ্মীপূজা করেন। বারুণীতে নানাস্থানে ও মাণিককুণ্ডের কালাকড়িতে গঙ্গাপূজা হয়। সংক্রান্তিতে ছাতুর সরা, পাখা ও জলভরা ঘট দান করা হয়।

নাড়াজোলে রামনবমীর মেলা

পূর্বোক্ত পূজা-পার্বণগুলি ছাড়া বৃক্ষ, মন্দির, জলাশয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাও পূর্বে হইত। এই উপলক্ষে জনসমাগম, ভোজন, দান, কীর্তন প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠান হইত। নাড়াজোলরাজকর্তৃক লঙ্কাগড় দীঘি প্রতিষ্ঠাও খুব ধুমধামের সঙ্গে হইয়াছিল। এই লঙ্কাগড়-দীঘির আয়তন সাড়ে ষাট বিঘা এবং ইহার মাঝখানে একটি সুদৃশ্য সৌধ আছে। ইহা রাজাদের গ্রীষ্মাবাস ছিল। রাজা মোহনলাল খাঁন এই দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার জন্য খরচ হইয়াছিল আশি হাজার টাকা।

এই দেশের উৎসব পূজাপার্বণগুলির উল্লেখ সংক্ষেপে করা হইল। ইহাদের মধ্যে বহু প্রাচীন প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে লোকের ধর্মবিশ্বাসের বিশেষ বিশেষ দিক উদ্‌ঘাটিত হয়। কালক্রমে এইসব আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথার অনেকগুলি লোপ পাইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক পর্যন্তও এই অঞ্চলের পল্লীতে পল্লীতে শহরে-গঞ্জে এই উৎসব অনুষ্ঠানগুলি সমারোহের সঙ্গে পালিত হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু আজ ইহাদের খুব কমই অবশিষ্ট আছে।



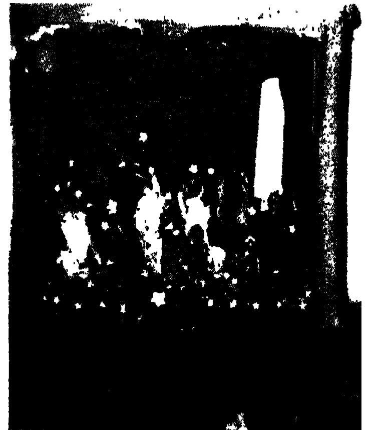
নয়াগঞ্জ অস্থলের বিগ্রহ



শ্যামপুরে (ঘাটাল থানা) গোঁসাইদের
কিশোরীমোহন ও গোপীমোহনজীউর বিগ্র:



গ্রামদেবদেবী—শীতলা, মনসা ও পঞ্চানন্দ



রাণীরবাজার ছোট অস্থলের বিগ্রহ



'শিবায়ন' পালাগানের দৃশ্য



'যাত্রাসিদ্ধিমোড়ে' (খড়ার-উদয়গঞ্জ)
শীতলা, মনসা ও ধর্মের পূজা



নূতন 'বিদ্যাসাগর সেতু', ঘাটাল শহর



শিবের গাজনে জিবফোঁড়ার দৃশ্য



জিবফোঁড়ার অপর এক দৃশ্য

মহকুমার কয়েকটি স্থানের পূজাপার্বণ ও মেলার বিবরণপঞ্জী :

ইতিপূর্বে মহকুমার কিছু কিছু গ্রামের পূজা-পার্বণ-মেলা সম্পর্কে উল্লেখ করা হইলেও আরও কয়েকটি স্থানের বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্বণাদি বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। নিম্নে এরূপ কয়েকটি পূজা উৎসবাদির বিষয় বলা হইল। গ্রাম বা মৌজার পার্শ্ববর্তী প্রথম বন্ধনীমধ্যস্থ নাম থানা বুঝাইবে। গ্রামের লোকসংখ্যা ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুসারে দেওয়া হইয়াছে।

(১) **কোটালপুর** (দাসপুর) [জে. এল. নং ২০৩, লোকসংখ্যা (১৯৭১ সালের আদমসুমারী) ৬১৭]: এই গ্রামে মাঘমাসে সাত দিন ধরিয়া সরস্বতী পূজার মেলা হয় যাহা ঐ অঞ্চলে 'পঞ্চমীর মেলা' নামে পরিচিত। মেলাটি প্রাচীন। শোনা যায়, কাছাকাছি কামালপুর গ্রামের বাগ্‌বেড়ের শ্রীচরণ গোঁসাই এক শ্রীপঞ্চমীর দিন এইখানে সমাধিস্থ হন। তাঁর ভক্তবৃন্দেরা এই দিন হইতে একাদশী তিথি পর্যন্ত তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এইখানে উৎসব করেন। সেই হইতে এই মেলাটির সূত্রপাত হয়। "পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা"র তৃতীয় খণ্ডের মেদিনীপুর জেলা অংশের ৪৩৫ ও ৪৩৬ পৃষ্ঠায় ইহাকে "সরস্বতী পূজার মেলা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, সরস্বতী পূজার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। উক্ত গোঁসাইয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। কাছাকাছি গোপালপুর গ্রামে প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন গাজন উৎসবটি সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতলা পূজা, কার্ত্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব, মাঘমাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোপালপুরে 'চক্রবর্তী' পদবীধারী 'বাবু'রা পূর্বে জমিদার ছিলেন। সরস্বতীর মেলায় আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় দশহাজার নরনারী আসেন। মেলায় নানা জিনিষের প্রায় দুইশত দোকান বসে।

(২) **যদুপুর** (দাসপুর) [জে. এল. নং ২৭, লোকসংখ্যা ৫৯৩]

এখানকার কালীয়দমন উৎসবের মেলাটি আকর্ষণীয়। যদুপুর কাঁসাই-এর তীরবর্তী। ভাদ্রমাসে এই উৎসবে নদীর দুই তীরে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া তিনদিন ধরিয়া একটি মেলা বসে। প্রায় দুই তিন হাজার নরনারী এই মেলায় আসেন। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের সীমান্তবর্তী নদীতে নৌকা করিয়া কীর্ত্তনীয়ার

দল হরিনাম সংকীর্তন করেন। নদীর উত্তরতীরবর্তী ব্রজবিনোদ গোস্বামী ঠাকুরের সমাধিমন্দির-সংলগ্ন এলাকায় পূর্বে উৎসব হইত।

(৩) **জোতকেশব** (দাসপুর) [জে. এল. নং ১৫৯, লোকসংখ্যা ১৭৩৮] কার্তিকমাসে কালীপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দিরসংলগ্ন এলাকায় সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বেশ প্রাচীন। ইহা ছাড়া এই গ্রামে সরস্বতীপূজাও সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

(৪) **ফতেপুর** (দাসপুর) [জে. এল. নং ১৩৫, লোকসংখ্যা/মৌজা, নবীন মহেশপুর ৪৮৪] এই গ্রামে প্রতিবৎসর ফাল্গুনমাসে রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে সাত দিন ধরিয়া একটি মেলা হয়। মেলাটি বেশি দিনের নয়।

(৫) **উত্তরধানখাল** (দাসপুর) [জে. এল নং ১২৩, লোকসংখ্যা ৫১৫] এখানের শীতলা মন্দিরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় ডোমেরা সন্ধ্যাদীপ দেন এবং মন্দিরের সামনে বাজনা বাজান।

(৬) **জনার্দনপুর** (দাসপুর) [জে. এল. নং ১২০, লোকসংখ্যা ৪৩৯]

এইখানে যুগেশ্বর শিবের মন্দিরে মেলের দিন বিশেষ পূজা হয় এবং শিবকে বিশেষ ভোগ চালকড়াইভাজা ও সিদ্ধি নিবেদন করা হয়। এই চালকড়াইভাজা নিবেদন বিষয়ে স্থানীয় একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম ধানখালের আনন্দরাম নামে জনৈক অধ্যাপক পণ্ডিত এক পূর্ণিমার রাত্রে সত্যনারায়ণ পূজা করিয়া ফিরিবার পথে ঐস্থানে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে যুগেশ্বর শিবের দেখা পান। তাঁর আদেশে তিনি প্রতিবছর মেলের দিন চালকড়াইভাজা ও সিদ্ধি যুগেশ্বরকে নিবেদন করিতেন। এখনও এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। জনার্দনপুর গ্রাম কাঁসাই তীরে (পলাশপাই খাল) অবস্থিত।

(৭) **ইড়পালা** (ঘাটাল) [জে. এল. নং ১৭, লোকসংখ্যা ২৯০১]

এইখানে প্রতিবৎসর আষাঢ় মাসে লক্ষ্মীজনার্দন এবং ফাল্গুন মাসে দামোদরের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন। রথযাত্রার মেলা আষাঢ় মাসে একদিন মাত্র হয়।

(৮) **কনকপুর** (ঘাটাল) [জে. এল. নং ১২৩, লোকসংখ্যা ৩০০]

প্রতি বছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতলাপূজা এবং চৈত্রমাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় শীতলামঙ্গল গান এবং যাত্রাদির অনুষ্ঠানও হয়।

(৯) **ঘাটাল** (ঘাটাল)/গম্ভীরনগর, (জে. এল. নং ৩২, সমগ্র ঘাটালের লোকসংখ্যা ২৭,৫৭০) ধর্মঠাকুরের মেলা মহাসমারোহে হয়। বারুণীর সময়ও মেলা হয়। সঙ্ বিচিত্রধরণের হয়। ঘাটাল সহরের কোন কোন পরিবারে

কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা বিশেষ আকর্ষণীয় এবং সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

(১০) **রাধানগর** (ঘাটাল) [জে. এল. নং ৭৮, লোকসংখ্যা ২,৭০৯]

এইস্থানে রাসপূর্ণিমা হইতে আদিবাসী সাঁওতালদের "ডালগাড়া" নামে একটি উৎসব হয়। একটি প্রাচীন গাছের নীচে বেদি করিয়া তাহাতে একটি বড়ো ডাল প্রথমে গাড়া হয়। পরে একটি বাঁশের মাথায় পতাকা দিয়া তাহা উপরে তোলা হয়। পূজাও চলে।

এই অঞ্চলে সাঁওতালদের আর একটি উৎসব হয় কার্তিকমাসের কালীপূজার পর প্রতিপদ ও দ্বিতীয়ায় দুই দিন। ইহাকে "গোরুর লাচ" (গোরুর নাচ) উৎসব বলে। রাধানগর ও তার আশপাশের অঞ্চলে এই উৎসবগুলি হয়।

(১১) **ঘোলা** (চন্দ্রকোণা) [জে. এল. ১৪, লোকসংখ্যা ২৫৯]

প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে শীতলাপূজা, আষাঢ়মাসে রাধাগোবিন্দের মহোৎসব, পৌষমাসে কুড়ুর্থা ঠাকুরের শিরণী উৎসব এবং মাঘমাসে সরস্বতী পূজা হয়। পূজা ও উৎসবগুলি প্রাচীন। আষাঢ় মাসে চারদিন মহোৎসবের মেলা হয়। কার্ত্তিকমাসে কালীপূজার সময় একদিন মেলা হয়। মেলাটি বেশ প্রাচীন।

(১২) **শ্রীনগর** (চন্দ্রকোণা) [জে. এল. নং ২৭, লোকসংখ্যা ১২৪৩]

মাঘমাসে রাধাগোবিন্দজীউর রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মেলাটি এক দিন চলে। কিন্তু এটি বেশ প্রাচীন। উৎসবটি গ্রামের চৌধুরীবংশের পারিবারিক উৎসব।

(১৩) **ক্ষিরাটি** (চন্দ্রকোণা) [জে. এল. নং ৫৪, লোকসংখ্যা ৫৯০]

গ্রামের পশ্চিমদিকে একটি তেঁতুলগাছের নীচে ক্ষিরাইচণ্ডীর থান আছে। ক্ষিরাটি নামটি সম্ভবত এই দেবীর নামানুসারে হইয়াছে। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। উৎসবগুলি স্থানীয় রায় পরিবারের দ্বারা পরিচালিত।

(১৪) **পরমানন্দপুর** (চন্দ্রকোণা) [জে. এল. নং ১৩৭, লোকসংখ্যা ৫৯২]

বৈশাখ মাসে রাধাগোবিন্দজীউর নামসংকীর্তন মহোৎসব ও বসুন্ধরাপূজা, জ্যৈষ্ঠমাসে রক্ষাকালী পূজা, শ্রাবণমাসে মনসাপূজা, অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন উৎসব, পৌষমাসে রঙ্কিনী দেবীর অন্নভোগ উৎসব, মাঘমাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্রমাসে বাসন্তীপূজা ও গাজন উৎসব এবং প্রতি দশবছর অন্তর সয়লা উৎসব

অনুষ্ঠিত হয়। রঙ্কিনীপূজার মেলাটি উল্লেখযোগ্য। পৌষমাসে দুই দিন ধরিয়া হয়। মেলাটি বেশ প্রাচীন।

(১৫) **ভিঙ্গাল** (চন্দ্রকোণা) [জে. এল. নং ২৭৯, লোকসংখ্যা ৮০৯]

বৈশাখমাসে রক্ষাকালীপূজা, জ্যৈষ্ঠমাসে হরিনাম-সংকীর্তন উৎসব এবং চৈত্রমাসে গাজন উৎসব। সব উৎসবগুলিই প্রাচীন। শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দিরসংলগ্ন এলাকায় আটদিন ধরিয়া একটি বেশ প্রাচীন মেলা বসে। কয়েক হাজার নরনারী এই মেলায় আসেন।

(১৬) **ভৈরবপুর** (চন্দ্রকোণা) [জে. এল. নং ৫৫, লোকসংখ্যা ১৩৪৯]

বৈশাখমাসে ধর্মপূজা উপলক্ষে গ্রামের উত্তর প্রান্তে প্রবাহিত শিলাই নদীর দুই তীরে তিনদিন ধরিয়া একটি মেলা বসে। পাঁচ হাজারেরও বেশি নরনারী এই মেলায় আসেন। মেলা বা পূজা চল্লিশ বছরেরও কম।

(১৭) **তাতারপুর** (চন্দ্রকোণা) [জে. এল. নং ১৬৫, লোকসংখ্যা ৯৮৪]

ফাল্গুন মাসে বিশালাক্ষীপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দিরসংলগ্ন জমিতে এবং জেলাবোর্ডের রাস্তার পাশে দুই দিনের একটি মেলা বসে। মেলাটি একশ বছরেরও বেশি প্রাচীন। এই সময় বিশালাক্ষীর চাঁচর উৎসব বিখ্যাত।

(১৮) **ডিহিবলিহারপুর** (দাসপুর) [জে. এল. নং ৫৮, লোকসংখ্যা ৩৪২]

এই গ্রামে রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরসংলগ্ন এলাকায় শ্রাবণমাসে গোসাঁইদের একটি 'মোচ্ছব' হয়। মোচ্ছবটি গোস্বামিবংশের পাঠকরাম বা গিরিধারীলাল গোস্বামীর মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে হইয়া থাকে। রথযাত্রার পরে কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথি হইতে ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত এই মোচ্ছব হয়। দিনের বেলা মাল্‌সাভোগ ও রাত্রিতে অন্নভোগ হয়। অন্নভোগের মধ্যে আলু পটলের রসা ও বিরির ডাল নিবেদন করা রীতি।

(১৯) (ক) **চন্দ্রকোণা** (নয়াগঞ্জ) [লোকসংখ্যা ৯৮১১]

চন্দ্রকোণার নয়াগঞ্জ পল্লীতে রামানুজসম্প্রদায়ের অস্থলে ঝুলন ও রথ উৎসব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কার্ত্তিকমাসে অন্নকূট উৎসবে পূর্বে ছাপান্ন রকমের ভোগ হইত। দোল উৎসবেও এখানে সমারোহ হয়।

(খ) **চন্দ্রকোণা**—রামানন্দী সম্প্রদায়ের ছোট অস্থল:

এই অস্থলে ঝুলন, পার্শ্বৈকাদশীতে জলঝুলন, পুষ্যাভিষেক, চাঁচর, দোল প্রভৃতি পূর্বে মহাসমারোহে হইত। চাঁচরবেড়ে নামক স্থানে দোলপূর্ণিমার রাত্রিতে হস্তীসহ চাঁচরের শোভাযাত্রা যাইত। একবার একটি দুর্ঘটনার পর শোভাযাত্রাটি বন্ধ হইয়া যায়।

(গ) অযোধ্যা (চন্দ্রকোণা পুরসভার অধীন) [জে. এল. নং ৮৮]

অযোধ্যা বা রঘুনাথপটিস্থ ঠাকুরবাড়িতে পৌষমাসে পুষ্যাভিষেক, রথ ও ঝুলন সমারোহের সহিত হইয়া থাকে। ঐ সময় সংলগ্ন প্রশস্ত এলাকায় মেলা ও বহু যাত্রিসমাগম হয়।

(২০) **কৈগেড়ে** (দাসপুর) [জে. এল. নং ২০৮, লোকসংখ্যা ৭৮৪]

এই গ্রামে মধ্বাচার্যসম্প্রদায়ের অস্থলে পয়লা বৈশাখ রামকৃষ্ণ দাসবাবাজী ও সাতই পৌষ উদ্ধবদাস বাবাজীর স্মরণোৎসব হয়। এই উপলক্ষে সেইসময় বহু ভক্ত ও শিষ্যসম্প্রদায়ের সমাবেশ হয়।

(২১) কাশীগঞ্জ (চন্দ্রকোণা) [জে. এল. নং ২১৩, লোকসংখ্যা ২৩৫]

এইখানে ভাণ্ডারচণ্ডীর দুর্গা-অষ্টমী, সন্ধি ও নবমীর দিন ছোট্ট মেলা হয়। ভাণ্ডারচণ্ডীর মন্দির কেঠে নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। দেবী প্রস্তরখোদিত একটি মূর্তি। পূজার সময় বলিদানের বিশেষত্ব আছে। বলিদানের সময় ছাগলকে কিছু খাইতে দিয়া ধরিয়া বলি দেওয়া হয়। হাঁড়িকাঠে বলি হয় না।

টীকা: ধর্মঠাকুরের এক পুরাতন ছড়া আছে—'ধর্মঠাকুর যেটা, সেটা ফিরিঙ্গী কি গোরা, বামুনের হাতে খায় না পূজা, পুজুরী তার ডোম বেটারা।'

টিপ্পনী: *খাসগেলাস—পূর্বে বিবাহ উপলক্ষে বরের শোভাযাত্রাকালে খাসগেলাসের ঝাড় হইত। মোমবাতি রাখিবার মাটির ছোট ছোট একরকম বাতিদানে অর্থাৎ মাটির একটি খুরির মাঝখান হইতে উপর-নীচে দুটি এক ইঞ্চি করিয়া চোঙ্গা থাকিত। উপর-নীচে লাল-কাগজের পাড় দিয়া মোড়া একটি অভ্রের গেলাস ঐ খুরির উপর আঠা দিয়া বসান হইত এবং তাহার মধ্যে একটি মোমবাতি জ্বালান হইত। ইহার পর মাটির খুরিটিকে একটি বাঁশের বাখারি বা ডাণ্ডায় আটকাইয়া দেওয়া হইত। এইভাবে আটক দশটি ডাল লইয়া একটি ঝাড় হইত। এবার এই ডালগুলি একটি বাঁশের লম্বা ডাণ্ডায় বাঁকাবাঁকিভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইত।

****বাঁধা রোশনাই**—বর ও কনের বাড়ীর পথের দুই দিকে খাসগেলাসের ঝাড় পুঁতিয়া দেওয়া। ইহার নাম বাঁধা রোশনাই।

সপ্তম অধ্যায়

সাহিত্য

মধ্যযুগ

"দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া যাই
আড়রায় হইলুঁ উপনীত॥"

[কবিকঙ্কণচণ্ডী]

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি **কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর** স্মৃতিবিজড়িত এই ঘাটাল মহকুমা। এই অঞ্চল তখন মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কবি বর্ধমানের সরকার সেলিমাবাজের অন্তর্ভুক্ত দামিন্যা গ্রামের অধিবাসী হইলেও সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসেন। মুড়াই, দারকেশ্বর প্রভৃতি নদী অতিক্রম করিয়া জাহানাবাদের (বর্তমান আরামবাগ) পাশ দিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হইতে থাকেন। ইহার পর নারায়ণ, পরাশর এবং আমোদর নদ পার হইয়া কবি **গোচড্যা** নামক গ্রামে আসিয়া খুবই কষ্টে পড়েন। এই সময় কবির স্নান করিবার তেল পর্যন্ত ছিল না। একটি পুকুরের পাড়ে আশ্রয় লইয়া শুধুমাত্র শালুক ফুল ও শালুক ডাঁটায় দেবীর পূজা করিয়া কবি সারাদিন জল খাইয়াই রহিলেন। কোথায়ও খাদ্য জুটিল না। সঙ্গে শিশুপুত্র খাদ্যের জন্য কাঁদিতে লাগিল। গোটা পরিবারকে লইয়া কবি দেশ ছাড়িয়াছিলেন। এই সময় সকলেই উপবাসী রহিল।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

তখনকার সেই গোচড্যা গ্রাম এখন চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত সম্ভবত 'গুচুড়ে', মৌজা নং ৭। কিন্তু এই গোচড্যাতেই কবি তাঁহার বিখ্যাত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনার প্রেরণা পাইলেন। উপবাস, পথশ্রম, ভয় ও ক্লান্তিতে নিরাশ্রয় কবি সেই পুকুরের পাড়েই ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, দেবী চণ্ডী তাঁহার শিয়রে বসিয়া নানা ছন্দে কাব্যরচনা করিতেছেন। তাঁহার চরণছায়ায় কবির যেন সমস্ত অবসাদ দূর হইল। দেবী আজ্ঞা দিলেন কবিকে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিবার জন্য। কিন্তু নিরাশ্রয় কবি কোথায় এই কাব্য রচনা করিবেন? তাই দেবী চণ্ডী কবিকে আদেশ দিলেন আড়রায় যাইবার জন্য। কবি

তাই শিলাই নদী বরাবর চন্দ্রকোণার দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান কেশপুর থানার অন্তর্গত আড়রাগড়ে চলিলেন। ইহা ব্রাহ্মণভূম পরগণার অন্তর্গত। সেখানে রাজা কবির সমস্ত কষ্ট দূর করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের খাদ্যের জন্য 'পাঁচ আড়া' ধান মাপিয়া দিলেন। এইভাবে কবি ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় পাইয়া তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। তারপর একদিন শুভক্ষণে শুচিকায়ে কবি তাঁহার বিখ্যাত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা আরম্ভ করিলেন। রাজা রঘুনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহার এই কাব্যের প্রচার বেশ হইল। ইহাই কবিকে শ্রেষ্ঠ সম্মান ও খ্যাতি আনিয়া দিয়াছিল। মুকুন্দরামের এই কাব্যরচনার কাল গবেষকদের মতে ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

ঠিকভাবে দেখিতে গেলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এই মহকুমার কবি নন, কিন্তু কাব্য বা সাহিত্য কখনও কোন দেশের কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। কবির অমরকাব্যে পরবর্তীকালে চিহ্নিত ঘাটাল মহকুমার এই ভূমিখণ্ড এক বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া আছে, কারণ এই ভূমিখণ্ডে পদার্পণ করিয়াই কবি তাঁহার এই অমর কাব্যরচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। এই ভূমিখণ্ডের মধ্য দিয়া বহমান আমোদর, শিলাই, কুবাই, দনাই প্রভৃতি ছোট-বড়ো নদী কবির মনোরাজ্যের একটু স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার 'চণ্ডীমঙ্গলে'এই নদীগুলির বর্ণনা আছে। কবির'দিগ্‌বন্দনায়' এই অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম অমর হইয়া আছে। কবি লিখিয়াছেন:

"কামেশ্বর লিঙ্গ বন্দোঁ কোঙাঞি নগরে।
চন্দ্রকোণার গড়পতি বন্দোঁ মল্লেশ্বরে" ॥
...কাইতির বাণেশ্বর বন্দি গাব আগে।
মৌলার রঙ্কিনী বন্দো মস্তকের পাগে ॥"

চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর কবির সময়েও প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেশপুর থানার নেড়াদেউলের কামেশ্বর শিব কবির কাব্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কাইতি বর্ধমান জেলার একটি গ্রাম। মৌলা চন্দ্রকোণা থানার ১৩৮ নং মৌজা। এখানের রঙ্কিনী দেবী প্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধ।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মেদিনীপুর জেলা তথা বাংলার মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। ঘাটাল অঞ্চল তাঁহার কাব্যরচনার উৎসস্থল। ষোল শতকের শেষ হইতে সতেরো শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এই অঞ্চল কবির স্মৃতিপটে

দারুণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' অসাধারণ জনপ্রিয়তায় জনসাধারণের চিত্তে অমর হইয়া রহিয়াছে।

কবিকঙ্কণের পরে মধ্যযুগের অপর একজন প্রসিদ্ধ কবি হইলেন **রামেশ্বর চক্রবর্তী**। বরদা পরগণার যদুপুর গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান ছিল। এই স্থান বর্তমানে ঘাটাল থানার ৪১নং মৌজা। খড়ারের পূর্ব-পার্শ্ববর্তী। 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' কাব্য লিখিয়া কবি খ্যাতি লাভ করেন। এই কাব্যটি এবং তাঁহার 'সত্যপীরের পাঁচালী' একসময় খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কাব্য দুটি একসময় ঘরে ঘরে পঠিত হইত। শিবায়ন গাজন বা দুর্গাপূজা উপলক্ষে এখনও বহুস্থানে গান করা হইয়া থাকে এবং 'সত্যপীরের পাঁচালী' সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে ব্রতকথারূপে মেদিনীপুর জেলার বহু স্থানে পাঠ করা হয়।

রামেশ্বর চক্রবর্তী

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যদুপুর কবির জন্মস্থান হইলেও সতেরো শতকের শেষের দিক ও আঠারো শতকের গোড়ার দিকে চেতুয়া-বরদার সেইসময়কার জমিদার বিদ্রোহী শোভাসিংহের ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করেন এবং মেদিনীপুর শহরের উত্তরে কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিবায়নকাব্যে স্বীয় পৃষ্ঠপোষক যশোবন্ত সিংহের প্রশস্তি গাহিয়া কবি লিখিয়াছেন :

"রঘুবীর মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্মিক রসিক রণধীর।
যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর ॥
তস্য সুত যশোমন্ত সিংহ সর্বগুণযুত
শ্রীযুত অজিতসিংহের তাত।
...রাজা রণে ভৃগুরাম দানে কর্ণ রূপে কাম
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্রের সমান সভা জলন্ত পাবক প্রভা
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎকবি ॥
...তস্য পোষ্য রামেশ্বর তদাশ্রয়ে করি ঘর
বিরচিল শিবসঙ্কীর্তন।"

কর্ণগড় বর্তমানে প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত একটি স্থান। মেদিনীপুর শহরের প্রায় ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। যশোবন্তের কর্ণগড় দুর্গ বর্তমানে জঙ্গলাকীর্ণ

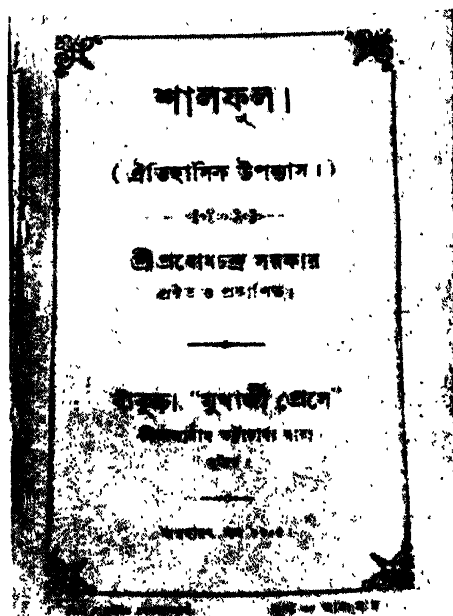
[illegible] । [illegible]বীপ্রসাদিজন নমস্কারেতে ॥ এতারবাক্য [illegible] । [illegible] [illegible] ॥ [illegible]
[illegible] । [illegible] আনন্দেতে ॥ [illegible] । তোমার [illegible] দেখে [illegible]
[illegible] । [illegible] ॥ [illegible] । [illegible]
[illegible] ॥ রাজা [illegible] । [illegible] ॥ এইরাজ্য [illegible]
[illegible] ॥ [illegible] । আমাপরিহরি [illegible] ॥ [illegible]

[illegible] । রাজা [illegible] রাজ । [illegible] হেরো রেবার ॥ রাজা [illegible] ৩৬
[illegible] । [illegible] ॥ [illegible] । [illegible] পাদপদ্ম [illegible]
[illegible] ॥ [illegible] রাজা [illegible] । [illegible] ॥ [illegible] পাদ [illegible] কারণ
[illegible] । [illegible] ॥ [illegible] । [illegible] মাত ॥

[illegible] । [illegible] সোনোকেমন ॥ [illegible] নিন । [illegible] গাদ
[illegible] ॥ [illegible] । [illegible] । [illegible] চরণ [illegible] পাইনজখন । [illegible]
[illegible] ॥ [illegible] বনসত্ত [illegible] । [illegible] ॥ ৮ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ [illegible] ॥ ঃ ॥ হ্রা ॥ [illegible] সিতারাম [illegible] সা [illegible]

[illegible] । [illegible] পুত্র [illegible] ॥ [illegible] । আ[illegible] মনেকিন
[illegible] ॥ [illegible] পিবরে । অনেক [illegible] লইল ॥ [illegible] বলে উচ্চস্বরে ।
[illegible] ॥ [illegible] ॥ আপ্তন [illegible] রাজার বনিতা ॥
[illegible] পরে । [illegible] ॥ আগে প্রদক্ষিণ করি [illegible] রাজাসত । [illegible]
[illegible] । [illegible] । [illegible] দেখে দেবী আইল [illegible]
[illegible] । পাতর [illegible] তোমার সমন ॥ [illegible]
[illegible] । [illegible] নাই [illegible] ॥ তোমার [illegible] আছে [illegible] । দিনকত
[illegible] ॥ [illegible] । পৌরুষ । অবনীর [illegible] হইবে [illegible] ॥ [illegible]
[illegible] । [illegible] দেখে আনি [illegible] ॥ [illegible] সহতারী । [illegible]
[illegible] ॥ [illegible] । [illegible] দেখি বনেতে ॥ [illegible]
[illegible] । [illegible] ॥ ঃ ॥ ১ ॥ ৺ ॥ [illegible] রাজা [illegible] বসাত । [illegible] দিন [illegible]
[illegible] । [illegible] বনিতা । [illegible] ॥ দেখিয়া প্রণাম [illegible]

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'শীতলামঙ্গল' পুথির দুটি পৃষ্ঠা


শালফুল।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সরকার

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা, "মুখার্জী প্রেসে"

'শালফুল' উপন্যাসের শিরোনাম-পৃষ্ঠা

ও দুর্গম। এই দুর্গের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দণ্ডেশ্বরের মন্দিরে কবি রামেশ্বরের কাব্যরচনার একটি বেদি এখনও বর্তমান। কথিত আছে, রামেশ্বর তান্ত্রিক উপাসকও ছিলেন। দণ্ডেশ্বরের পার্শ্ববর্তী মহামায়ার মন্দিরের একটি পঞ্চমুণ্ডী আসনে তিনি ও যশোবন্ত সিংহ আসিয়া মাতৃ-আরাধনা করিতেন। কবির সমাধি দণ্ডেশ্বর-মন্দিরের বাইরে পূর্বদিকে অবস্থিত। রামেশ্বর ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে শিবায়ন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবত ১৬৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

কবি রামেশ্বর কেশরকণির সন্তান ভট্টনারায়ণের বংশধর নারায়ণ চক্রবর্তীর প্রপৌত্র ছিলেন। নারায়ণ চক্রবর্তী সুত গোবর্ধন তস্য সুত লক্ষ্মণ এবং তস্য সুত রামেশ্বর ও শম্ভুরাম। কবির মাতার নাম ছিল রূপবতী। সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী নামে তাঁহার দুই পতিব্রতা স্ত্রী ছিলেন। শিবায়ন-কাব্যে রামেশ্বরের একটি ভণিতা প্রায়ই দেখা যায় :

"চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥"

কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রচূড় নামক কোন তান্ত্রিক গুরুর নিকট রামেশ্বর দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দীক্ষিত হইবার পর তিনি কর্ণগড়ে মহামায়ার মন্দিরের পঞ্চমুণ্ডী আসনে তন্ত্রসাধনায় নিরত থাকিতেন। তাঁহার সমাধিস্থানে যেখানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (মেদিনীপুর শাখা)-কর্তৃক একটি স্মৃতিমন্দির স্থাপিত হইয়াছে, তাহারই পাশে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক যশোবন্ত সিংহের সমাধির ভগ্নাবশেষ বর্তমান।

রামেশ্বরের কিছু পরবর্তী বরদা পরগণার অপর একজন কবি ছিলেন **অকিঞ্চন চক্রবর্তী**। তাঁহার জন্মস্থান ছিল ক্ষীরপাইয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্ধমান রাস্তার পার্শ্ববর্তী আটঘরা গ্রামে। (চন্দ্রকোণা থানা, মৌজা নং ২৩৩) পরবর্তীকালে কবি ঘাটাল থানার বেঙ্গরাল গ্রামে সম্ভবত বসবাস করিয়াছিলেন। কবির পিতার নাম ছিল পুরুষোত্তম, মাতা গঙ্গাদেবী, পিতামহের নাম হরিহর আচার্য। কবির এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম গোবর্ধন। তাঁহার 'চণ্ডীমঙ্গল' পুথি হইতে তাঁহার তিন পুত্রের নামও জানা যায়—রামদুলাল, রামচন্দ্র ও শিবানন্দ।

অকিঞ্চন চক্রবর্তী

প্রধানত মুকুন্দরামকে অনুসরণ করিয়া কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ইহা ছাড়া গঙ্গামঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কিছু কিছু দুর্গা ও শ্যামাসঙ্গীতও তিনি

রচনা করেন। তাঁহার কাব্যের ভাষা খুবই পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। মুকুন্দরামকে অনুসরণ করিলেও তাঁহার কাব্যের কোন কোন স্থানে মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আঠারো শতকের প্রথম পাদ হইতে আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত তিনি বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। গঙ্গামঙ্গল পুথির দুটি অংশের একটি ১১৮১ ও অপরটি ১১৮৩ সালে রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কবি উল্লেখ করিয়াছেন। অকিঞ্চনের বিভিন্ন পুথিতে বর্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র, তিলকচন্দ্র ও তেজশ্চন্দ্রের উল্লেখ আছে। একটি ভণিতায় কবি বলিয়াছেন :

"মহারাজা তেজশ্চন্দ্র : বৰ্দ্ধমানে যেন ইন্দ্র : পৃথিবীপালনে যুধিষ্ঠির।
প্রতাপে প্রচণ্ড রবি : সভাতে পণ্ডিত কবি : ক্ষেত্রিয়নন্দন রণধীর ॥
নিবাস তাঁহার দেশে : গঙ্গার মঙ্গল ভাষে : কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ সুবিদ্বান্।

স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ কবির কাব্যরচনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'কবীন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি এই উপাধিটি বহুমানপূর্বক ব্যবহার করিতেন।

অকিঞ্চন কবিকঙ্কণের অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল পুথিতে সুন্দর সুন্দর চরিত্র-চিত্রণে, প্রাকৃতিক বর্ণনা প্রভৃতিতে তিনি যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। 'চণ্ডীমঙ্গল' পুথিতে কবির একটি ভণিতা আছে :

"বিপ্রকুলোৎপতি আটঘরাস্থিতি
ঠাকুর পুরুষোত্তম।
তাঁহার নন্দন কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ
রচে কাব্য মনোরম ॥"

একই পরগণার কবি রামেশ্বর তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী হওয়ায় কবি অকিঞ্চন রামেশ্বরের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছিলেন মনে হয়। সম্ভবত এই দুই কবির মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবও বোধ হয় বর্তমান ছিল। অকিঞ্চনের চণ্ডীমঙ্গল ততটা জনপ্রিয় না হইলেও তাঁহার শীতলামঙ্গলের প্রচার বেশ হইয়াছিল। ঘাটাল অঞ্চলের কোন কোন স্থানে শীতলাপূজা উপলক্ষে তাঁহার শীতলামঙ্গল গান এখনও হইয়া থাকে।

হরিরাম

হরিরাম নামে এক কবি বরদা পরগণায় সতেরো শতকের শেষদিকে "অম্বিকামঙ্গল" নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্রোহী জমিদার শোভা সিংহের আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্য রচনা করেন বলিয়া জানা যায়। সম্ভবত ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শোভা সিংহের বিদ্রোহের আগে হরিরাম তাঁহার এই কাব্যরচনা শেষ করেন। কবিরচিত

অভ্রিজামঙ্গলের যে পুথিটি পাওয়া গিয়াছে তাহা বাংলা ১০৮০ সালে নকল করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই কাব্যে কবি শোভাসিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিজ গঙ্গাদাসও 'অভয়ামঙ্গল' নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি সম্ভবত সতেরো শতকের গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, ইহাতে সেইসময়ে বরদার জমিদার দলপতির নামের উল্লেখ আছে। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রচিত 'বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী' গ্রন্থে বরদার জমিদার দলপতের নাম পাওয়া যায়। ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কবি পুথির একস্থানে লিখিয়াছেন :

দ্বিজ গঙ্গাদাস

"ধন্য দলপতি রাজা রণকালে মোহাতেজা
ছিলা রাজা বরদানগরে।
হয়্যা রাজা যুথাসীত প্রতীষ্টা করিল গীত
গাএন গঙ্গেষ কবিবরে ॥

পুথিটির লিপিকাল ১১৪৩ সাল।

প্রাণবল্লভ ঘোষ নামে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা-কালনার এক কবি এই মহকুমার চেতুয়া পরগণা-বন্দোবস্তের জন্য নবাব মুর্শিদকুলি খাঁনের রাজ্যকালে আনুমানিক ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। কবি নবাব মুর্শিদকুলির রাজস্ব-বন্দোবস্তের এক কর্মচারী ছিলেন। চেতুয়া গ্রামে এই কার্যের সদর কাছারী ছিল। এই পরগণার বাসুদেবপুর গ্রামে তাঁহার 'জাহ্নবীমঙ্গল' পুথিটির নকল শেষ হইয়াছিল বাংলা ১১৩১ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে। পুথিটি গঙ্গামঙ্গল কাব্যের এক বৃহত্তম কাব্য। বাংলা ১১০৪ সালে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের মাতার রাজত্বকালে ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। বাসুদেবপুর-নিবাসী ব্রজবল্লভ রায়ের গৃহে ১৬৪৬ শকাব্দ বা বাং ১১৩১ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ বেলা ছয়দণ্ড শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে কাব্যটি নকল করা শেষ করেন আম্বুয়া পরগণার অধিবাসী সীতারাম দাস সুর। একটি ভণিতায় কবি বলিয়াছেন :

প্রাণবল্লভ ঘোষ

"অম্বিকানগরে স্থিতি কৃষ্ণপদে করি নতি
বিরচিল শ্রীপ্রাণবল্লভ।"

কবির বাবার নাম ছিল বংশী ঘোষ। ইহা ছাড়া পুথিটির মধ্যে সেকালের গদ্যে

রচিত কতগুলি 'কড়চা' হইতে এই অঞ্চলে মুর্শিদকুলির রাজস্ব-বন্দোবস্তের বিক্ষিপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা যায়। যেমন—

(১) "চেতুয়া পরগণা বন্দোবস্ত করিতে শ্রীনারায়ণ সিংহ ও শ্রীরাজবলয় বিশ্বাস আসিয়াছেন।" (২) "শ্রীরামচন্দ্র রায় তগীরিতে বহল শ্রীপ্রাণবল্লভ ঘোষ সাযুজ্যা বহল হইলেন।" (৩) "বাসাতে আমল শ্রীযুত ব্রজবল্লভ রায় মুরসিদাবাদে বন্দখানাতে এ সময় লিখিবার হইল পরনামজকুর বন্দোবস্ত করিতে শ্রীযুত নারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুত বিশ্বাস।" ১১৩১ সালের ফাল্গুন মাসে কবি যে চেতুয়ায় ছিলেন তাহাও এই কড়চা হইতে জানা যায়। জাহ্নবীমঙ্গল পুথিটি বাসুদেবপুর গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবত কবি এইখানেই স্থায়িভাবে বাস করিয়াছিলেন।

"জাহ্নবীমঙ্গল" কাব্যের ভাষা খুবই সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ। কাহিনী মূলত পৌরাণিক হইলেও কোন কোন স্থানে কবির মৌলিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি ভণিতার আর এক স্থানে বলিয়াছেন :

"জাহ্নবীমঙ্গল গীত অমৃতলহরী।
পিবত ভকতলোক কর্ণপুট ভরি॥"

চেতুয়া পরগণার দুইজন প্রসিদ্ধ পালাগায়ক

এই মহকুমার চেতুয়া পরগণায় আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে আরও দুইজন কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদের নাম আজও অনেকের নিকট অজ্ঞাত। সম্প্রতি এই কবিদ্বয়ের কতগুলি পালাগানের পুথি পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে দাসপুর ও চেতুয়া অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস কিছু জানিতে পারা যায়। কবিত্ব-উৎকর্ষের দিক হইতে এই দুইজন কবির পালাগানগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ইঁহাদের নাম **শঙ্কর** ও **কৃষ্ণকিঙ্কর**।

শঙ্করের পদবী ছিল 'দেব'। তাঁহার আদিবাস ছিল কাশীজোড়া পরগণার পশ্চিমমালিকা গ্রাম। পলাশপাই খাল বা কাঁসাই-তীরবর্তী এই গ্রামটি বর্তমানে পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত। কবি তাঁহার 'শীতলামঙ্গলে'র একস্থানে আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন :

"সংগ্রাম কুবের সুত হরিদাস দেবজুত
পশ্চিমমালিকা পুরে বাস।
সুদামা দেবের সুত পুণ্যশ্লোকগুণজুত
তাহার তনয় কৃষ্ণদাস॥

মাধবী জঠরে জন্ম সদা চেষ্টা গান কর্ম
বিরচিলা শীতলামঙ্গল।
প্রভুর চরণ সেবি কহেন শঙ্কর কবি
নায়কের চিন্তহ কুশল ॥"

ইহা হইতে জানা যায়, কবির পিতার নাম ছিল কৃষ্ণদাস এবং মাতার নাম মাধবী। কৃষ্ণদাসের পিতা সুদামা দেব তস্য পিতা হরিদাস দেব তস্য পিতা সংগ্রামকুবের দেব। পরবর্তীকালে কবি এই পরগণার কলাইকুণ্ড গ্রামে বাস করেন। ইহা বর্তমানে দাসপুর থানার ১৮০ নং মৌজা। শঙ্করের শীতলামঙ্গল কাব্যের চারখানি পালার মধ্যে লঙ্কাপূজা, বিরাট জাগরণ, নীলধ্বজ রাজার পূজা, নিমা জগাতীর পালাগুলি আছে। এগুলি ছাড়া কবিরচিত দিগ্‌বন্দনা, কামাখ্যার গীত, ফেস্তারার পালা, রঘুদত্তের পালা, পঞ্চাননের গীত, গঙ্গাবন্দনা প্রভৃতি পালাও পাওয়া যায়। 'লঙ্কাপূজা' পালার একস্থানের একটি ভণিতা হইতে জানা যায় ১১৪৪ সালের ২৮শে আশ্বিন শুক্রবার সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টির সময় কবি ইহা শীতলার দয়ায় রচনা করেন।

কবি শঙ্করের পূর্বপুরুষেরা বোধ হয় পালাগায়ক ছিলেন। কবিও স্বয়ং শীতলামঙ্গলের পালাগান রচনা করিয়া নানা স্থানে গান করিয়া বেড়াইতেন। একসময় তিনি রূপনারায়ণের পূর্ব তীরবর্তী মণ্ডলঘাট পরগণার ভাটোরার কাছাকাছি কুলিয়া গ্রামে জমিদার ঠাকুরদাস চৌধুরীর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং সেখানে তাঁহার মধুর কণ্ঠের গান শুনিয়া ঠাকুরদাসের পত্নী কবিকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া বহু বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করিয়াছিলেন। কবি ইহা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিয়াছেন। শীতলামঙ্গলের 'বিরাট জাগরণ' পালার একস্থানে কবির একটি ভণিতা এইরূপ :

"চেতুয়ার শেষ খণ্ড নিবাস কলাইকুণ্ড
যথা অধিষ্ঠান সরস্বতী।
শীতলার পদসেবী কহেন শঙ্কর কবি
নায়কের চিন্তহ সন্ততি ॥"

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নামে অপর একজন পালা রচয়িতা এই পরগণার ক্ষেপুতের নিকটবর্তী হাড়োয়াচক নামক স্থানে বাস করিতেন। শান্তিরাম আগমবাগীশ নামে একজন পালাগায়কের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি প্রথমে মনসামঙ্গলের একটি পালা রচনা করেন। নানা কারণে কবি স্বীয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া পরে ক্ষেপুতের নিকটবর্তী 'কিটবাটী' গ্রামে বসতি করেন। ইহার পর তিনি বেশ কয়েকটি

পালাগান রচনা করিয়াছিলেন, যেমন, লঙ্কাপূজা, বরুণপূজা, ইন্দ্রপূজা, রাবণ-পূজা—শীতলামঙ্গলের এই চারটি পালা, পঞ্চানন মঙ্গল, দেবী লক্ষ্মীর গীত, সত্যনারায়ণের সাত ভাই দুঃখীর পালা, শীতলার জন্মপালা, শীতলার জাগরণপালা প্রভৃতি।

কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর আঠারো শতকের শেষদিকে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার 'সত্যনারায়ণের সাত ভাই' পালার একস্থানে কবি ঐ পালার রচনাকাল ১১৯৫ সাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'পঞ্চাননমঙ্গলে' প্রহেলিকার মাধ্যমে যে সাল তারিখ পাওয়া যায় তা ১১৮০ সাল। জানা যায়, কবি সম্ভবত অব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি সমাজপতি ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছিলেন। পরে স্বগ্রামের এই ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করেন। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর তাই এইসব ব্রাহ্মণের এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক পূর্বোক্ত মণ্ডলঘাট পরগণার জমিদার ঠাকুরদাস চৌধুরীর পুত্র বাঞ্ছারাম চৌধুরীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি পালাগানে সেইসময় চেতুয়া, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি পরগণার তদানীন্তন কিছু কিছু ইতিহাস জানিতে পারা যায়। কবি লিখিয়াছেন :

"ক্ষেপুত ভাটড়া তড়া গোপালনগর শ্রীবরা
পঞ্চপাটে পঞ্চ ভট্টাচার্য্য।
দেব অনুগ্রহ কবি এ পঞ্চ পণ্ডিত সেবি
তবে কৈল কবিতায় ধার্য্য॥"

সেইসময় ক্ষেপুত, ভাটড়া, তড়া, গোপালনগর, শ্রীবরা—এই পাঁচটি গ্রামে বহু টোল ও পণ্ডিত-ভট্টাচার্যদের বাস ছিল। ভাটড়া, তড়া এই দুটি গ্রাম ছাড়া বাকী সবগুলিই চেতুয়া ও কাশীজোড়া পরগণায় অবস্থিত। কবি এই 'পঞ্চপাটের' প্রধান পাঁচজন ভট্টাচার্যের আশীর্বাদ লইয়া কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেন এবং অচিরেই কবিত্বখ্যাতি লাভ করেন। ইঁহাদের নামও কবি বলিয়াছেন—ভাটোরা গ্রামের রুক্মিণী ভট্টাচার্য, গোপালনগরের গঙ্গেশ্বর ভট্টাচার্য, শ্রীবরার ভোলানাথ ভট্টাচার্য, ক্ষেপুতের রামগোপাল ভট্টাচার্য এবং তড়ার সার্থকরাম ভট্টাচার্য। ক্ষেপুতের শুকদেব রায় নামে এক ব্রাহ্মণ কবিকে "পঞ্চাননমঙ্গল" নামক কাব্যরচনার প্রেরণা দেন। কবি তাঁহার প্রশংসাও করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তদানীন্তন বর্ধমান-অধিপতি তেজশ্চন্দ্র ও তাঁহার পুত্র প্রতাপচন্দ্রের উল্লেখও তাঁহার একটি পালাগানে আছে। প্রাচীন চন্দ্রেশ্বর খালের খননকর্তা রাজা চন্দ্রেশ্বরের নামের উল্লেখও তাঁহার 'পঞ্চানন-মঙ্গলে' আছে।

শীতলার 'জাগরণ পালা'র পুথির একস্থানে কবি তাঁহার আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, কবির পিতার নাম কাণামণি, খুল্লতাত আনন্দ। কবিরা চার ভাই ছিলেন—জ্যেষ্ঠ দীনবন্ধু, দ্বিতীয় নিমাই, তৃতীয় স্বয়ং কবি এবং সর্বকনিষ্ঠ নারায়ণ। শ্রীমতী নামে কবির এক পিসিও ছিলেন। কবির বংশপরিচয় এইরূপ—শঙ্করপুত্র লক্ষ্মীকান্ত তস্য সুত শূলপাণি তস্য সুত জগন্নাথ তস্য সুত মুকুন্দ তস্য সুত কাণামণি ও আনন্দ। কাণামণি সুত দীনবন্ধু, নিমাই, কিঙ্কর ও নারায়ণ।

পূর্বকথিত কবি শঙ্কর ছাড়াও অপর একজন **শঙ্কর** নামে কবি এই মহকুমার রাণীরবাজার নামক স্থানে ১৬৮১ শকাব্দ বা ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ষষ্ঠীমঙ্গল' নামে একখানি কাব্যরচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। রাণীরবাজার ঘাটাল থানার অন্তর্গত ৭১ নং মৌজা, ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পাকা রাস্তার ধারে অবস্থিত। পূর্বে এই স্থান খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল। চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভাসিংহের গড় এলাকা হইতে এইস্থান খুব দূরে নয়। সম্ভবত সিংহবংশের কোন রাণীর নামানুসারে সে সময় এখানে একটি বাজার ছিল। কবি শঙ্কর 'ষষ্ঠীমঙ্গলে' তাঁহার আত্মপরিচয়ের মধ্যে বলিয়াছেন :

"আত্মবসু চন্দ্রকলা শেষে রাণী পাটনীলা
নাম যার ছিদাম সুদাম।
রাণীর বাজারে স্থিতি যশোমতী পুণ্যবতী
বিশালাক্ষী পদ্ম যার আশ॥
তাহার তনুজ শ্যাম সীতারাম তার নাম
তার জ্যেষ্ঠপুত্র গোবর্দ্ধন।
তাহার অনুজ ভাই ষষ্ঠীর আদেশ পাই
শ্রীকবি শঙ্করে রসগান॥"

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, যশোমতীর পুত্র সীতারাম তস্য পুত্র গোবর্ধন ও শঙ্কর। ঘাটাল অঞ্চলের নানা স্থানে ষষ্ঠী দেবীর পূজা আজও হইয়া থাকে। কবি শঙ্কর এই ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য এই কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিজ বাঞ্ছারাম নামে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ের এক কবি ঘাটালের কোন স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার রচিত কোন সম্পূর্ণ কাব্যের পুথি আজও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু দ্বিজ বাঞ্ছারাম ভণিতায় বেশ কিছু পদ্য তিনি লিখিয়াছিলেন। এই পদ্যগুলির কিছু কিছু খনার প্রবচনের আকারে রচিত। রামায়ণ ও মহাভারতের কোন কোন কাহিনী

অবলম্বন করিয়াও দ্বিজ বাঙ্গারাম কয়েকটি ছোট ছোট কবিতা লিখিয়াছিলেন। হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের কিছু কিছু গল্পকেও তিনি পদ্যাকারে রূপ দিয়াছিলেন। অবশ্য এসবের মধ্যে আঠার শতকের বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্রের প্রভাব বেশ লক্ষ্য করা যায়। তাই মনে হয় কবি বাঙ্গারাম আঠারো শতকের শেষদিকে আবির্ভূত হন। খনার প্রবচনের আকারে বা জ্যোতিষের কিছু কিছু তত্ত্ব কবিরচিত নীচের একটি পদ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে :

"তারাশুদ্ধি তত্ত্ব বলি ভাষায় সুষম।
জন্মতারায় যাত্রা করা বড়ই বিষম॥
সম্পৎ সকল শুভ সর্বত্র মর্যাদা।
বিপৎ আপৎ বাড়া অতএব বাধা॥
...বাঙ্গারাম দ্বিজে বলে ইথে শুভাশুভ॥"

কবির সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

'শীতলামঙ্গল' কাব্যের বিখ্যাত কবি **নিত্যানন্দ চক্রবর্তী** যদিও সম্ভবত এই মহকুমার অধিবাসী ছিলেন না, তথাপি এই অঞ্চলে অতিপরিচিত তাঁহার 'শীতলামঙ্গল' কাব্যখানি আজও মহকুমার নানাস্থানে শীতলাপূজা উপলক্ষে গীত হইয়া থাকে। কবি চেতুয়া পরগণার দক্ষিণপূর্ব সীমারেখা বরাবর কাঁসাই নদীর দক্ষিণ তীরে কাশীজোড়া পরগণার কানাইচকে বাস করিতেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষ পূর্বে ভরদ্বাজগোত্রসম্ভূত ডিণ্ডিশাহী বা ডিংশাহিগ্রামী কাঁটাদিয়াবাসী ছিলেন। ইঁহার বংশে প্রথমে ডিংশাই, পরে মিশ্র এবং পরে চক্রবর্তী উপাধি প্রচলিত হয়। কবির পিতার নাম ছিল মহামিশ্র রাধাকান্ত তস্য পিতা চিরঞ্জীব মিশ্র তস্য পিতা মনোহর মিশ্র তস্য পিতা ভবানী মিশ্র। কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণের তিনি সভাসদ্ বলিয়া কবি তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। বাং ১১৬১ সালে কবি তাঁহার 'শীতলামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। শীতলামঙ্গলে আটটি পালা আছে : (১) স্থাপনা বা স্বর্গপালা, (২) পাতালপালা, (৩) লঙ্কাপালা, (৪) কিষ্কিন্ধ্যাপালা, (৫) অযোধ্যাপালা, (৬) মথুরা ও মগধপালা, (৭) গোকুলপালা, (৮) বিরাটপালা। বর্তমানে কবির বংশধরেরা পাঁশকুড়া থানার কানাইচকে (মৌজা নং ২৬০) বাস করেন। পূর্বে ঐ থানারই মাড়বেড়িয়ায় (মৌজা নং ২৭৮) ইঁহাদের বসতি ছিল বলিয়া জানা যায়। ঘাটাল অঞ্চলে শীতলার পালাগানের বহু গায়ক আছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই কবি নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গলের পালাগান করিয়া থাকেন। কবি নিত্যানন্দের জন্মস্থান বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। কেহ

বসন্তেরমতিন ছত্র ২॥ বারেই বৈশএদেশে: বার্তা [illegible] তি তাহার পাশে: পতি বৈশে বজারে ২। [illegible]
ভ মগড়ের বাহির: পাটি দাত্র সেকদার: চারিভিতে বেশমত্রেহ ।। জনাভিতে ক রঙী। শোভই। [illegible] বেলে
বেহেরান: কতজাতি বৈশেনানা ঃ নৈরিনগারে বেচে গেই। শভার শব লগাই: দোমিদেরিসিতনাই: শতা
রাজাএতে হৈলতার ।। নগরেনরনারি শব: কা: জনের মহাবর: পাট রানি সমাচার পাইল। হরিয়া কা
পদানির রাজা কে কহে রানি: অবধানে সুমন রাজার। কহে রানি অরশেশে: প্রমাদ সতি বশেশে: কো
নপানে পুরহ তবর ।। পরগনামগুন মাঠে: [illegible] শনিকটে: কুণ্ঠগ্রাম জতি মনত্র ।। সেই কুন্তী
গ্রামে বাশ: চৌধরি ঠাকুরদাস: পুন্য শোক দেবির [illegible] র ।। তার পতি [illegible] নারি: মোরে [illegible]
করি: দিলা নানা বস্ত অলংকার। শিতলা চরন সেবি: কহেন সংক্ষর করি: দেবি জারে হৈন [illegible]
কর ।। [illegible] ।। ৬১ ।। [illegible] ।। পশ্চিম প্রতিতে [illegible] র। হাতি ঘোড়া লোক জন করে মরেরম ।।

বিজাতি বিশতবৈল সেরেশ [illegible] ন। [illegible] রানি বলে রাজা কি হবে এখন ।। বেডিন নগর দেশে কার [illegible]
তায়। রাজই অভাগির বোল বাজারে [illegible] ।। [illegible] পতি ভাবে মনে ২। দারুন শংকট প্রত্র
রাখিকোন খানে ।। সুর্যের নিকটে কারি নাই অরিজার। সুর্যে দেব [illegible] রাখিরে প্রত্রকে আমরা ।। এ
বলি সুর্যে স্তব করে [illegible] । এ বার আমার প্রত্র [illegible] বাহর ।। তোমার শরণে আতে কার অধি
কার নাই ।। এ তব আমার প্রাণ রাখহ গোসাই ।। রাজার স্তরেতেও [illegible] বৈল দিজমনি। কোলে করি রাজ
প্রত্রে রাখিল আপনি ।। সুর্য রাখিলেন প্রত্র আপনার রথে। এমনে রোগের মাত্র পাইল দেখিতে ।। দেবি
বলে ওগো [illegible] দাশি রক্ত বতি শুন। সুর্য জে রাজার প্রত্র [illegible] রাখিলেন কেনে ।। কি কারনে রাজ প্রত্রে রাখে
[illegible] মনি। মজার সুর্যের প্রি [illegible] শাজিয়া আপনি ।। ইশ্বরি বলেন পাত্র সংগে লহ জর। বিরক্ষি
[illegible] সংগে বল গেল অতঃপর ।। এমন বিবাদ হৈল [illegible] র শাহিতে। মজাব সুর্যের প্রি রি কেপারে বাখিতে

কেহ দাসপুর থানার আদিখয়রা গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া মনে করেন। কবি অবশ্য শেষ জীবনে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন :

"নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুক্ষর।
প্রতিষ্ঠিল গঙ্গাতীরে সিংহ হলধর ॥"

অতএব আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান না হওয়া পর্যন্ত কবির সঠিক বাসস্থান বা জন্মস্থান সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। কবির সময়ে কানাইচক, বৃন্দাবনচক প্রভৃতি গ্রাম চেতুয়া পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মধ্যযুগের উল্লিখিত কবিকুল ব্যতীত এই মহকুমায় বা পার্শ্ববর্তী বহু স্থানে অখ্যাত অজ্ঞাতনামা অনেক কবি বা পালাগায়কের আবির্ভাব হইয়াছিল। স্থানে স্থানে এই কবিবর্গের তুলটকাগজে লিখিত অনেক প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের বেশির ভাগই মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধারা বা খ্যাতনামা কবিদের অনুসরণ করিয়া পালাগান বা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের পালাগান বা কাব্যে মৌলিকতার তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবত আঠার শতকের শেষ দিকে **মধুসূদন** নামে এক কবি 'মধুমল্লিকা-মঙ্গল' নামে এক কাব্য রচনা করেন। তিনি ঘাটালের কোন এক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। 'ধর্মমঙ্গল' রচয়িতা বিখ্যাত কবি **মাণিক গাঙ্গুলী**ও সম্ভবত ঘাটালের উত্তরাংশে জাহানাবাদ পরগণার বেলডিহা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঘাটাল ও তৎসংলগ্ন এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু ধর্মমন্দির ও ধর্মঠাকুর লক্ষ্য করা যায়। ধর্মঠাকুরের কাহিনী লইয়া নিশ্চয়ই এই অঞ্চলে কিছু কিছু ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল। চন্দ্রকোণায় এই ধরণের কিছু কিছু পুথি পাওয়া গিয়াছে। মঙ্গলকাব্য ছাড়াও শ্যামা বা দুর্গা-বিষয়ক সঙ্গীত বা পদ এবং বৈষ্ণবপদও এই অঞ্চলে অনেক রচিত হইয়াছিল মনে হয়। পূর্বোক্ত অকিঞ্চন চক্রবর্তী-রচিত শ্যামা ও দুর্গাবিষয়ক এই ধরণের অনেকগুলি সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছাড়াও ঘাটাল ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু নূতন নূতন গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, নাটক, কাব্য, দর্শন প্রভৃতির টীকা বা প্রবন্ধ রচনা করিয়া এই অঞ্চলের কোন কোন পণ্ডিত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে **গোপাল চক্রবর্তীর** নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। গোপালের জন্মস্থান কেশপুর থানার যদুপুরে (মৌজা নং ১৩৪) ছিল। তিনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের

সমসাময়িক ছিলেন। যদুপুর গ্রামটি প্রাচীন ব্রাহ্মণভূম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সতেরো শতকের গোড়ার দিকে গোপাল চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ভাগবত, অধ্যাত্মরামায়ণ প্রভৃতি সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছে। লণ্ডনের গ্রন্থাগারে তাঁহার রচিত গ্রন্থের অনেক পুথি রক্ষিত আছে। তাঁহার রচিত অপ্রকাশিত প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকের টীকা বর্তমান। আরও অনেক টীকাকারের মধ্যে দাসপুর থানার বলিহারপুর গ্রামের আনন্দরাম বিদ্যালঙ্কার ও বাসুদেবপুরের 'ভবানন্দ ভট্টাচার্য ব্যাকরণের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীবরার অধ্যাপক নারায়ণ সিদ্ধান্তের বংশধরগণের অনেকে স্বভাব কবি ছিলেন।

সংস্কৃত কবি ও টীকাকার

এই মহকুমার কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় কাব্য ও নাটক লিখিয়াছেন, তাহা আজও অনেকের নিকট অজ্ঞাত। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইলেন দাসপুর থানার ধানখালের **রামকানাই তর্কভূষণ**। তিনি আজ হইতে প্রায় একশ' বছর আগে **কৃষিসম্ভবম্** নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। ঘাটাল থানার অন্তর্গত কিস্মৎ দীর্ঘগ্রামের সীতারাম চক্রবর্তীর পুত্র **ভবতারণ কাব্যতীর্থ** কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠের সময়েই **মূঢ়মর্দনম্** নামে একটি সংস্কৃত নাটক লিখিয়াছিলেন। উহা এবং **বিরহাবসানম্** নামে তাঁহার অপর একখানি নাটক সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল পত্রিকার ইং ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি ১৯২৭ সালে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বলিহারপুর গ্রামের সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক 'মুদ্রারাক্ষসের' ও তাঁহার ভ্রাতা রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র টীকাকার ছিলেন। এই গ্রন্থের অন্যতম লেখক **পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থের প্রমদ্বরা** নামে একটি একাঙ্ক সংস্কৃত নাটক এবং **কথাকোষ** ও **ঈশপীয়া নীতিকথা** নামে যুক্তাক্ষর-বর্জিত দুটি সংস্কৃত গল্পের বই আছে। উক্ত গল্প বই দুটির কতকাংশ কলিকাতার "মঞ্জুষা" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মহকুমার অন্যান্য স্থানে সম্ভবত আরও কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় কাব্য, নাটক প্রভৃতি রচনা করিয়া থাকিবেন।

আধুনিক যুগ ঃ

'আধুনিক যুগ' বলিতে বিদ্যাসাগরের সময় হইতেই এই অঞ্চলে বাংলা গদ্য রচনা সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত হয়। বাংলা গদ্যের সক্ষম শিল্পী

বিদ্যাসাগর বীরসিংহে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অবশ্য, তাঁহার আগে এই মেদিনীপুর জেলায় **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারকেই** বাংলাগদ্যের আসল জনক বলা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগরের জন্মগ্রহণের পূর্বেই মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চারখানি গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন : **বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলি** ও **প্রবোধচন্দ্রিকা**। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনখানি গ্রন্থ তাঁহার জীবিতকালেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিদ্যাসাগরের জন্মের পূর্বেই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরের বৎসর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। তিনি এই প্রয়াত সাহিত্যসাধক মৃত্যুঞ্জয়ের যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর

মৃত্যুঞ্জয় ও বিদ্যাসাগরের পরে মেদিনীপুর জেলায় বহু সাহিত্যসেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই মহকুমার চন্দ্রকোণার অধিবাসী **প্রবোধচন্দ্র সরকার** **শালফুল** নামে একটি সুন্দর উপন্যাস রচনা করেন।

"শালফুল" একটি চমৎকার ঐতিহাসিক উপন্যাস। সন ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বাঁকুড়া "মুখার্জী প্রেসে" রাজারাম ভট্টাচার্যদ্বারা এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হইয়াছিল এবং গ্রন্থকারকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উপন্যাসটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৬ এবং আকার ৪½"×৭"। ক্ষুদ্রায়তন এই গ্রন্থটিতে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বগড়ি-অঞ্চলের প্রসিদ্ধ "নায়েক বিদ্রোহে"র ইতিহাস অবলম্বনে এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই উপন্যাসে প্রবোধচন্দ্রের শিল্পক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসটির ভূমিকা-অংশের একস্থানে প্রবোধচন্দ্র লিখিয়াছেন :

প্রবোধচন্দ্র সরকারের ঐতিহাসিক উপন্যাস :

"বহুবিধ কারণে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ ভারতবাসি জনগণের স্মরণীয় হইবে ; এক দিকে কংগ্রেসসভায় কতিপয় ভারতসন্তানের রাজনৈতিক জল্পনার মধুর কল্লোল, রাজভক্ত ভারতবাসিগণের হীরক জুবিলি উৎসবে আনন্দোচ্ছ্বাস ; অপর দিকে প্লেগ, প্লাবন, ভূকম্পন, দুর্ভিক্ষ, সীমান্তে সমরানল এবং সমস্ত ভারতব্যাপী রাজনৈতিক গগনের তমোময় ভীষণ চিত্র, ভারত ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠায় জলন্ত অক্ষরে চিত্রিত থাকিবে। সেই জুলাই মাসে, তখন বোম্বাই প্রদেশের বিমল আকাশে হঠাৎ একখণ্ড কালো মেঘ সমুদ্ভূত হইয়া নিমেষ কাল মধ্যে গভীর গর্জনে সমস্ত ভারতাকাশ সমাচ্ছন্ন করিল ; যখন ভারতের যাবতীয় কৃতী সন্তানগণ ভয়াকুলচিত্তে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কে কবে নির্বাসিত

হইবে, কে কবে বন্দীকৃত হইবে……সেই বিঘোর দুর্দিনে ক্ষুদ্র গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র "শালফুল" উপন্যাস মুদ্রিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।"

গ্রন্থকারের এই উদ্ধৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায় সেই সময়ে এই উপন্যাসটি প্রকাশ করিয়া তিনি কতখানি সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। 'শালফুল' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম—"বনপথে ডাকাত"। ইহার প্রথম অংশের একটু উদ্ধৃতি দেওয়া হইল:

"বৈশাখ মাস। বেলা শেষ হইয়াছে। সূর্য ক্ষণমাত্র অস্ত গিয়াছেন। তাঁহার রূপরাগে পশ্চিমগগন এখনও রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। রৌদ্রের তাপ নাই, নিশার আঁধার নাই। উর্দ্ধে নীল বিমল আকাশ, নিম্নে শ্যামল প্রান্তর। বৃক্ষে বৃক্ষে নবীন পল্লব, নবীন কুসুম। নবীন কুসুমে নবীন ভ্রমর। নিদাঘ প্রারম্ভে বঙ্গে গোধূলি কি লীলাময়ী! কি মনোহারিণী! বিবিধ বিহগকুল—কেহ উড়িতেছে, কেহ বসিতেছে, কেহ মধুর স্বরে সান্ধ্যসঙ্গীত গাইতে গাইতে কোথায় যাইতেছে…এমন সময়ে কয়েকজন বাহক একখানি পাল্কী স্কন্ধে লইয়া বিষ্ণুপুর হইতে মেদিনীপুরের পথে যাইতেছিল।" (পৃষ্ঠা ১—২) এই উপন্যাসে মোট তিরিশটি পরিচ্ছেদ ও একটি ক্ষুদ্র পরিশিষ্ট আছে। মূল্য মাত্র ৸৹ আনা ছিল। সম্ভবত পরে কোন দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই।

প্রবোধচন্দ্র সরকারের এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি এই অঞ্চলের সাহিত্য সাধনার এক উজ্জ্বলতম নিদর্শনরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। সম্ভবত উপন্যাসটির প্রচার খুব বেশি না হওয়ায় ইহা অনেকের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা **দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন পদ্যাঙ্কুর** নামে একটি কবিতাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উহা সতের পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং সাতটি কবিতার সমষ্টি। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে ১২ই আগস্ট, ১৮৬৭ লিখিত আছে। তাঁহার অপর ভ্রাতা **শম্ভুচন্দ্র** বিদ্যাসাগরের প্রথম জীবনচরিতকার। চন্দ্রকোণার বিখ্যাত গীতিকার ও গায়ক **রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়** বর্ধমানরাজ মহাতাবচাঁদের রাজসভার গায়ক ছিলেন। তিনি **বাঙ্গালীর গান** নামে সঙ্গীতাবলী রচনা করিয়াছিলেন। 'বঙ্গবাসী কার্যালয়' কলিকাতা হইতে সেইগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' তাঁহার দুয়েকটি গানের অনুলিপি দেওয়া হইবে। চন্দ্রকোণার অযোধ্যা-নিবাসী **কালিদাস দত্ত**-রচিত গ্রন্থাবলী (১) সমরসঙ্গীত (২) কল্পনা কুসুম (৩) 'বঙ্গে চৌহান' নাটক ও (৪) কাদম্বরী নাটক। দাসপুর থানার সয়লার **কালীপদ সিংহ**ও একটি দীর্ঘ উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহার নাম

'পরিশোধ'। ক্ষীরপাইয়ের **রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়** 'নবসঙ্গীত' নামে চৌষট্টি পৃষ্ঠার গ্রন্থ লিখিয়া বাং ১২৯৯ সালে কলিকাতায় মুদ্রিত করেন। দাসপুর থানার কুচামারীর (মৌজা নং ১৫৪) **পুলিনবিহারী অধিকারী** 'কবিতাগুলি' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ঘাটালের **গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী** বৈষ্ণব কবি ছিলেন। তাঁহার **'জন্মাষ্টমী কাব্য'** অপূর্ব ভাব ও ভক্তির সমন্বয়। শিবপ্রসন্ন সেন স্বভাবকবি ছিলেন। তিনি মুখে মুখে গান, কবিতা প্রভৃতি রচনা করিতে পারিতেন। দাসপুর থানার চেতুয়া-বাসুদেবপুরের **প্রিয়নাথ রায়** পদ্যে **'শ্যামানন্দ প্রকাশ'** (শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুর) প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৩০২ সালে ঘাটাল, 'রামেশ্বর মেডিকেল হল প্রেসে' রামচরণ দাসকর্তৃক মুদ্রিত হয়। ইহাতে চারটি সর্গ, ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা ও ভূমিকা ছিল। মূল্য মাত্র আট আনা।

নিম্নে ঘাটাল মহকুমার আরও কয়েকজন কবি, সাহিত্যিক, নিবন্ধকার ও পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা-সম্পর্কে উল্লেখ করা হইল :

(১) **রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন :** ইনি নাড়াজোলের রাজা ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—(১) সঙ্গীতলহরী (১৮৭১ খ্রীঃ) (২) মনমিলন (১৮৭৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮২) (৩) গোবিন্দগীতিকা (১৮৮৩) (৪) শারদোৎসব (১৮৮১) (৫) মথুরামিলন (১৮৮৩)। ইঁহার লিখিত নাড়াজোলরাজাদের ইতিবৃত্তমূলক একটি প্রামাণিক গ্রন্থ 'The History of Midnapore Raj" ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় Thaker Spink and Co. কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৯।

(২) **রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন :** মহেন্দ্রলালের পুত্র নরেন্দ্রলাল বাংলা পদ্যে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' রচনা করাইয়াছিলেন।

(৩) **রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় :** ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ঘাটালের মহকুমা শাসক ছিলেন। ইঁহার রচিত উনিশ শতকের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বিদ্যাসাগরের শিক্ষক "প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবনী" একটি উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ।

(৪) **সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য :** ইনি প্রসিদ্ধ **'পুরোহিত-দর্পণ** নামক গ্রন্থের প্রণেতা এবং একজন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। ঘাটাল শহর ইঁহার জন্মস্থান। তাঁহার **'পরলোকরহস্য'** প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

(৫) **রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় :** বরদার অধিবাসী। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত ইঁহার একটি পুস্তিকা-গ্রন্থ "রাজা শোভাসিংহের বিদ্রোহ ও শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী মাতার ইতিহাস"।

(৬) **চন্দ্রশেখর ঘোষদাস :** ইনি ১৩০৬ সালে রামেশ্বর মেডিকেল হল প্রেস হইতে প্রসিদ্ধ 'কায়স্থকুলদর্পণ' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬। পদ্যে নানা বন্দনাদিসহ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণের বিবরণ ইহাতে আছে। মূল পুথি রাধাকান্তপুরের তালুকদার বসুবংশে পাওয়া গিয়াছিল।

(৭) **মৃগাঙ্কনাথ রায় :** ইনি জাড়ার প্রসিদ্ধ রায়বংশের সন্তান। ইহার লিখিত "চন্দ্রকোণার ইতিবৃত্ত" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ সুপরিচিত "মেদিনী-বাণী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৮) **মানবেন্দ্রনাথ রায়** (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) : বিখ্যাত বিপ্লবী ও মনীষী। ইহার বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহার রচিত গ্রন্থাবলী—From Savagery to Civilization, Science and Superstition, Heresies of 20th Century, Historic Role of Islams, Message of India, Materialism and Reason, Romanticism and Revolution প্রভৃতি।

(৯) **কানাইলাল ঘোষ :** দাসপুর থানার ক্ষেপুত গ্রামের অধিবাসী। ইহার রচিত 'শরৎচন্দ্র', 'দশবছরের ডায়েরী', 'খোলা চিঠি', 'অন্তরালে', 'কথা কও', 'শাখা-প্রশাখা' প্রভৃতি গ্রন্থ আছে।

(১০) **দিবাকর ঘোষ :** এই অঞ্চলের একজন পরিচিত কবি। বহু পত্র-পত্রিকায় ইহার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। দাসপুর থানার নন্দনপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার কাব্যগ্রন্থ 'শিখান্বিত' (১৯৫১), 'জাগ্রত জীবন' (১৯৫২), 'ভূদানযজ্ঞ' (নাট্যকাব্য, ১৯৫৫)। 'ঘুমিয়ে ছিল যে' (১৯৫৪)—এক বারোয়ারী উপন্যাস। অন্যান্য কয়েকটি কাব্যও রচনা করিয়াছেন। যেমন, 'স্বপ্নের ঝিনুক' (১৯৭৫), 'রক্তাঞ্জলি' (গীতি-আলেখ্য ১৯৭৫)। কবি অকালে পরলোকগত।

(১১) **কানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী :** ইনি চন্দ্রকোণার পার্শ্ববর্তী জয়ন্তীপুরের অধিবাসী। ইহার রচিত 'ভগ্ন দেউলের ইতিবৃত্ত' (প্রথম খণ্ড) বাং ১৩৭৮ সালের 'পৌষী পূর্ণিমায়' প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থটিতে চন্দ্রকোণা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইতিহাস ও কিংবদন্তী বর্ণিত হইয়াছে।

(১২) **পঞ্চানন চক্রবর্তী :** দাসপুর থানার খাঞ্জাপুর গ্রামের অধিবাসী। বর্তমানে কলিকাতাবাসী। কবি-রামেশ্বর সম্পর্কে গবেষণা

করিয়াছেন। ইঁহার সম্পাদিত 'রামেশ্বর-রচনাবলী' কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু গবেষক।

(১৩) **নিরঞ্জন চক্রবর্তী ঃ** সাহিত্যিক ও গবেষক। আঠারো ও উনিশ শতকের কবিয়ালদের উপর গবেষণা ও গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহার প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থ "উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য"। ইহা ছাড়া আরও গ্রন্থ ইনি প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি খাঞ্জাপুরের অধিবাসী ছিলেন। বর্তমানে কলিকাতায় ও অন্যত্র বাস করেন।

(১৪) **সতীশচন্দ্র রায় ঃ** ইঁহার রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "সংশপ্তক সতীশচন্দ্র"। উক্ত নামটি ইঁহার পুত্র পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ-কর্তৃক প্রদত্ত। আত্মজীবনী হইলেও ইহাতে উনিশ শতকের শেষ দিক হইতে বর্তমান বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত চেতুয়া অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ইনি কয়েকটি কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।

(১৫) **পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ঃ** বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থকার। এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গবেষক, কবি ও প্রবন্ধকার। 'দাসপুরের ইতিহাস', 'বাংলার মন্দির' প্রকাশিত গ্রন্থ। ইহা ছাড়া 'নিয়তি নির্ণয় সংকেত', 'হোরাষট্ পঞ্চাশিকা', 'প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক', 'পদ্যচণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। বহু প্রসিদ্ধ পত্রপত্রিকায় ইঁহার লেখা প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৬) **সুধীরকুমার বেরা ঃ** দাসপুর থানার জুয়াখালিতে জন্ম। কবি ও লেখক। 'বসুমতী' পত্রিকার প্রাক্তন সহ-সম্পাদক। ইহা ছাড়া কয়েকটি পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। ইঁহার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমেরিকার পত্রিকায় ইঁহার কয়েকটি কবিতা অনূদিত হইয়াছে। ১৯৭৬ সালে আমেরিকার বাল্টিমোরে বিশ্বকবি সম্মেলনে (World Poet Congress) ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিদেশে ইঁহার Dream of One World কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'অনন্তা' ও 'সাহানা' উল্লেখযোগ্য।

(১৭) **হরিসাধন পাইন:** ঘাটালের অধিবাসী। বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। অনেক কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি পরলোকগত।

(১৮) **সুনীতিকুমার পাঠক:** গবেষক ও লেখক।

(১৯) **গুণময় মান্না:** ঘাটাল পুরসভার অন্তর্ভুক্ত আড়গোড়া গ্রাম জন্মস্থান। প্রকাশিত গ্রন্থ 'লখীন্দর দিগার' (১৩৫৭), 'কটা ভানারি' (১৩৬০), 'জননী', জুনাপুর স্টীল—পূর্ব ও উত্তরখণ্ড (১৩৬৭), 'অসামাজিক', 'রবীন্দ্রকাব্যরূপের বিবর্তনরেখা' (১৩৭২)। গ্রন্থগুলি সাহিত্য-জগতে পরিচিত। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে ইঁহার এক স্থান আছে।

এই মহকুমার অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে নানা স্থানে তরুণ ও ছাত্রদের মধ্যে আধুনিক কবিতা রচনা ও চর্চা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা

(১) **গয়ারাম মিস্ত্রা:** চন্দ্রকোণা থানার গোহালডাঙ্গার (১৯৯নং মৌজা) অধিবাসী ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'গণিতদর্পণ' প্রকাশ করেন।

(২) **শ্রীনাথচরণ মাসান্ত:** চেতুয়া-বাসুদেবপুরের অধিবাসী ছিলেন। বাং ১২৭৯ সালের পৌষমাসে "পদ্য-পরিচয়", প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন। উহাতে সতেরোটি কবিতা ছন্দোলক্ষণসহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয় পৌষ ১২৮৫ সালে। অগ্রহায়ণ ১২৯৪ সালে তৃতীয় সংস্করণটি ঘাটাল 'রামেশ্বর মেডিকেল হল প্রেসে' ফকির নারায়ণ সরকার-কর্তৃক মুদ্রিত হয়। লেখক হুগলি জেলার উত্তরপাড়া সরকারী বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার অপর একটি গ্রন্থ 'হরিকথা' (প্রথম খণ্ড) পূর্বোক্ত প্রেস হইতে রামচরণ দাসকর্তৃক ১৩০২ সালে প্রকাশিত হয়। উহা গদ্যগ্রন্থ, তিনটি গানও আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা বারো। লেখক 'বৈষ্ণবদাসানুদাস বাসুদেবপুর হরিসভাধ্যক্ষ' বিশেষণে ভূষিত। ঘাটালের প্রথম সংবাদপত্র **ঘাটাল পত্রিকা** ১২৯০ সালে ইনিই প্রথম প্রকাশ করেন। পদ্য-পরিচয়, ১ম ভাগের অর্থপুস্তক বাসুদেবপুরের রামলাল মাসান্ত প্রণয়ন করেন।

উহাও উক্ত প্রেসে ১২৯৮ সালে পরেশনাথ ঘাঁটি দ্বারা প্রকাশিত হয়। 'পদ্য-পরিচয়' দুই আনা এবং উহার অর্থপুস্তক এক আনা মূল্য ছিল।

(৩) **উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় :** ঘাটাল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন পণ্ডিত ও বাসুদেবপুর মডেল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি 'ভূগোল-বোধ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উহা দ্বাদশ অধ্যায় ও পরিশিষ্টসহ ২৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সমগ্র ভূমণ্ডলের সকল ভৌগোলিক বিষয়ই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল! শকাব্দ ১৮১০ (ইং ১৮৮৮) ৪ঠা শ্রাবণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

(৪) **কুমুদনাথ দত্ত :** ইনি 'Legal Practitioner' গ্রন্থের লেখক ছিলেন। গ্রন্থকার রেভিনিউ বোর্ডের সেরেস্তাদারও ছিলেন। ইনি চেতুয়া বাসুদেবপুরের অধিবাসী ছিলেন।

(৫) **জানকীনাথ শাস্ত্রী :** পাইকমাজিটার অবসথি-চট্টোপাধ্যায়বংশের সন্তান। ইনি প্রসিদ্ধ Help to the Study of Sanskrit গ্রন্থের লেখক।

(৬) **ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য :** দাসপুর থানার বলিহারপুরের অধিবাসী। বাংলা ব্যাকরণ প্রভৃতি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছেন।

(৭) **পার্বতীচরণ ঘোষ :** ঘাটাল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। 'শোকগাথা' নামে একটি করুণরসাত্মক কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

উপরি উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ছাড়া এই মহকুমার আরও অনেকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে সকলের উল্লেখ করা গেল না।

পত্রপত্রিকা

সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে এই মহকুমায় বর্তমানে নানা পত্রপত্রিকা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আজ হইতে প্রায় একশ বছর আগে প্রথম একটি সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশের পর হইতে পরবর্তীকালে আরও কিছু কিছু সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। কিন্তু তাহাদের অনেকগুলিই বর্তমানে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবুও আধুনিককালে কবিতা ও সাহিত্যচর্চার গতি নবীন ও প্রবীণ কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ধরণের বেশ কিছু সাহিত্য-পত্র ও পত্রিকা ঘাটাল মহকুমায় এখনও আছে। নিম্নে কয়েকটি

প্রাচীন ও আধুনিক পত্রপত্রিকা-সম্পর্কে উল্লেখ করা হইল। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে এখানে সবগুলির নাম উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়।

(১) **ঘাটাল পত্রিকা**: ইহাই ঘাটালের প্রথম সংবাদপত্র। পত্রিকাটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে বাং ১২৯০ সালে। সম্পাদক ছিলেন বাসুদেবপুরের শ্রীনাথ মাসান্ত। ঘাটালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রবর্তক রামেশ্বর মল্লিক মহাশয়ের ছাপাখানা হইতে ইহা মুদ্রিত হইত।

(২) **আরো আগে**: এই পত্রিকাখানি ঘাটালের সুপরিচিত ব্যবহারজীবী শ্রীভবানীরঞ্জন পাঁজা মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা।

(৩) **জনমত**: সম্পাদক ছিলেন শ্রীভূপতি মাঝি। স্বাধীনতাপূর্ব-যুগে ভবানীরঞ্জন পাঁজার সম্পাদনায় ইহা বার্ষিক পত্ররূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা পরে উঠিয়া যায়।

(৪) **আমার দেশ**: হরিসাধন পাইনের সম্পাদনায় কিছুকাল প্রকাশিত হইবার পর উঠিয়া যায়। পরে নিত্যানন্দ রায়ের সম্পাদনায় তাহার আবির্ভাব ঘটিলেও পরে বন্ধ হইয়া যায়।

(৫) **মেদিনীপুরহিতৈষী**: ক্ষেপুতের মন্মথনাথ নাগ সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'সংসারশ্রী' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব-বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ-প্রণেতা।

আধুনিক কয়েকটি পত্রপত্রিকার মধ্যে (ইহাদের মধ্যে বেশির ভাগই লুপ্ত)—

(১) দাশপুর বার্তা: পাক্ষিক সংবাদপত্র। সম্পাদক শ্যামপদ পাত্র, দাদপুর। প্রকাশকাল ১৯৭৬।

(২) সৈকত: মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ছিল। বর্তমানে লুপ্ত। সম্পাদক মানিক দোলই, দাসপুর, প্রকাশকাল ১৯৭৫। একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(৩) পল্লীপ্রচার : পাক্ষিক সংবাদ, ক্ষীরপাই। সম্পাদক নিমাই পাত্র, অলোক ঘোষ, অধীর মণ্ডল, দেবীপ্রসাদ কুশারী, প্রমথ চক্রবর্তী, মনোমোহন মণ্ডল। প্রকাশকাল ১৯৭৩।

(৪) তরঙ্গ : ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা ছিল। বর্তমানে লুপ্ত। প্রকাশকাল ১৯৭৬। একটিমাত্র সংখ্যা বাহির হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(৫) অনামিকা : সাহিত্য ত্রৈমাসিক। অবলুপ্ত। সম্পাদক রাধানাথ চক্রবর্তী, চন্দ্রকোণা। প্রকাশকাল ১৯৭৩। দুটি সংখ্যা মাত্র।

(৬) শ্রীমোহিনী : সাহিত্য পত্রিকা। প্রকাশ অনিয়মিত। সম্পাদক ডাঃ সুদর্শন কুমার রায়, চন্দ্রকোণা। বৎসরে কমপক্ষে একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম আত্মপ্রকাশ আনুমানিক ১৯৬২-৬৩।

(৭) সবুজনক্ষত্র : মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৭৫। রাধানগর হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইত। প্রথম সম্পাদক আশিস অধিকারী ১৯৭৬ সালের মে পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৬ সালের জুন হইতে সম্পাদক প্রভাত কুমার মিশ্র ও তারকনাথ রুদ্র ছিলেন। বর্তমানে লুপ্ত।

(৮) ভোরের পাখি : সাহিত্য পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫। অধুনা অবলুপ্ত।

(৯) ধ্রুবতারা : মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫। সম্পাদক সৈয়দ জিয়াউল করিম। একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(১০) গ্রাম থেকে : ইতিহাস সংস্কৃতি-বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা। বর্তমানে লুপ্ত। দাসপুর হইতে কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদক ত্রিপুরা বসু।

(১১) তুহিনা : ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। অধুনা অবলুপ্ত। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫। সম্পাদক শক্তি সাউ, পাণ্ডুয়া।

(১২) উন্মেষ : ত্রৈমাসিক সাহিত্য। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮-৬৯। রাজনগর। সম্পাদক উমাপদ ভট্টাচার্য। দুটি সংখ্যার পর আর প্রকাশিত হয় নি।

(১৩) মৌরীফুল : ছোটদের পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫। সম্পাদিক মাণিক চন্দ্র দোলুই। একটি মাত্র সংখ্যার পর আর প্রকাশিত হয় নি।

(১৪) চানাচুর : ছোটদের পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬। সম্পাদক সুদর্শন কুমার রায়, চন্দ্রকোণা।

(১৫) সাগরদীপ : দেওয়াল পত্রিকা। বীরসিংহ পাঠাগারে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫। সম্পাদক তারকনাথ রুদ্র।

(১৬) অঙ্গীকার : বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদক ত্রিপুরা বসু।

উপরিউক্ত পত্রিকাগুলি ছাড়া আরও কিছু কিছু পত্রপত্রিকা মহকুমার নানাস্থানে পূর্বে প্রকাশিত হইত বা এখনও হইয়া থাকে। স্থানাভাবে এখানে সকলের নাম করা সম্ভব হইল না। এইগুলি ছাড়া অনেক বিদ্যালয় হইতে বার্ষিক কিছু কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয় যাহাদের সাহিত্যিক মূল্যও কিছুমাত্র কম নহে। এই সকল পত্রপত্রিকা হইতে ঘাটাল অঞ্চলে আধুনিককালের কাব্য ও সাহিত্যচর্চার গতি-প্রকৃতি কিছুটা বোঝা যাইবে।

এই অধ্যায় রচনায় স্থানবিশেষে নিম্নোক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থ ও পুস্তিকা—

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডীমঙ্গল (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)
প্রাণবল্লভ ঘোষ : জাহ্নবীমঙ্গল পুথি (অপ্রকাশিত)
প্রবোধচন্দ্র সরকার : 'শালফুল' (উপন্যাস, সংস্করণ ১৩০৪)
ঘাটাল বিদ্যাসাগর সর্বার্থসাধক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৬৫
Centenary Souvenir, Ghatal Municipality 1869-1969

প্রবন্ধাবলী—

*ডঃ ক্ষুদিরাম দাস : মুকুন্দরামের গ্রামত্যাগ ও কাব্যরচনাপ্রসঙ্গ
(বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৫)

*পঞ্চানন রায় : 'একটি অপ্রকাশিত মঙ্গলকাব্য' (কৌশিকী, ৪র্থ খণ্ড ১৩৭৭)

*প্রণব রায় : (১) 'আঠার শতকের কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী',
('অমৃত', ২৯, অক্টোবর, ১৯৭১)

(২) 'মঙ্গলকাব্যের এক নবাবিষ্কৃত কবি',
('অমৃত', ২৯ নভেম্বর, '৭১)

(৩) 'প্রাচীন কবি অকিঞ্চনের হস্তলিপি ও নথিপত্র',
('অমৃত', ১লা পৌষ, ১৩৭৮)

(৪) 'বিস্মৃত কবি দ্বিজ বাঞ্ছারাম,' ('অমৃত,'৭ই পৌষ,১৩৭৯)

(৫) 'প্রাচীন বাংলার কয়েকজন অপরিচিত কবি'
(সমকালীন, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯)

(৬) 'অকিঞ্চন চক্রবর্তীর 'গঙ্গামঙ্গল'
(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৭৯বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, ১৩৭৯)

(৭) 'গঙ্গামঙ্গলকাব্য ও প্রাণবল্লভের 'জাহ্নবীমঙ্গল'
(বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮০)

(৮) 'মঙ্গলকাব্যের প্রাচীন তিন কবি'
('সাহিত্য ও সংস্কৃতি', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮০)

(৯) 'মেদিনীপুরের আঠারো শতকের সাহিত্য'
(সমকালীন, কার্ত্তিক, ১৩৮০)

*ত্রিপুরা বসু : (১) 'মঙ্গলকাব্যের এক বিস্মৃত কবি'
(সমকালীন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯)

(২) 'একটি অপ্রচলিত মঙ্গলকাব্য'
(সমকালীন, অগ্রহায়ণ,১৩৭৯)

(৩) 'মধ্যযুগের একজন অখ্যাত কবি'
(অমৃত, ১৭, কার্ত্তিক, ১৩৭৯)

*'রজতস্বাক্ষর' পত্রিকা, রজত জয়ন্তী বর্ষ, ১৩৮০ (যুবসংঘ, কোলাঘাট)

*ব্যোমকেশ মুস্তফী : নিত্যানন্দের 'শীতলামঙ্গল'
(সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩০৫)

অষ্টম অধ্যায়

পুরাকীর্তি ও ধর্মস্থান ঃ মঠ-মন্দির-মসজিদ

কোন দেশের প্রাচীন কীর্তি বলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, যেমন প্রাচীন ভাস্কর্য, মঠ-মন্দির-মস্‌জিদ, প্রাচীন রাজা বা জমিদারদের গড়বাড়ী, পুষ্করিণী বা দীঘি বা অন্যান্য কোন কোন ঐতিহাসিক নিদর্শনকে বুঝাইয়া থাকে।

পুরাকীর্তি ও তাহার ভূমিকা

দেশের প্রাচীন বা বিস্মৃত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার বা নবমূল্যায়নে এই পুরাকীর্তিগুলির ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে মঠমন্দির ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির প্রতি জনসাধারণ, গবেষক ও সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। প্রাচীন মন্দির-দেবালয় বা মসজিদ অথবা জঙ্গলাকীর্ণ কোন গড় বা দীঘির মধ্যে বিস্মৃত অতীতের যেন কোন্ এক অজানা রহস্য লুক্কায়িত আছে। এইগুলির কোন কোনটিকে লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা বা কিংবদন্তীর উদ্ভব হইয়াছে যাহা অনেক সময় ইতিহাসের দিঙ্‌নিরূপণে অনেকখানি সহায়তা করিতে পারে। ইতিহাস বলিতে আমরা এতদিন রাজা-রাজড়া, জমিদার, আমীর ওমরাহদের রাজ্যশাসনপ্রণালীকেই বুঝিতাম, কোন দেশের ইতিহাস এইভাবেই লিখিত হইত। কিন্তু বাংলাদেশের জেলাগুলি বা জেলার অধীন অঞ্চলবিশেষের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইত। এই সব অঞ্চলবিশেষের ইতিহাস আজও সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয় নাই। সেই ইতিহাস লিখিতে হইলে অঞ্চলবিশেষের প্রাচীন কীর্তিগুলির মধ্যে তাহার কতকটা অনুসন্ধান করিতে হইবে। মন্দির-দেবালয় বা মসজিদের গাত্রে ক্ষোদিত শিলালিপিগুলির মধ্যে ও তাহার পোড়ামাটির শিল্প ও ভাস্কর্যসমূহে, প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি বা পোড়ামাটির বস্তুসমূহে, গড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, প্রাচীন পুথি ও দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে অঞ্চল বিশেষের ইতিহাসের মালমশলা লুক্কায়িত আছে। এই মালমশলার উদ্ধার ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস রচনায় সেইগুলির ব্যবহার গভীর পরিশ্রম-সাধ্য ও নিষ্ঠার বিষয়।

এই মহকুমার এমন বহুস্থানে ইতিহাসের সেইসব মাল-মশলা আজও অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে। মঠ-মন্দিরাদির মধ্যে এই অনুসন্ধান আজ ব্যাপকভাবে প্রয়োজন। মহকুমায় অন্যান্য পুরাকীর্তির তুলনায় মঠ-মন্দিরের সংখ্যা সর্বাধিক। এখানকার তিনটি থানার মধ্যে আবার দাসপুরে এইগুলির

সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, দাসপুর অঞ্চলে প্রায় প্রতি গ্রামেই মন্দির আছে এবং এই মন্দিরগুলির মধ্যে পোড়ামাটির কারুকার্য-যুক্ত অনেক মন্দিরও বর্তমান। আকর্ষণীয় কিছু কিছু দীর্ঘ শিলালিপিও এই মন্দিরের কোন কোনটিতে আছে।

মঠ-মন্দিরের সংখ্যাধিক্য

পোড়ামাটির মূর্তিগুলির মধ্যে মন্দিরগাত্রে সেকালের সামাজিক চিত্রপট, পৌরাণিক ও রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্যাবলী, মিথুনদৃশ্য খুবই উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরগুলির সবই ইঁটের তৈরি এবং প্রচলিত 'বাংলারীতি'তে নির্মিত। পাথরের কোন মন্দির দাসপুরে চোখে পড়ে না। শস্যশ্যামল পলিমাটিপ্রধান দাসপুরের পূর্বে রূপনারায়ণ ও পশ্চিমে শিলাই প্রবাহিত। জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় এখানকার মাটি পাথুরে নয়। তাই সহজলভ্য মৃত্তিকায় তৈয়ারি ইঁটের দ্বারায় এই মন্দিরগুলি এক সময় নির্মিত হইয়াছিল। দাসপুর, কল্‌মিজোড়, গৌরা প্রভৃতি গ্রামের সূত্রধরসম্প্রদায় এই মন্দিরগুলি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তৈয়ারি করিয়াছিলেন। মন্দিরসমূহে তাঁহাদের শিল্পকর্মের আশ্চর্য নিদর্শন আজও লক্ষ্য করা যায়। বহু মন্দির কালের করাল দৃষ্টিপাতে আজ লুপ্ত হইলেও এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে তাহার সংখ্যা কম নয়। দাসপুরকে তাই 'মন্দিরের দেশ' বলা যাইতে পারে।

কিন্তু দাসপুরের এই মন্দিবগুলির কোনটিই আঠার শতকের পূর্বেকার নয়। দাসপুর গ্রামের বঙ্গরাম চৌধুরীর অধুনা বিধ্বস্ত শ্যামরায়ের একচূড়ার মন্দিরটি সমগ্র থানার মধ্যে প্রাচীনতম ছিল। ইহা বাংলা ১১০৬ সালে নির্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটির গায়ে 'টেরাকোটা' বা পোড়ামাটির কাজ খুবই সুন্দর ছিল। তাহার কিছু কিছু নমুনা 'দাসপুর বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে' সংরক্ষিত আছে। অবশ্য এই গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ডিহিবলিহারপুরে পাঠক গোস্বামীর চারচালা রীতির সাল-তারিখবিহীন সমাধি মন্দিরটি আরও প্রাচীন মনে হয়। ইহার পর দাসপুরের সিংহদের বর্তমান গোপীনাথের একচূড়ার মন্দিরটি প্রাচীনত্ব ও শিল্পকার্যের দিক হইতে খুবই উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি বাংলা ১১২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরটি ও রাধাকান্তপুরের দাসেদের গোপীনাথের একচূড়ার মন্দিরটি সমসাময়িক মনে হয়। উল্লেখযোগ্য, দাসেদের মন্দিরটিতে একটি দীর্ঘ বাংলা লিপি আছে। তাহা ১২৫১ সালে মন্দিরটির সংস্কারকালে স্থাপিত হয়। তাহা হইতে জানা যায়, ঐটি সংস্কারকালের ২০০ বছর আগে স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু স্থাপত্য ও পোড়ামাটির কাজের নিদর্শন লক্ষ্য করিলে

দাসপুর গ্রামের কয়েকটি প্রাচীন মন্দির

ঐ মন্দিরটিকে দাসপুরের পূর্বোক্ত গোপীনাথের মন্দিরের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। কাছাকাছি মামুদপুর গ্রামের চক্রবর্তীদের ভগ্ন ও পরিত্যক্ত কালী মন্দিরটিও (একচূড়া) সম্ভবত ঐ একই সময় তৈয়ারি হইয়া থাকিবে। ইহা ছাড়া এই থানায় যে অসংখ্য মন্দির আছে তাহাদের বেশির ভাগই আঠার শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে উনিশ শতকের শেষ ও বর্তমান শতকের গোড়ার দিকের মধ্যে তৈয়ারি হইয়াছিল। সেই মন্দির-নির্মাণের রীতি আজও অব্যাহত আছে। আশ্চর্যের বিষয়, আজ হইতে মাত্র পাঁচ বৎসর আগেও মন্দির নির্মিত হইয়াছে। চেঁচুয়া-গোবিন্দনগরে এরূপ একটি মন্দির লক্ষ্য করা যায়। গ্রাম-গ্রামান্তরে সমাধিমন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীন মন্দির-স্থাপত্যরীতির অব্যাহত ধারা আজও লক্ষ্য করা যায়।

দাসপুর, ঘাটাল বা চন্দ্রকোণা অঞ্চলে যে সব মন্দির-দেবালয় লক্ষ্য করা যায় তাহাদের স্থাপত্যরীতি সমগ্র জেলার মন্দির-স্থাপত্যরীতি হইতে বিচ্ছিন্ন না হইলেও এই অঞ্চলসমূহে 'খাঁটি বাংলারীতি'র মন্দির বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই নির্মিত হইয়াছিল। এদেশের বাঁকানো কার্ণিশযুক্ত দোচালা বা চারচালা খোড়ো ঘরের অনুকরণে পাকার দোচালা, চারচালা, সামনে-পিছনে দুটি দোচালা যুক্ত করিয়া জোড়বাংলা, চারচালার উপরে ছোট আকারের আর একটি চারচালা—নাম আটচালা, খুব কম বারো-চালা রীতির মন্দিরগুলি মহকুমার এই তিনটি থানায় কম-বেশি লক্ষ্য করা যায়। উপরি উক্ত এই চারিটি রীতিকে খাঁটি বাংলারীতি বলা যায় অর্থাৎ বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলের খড়ের চালের এধরণের ঘর বহু দেখা যায়। এইসব ঘরের অনুকরণে 'চালা রীতি'র উদ্ভব ঘটে। বাংলারীতির এই চারটি শৈলীর মধ্যে আটচালা রীতিটিই এই অঞ্চলে অধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রাম-গ্রামান্তরের বহু মন্দির এই রীতিতে নির্মিত হইয়াছে, সে তুলনায় দোচালা, জোড়বাংলা ও চারচালার সংখ্যা নগণ্যমাত্র। বারোচালার একটিমাত্র মন্দির এই দেশের ঘাটাল থানার জলসরা গ্রামে আছে। যতদূর অনুসন্ধান করা গিয়াছে, মহকুমার আর কোথাও বারোচালা রীতির মন্দির নাই।

মন্দিরের শ্রেণী—স্থাপত্যরীতি

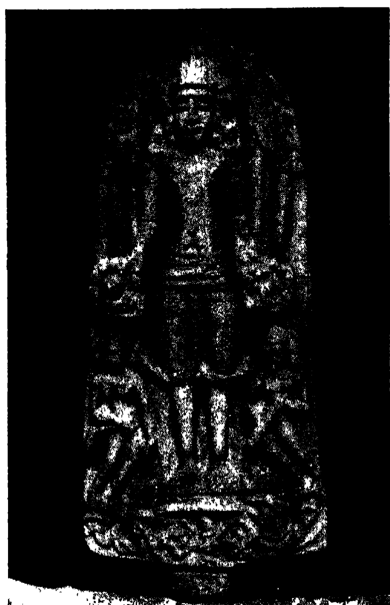
চালার পরে 'চাঁদনী' রীতির মন্দির এই অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এটিও একটি বাংলারীতি। চালায় চালগুলি যেমন ঢালু ও কার্ণিশ বাঁকানো থাকে, চাঁদনীতে আয়ত বা বর্গক্ষেত্রাকার ঘরের সমতল ছাদ থাকে ও সরল কার্ণিশ থাকে। মোটকথা, চালা ও চাঁদনীকে খাঁটি বাংলারীতির মন্দির



সিংহবাহিনীর 'চারচালা' মন্দির, কোন্নগর, ঘাটাল
প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ



মনসার 'রথ'বিন্যাসযুক্ত 'চারচালা'
আজুড়িয়া (দাসপুর)



ঘাটাল অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন বিষ্ণমতি



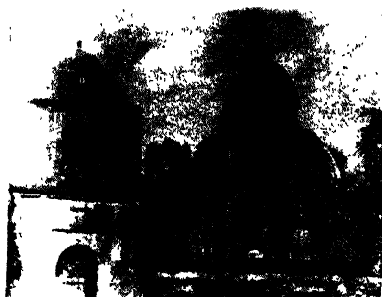
রাধাবল্লভের 'চারচালা', রঘুনাথপুর (চন্দ্রে



লালজীউর 'আটচালা', রঘুনাথবাড়ী,
অযোধ্যা (চন্দ্রকোণা)



বুড়োশিবের 'বারোচালা' রীতির মন্দির,
জলসরা (ঘাটাল)



উমাপতি শিবের 'আটচালা' ও নহবৎখানা,
গঙ্গাদাসপুর



লাউজীউর মন্দিরের সম্মুখভাগ,
'ইমারতি' থাম ও 'দরুন' খিলান



প্রাচীন দুর্গাদালান (ভগ্ন), কোন্নগর, ঘাটাল

বলা যায়। ঘাটাল মহকুমায় এই দুটি রীতির মন্দির খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

চালা-চাঁদনীর পরে 'রত্ন'মন্দিরগুলি এদেশে বহু নির্মিত হইয়াছে। রত্নমন্দির নামটির একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বাঁকান কার্নিশযুক্ত চালা অথবা চাঁদনীর উপর এক,পাঁচ,নয়,তের,সতের,একুশ এবং পঁচিশটি ক্ষুদ্রাকৃতি 'শিখর' বা পিঢ়া'-মন্দির যোগ করিয়া যথাক্রমে একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, ত্রয়োদশরত্ন, সপ্তদশরত্ন একবিংশতিরত্ন ও পঞ্চবিংশতিরত্ন মন্দিরের উদ্ভব হইয়াছে। 'শিখর'মন্দির বলিতে সংক্ষেপে 'দেউল'মন্দির বলিতে হয়। এক'রত্নে চারচালা বা চাঁদনীর কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র দেউলমন্দির থাকে, পঞ্চরত্নে উক্ত চালা বা চাঁদনীর কেন্দ্রে একটি ও চারকোণে চারটি ঐরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি দেউলমন্দির থাকে। নবরত্ন মন্দিরটি সাধারণত দ্বিতল হয়, নীচের ও উপরের চালা বা চাঁদনীর প্রতিটির চারকোণে চারিটি করিয়া আটটি রত্ন ও দ্বিতলের কেন্দ্রস্থলে একটি অপেক্ষাকৃত বড় রত্ন থাকে। এইভাবে রত্ন বা ক্ষুদ্রাকৃতি দেউলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পঞ্চবিংশতি বা পঁচিশ-চূড়া মন্দির হয়। তবে বাংলাদেশে এই শেষোক্ত শ্রেণীর মন্দিরের ক্ষেত্রে সর্বাধিক চারটি তল দেখা গিয়াছে—অর্থাৎ দ্বিতলে আটটি, ত্রিতলে আটটি ও চারতলায় আটটি ও চারতলার কেন্দ্রস্থলে একটি লইয়া মোট পঁচিশটি চূড়া বসান হয়।

এই মহকুমায় রত্নরীতির মন্দিরের মধ্যে একরত্ন ও পঞ্চরত্ন মন্দির সর্বাধিক নির্মিত হইয়াছে, নবরত্নের স্থান ইহার পরে। ত্রয়োদশ, সপ্তদশ, একবিংশ ও পঞ্চবিংশ রত্ন খুব কম দেখা যায়। শুধুমাত্র চন্দ্রকোণা ও খড়ার শহরে এই শ্রেণীর দু'য়েকটি মন্দির আছে। রত্নরীতি ছাড়া দেউলরীতি বা রেখরীতির মন্দিরও বহু নির্মিত হইয়াছে, অর্থাৎ পুরী বা ভুবনেশ্বরের 'রেখ' দেউলমন্দিরের অনুকরণে সরলভাবে যে সব মন্দির নির্মিত হইয়াছিল তাহারা এই অঞ্চলে একটি নূতন রূপ লইয়াছে। জেলার দক্ষিণাংশে বা দক্ষিণ পশ্চিমাংশে বা সদর (উত্তর) মহকুমার কিছু কিছু স্থানে খাঁটি উড়িষ্যারীতির দেউল যতখানি নির্মিত হইয়াছে, এই মহকুমায় তাহার একটিও নাই বলিলেই চলে, পরিবর্তে এই রীতি সরলীকৃত একটি নূতনরূপ লইয়াছে, যেমন ঘাটাল থানার সিংহডাঙ্গার দেউল বা দাসপুর হোসনাবাজারের শীতলানন্দের দেউল। এই দেউলগুলির সঙ্গে কর্ণগড় (সদর উত্তর মহকুমা) বা চন্দ্রকোণার রঘুনাথবাড়ীর রঘুনাথজীউর দেউলগুলির একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। বলাবাহুল্য, মন্দিরগুলির সামনের দিকে উড়িষ্যা-রীতির মন্দিরগুলির মত কোন পরিদর্শনকক্ষ বা 'জগমোহন' (audience hall) নাই।

মহকুমার প্রাচীনতম মন্দিরটি ঘাটাল শহরের কোন্নগর পল্লীর সিংহবাহিনীর চারচালা মন্দির। এই মন্দিরটি ১৪১২ শকাব্দ বা ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। এত প্রাচীন মন্দির মহকুমায় কেন, জেলায় খুবই বিরল। মন্দিরটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, মূল চারচালা মন্দিরটির সম্মুখে সংলগ্ন চারচালা জগমোহন আছে। ক্ষুদ্রাকৃতি এই অতিপ্রাচীন মন্দিরটি শুধু মহকুমায় নয়, সমগ্র জেলার একটি বিস্ময়। মন্দিরটির গায়ের পোড়ামাটির ফুলের নক্শা, পোড়ামাটির কয়েকটি ফুল ও ছোট ছোট দুটি টালিতে দুটি মূর্তি সে যুগের টেরাকোটাসজ্জার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

প্রাচীনতম মন্দির

সেকালে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধিশালী স্থানগুলিতে মন্দির সর্বাধিক সংখ্যায় নির্মিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ ব্যবসায়িগোষ্ঠী, ধনী ও জমিদার সম্প্রদায়েরাই এই মন্দিরগুলি তৈয়ারি করাইতেন। সেকালে দাসপুর, খড়ার, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, জাড়া, চন্দ্রকোণা স্থানগুলি ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা সমৃদ্ধিশালী শহরে পরিণত হইয়াছিল। দাসপুর, ক্ষীরপাই, রাধানগর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থান তাঁত, রেশমী বস্ত্র, চিনি, ঘৃত প্রভৃতি ব্যবসায়ের জন্য খুবই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। খড়ার ও ঘাটাল পিতল-কাঁসার বাসনের ব্যবসায়ের কেন্দ্র থাকায় এই অঞ্চলেও বহু ব্যবসায়ীর আবির্ভাব হয়। চন্দ্রকোণা, বরদা প্রভৃতি স্থান রাজা ও জমিদারদের বাসস্থান ছিল। সম্ভবত এই দুটি স্থান সতের শতকের গোড়ার দিক হইতে সমৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করে এবং প্রায় একই সময়ে দুটি স্থানেরই অভ্যুদয়ের সূচনা হয়। চন্দ্রকোণার ভানরাজারা ও বরদার প্রাচীন রাজবংশ এবং বিদ্রোহী জমিদার 'বাংলার শিবাজী' শোভা সিংহ খুবই প্রতাপশালী ছিলেন। এই কারণে তাঁহাদের উদ্যোগে বহু মন্দির-দেবালয় এই সব অঞ্চলে নির্মিত হইয়াছিল। রামজীবনপুরও সেকালে ব্যবসায়ীদের একটি কেন্দ্র ছিল এবং জাড়ার জমিদার বাবুরাও ঐ স্থানের প্রভাবশালী ভূস্বামী ছিলেন। বহু মন্দির এই দুটি স্থানে আজও দেখা যায়। চন্দ্রকোণা শহরের বিস্তীর্ণ এলাকায় এককালে বহু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে এই সব মন্দিরের অনেকগুলিই আজ আর নেই। বহু প্রাচীন মন্দির-দেবালয় কালস্রোতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, অধুনারক্ষিত তাহাদের দুয়েকটির শিলালিপি হইতে তাহাদের পূর্ব অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, যেমন—চন্দ্রকোণার রঘুনাথবাড়ীর লালজীউর মন্দিরে রক্ষিত একটি প্রাচীন শিলালিপি হইতে ভানরাজা হরিনারায়ণের মহিষী লক্ষ্মণাবতী কর্তৃক গিরিধারী লালজীউর নবরত্ন মন্দিরটির নির্মাণের কথা জানা যায়।

মহকুমার মন্দির-কেন্দ্রিক স্থান

দাসপুরের ন্যায় ঘাটাল-চন্দ্রকোণা অঞ্চলের মন্দিরগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইটের তৈয়ারি। অবশ্য, পাথরের তৈয়ারি দু'চারটি মন্দিরও এই অঞ্চলে আছে।

চন্দ্রকোণার মন্দির

রাধানগরে গোপীনাথের পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন এবং চন্দ্রকোণায় পাথরের বেশ কয়েকটি মন্দির আছে। এই মহকুমার মধ্যে একমাত্র চন্দ্রকোণায়ই পাথরের মন্দির বেশি আছে এবং তাহাদের কোন কোনটিতে ভাস্কর্যও আছে। ভান রাজাদের সময়ে প্রতিষ্ঠিত মন্দির চন্দ্রকোণায় সম্ভবত নাই, অবশ্য দক্ষিণপাড়ার জোড়বাংলাটি বেশ প্রাচীন মনে হয়। এইখানের বেশীর ভাগ মন্দিরই আঠার-শতক হইতে উনিশ শতকের মধ্যে তৈয়ারি হইয়াছিল। অনেক মন্দিরের গায়ে প্রতিষ্ঠাকালের লিপি নাই। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া মোটামুটি একটা সময় নির্ণয় করা যাইতে পারে। চালা, রত্ন, চাঁদনী ও দেউলরীতির বহু দেবালয় চন্দ্রকোণায় থাকিলেও উৎকৃষ্ট কারুকার্যযুক্ত মন্দির এইখানে কম। সম্ভবত পূর্বে এই ধরণের মন্দির নিশ্চয়ই কিছু ছিল। বর্তমানে দু'চারিটি মন্দিরে উৎকৃষ্টমানের কারুকার্যের পরিচয় পাওয়া যায় শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের দিক হইতেই নয়, স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্যের জন্যও এইখানকার মন্দিরগুলি সমগ্র মহকুমায় কেন, জেলার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই মহকুমার মঠ ও ঠাকুরবাড়িগুলিতেও বহু মন্দির আছে। চেতুয়া-বৈকুণ্ঠপুর নিম্বার্ক-মঠ এলাকায় পোড়ামাটির সুন্দর কারুকার্যযুক্ত একটি প্রাচীন মন্দির আছে। নিমতলার গাণপত্যমঠে ভৈরবেন্দ্র পুরীর সমাধিমন্দিরটি একটি অদ্ভুত স্থাপত্যের নিদর্শন। চন্দ্রকোণার রামানুজসম্প্রদায়ের অস্থলেও দুয়েকটি মন্দির আছে। রাণীর বাজারের (ঘাটাল) শ্যামরায় ও রসিকনাগর জীউর মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। নিমতলার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ের অস্থলের সমাধি-মন্দিরগুলির বেশিরভাগ বাংলা চালারীতিতে তৈয়ারি। মহকুমার প্রধান প্রধান অস্থলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে দেওয়া হইবে।

মন্দিরগুলি এই দেশে সর্বাধিক সংখ্যায় নির্মিত ও বৈচিত্র্যময় বলিয়া ইহাদের বিষয় অগ্রে বলা হইল। পরে থানা অনুসারে ইহাদের একটি মোটামুটি পরিসংখ্যান ও কোন কোনটির সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইবে। ইহা হইতে বোঝা যাইবে, এই মহকুমায় মন্দিরগুলির মোটামুটি সংখ্যা কত এবং কোন্ কোন্ স্থানে সর্বাধিক মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। মন্দির-

মসজিদ ও পীরস্থান

দেবালয়-প্রসঙ্গে মসজিদ ও পীরস্থানগুলি এই দেশে কম উল্লেখযোগ্য নয়। ইহাদের কোন কোনটিকে কেন্দ্র করিয়া কিংবদন্তী ও জল্পনা-

কল্পনার শেষ নাই। তবে সংখ্যার দিক হইতে মন্দিরের তুলনায় ইহারা খুবই নগণ্য। এই দেশে পীরস্থানগুলি সর্বসাধারণের নিকট খুবই শ্রদ্ধেয় এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এইখানে মানতমানসিক ইত্যাদি করিয়া থাকেন। দাসপুর থানার ডিহিচেতুয়া গ্রামের চাঁদখাঁ পীর সাহেবের আস্তানাটির ঐ অঞ্চলে খুবই মাহাত্ম্য আছে। চন্দ্রকোণা থানার পিয়ারডাঙ্গার সৈয়দ শাহ ঈশাপীরের আস্তানাও একটি উল্লেখযোগ্য পীরস্থান। মসজিদগুলির মধ্যে দাসপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী শাহবাজারের ও ঘাটালের আলমগঞ্জের দুটি মসজিদ উল্লেখ করার মতো। ইহা ছাড়াও আরও দুয়েকটি মসজিদ ও পীরস্থান আছে। তবে সেগুলি আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়।

শেষ-মধ্যযুগের এইসব মন্দির-দেবালয় প্রধানত পনের শতক হইতে উনিশ শতকের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল, ইহা আগেই বলা হইয়াছে। তার পূর্বের কোন মন্দির সম্ভবত এই মহকুমায় নাই। নানা অঞ্চল পরিক্রমা ও সরেজমিন অনুসন্ধানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু গত কয়েক বৎসর পূর্বে ঘাটাল থানার অন্তর্ভুক্ত শিলাই তীরবর্তী পান্না গ্রামে (জে. এল. নং ১২০, ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী লোকসংখ্যা ১৮০৫) যে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন (Archaeological excavation) হয় তাহার ফলে এই স্থানের সুপ্রাচীনত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে পোড়ামাটির নানা মূর্তি ও জিনিষপত্র, পাথরের ভগ্ন মূর্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এইসব মূর্তিকে গুপ্ত ও পালযুগের বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং এইস্থান ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীর অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন। পান্না গ্রামের চারপাশে একটি গড়ের চিহ্ন আজও পাওয়া যায় এবং প্রাচীন ইটের গাঁথনির চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। ইহা ছাড়া গ্রামের মধ্য দিয়া প্রাচীন 'দারির জাঙ্গাল' (বর্তমানে 'নন্দকাপাসিয়া রাস্তা' নামে পরিচিত) রাস্তা বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তাটি যে খুবই প্রাচীন তাহা দেখিলেই বোঝা যায়। স্থানে স্থানে রাস্তাটি মাঠে পরিণত হইলেও উত্তরে বরদার চৌকান হইয়া আরও বহু উত্তরে বর্ধমানের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বে শিলাই অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পান্না গ্রামে যে স্থানে 'গঞ্জলস্কর পীরে'র স্থান আছে ঐ রাস্তাটি তার পাশ দিয়া গিয়া গ্রামের দক্ষিণপূর্বে মাঠে পড়িয়াছে এবং পরে আবার পূর্বদিক বরাবর শিলাই নদীর তীরে উঠিয়াছে। পান্না গ্রামের প্রাচীন হেতুয়া পুকুরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি উচ্চ ভূমিখণ্ড হইতে

পান্নার প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে পোড়ামাটির একটি বরাহমস্তক, অপূর্ব হাস্যযুক্ত নারীর মুখমণ্ডল বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করার মতো। এই মূর্তিগুলি বর্তমানে কলিকাতার বিভিন্ন সংগ্রহ-শালায় সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সব প্রাচীন নিদর্শন হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শিলাবতীর তীরভূমি সংলগ্ন-এলাকায় সেকালে একটি প্রাচীন নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিচিত্র ধরণের পোড়ামাটির বাসনের অংশ বিশেষ, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, পোড়ামাটির ফলকে 'ধর্মচক্রপ্রবর্তনমুদ্রা'য় আসীন সুন্দর বুদ্ধমূর্তি ও তাহাতে প্রাচীন অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি লিপি প্রভৃতি এই অঞ্চলের সুপ্রাচীনত্ব ও একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীর পরিচয় দেয়। গুপ্ত ও পালযুগে পান্নাকে কেন্দ্র করিয়া শিলাবতীর সংলগ্ন এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে এক বিচিত্র জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে সেই জনপদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং শিলাবতী ও মৃত্তিকাগর্ভে তাহাদের অস্তিত্ব লীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এইসব পুরাবস্তু হইতে সেই যুগে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়।

পান্না ছাড়াও এই মহকুমার নানাস্থানে বিষ্ণু, সূর্য, বুদ্ধ প্রভৃতির প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের স্থানে স্থানে মন্দির-দেবালয় বা গাছতলায় তাহাদের পূজা হইতেছে। দাসপুর থানার রসিকগঞ্জ গ্রামের শীতলা মন্দিরে দুটি বিষ্ণুমূর্তি আছে। ঐ মূর্তি দুটি অনন্ত ও বাসুদেবের বলিয়া পূজিত হয়। অনন্তদেবের মূর্তির মাথার চারদিকে সর্পের ফণা আছে। বাসুদেব চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি। মূর্তিগুলি নিমতলার যুগীপুকুর সংস্কারের সময় পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। চন্দ্রকোণা থানার গঙ্গাদাসপুরের উমাপতিশিবের মন্দিরে একটি সূর্যমূর্তি আছে। চন্দ্রকোণার কুমারগঞ্জ পল্লীর বৈষ্ণববেড় হইতে একটি ভগ্ন জৈনমূর্তি বেশ কিছুকাল আগে পাওয়া গিয়াছিল এবং স্থানে স্থানে কয়েকটি বুদ্ধমূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। চন্দ্রকোণার শরাক তন্তুবায়জাতি পূর্বে বুদ্ধের উপাসক ছিলেন। ইহাদের কাহারও কাহারও বাড়িতে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই এই স্থানে এক সময় বুদ্ধধর্মের যে প্রভাব ছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। দাসপুরের কয়েকটি গ্রামেও বেশ কিছুকাল আগে দুয়েকটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। অতএব এই সব প্রাচীন মূর্তি হইতে একদিকে এই দেশে যেমন নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়, অন্যদিকে এই সব ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত নানা মঠ-মন্দিরের অস্তিত্বও অনুমান করা যায়। সেইসব প্রাচীনমন্দির

প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি

কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তিগুলি আজও অম্লান রহিয়াছে। মূর্তিগুলির বেশির ভাগই পালযুগের বলিয়া অনুমান করা যায় এবং এই অঞ্চলের প্রাচীন সংস্কৃতির কিছুটা পরিচয় এই মূর্তিভাস্কর্য হইতে অনুমান করা যায়। মূর্তিসমূহের কোন কোনটিতে শিল্পকলা সৌন্দর্যের চমৎকার প্রকাশ ঘটিয়াছে লক্ষ্য করা যায় এবং এইসব মূর্তি সেকালে এই দেশে নির্মিত হইয়া থাকিলে এখানকার শিল্পকলাচর্চার এক সুবিন্যস্ত ধারা এবং ভাস্কর-সূত্রধরদের এই শিল্পকলায় অপরূপ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহকুমার মধ্য দিয়া প্রবহমানা শিলাবতীর তীরে তীরে পান্নার মত হয়তো আরও দুয়েকটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল, মৃত্তিকার অতলগভীরে হয়তো তাহারা আজ সমাহিত এবং এইসব মূর্তি হয়তো সেই সব জনপদের কোন কোন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কে জানে? প্রত্নতাত্ত্বিকদের খনিত্রের আঘাতে ইতিহাসের সেই রহস্যময় যবনিকা হয়তো উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

প্রাচীন গড় ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ

ঘাটাল মহকুমায় গড় ও দীঘির সংখ্যাও প্রচুর। সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য একটি গড় বরদাগ্রামে শোভাসিংহের গড়। ঘাটাল শহর হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে বরদাগ্রামে ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পাকা রাস্তার পাশে এই বৃহৎ গড়টিতে এক সময় চেতুয়া-বরদার বিদ্রোহী জমিদার শোভাসিংহের বিরাট্ অট্টালিকা ছিল। গড়টি একটি বিরাট এলাকা জুড়িয়া বিস্তৃত এবং চারপাশ পরিখাবেষ্টিত। 'ভিতরগড়' এবং 'বাহিরগড়' নামে গড়ের দুটি অংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় এবং গড় দুটির প্রতিটির চারিপাশ আঁকা-বাঁকা পরিখার দ্বারা বেষ্টিত। ভিতরগড়ের চারপাশের পরিখা স্থানে স্থানে খুবই চওড়া এবং পরিখার চারপাশ সেই সময় উচ্চ মৃৎ-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং প্রাচীরের চার কোণে চারটি উঁচু টিলায় সম্ভবত সৈন্য ও কামান প্রস্তুত থাকিত শত্রুর গতিবিধি এবং শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করিবার জন্য। 'ভিতরগড়ে'ই মূল রাজপ্রাসাদ ছিল। এখন প্রাসাদের চিহ্ন আর কিছুই নাই, স্থানে স্থানে মাকড়া পাথরের বৃহৎ বৃহৎ খণ্ড, ইটের স্তূপ, পাথরের ভাঙা অংশ প্রভৃতি রহিয়াছে। বেশির ভাগ স্থানই সমতল

বরদার শোভাসিংহের গড় ও দীঘি

ধানক্ষেতে পরিণত হইয়াছে। ভিতরগড়ে 'জলহরি' নামে একটি পুকুর এবং তাহার এক পাড়ে ইঁটের স্তূপ লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত এইখানে একটি মন্দির ছিল। ভিতরগড়ের উত্তর-পূর্বপার্শ্বে বাহিরগড়ে 'রাধাসাগর' নামে একটি বিশাল পুষ্করিণী আছে। মাকড়া পাথরে বাঁধান তাহার একটি ঘাট আজও বর্তমান। ঘাটের

একস্থানে তৈল রাখিবার একটি স্থান এখনও আছে। সম্ভবত অট্টালিকার অন্তঃপুরিকারা এই পুষ্করিণী ব্যবহার করিতেন। ভিতর গড়ে যেখানে অট্টালিকা ছিল, সেই স্থান হইতে এই পুষ্করিণীর দূরত্ব অল্প ব্যবধানের মধ্যে। বাহির গড়ের সুবিস্তীর্ণ এলাকায় বিরাট্ বিরাট্ দীঘি আজও রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সিংহসাগর, চোংদারদীঘি, রণসায়র, কাগজকাটা দীঘি নামে দীঘিগুলি বেশ প্রাচীন এবং শোভাসিংহ বা তৎপূর্ববর্তী সময়ের বলিয়া মনে হয়। শোভাসিংহের গড়ের তৃতীয় অংশের নানাস্থানে এই দীঘির কয়েকটি অবস্থিত। ইহাদের কয়েকটির অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। কাগজকাটা দীঘিটি বিরাট্ এলাকা জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। তাহার উচ্চ পাড় ক্রমশঃ সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। 'সিংহসাগর' দীঘিটি গড়ের তৃতীয় অংশে বাহিরের দিকে অবস্থিত এবং ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পাকা রাস্তার ধারে বর্তমান। এই দীঘির কয়েকটি পাকাঘাট ছিল। এখন তাহাদের কোন চিহ্নই নাই। শোভাসিংহের প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষী দেবী এই অঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ। বিশালাক্ষীর মাটির মন্দিরটি বর্তমানে দ্বিতীয় পরিখার বাহিরে পাকা রাস্তার পাশে অবস্থিত। পূর্বে দেবী ভিতরগড়ের কোনস্থানে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। বরদা গ্রামের সন্নিকটবর্তী নির্মলবাজার প্রভৃতি এলাকায় সেকালে ঘনলোকবসতিপূর্ণ বাজার ছিল। শোভা সিংহের রাজধানী দাসপুর থানার চেতুয়া-রাজনগর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এই গ্রামের বর্তমান কাঁকী-নদীটি তিনি খনন করাইয়া ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই ক্ষুদ্র খালটি শিলাই নদী ও কাঁসাই খালের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া রাজধানীর পশ্চিম দিককে সুরক্ষিত করিয়াছিল।

রাজনগরের উত্তরদিকে 'আনন্দগড়' নামে একটি প্রাচীন গড়ের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় এবং স্থানে স্থানে ইঁটের পুরানো দেওয়াল দেখা যায়। সম্ভবত শোভা-সিংহের পূর্ববর্তী কোন রাজা এই স্থানে গড় নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন। সেই প্রাচীন রাজার সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। রাজনগর গ্রামে শোভাসিংহের রাজধানীর কোন চিহ্নই এখন নাই। গ্রামের পূর্বদিকে একটি বিরাট্ দীঘি আছে। তাহার দুই এক স্থানে মাকড়া পাথরের খণ্ড লক্ষ্য করা যায়।

দাসপুর থানায় নাড়াজোলরাজগড়টিরও চারপাশ পরিখাবেষ্টিত এবং পরিখার ভিতরে রাজবাড়ি ও মন্দির আছে। গড়টি সম্ভবত উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রাজা মোহনলাল খাঁনের সময়ে নির্মিত হইয়া থাকিবে। এই থানায় ছোটখাটো আরও অনেক গড় ও দীঘি-পুষ্করিণী প্রভৃতি আছে। এই সমস্ত

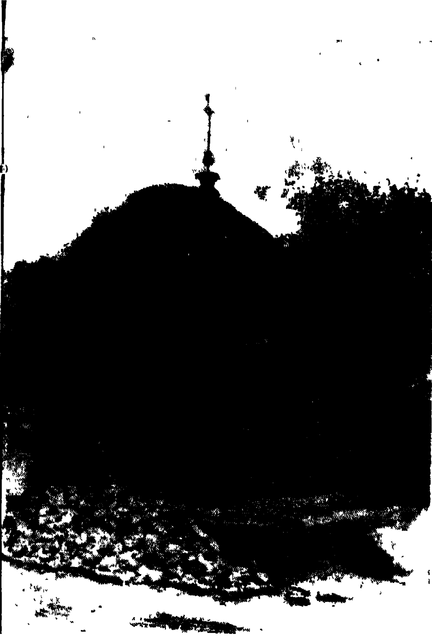
গড়বাড়ি এই অঞ্চলের ছোটখাটো জমিদারেরা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। কথিত আছে, শোভাসিংহের দেওয়ান বঙ্গরাম চৌধুরী দাসপুর গ্রামে চৌধুরী-গড় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং গড়-মধ্যে শ্যামরায়ের একচূড়ার একটি মন্দির সন ১১০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই মন্দিরটি সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে। মন্দিরটি এখন নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, তবে গড়ের পরিখার চিহ্ন এখনও বোঝা যায়। দাসপুর থানার ভূতা গ্রামেও পূর্বে একটি গড় ছিল বলিয়া জানা যায় এবং রাণীচকের কাছে জোতকানুরামেও একটি গড় ছিল। বর্তমানে জোড়কানুরামগড় গ্রামের নামটি সেই প্রাচীন স্মৃতির ক্ষীণ পরিচায়ক। ঘাটাল পৌর এলাকার দশ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন গড় প্রতাপনগর গ্রামটিও পূর্বে কোন রাজা বা জমিদারের গড় ছিল বলিয়া অনুমান।

মহকুমার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় স্থান চন্দ্রকোণা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল। এই স্থানের অভ্যুদয় ঠিক কোন্ সময়ে হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। তবে

চন্দ্রকোণার গড় এলাকা

ভানরাজাদের আমলে এইস্থান যে অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তৎপূর্বে কেতুবংশের রাজাদের রাজধানী ছিল এই চন্দ্রকোণা। মল্লেশ্বরপুরের বর্তমান মল্লেশ্বর-ঠাকুরবাড়ির সন্নিহিত স্থানে এই প্রাচীন কেতুবংশের দ্বাদশদ্বারী বা বারদুয়ারী নামক একটি গড়ে অট্টালিকা ছিল। সম্ভবত ভানরাজাদের অভ্যুদয়ে এই গড় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। তৎপরে লালগড়, রামগড় ও রঘুনাথগড় নামে পর পর তিনটি গড় নির্মিত হয় এবং সেখানে সুবিশাল রাজপ্রাসাদ, মন্দির-দেবালয় ও দীঘি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই লালগড়, রামগড় ও রঘুনাথগড় এখন এক একটি পৃথক পল্লী এবং বর্তমানে সেখানে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ বা মন্দিরাদির কোন চিহ্নই নাই। লালগড়ে ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গিরিধারীলাল জীউর যে নবরত্ন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মন্দির এবং অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ পর্যন্ত এখন আর চোখে পড়ে না, অবশ্য দুয়েকটি প্রাচীন দীঘি গড়ের মধ্যে থাকিয়া অতীত স্মৃতির ক্ষীণ সূত্রটুকু এখনও ধরিয়া রাখিয়াছে। রঘুনাথগড়ের নিকটবর্তী 'সিমসাগর' ও 'রাণীসাগর' নামে দুটি দীঘি বর্তমান আছে।

চন্দ্রকোণা ও তার আশপাশে বহু দীঘি ও পুষ্করিণী বর্তমান। এই সব দীঘি ও পুষ্করিণী লইয়া কিছু কিছু কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। চন্দ্রকোণার ইলামবাজার এলাকায় রাজা হরিনারায়ণের মহিষী রাণী লক্ষ্মণাবতীর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমিত রাজার মাতার পুষ্করিণী বা 'রাজার মায়ের দীঘি' নামে



'দোচালা' মন্দির, রামপুর (দাসপুর)



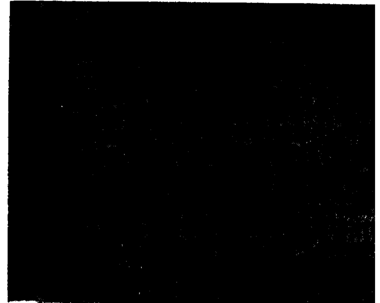
শিবের 'আটচালা' রীতির মন্দির,



নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত প্রস্তরযুগের অস্ত্র
অন্যান্য পুরাবস্তু



দাসপুর চৌধুরীদের শ্যামরায়ের 'আল্‌গো
(একরত্ন) রীতির মন্দির (বর্তমানে লু



চন্দ্রকোণার ভানরাজাদের ঐতিহাসিক



লালজীউর মন্দিরের সম্মুখভাগ ও প্রবেশপথের 'দরুন' খিলান



মল্লেশ্বরের 'পঞ্চরত্ন', মল্লেশ্বরপুর, চন্দ্রকোণ



চন্দ্রকোণা-দক্ষিণবাজারের প্রাচীন 'জোড়বাংলা' মন্দির (পরিত্যক্ত ও ভগ্ন)



একটি প্রাচীন ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি (চন্দ্রকোণা গোঁসাইবাজার হইতে প্রাপ্ত)



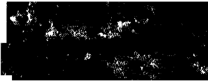
ক্ষীরপাই পাহাড়ীপাড়ার শিবের তিনটি 'আটচালা'

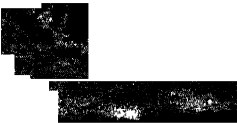


জহরা পুষ্করিণী, ভেয়েরবাজার, চন্দ্রকোণা

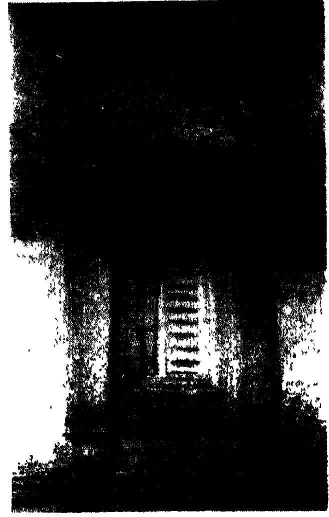


সিংহডাঙ্গায় শিবের রেখ দেউল

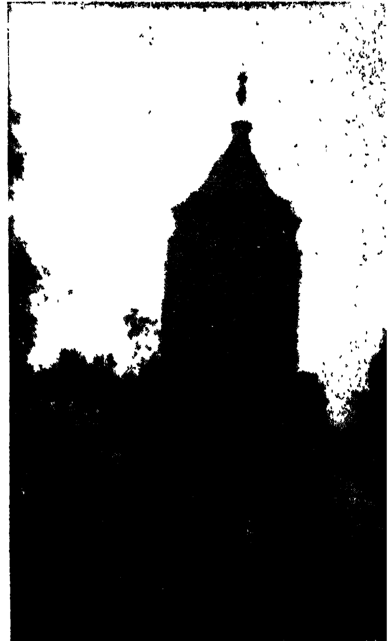




গোপীনাথের তুলসীমঞ্চ, দাসপুর



মন্দিরগাত্রে য়ুরোপীয় স্থাপত্যের চিহ্ন
'ফ্যানলাইট্' ও 'ভিনিসীয়' দরজা



রাধারসিকরায়জীউর রাসমঞ্চ,
লালবাজার, চন্দ্রকোণা



পোড়ামাটির হাতির উপর তুলসীমঞ্চ,
গোঁসাইবেড়, ডিহিবলিহারপুর



চন্দ্রকোণা বড় অস্থলের 'রেখ দেউল'
রীতির পঞ্চরত্ন



মন্দিরগাত্রে 'টেরাকোটা'—সেকালের যুদ্ধদৃশ্য



মন্দির-প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে পোড়ামাটির দ্বারী
সিংহবাহিনীর 'চারচালা', কোন্নগর (ঘাটাল)



মন্দিরের সম্মুখপ্রস্থে পোড়ামাটির লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য

একটি বিশাল দীঘি বর্তমান। কথিত আছে, মিত্রসেনপুরের কালীপূজাও রাণী লক্ষ্মণাবতী প্রবর্তন করিয়াছিলেন। গোঁসাইবাজারের সন্নিহিত 'জহরা' পুষ্করিণীও চন্দ্রকোণার কোন প্রাচীন রাজার পরিবারবর্গের জহরব্রত পালনের ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে।

প্রাচীন দীঘি

চন্দ্রকোণা ছাড়াও মহকুমার বহু স্থানে প্রাচীন দীঘি অনেক আছে। ঘাটাল হইতে চন্দ্রকোণা পর্যন্ত এই ধরণের বহু দীঘি বা পুষ্করিণী লক্ষ্য করা যায়। ঘাটাল অঞ্চলের রাণীরবাজার ও তৎপার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থানে দু'চারটি প্রাচীন পুষ্করিণী লক্ষ্য করা যায়। **ক্ষীরপাই ও গঙ্গাদাসপুরে বেশ বড় বড় কয়েকটি দীঘি আছে, যেমন, হালদারদীঘি, দালালপুকুর, মোষপুকুর, মহিষাপুকুর, মথুরাপাল প্রভৃতি।** দাসপুর থানায় উল্লেখযোগ্য দীঘি বা পুষ্করিণীর মধ্যে প্রাচীনত্বের দিক হইতে **চেতুয়া-বাসুদেবপুর গ্রামের জয়চণ্ডীর দীঘি** এবং **বলিহারপুর গ্রামের গেঁড়িবুড়ির দীঘি** উল্লেখযোগ্য। গেঁড়িবুড়ি দীঘিটির বর্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয়। দীঘির বেশির ভাগ অংশই বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত। ইহার চারপাশ এককালে উচ্চপাড় বেষ্টিত ছিল। **চাঁদপুর গ্রামের চাঁদদীঘি** আজ শুধু নামেই পর্যবসিত। দীঘিটি খুবই প্রাচীন ছিল এবং **সম্ভবত চাঁদখাঁ পীরের নামে দীঘির নামকরণ হইয়াছিল।** এই চাঁদখাঁ পীরের একটি 'থান' ডিহিচেতুয়া গ্রামে আছে। ইহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। চাঁদদীঘির একটি মাত্র পাড় এখনও আছে এবং সমগ্র দীঘিটিই বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। **নাড়াজোলের নিকটবর্তী লঙ্কাগড় দীঘিটি রাজা মোহনলাল খাঁন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।** দীঘিটির মধ্যস্থলে মোহনলাল-কর্তৃক নির্মিত **জলহরি** নামে একটি আবাসস্থান আছে। এই দীঘিটি বৃহৎ। উপরি উক্ত এই দীঘিগুলি ছাড়া আরও কিছু কিছু প্রাচীন দীঘি ও পুষ্করিণী বর্তমান। স্থানাভাবে তাহাদের সকলের উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

উপরি উক্ত আলোচনায় এই দেশের প্রাচীনত্ব কতকটা অনুমিত হইবে। সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মধ্যে একমাত্র ঘাটাল অঞ্চলই সেকালে রাঢ় দেশের অন্তর্বর্তী ছিল। তাম্রলিপ্তকে কেন্দ্র করিয়া সুপ্রাচীনকালে যখন একটি 'তাম্রলিপ্ত রাজ্য' গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই অঞ্চলও সম্ভবত সেই সময় বৃহত্তর 'তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। পান্নায় প্রাপ্ত টেরাকোটা ও পাথরের প্রাচীন নিদর্শনগুলি হইতে বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের এক সমৃদ্ধিশালী জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রাজ্যে অনেক উত্থান-পতন হইয়াছে, কিন্তু সেইসব প্রাচীন

নিদর্শন আজও এই অঞ্চলের পূর্ব গৌরব সূচিত করিতেছে। মুসলমান-পূর্ববর্তী যুগে এই অঞ্চলে কিছু কিছু মন্দির-দেবালয় নির্মিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাদের একটিও আজ অবশিষ্ট নাই। শ্রীচৈতন্য-পরবর্তীযুগে বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া অঞ্চলে মন্দির-স্থাপত্যে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষিত হয় অর্থাৎ 'চালা' ও 'রত্ন'রীতির পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর কারুকার্যযুক্ত যে সব মন্দির তৈয়ারি হয়, ঘাটাল অঞ্চলে সেই ধরণের অনেক মন্দির পরে তৈয়ারি হইয়াছিল। অবশ্য, বিষ্ণুপুরে মন্দির-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আসার বহু আগে ঘাটাল অঞ্চলে 'চালা'রীতির মন্দিরনির্মাণ-পদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল না। নিম্নে মহকুমার তিনটি থানায় অবস্থিত মন্দিরাদিপুরাকীর্তির মোটামুটি একটি পরিসংখ্যান এবং উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া যাইতেছে। মন্দিরাদির পরিসংখ্যান বা বিবরণীতে বর্ণানুক্রমিক মৌজার উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইবে:

দাসপুর থানা:

[এই থানার মৌজাগুলির 'সংখ্যা' ১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে প্রদত্ত হইল। বন্ধনীমধ্যস্থ সংখ্যাটি মৌজার এবং মন্দিরনামের পাশের অঙ্কটি মন্দিরটি তত বৎসর পূর্বে নির্মিত। মন্দিরনামের পাশে কোন অংকের উল্লেখ না থাকিলে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় নাই বুঝিতে হইবে।]

অভিরামপুর (১২৬): কারকদের শ্রীধরজীউর 'চাঁদনী'। দাসপুরের মিহিরচন্দ্র মিস্ত্রী-কর্তৃক ৫৮ বৎসর পূর্বে নির্মিত। কোন কারুকার্য নাই।

আজুড়িয়া (১৬০): এই স্থানটি পূর্বে শিল্পিপ্রধান ছিল। এখানে মনসার একটি 'চারচালা' ও দক্ষিণপাড়ায় শীতলার একটি প্রাচীন 'দেউল' মন্দির বর্তমান। দেউলটি আনুমানিক দেড়শ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। পূর্বপাড়ায় চরণদের নবরত্ন মন্দির ১০৬ বৎসর পূর্বে নির্মিত।

উত্তরগোবিন্দনগর (১৬৪): দামোদরের পঞ্চরত্ন (১২২), যজ্ঞেশ্বরের দেউল (১১১)—মিস্ত্রী হরিদাস, ভুবনেশ্বরের আটচালা-রীতির মন্দির (১২৬) দামোদর ও ভুবনেশ্বর-মন্দিরে পোড়ামাটির মূর্তি। ভুবনেশ্বরের আটচালাটি দাসপুরের আনন্দ মিস্ত্রী-দ্বারা নির্মিত।

উত্তরধানখাল (১২৩): লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন (১৪৪)—প্রতিষ্ঠাতা নন্দরাম ভুঞা, শীতলা, মনসা ও পঞ্চানন্দের পঞ্চরত্ন (৮৮)

—নির্মলবাজারের পঞ্চারাম মিস্ত্রীকর্তৃক নির্মিত এবং দামোদরের চাঁদনী (১২২)।

উত্তরবাড় (২২২) : শিবের একটি 'চাঁদনী'ও চক্রবর্তীদের দুর্গাদালান।

কাদিরপুর (১০৮) : দত্তদের রঘুনাথজীউ ও গোপালজীউয়ের পঞ্চরত্ন
ফকিরবাজার (১৭৭) ও রঘুনাথজীউর নবরত্ন রাসমঞ্চ। ফকির বাজারে শীতলার পঞ্চরত্ন (১২৮), গঙ্গাধর শিবের 'আটচালা' ও গোপীনাথ জীউর 'চাঁদনী'।

কোটালপুর (২০৩) : ভূঞাদের শ্রীধরজীউর 'পঞ্চরত্ন' (১৬২) ও একটি ছোট্ট তুলসীমঞ্চ এবং 'বেহারিরস্থনে-চূড়াযুক্ত শ্রীধরজীউর 'নবরত্ন' রাসমঞ্চ; 'পঞ্চমীর মেলা'-স্থানে শ্রীচরণ গোঁসাইয়ের 'চারচালা' সমাধি।

খাঞ্জাপুর (১০৫) : বিশালাক্ষী, শীতলা ও শিবের দালান (১১১) ও হরনাগর শিবের 'আটচালা' এবং গুঁইয়েদের দ্বিতল 'চাঁদনী'।

খুকুড়দহ (১৫০) : শীতলানন্দ শিবের বিশাল 'আটচালা'ও খুকুড়চণ্ডীর আধুনিক 'চাঁদনী' মন্দির।

খোর্দা বিষ্ণুপুর (৪৪) : যদুনাথ রায়ের প্রতিষ্ঠিত পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন (আঃ ১২৫৬ সাল) মন্দিরে পোড়ামাটির অনেক মূর্তি আছে। পার্শ্ববর্তী দুটি দেউল।

গোপালপুর (১৯৯) : শিবের দুটি 'আটচালা' (আঃ ১৯ শতকের প্রথমদিক)—কয়েকটি 'টেরাকোটা'; দামোদর, গোপাল ও রাধামাধবের বৃহৎ দালান; রাস ও দোল নবরত্ন রাসমঞ্চ, ঝাকড়েশ্বর শিবের দেউল এবং শীতলার 'চাঁদনী'।

গোকুলনগর (২৮) : শীতলানন্দ শিবের পরিত্যক্ত দেউল (১৪১)—তৈয়ারি নারায়ণ মিস্ত্রী। ভট্টাচার্যপাড়ার দক্ষিণে আর একটি পরিত্যক্ত দেউল।

গোপালনগর (২৯) : ঝাকড়েশ্বরের 'আটচালা' (৯৩)—প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমন্ত ভূরিষ্টাল ও অন্নপূর্ণা দেবী।

গোবিন্দনগর (৭৮) : গোস্বামীদের রাধাগোবিন্দ ও রাধারমণ জীউর
(চেঁচুয়া) পঞ্চরত্ন (১৯৬)—মন্দিরটির সামনের দিকে প্রচুর

পোড়ামাটির কাজ আছে এবং সেগুলি উৎকৃষ্ট-মানের। রামরাবণের যুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা-দৃশ্য প্রভৃতি পোড়ামাটির ফলকে অঙ্কিত। সেকালের সামাজিক চিত্রও অঙ্কিত। এই মন্দিরটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি বলিয়া ঘোষিত। দাসপুরের সাফলরামচন্দ মিস্ত্রী-কর্তৃক এই মন্দিরটি তৈয়ারি হইয়াছিল। রাধা-গোবিন্দের একটি তুলসী মঞ্চ আছে। গোস্বামীদের ছয়টি চারচালা ভগ্ন সমাধি মন্দিরও আছে।

গৌরা (৮০) ‘গঙ্গামাড়ো’য় পূর্বে গঙ্গার একটি পঞ্চরত্ন ছিল (১৯৭)। বর্তমানে একটি নূতন মন্দির তৈয়ারি হইয়াছে। উত্তরপাড়ায় হাঁড়াদের লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন (১৫৩), হটনাগর শিবের আটচালা (১৭১), মণ্ডলপাড়ায় শিবের দেউল (১৩৩) ও আরও ভগ্ন কয়েকটি মন্দির আছে। হাঁড়াদের মন্দিরে পোড়ামাটির বহু মূর্তি আছে।

ঘনশ্যামবাটী (১৮৮) বৈদ্যনাথের আটচালা (১৮২), শীতলার ‘আটচালা’ ও ধর্মের ‘আটচালা’ ও গোসাঁইদের কয়েকটি প্রাচীন ভগ্ন সমাধি।

চাঁইপাট (২১৬) হাটপাড়ায় শিবের কয়েকটি ‘আটচালা’—পার্শ্ববর্তী বেলভাঙ্গায় চক্রবর্তীদের জগদ্ধাত্রীর ‘আটচালা’ আছে।

জোতকেশব (১৫৯) চক্রবর্তীদের শীতলা ও মনসার দেউল এবং জগমোহন (৭৫)—দাসপুরের যদুরথ শীলকর্তৃক নির্মিত। উল্লেখযোগ্য, শীতলা ও মনসার পেতলের দুটি বড় মূর্তি ও কিছু কিছু ‘টেরাকোটা’ আছে।

জনার্দনপুর (১২০) চক্রবর্তীদের রঘুনাথ জীউর ‘আটচালা’ ও সংলগ্ন চারচালা জগমোহন (৬৩), সীতারামের দেউল (১৬৩)—দুয়েকটি পোড়ামাটির মূর্তি, যোগেশ্বরের ‘আটচালা’ (আঃ ১৫০ বছর) এবং একটি পরিত্যক্ত ও ভগ্ন ‘চাঁদনী’।

জয়কৃষ্ণপুর (১০২) : লক্ষ্মীবরাহের পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন (৯৩), হাজরাদের শ্রীধরজীউর পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন রাসমঞ্চ এবং শিবের 'আটচালা'।

তিওরবেড়িয়া (১৪৮) : সামন্তদের পেতলের রথ, শিবের একটি 'আটচালা'।

দক্ষিণবাড় (২২৪) : চক্রবর্তীদের মদনমোহনের দ্বিতল 'চাঁদনী' (১৯২)—মদনবাড়ের রঘুনাথ মিস্ত্রীর তৈয়ারি, দণ্ডেশ্বরের 'চাঁদনী', একটি বড়ো 'আটচালা' —মন্দিরটির সামনে প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি এবং ক্ষেপুতেশ্বরীর 'আটচালা' (২০০)। ক্ষেপুতের চৌধুরীবেড়ে প্রাচীন বৌদ্ধ ফিঙ্গারাজগণের একটি বুদ্ধমন্দির ছিল—এইরূপ অনুমান। এখানে একটি ভগ্ন বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। স্থানটি বেশ প্রাচীন। উত্তরবাড় ও দক্ষিণবাড় 'ক্ষেপুত' নামে পরিচিত।

দাসপুর (৬০) : এখানে বহু মন্দির আছে। দাসপুর থানার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিরটি এই গ্রামে অবস্থিত। এককালে এই গ্রামে মন্দির-স্থপতিদের এক 'গোষ্ঠী'র বাস ছিল। তাঁহারা এই জেলার নানা স্থানে মন্দির নির্মাণ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে **সাফলরাম চন্দ্র, গোপাল চন্দ্র, শত্রুঘ্ন চন্দ্র, বৃন্দাবন চন্দ্র, শীতলপ্রসাদ চন্দ্র, মাধবচন্দ্র, হরিচরণ দাস, হরিদাস মিস্ত্রী, আনন্দ মিস্ত্রী, হরহরি চন্দ্র মিস্ত্রী, গোপাল চন্দ্র দে, বৈষ্ণবদাস মিস্ত্রী, ঠাকুরদাস শীল** ও **যদুরথ শীলের** নাম জেলার নানাস্থানের মন্দির-গাত্রে লিপিবদ্ধ আছে। মন্দির-স্থপতি বা সূত্রধরকুলের এই বিরাট গোষ্ঠী মন্দির-নির্মাণে একটি পৃথক্ **'ঘরানা'**র প্রবর্তন করিয়াছিলেন যাহা **'দাসপুর ঘরানা'** নামে

খ্যাতি লাভ করে। এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মন্দিরের নাম নিয়ে উল্লিখিত হইল। (১) বঙ্গরাম চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত **শ্যামচাঁদ ও মদনমোহনের একরত্ন** (বর্তমানে লুপ্ত) : ২৭৮ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির মূর্তি ছিল। (২) সিংহদের **গোপীনাথের একরত্ন :** ২৬১ বছরের পুরানো —সুন্দর পোড়ামাটির কাজ। (৩) পালেদের **লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন** ১৮৬ বছরের পুরানো --সুন্দর পোড়ামাটির কাজ। ৪) **আনন্দময়ী কালীর আটচালা :** ১৬১ বছরের পুরানো। (৫) মামুদপুরে **চক্রবর্তীদের দক্ষিণাকালীর একরত্ন :** বেশপ্রাচীন, পরিত্যক্ত ও সুন্দর পোড়ামাটির কাজ ছিল। (৬) **রাসবিহারী চক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্ন :** ১৩১ বছর। পোড়ামাটির কাজ আছে। এই মন্দিরটির মিস্ত্রী ছিলেন দাসপুরের **ঠাকুরদাস শীল** (৭) **নন্দীদের চাঁদনী :** ১৫৮ বছর ও **নন্দীদের আর একটি ছোট চাঁদনী** ১৭৭ বছর (৮) **হোসনাবাজারে শীতলানন্দের দেউল** ১২৮ বছর ও **বিন্দা-দেবীর পঞ্চরত্ন তুলসীমঞ্চ :** ১২৪ বছর। প্রথমটির নির্মাতা **গোলক মিস্ত্রী** ও দ্বিতীয়টির **ঠাকুরদাস শীল,** হোসনাবাজারে শীতলা ও বিষহরির 'চাঁদনী' : ১৩২ বছর।

নন্দনপুর (২৬) : মণ্ডলদের লক্ষ্মীজনার্দন ও দামোদরের দ্বিতল 'চাঁদনী' (১২৭) এবং নবরত্ন রাসমঞ্চ ; ঘোষেদের পরিত্যক্ত একটি রাসমঞ্চ ও দালানও আছে।

নিজনাড়াজোল (১৭) : রাজবাড়ি-এলাকায় গোবিন্দজীউর নবরত্ন—'টেরা কোটা' ও প্রস্তর-ভাস্কর্য আছে। রঘুনাথজীউর 'চাঁদনী'—বেলেপাথরের তৈয়ারি, রাজা মোহন লাল খাঁন প্রতিষ্ঠিত (১৫৮), জয়দুর্গার ভগ্ন ও

পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন (আঃ ১৮ শতকে) নির্মিত। এখানে সুন্দর একটি দুর্গামণ্ডপে **পঙ্কের কাজ** ও কিছু কিছু 'টেরাকোটা' আছে। গড় এলাকার বাইরে একটি **পঁচিশচূড়া রাসমঞ্চে** পোড়া-মাটির কোন কাজ নাই, তবে পার্শ্ববর্তী **পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চে** সুন্দর কাজ আছে। এইখানে শিবের ছয়টি 'আটচালা' মন্দির ও কয়েকজন নাড়াজোল রাজার সমাধি আছে, গড়ের বাইরে পূর্বদিকে ধর্মের একটি মন্দিরে ধর্মের আসন, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবী এবং মন্দিরগাত্রে পোড়া মাটির কিছু স্থূলমূর্তি আছে।

পশ্চিমদিকে **কিস্মৎ নাড়াজোলে** (১৬) মদনমোহনের অস্থলে মদনমোহনের পঞ্চরত্ন এবং একটি উচ্চ নবরত্ন রাসমঞ্চ আছে। রাসমঞ্চটি সেনহাটীর মথুরামোহন মিস্ত্রী নির্মাণ করিয়াছিলেন (১৫৩)। প্রতিষ্ঠাতা রাজা চুনীলাল খাঁন। **এই অস্থলটি শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের অধীন। লঙ্কাগড়ে** দীঘির দক্ষিণ তীরে রাজা মোহনলাল খাঁনের দেউল সমাধি-মন্দির বিশিষ্ট স্থাপত্য-কৌশলের পরিচায়ক। এখানে আরও দুটি 'আটচালা' আছে।

পলশপাই (১৫৬) : মাইতিদের শ্রীধরজীউর বৃহৎ দেউল (১৪৩)—প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম মাইতি। দেউলটির চারপাশে পোড়ামাটির নিম্নমানের মূর্তি আছে। শ্রীধরের নবরত্ন রাসমঞ্চ (১৫১)—পোড়ামাটির বহু মূর্তি আছে।

পুরুষোত্তমপুর (৫৯) : এই মৌজাটির ডাক নাম 'বলিহারপুর'। গেঁড়িবুড়ির একরত্ন (২২০)। মন্দিরে গেঁড়িবুড়ি, শীতলা, পঞ্চানন, ধর্মরাজ প্রভৃতি দেবদেবী আছেন। রায়েদের ব্রজকিশোরের একরত্ন (২০৩)—পোড়ামাটির সুন্দর কারুকার্য আছে এবং ব্রজকিশোরের একটি নবরত্ন রাসমঞ্চ।

পাশ্ববর্তী ডিহিবলিহারপুর গ্রামে গোস্বামীদের রাধাগোবিন্দের পঞ্চরত্ন (১৭৯)—পোড়ামাটির প্রচুর মূর্তি এবং একটি নবরত্ন রাসমঞ্চ (১৫০)।

গ্রামের উত্তর দিকে গোসাঁইপাড়ায় বাণেশ্বর ও বীরেশ্বর শিবের 'আটচালা' (১৫৮ ও ১৬৫) ও একটি 'চাঁদনী' (২৫৩)।

বাসুদেবপুর (৬৩) : ভট্টাচার্যদের দামোদরের ভগ্ন পঞ্চরত্ন (১৭৬), দত্তদের বৃন্দাবনচন্দ্রের নবরত্ন (১২০), রায়েদের গম্বুজাকৃতি দেউল, মহাপ্রভুর নবরত্ন (১৪৪) ও নবরত্ন রাসমঞ্চ, ধর্মঠাকুরের 'চাঁদনী' (১:৮)—লোধন সাঁই মিস্ত্রীকর্তৃক নির্মিত। বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় শিবের জীর্ণ পঞ্চরত্ন।

বালিতোড়া (১০৩), (ডাক বাজুয়া) : চৌধুরীদের শ্রীধরজীউর পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন রাসমঞ্চ (১২৫)—পোড়ামাটির কাজ আছে।

বৃন্দাবনপুর (১২৭) : মহাপ্রভুর পঞ্চরত্ন (১৫০)—প্রচুর 'টেরাকোটা' আছে। এই গ্রামে জন্মাষ্টমী ও দোল উৎসব হয়। পোড়ামাটির মূর্তিগুলির অবস্থা ভালো।

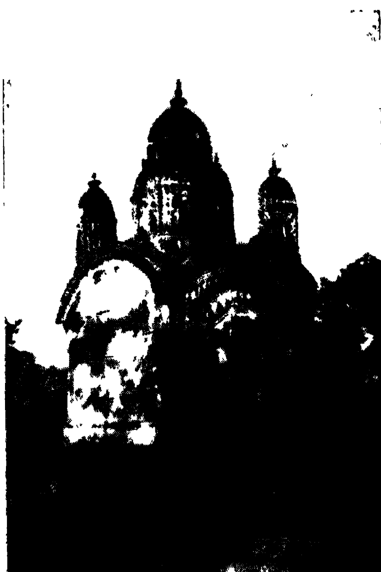
বৈকুণ্ঠপুর (৬৪) : নিম্বার্কসম্প্রদায়ের প্রাচীন অস্থল। অস্থল-এলাকায় মদনমোহনের একটি একরত্ন বেশ প্রাচীন। পোড়ামাটির সুন্দর মূর্তি ও নক্সা আছে।

ব্রাহ্মণবসান (১১১) : মণ্ডলদের শ্রীধরজীউর 'আটচালা'—পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর ও উৎকৃষ্টমানের কারুকার্য আছে।

মহাকালপোতা (১৭৮) : বাণেশ্বর শিবের 'আটচালা'(১৫৮)—পোড়ামাটির অনেক মূর্তি, দেওয়ালের একদিকে শিশুক্রোড়ে এক নারীমূর্তি।

রবিদাসপুর (৯০) : অধিকারীদের শীতলা ও বলরামকৃষ্ণের পঞ্চরত্ন (আঃ ১৯ শতক)—পোড়ামাটির বহু মূর্তি আছে।

রাধাকান্তপুর (৬৭) : দাসেদের গোপীনাথজীউর একরত্ন। **এই মন্দির-গাত্রে বাংলাপদ্যে রচিত পোড়ামাটির একটি দীর্ঘ লিপি আছে।** তাহা হইতে জানা যায়, মন্দিরটির ১৩৩ বছর আগে সংস্কার হয়। তাহারও দুশ বছর আগে প্রতিষ্ঠাকাল



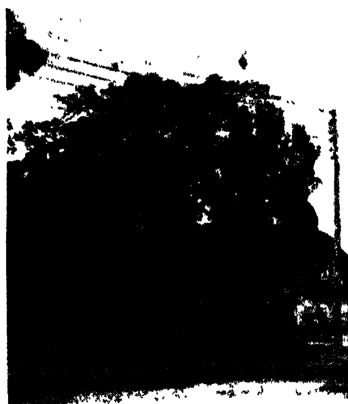
শান্তিনাথ শিবের 'পঞ্চরত্ন', চন্দ্রকোণা



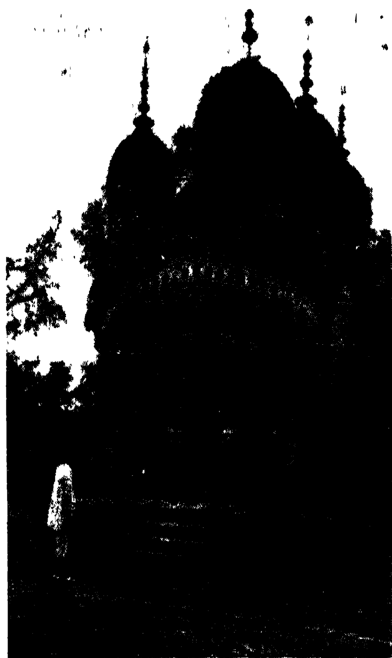
'দে'-পরিবারের 'পঞ্চরত্ন' তুলসীমঞ্চ, গম্ভীরনগর, ঘাটাল



গেঁড়িবুড়ির 'একরত্ন', পুরুষোত্তমপুর (দাসপুর)



গোবিন্দপুরে (চন্দ্রকোণা) শিবের নহবৎখানা, পাশে শিবের 'আটচালা



শ্যামচাঁদজীউর 'পঞ্চরত্ন',
জয়ন্তীপুর (চন্দ্রকোণা)



পার্বতীনাথের সতেরো চূড়ার মন্দির, চন্দ্রকোণা



রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন',
চেঁচুয়া-গোবিন্দনগর (দাসপুর)



বৃন্দাবনচন্দ্রের 'নবরত্ন' মন্দির,
কোন্নগর, ঘাটাল








শিবের দেউল ও ক্ষুদ্র জগমোহন
(দাসপুর হাই স্কুলের সম্মুখে)



শিবের 'সপ্তরথ' রেখ দেউল,
বৈকুণ্ঠপুর (দাসপুর)



শিবের গম্বুজাকৃতি রেখ দেউল,
চেতুয়াবাসুদেবপুর (দাসপুর)



'বিহারীরসুনে' চূড়াযুক্ত 'নবরত্ন' রাসমঞ্চ,
ক্ষীরপাই

বলিয়া উল্লেখ আছে। পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর উৎকৃষ্টমানের কারুকার্যযুক্ত এই মন্দিরটি দাসপুর থানার অন্যতম একটি উৎকৃষ্ট মন্দির। বসুদের দধিবামনের পঞ্চরত্ন (২০৭)—পোড়ামাটির অল্প কাজ আছে। দত্তদের পঞ্চরত্ন (১৩১)—পোড়ামাটির প্রচুর মূর্তি। ঘোষেদের একটি দেউল।

কিস্মৎরাধাকান্তপুর গ্রামের মণ্ডলপাড়ায় রঘুনাথ জীউর পঞ্চরত্ন (৭৯)—পোড়ামাটির স্থূলমূর্তি, বিশ্বেশ্বরের দেউল, রামেশ্বর শিবের ক্ষুদ্রাকৃতি পঞ্চরত্ন—পোড়ামাটির অল্প মূর্তি আছে।

রাণাপুর (২০২) : প্রামাণিকদের রঘুনাথজীউর নবরত্ন (১৭৬)—পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর মূর্তি, এমন কি দ্বিতলেও পোড়ামাটির মূর্তি ও নক্সা আছে।

রাণীচক (২১৩) : রাণীচকের মণ্ডলবংশের গৃহদেবতাগণের 'জোড়-বাংলা' মন্দির আছে, প্রাচীন বলিয়া অনুমিত, তবে আধুনিক লিপি আছে। রূপনারায়ণ-তীরবর্তী একটি 'আটচালা' পূর্বে ছিল (১৫৫), বর্তমানে তাহা লুপ্ত।

রামপুর (৮১) : পূর্বপাড়ায় কালুরায়ের 'দোচালা', শীতলার দেউল (৮৪), মনসার 'চারচালা', শিবের 'আটচালা' (২২২)।

রামকৃষ্ণপুর (১৯০) : অধিকারীদের বৃন্দাবনচন্দ্রের 'চাঁদনী' (১৯৩)—প্রতিষ্ঠাতা গোকুলবৃন্দাবন গোস্বামী। উৎকৃষ্ট-মানের অল্প কয়েকটি 'টেরাকোটা' আছে।

রামদাসপুর (১৯) : মাইতিদের দধিবামনের পঞ্চরত্ন (আঃ ১৯ শতকের গোড়া)—প্রচুর টেরাকোটা আছে।

লাওদা (৫৫) : বাঁকা রায়ের নবরত্ন (১৭৬)—পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর বহু মূর্তি আছে। ভূতনাথের 'দালান'।

সরবেড়িয়া (১০৪) সত্যনারায়ণের নবরত্ন (১৪০)—পোড়ামাটির কয়েকটি মূর্তি আছে।

সয়লা (১৭১) সিংহদের 'ছোট শিবের' দেউল (১১৩)—অবস্থা খুবই শোচনীয়। সিংহদের রঘুনাথজীউর পঞ্চরত্ন (লিপিতে ২৫৫ বৎসর পূর্বে নির্মিত বলিয়া বোঝা যাইলেও এটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি কালে নির্মিত মনে হয়। **বর্তমান লিপিটি সংস্কারকালীন এবং সম্ভবত ঠিক নয়।**

সামাট (২৩) : মদনগোপালের বৃহৎ 'চাঁদনী' (১৪৯)—রামানুজ সম্প্রদায়ের অস্থল।

সৌলান (১০৫) : অধিকারীদের শ্যামসুন্দরের পঞ্চরত্ন—পোড়ামাটির বহু মূর্তি আছে, শীতলার দেউল ও শ্যামসুন্দরের নবরত্ন রাসমঞ্চ। একটি 'চাঁদনী' দুর্গামণ্ডপ ও ও শিবের তিনটি আটচালাও আছে।

সোনাখালি (১৭২) : পঞ্চাননের 'আটচালা' (২০৪)—প্রতিষ্ঠাতা কৃপারাম সেন—পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর মূর্তি—কয়েকটি মিথুনদৃশ্য।

সোনামুই (৮৬) : গৌরাঙ্গের আটচালা (১৫৩)।

সুরতপুর (৪১) : হাজারীদের রঘুনাথ জীউর ভগ্ন পঞ্চরত্ন (২২২), শীতলার পঞ্চরত্ন(১২৯)—পোড়ামাটির প্রচুর মূর্তি, মল্লেশ্বরের দেউল (১৫৬) পার্শ্ববর্তী **বাগপাতা** গ্রামে মল্লেশ্বরের 'চাঁদনী'।

সুরনয়নপুর (৪৬) : শম্ভুনাথের দেউল (১৪১)—হরিরামপুরের দুলাল দাস মোদক মিস্ত্রীর তৈয়ারি—পোড়ামাটির কয়েকটি মূর্তি এবং শীতলানন্দের 'আটচালা' (১৪৪)।

শ্রীধরপুর (১৮২) বেরাদের সীতারামের পঞ্চরত্ন (পরিত্যক্ত)—পোড়ামাটির কয়েকটি স্থূলমূর্তি ও নবরত্ন রাসমঞ্চ, শিবের দেউল (১৩১), নীলকণ্ঠ শিবের ভগ্ন ও পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন—পোড়ামাটির বেশ কয়েকটি মূর্তি, সামন্তদের রঘুনাথজীউর পঞ্চরত্ন (আঃ ৮৬) —পোড়ামাটির প্রচুর মূর্তি।

সাহ্‌বাজার **মামুদপুর** (৬১) মৌজায় অন্তর্গত এই পল্লীতে বৃহৎ চত্বরবেষ্টিত একটি ইদ্‌গা আছে, ইহা তিন গম্বুজযুক্ত একটি মসজিদ। গম্বুজের ভিতরের ছাদ চতুষ্কোণ গোলাকার 'ভল্ট্' ও বৃহৎ খিলানের উপর অবস্থিত।

শ্রীপুর (১৫১) : শীতলানন্দ শিবের দেউল (১১৫)—দাসপুরের বৈষ্ণবদাস মিস্ত্রী-কর্তৃক নির্মিত। প্রতিষ্ঠাতা উৎসবানন্দ মাইতি—চারপাশে পোড়ামাটির কয়েকটি মূর্তি আছে।

হরিরামপুর (৩৮) : শীতলার 'চাঁদনী' (৯২) ও শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' (আঃ ১২০)—পোড়ামাটির বহু মূর্তি।

হরেকৃষ্ণপুর (১৮৩) : অধিকারীদের রাধাকান্ত জীউর 'চাঁদনী' (আঃ ১৮শতকের শেষ)—পোড়ামাটির বেশ কিছু মূর্তি।

হোসেনপুর (২৪) : গোপীনাথ জীউর পঞ্চরত্ন (৯১)—কলমিজোড়ের রাজারাম চন্দ্র মিস্ত্রীর তৈয়ারি, প্রতিষ্ঠাতা শিবপ্রসাদ চৌধুরী, গোপীনাথের একটি 'চাঁদনী', ঝুলনমন্দির ও নবরত্ন রাসমঞ্চ (৮১)—রাসমঞ্চটিও রাজারাম মিস্ত্রীর তৈয়ারি।

উপরি উক্ত মৌজাগুলিতে উল্লিখিত মন্দিরগুলি ছাড়া দাসপুর থানার অন্যান্য মৌজায় আরও বহু মন্দির আছে। স্থানাভাবে সকলের উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। **এরেটীর** মান্নাবংশের ঠাকুরবাড়িতে একটি 'চাঁদনী' দেবালয় আছে। এখানে পূর্বে এক 'বাগী' চাউলের অন্নভোগ ও অতিথিসেবা হইত। ডিহিচেতুয়া (৪৮)—বলরাম বাজারের চৌধুরীবংশের গোপীনাথ, গোবিন্দ প্রভৃতি দেবতার একটি প্রাচীন 'দালান' মন্দির আছে। চেতুয়া-বরদার রাজা রঘুনাথ সিংহ (শোভা সিংহের পূর্বপুরুষ) বাং ১০২১ সালের ১৫ই ভাদ্রে প্রদত্ত সনন্দে আনন্দগড় প্রভৃতি স্থানে এই দেবতাদের সেবার জন্য প্রায় দুইশত বিঘা জমি দান করেন। দেবতাগণের নিত্য মাপা চৌদ্দপুয়া চাউলের ভোগ ও অতিথি সেবা পূর্বে হইত। চৌধুরীবংশ বেশ প্রাচীন। এই বংশের প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি এখনও লক্ষ্য করা যায়। বলরামবাজারে শীতলার একটি 'চাঁদনী' মন্দিরও আছে। ইহা ৮১ বৎসর পূর্বে নির্মিত। **মন্দির-গাত্রে ৩৫০ টাকা মন্দির-নির্মাণের খরচ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।**

পূর্বেই বলা হইয়াছে, দাসপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে দেড়শত পরিবারের এক সূত্রধর-শিল্পিগোষ্ঠীর বাস ছিল। ইঁহারা মন্দির ও প্রাসাদ-নির্মাণ, দেবমূর্তি-নির্মাণ, কাষ্ঠতক্ষণ ও চিত্রাঙ্কনে নিপুণ ছিলেন। ইঁহাদের উদ্‌ভাবিত মন্দির-স্থাপত্যের পরিভাষিক কতকগুলি শব্দ খুবই চিত্তাকর্ষক। এদেশের বিভিন্ন মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত যে বিচিত্র ধরণের থাম দেখা যায় সূত্রধরেরা সেইগুলির নাম দিয়াছিলেন—**চৌকা, গোল, জোড়াগোল, কলাগেছে ও ইমারতি**। 'কলাগেছে' থাম ৪, ৮, ১২ বা ১৬টি সরু থামের সমষ্টি। এই ধরণের থামওয়ালা মন্দির এই দেশে বহু দেখা যায়। 'ইমারতি' থাম বহু প্রাচীন মন্দিরেও লক্ষ্য করা যায়। এই থাম বত্রিশ থাক বিভিন্ন প্রকারের ইষ্টকে বা প্রস্তরে গঠিত। খিলানগুলির নাম তাঁহারা দিয়াছিলেন—**গোল, চামচিকে, দরুন, হাইকোর্ট, হাঁসগলা** প্রভৃতি এবং মন্দিরের স্থাপত্যগত অলঙ্করণগুলির নাম, **তুরুজ, কমলাতুরুজ, কোণ, কল্‌কা, সোনাগেছ্যা** ও **খাঁজবন্দী**। মন্দিরশ্রেণীর মধ্যে চিত্তাকর্ষক একটি নাম **আলগোছটুঙ্গী** যাহার বিশুদ্ধ নাম 'একরত্ন' বা একচূড়া। 'আলগোছটুঙ্গী' নামটি দাসপুরে খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন মিস্ত্রীরা এই নামটির বহুবার উল্লেখ করিতেন। নামটির অর্থ হইল, যেন আলগোছে বা আলতো-ভাবে চারচালার কেন্দ্রে একটি টুঙ্গী বা রত্ন বসাইয়া দিলে যেমন দেখায়। দাসপুর গ্রামে পূর্বোক্ত **গোপীনাথের একরত্ন** বা **রাধাকান্তপুরের দাসেদের একরত্ন** কতকটা এইরূপ। **বাংলার মন্দির-গবেষণায় দাসপুর সূত্রধর-গোষ্ঠীর উদ্‌ভাবিত এই নামগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে।**

দাসপুর—সূত্রধরদের উদ্‌ভাবিত মন্দির-স্থাপত্যের কয়েকটি পরিভাষা

ঘাটাল থানা :

ঘাটাল থানার বিভিন্ন মৌজায় সরেজমিন অনুসন্ধানে বেশ কিছু মন্দির ও অন্যান্য পুরাকীর্তির বিষয় জানা গিয়াছে। নিম্নে কয়েকটি মৌজার উল্লেখযোগ্য মন্দিরাদির বিষয় উল্লিখিত হইল। মন্দিরনামের পার্শ্ববর্তী সংখ্যাটি তত বৎসর পূর্বে মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল বুঝাইবে :

বীরসিংহ (৪৮) : শীতলানন্দ শিবের দেউল (১৪০)—কলিকাতা শোভাবাজারের রামকানাই দাসের কৃতপুত্র নৃসিংহলাল দাস-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, বাঁকুড়া রায় ধর্ম ও কালীবুড়িকামিথ্যার 'আটচালা' ও একটি ক্ষুদ্র পঞ্চরত্ন রাসমঞ্চ আছে।

ইয়াকুবপুর (৮০) : শীতলার 'চাঁদনী'—অল্প 'টেরাকোটা' ও চুনবালির কাজ আছে।

উদয়গঞ্জ (৪৭) : একটি ধর্ম মন্দির ও নবরত্ন রাসমঞ্চ। ধর্ম-মন্দিরে ধর্মের বহু আসন, কূর্মাকৃতি ধর্ম প্রভৃতি আছে।

কাটান (১৪৯) : শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' ও তৎসংলগ্ন একটি 'আটচালা' জগমোহন (৯৩)—মন্দিরদুটি দুইটি গ্রামের সীমানায় অবস্থিত বলিয়া জানা যায়। তবে দ্বিতীয় 'আটচালা'টি মূল মন্দিরের 'জগমোহন', ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রামে গণ্ডীদের রঘুনাথজীউর নবরত্নটি ত্রিতল, বর্তমানে পরিত্যক্ত—রঘুনাথজীউর বর্তমান পঞ্চরত্ন (১৪০), চক্রবর্তীদের শীতলা ও শ্রীধরের আটচালা (১২৯) এবং প্রামাণিকদের শ্রীধরজীউর দ্বিতল 'চাঁদনী'—প্রচুর টেরাকোটা আছে ও শ্রীধর জীউর নবরত্ন রাসমঞ্চ।

কোওরপুর (৯৯) : শিবের দেউল (১৩৫) ও একটি রাসমঞ্চ।

কুশপাতা-গোবিন্দপুর (১৪৫) : পালিতদের লক্ষ্মীজনার্দনের নবরত্ন (আঃ১৮ শতকের শেষ দিক)—ভগ্ন ও পরিত্যক্ত—সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির মূর্তি ছিল এবং নবরত্ন রাসমঞ্চ, শীতলার 'চাঁদনী' (১৬৫), শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' (৭২), রায়েদের নাড়ুগোপালের 'চাঁদনী' (১৪৭)।

খড়ার (৪৪) মল্লিকপাড়ায় মণ্ডলদের শীতলার নবরত্ন—বহু 'টেরাকোটা' আছে, মাজীদের সীতারামজীউর 'তেররত্ন' **সেনহাটের কার্তিকচন্দ্র মিস্ত্রী ও মাহিন্দনাথ মিস্ত্রীর তৈয়ারি** (১১৩), **প্রতিষ্ঠাতা ব্রজলাল মাজি**—মন্দিরের সামনে পোড়ামাটির মূর্তি আছে, ঐ একই স্থানের মৃত্যুঞ্জয় ও শশিশেখরের আটচালা (৭২), 'ভূতের মাড়ো' এলাকায় কর্মকারদের ভগ্ন ও পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন এবং শিব ও শীতলার 'আটচালা' —শেষেরটিতে পোড়ামাটির অল্প কাজ।

খড়ারের কৃষ্ণপুর পল্লীতে হাজরাদের সিংহবাহিনীর

পঞ্চরত্ন (১৫০)—পোড়ামাটির **কয়েকটি** মূর্তি আছে, বৃন্দাবনজীউর দেউল, রায়েদের সিংহবাহিনীর নবরত্ন (১০০)—**সেনহাটের মাহিন্দি মিস্ত্রীর তৈয়ারি**, শিবের দেউল এবং ঘোষেদের বিষ্ণু ও শিবের দুটি 'আটচালা' (৮০) এবং মাঝখানে নবরত্ন রাসমঞ্চ, দুটি শিবের দেউল (১২৫)।

গোপমহল ওরফে মনোহরপুর (১৫৪) : শীতলানন্দ শিবের আটচালা (২০৩), কালীর ও ধর্মের দুটি 'চাঁদনী', ভগবতীর দ্বিতল 'চাঁদনী' (৭৪), তন্তুবায়দের বুড়োশিবের দেউল (৭৩), মেজগিন্নী শিবের 'আটচালা' ও নবরত্ন রাসমঞ্চ।

ঘোলশাহি (১০০) : শীতলার 'চাঁদনী'—ক্ষুদ্রাকৃতি, আধুনিক স্তম্ভযুক্ত ও 'স্টাকো'র অলংকরণ আছে।

চাউলি (৩৩) : জানাদের শ্রীধরজীউর পঞ্চরত্ন (১৭৯)—বহু সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির মূর্তি আছে এবং একটি ভগ্ন দুর্গামণ্ডপ। মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা **গঙ্গারাম জানা**। শিবের মাড়োয় শীতলানন্দের আটচালা (১৬৮)—বেশ সুন্দর সুন্দর অল্প কয়েকটি 'টেরা-কোটা', চাউলি গ্রামে ঘোষেদের দুর্গাদালান (৯৯)—পরিত্যক্ত ও ভগ্ন।

জলসরা (৭৩) : বুড়োশিবের **বারোচালা**—অতি অল্প অলংকরণ। মহকুমার এইটিই সম্ভবত একমাত্র 'বারোচালা' রীতির মন্দির। এই ধরণের মন্দির খুবই বিরল।

দলপতিপুর (৪৩) : এইখানে কয়েকটি মন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে ধর্মের একটি পঞ্চরত্ন। ইহার অল্প কয়েকটি টেরাকোটা-মূর্তি সুন্দর। মন্দিরটির গায়ে কোন পলেস্তারা নাই। এই গ্রামে একটি নবরত্ন ১৭৪ বছরের প্রাচীন। রত্নগুলি ক্ষীণ। এই মন্দিরটির সামনে একটি ছোট **আটচালা রীতির তুলসীমঞ্চ** আছে। গ্রামে আরও দুয়েকটি পঞ্চরত্ন আছে।

দুর্গাপুর (৬২) : রঘুনাথ জীউর পঞ্চরত্ন (১৫২)—প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন বাঙ্গাল—মন্দির গাত্রে বহু 'টেরাকোটা' আছে। মন্দিরটির সামনে একটি তুলসীমঞ্চ ও নবরত্ন রাসমঞ্চ। এই গ্রামে দণ্ডেশ্বর শিবের একটি 'চাঁদনী' আছে। এই শিবের গাজন ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

নবগ্রাম : রায়েদের (সদ্‌গোপ জাতীয়) সিংহবাহিনীর পঞ্চরত্ন (২৬৮) পোড়ামাটির ও কয়েকটি স্লেট পাথরের অপূর্ব কাজ। কাজগুলি খুবই উৎকৃষ্টমানের। পাশে শিবের একটি পঞ্চরত্ন 'রেখ'। সংলগ্ন দোচালা জগমোহনটি ভগ্ন।

নিমতলা : উল্লেখযোগ্য মন্দির হেমন্তনাথের আটচালা (আঃ ১৯ শতকের গোড়া)—সুন্দর 'টেরাকোটা' আছে। এখানে আর কয়েকটি মন্দির আছে। রাজবল্লভীর 'চাঁদনী' (১৩৬), ঠাকুরবাড়ির নবরত্ন রাসমঞ্চ (১৫৪) ইত্যাদি।

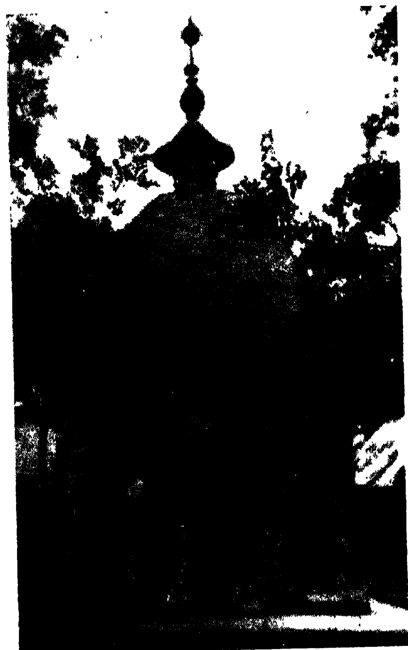
পান্না (১২০) : পান্নার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি-সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। এখানকার শীতলানন্দ শিবের 'চাঁদনী' মন্দিরটি ১৯৩ বছরের প্রাচীন। মন্দিরটি ১৩৫৬ সালে পান্নানিবাসী চন্দ্রকুমার ভৌমিক সংস্কার করেন। এই মন্দিরে পোড়া-মাটির কয়েকটি মূর্তি আছে। **পান্নাগ্রামে গঞ্জলস্কর পীরের একটি আস্তানা আছে।** আস্তানাটির ভিত্তিবেদির কিছু কিছু ইট পুরানো হইলেও উপরের অংশ অর্বাচীন ইষ্টকে নির্মিত।

প্রতাপপুর (১৫২) : স্থানীয়ভাবে ইহা 'পাঁচমাড়ো-প্রতাপপুর' নামে পরিচিত। শিলাই-তীরবর্তী এই স্থানে উল্লেখযোগ্য মন্দির চক্রবর্তীদের দামোদরের ভগ্ন 'আটচালা' (২২৫)। মন্দিরটির উত্তরপাশে বৃন্দাবনচন্দ্রের বিধ্বস্ত পঞ্চরত্নের একটি দেওয়াল এখনও খাড়া আছে। শিলাই-তীরবর্তী শীতলানন্দ শিবের একটি 'আটচালাও' আছে।

রাধানগর (৭৮) : গোপীনাথের পঞ্চরত্ন (২৫৯)—বর্তমানে পরিত্যক্ত। মাকড়া পাথরের মন্দির। মন্দিরটির অভ্যন্তরীণ স্থাপত্য-কৌশল অদ্ভুত রকমের। সামনের দেওয়ালে মাকড়া পাথরে খোদিত অল্প কয়েকটি ভাস্কর্য আছে। এই মন্দিরটি সেকালে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির সময় জনৈক তন্তুবায় তৈয়ারি করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। মন্দিরটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। প্রশস্ত ও সুদৃশ্য এই মন্দিরটি ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পাকা রাস্তার পাশেই অবস্থিত। **রাধানগরের একস্থানে লম্বা আকারের দুটি প্রস্তর-ফলকে আর্মেণীয় লিপি খোদিত আছে।** একটির ইংরাজি অনুবাদ এই—This is the Tomb of Alaveli, son of Amir Khaian, died in 1716.

রাণীরবাজার (৭১) : শীতলার পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন ও দামোদরের ছোট্ট দেউল—পরিত্যক্ত ও ভগ্ন; দামোদরের পঞ্চরত্ন (১৯৬)—পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ—সুন্দর টেরাকোটা ছিল, বর্তমানে বেশ কিছু 'টেরা-কোটা' অপহৃত; ছোট অস্থলের শ্যামরায়জীউর পরিত্যক্ত ও ভগ্ন একরত্ন (আঃ ২৫০ বছর) এই মন্দিরটির সামনের দিক একেবারে পড়িয়া গিয়াছে—সুন্দর সুন্দর 'টেরাকোটা' ছিল।

রত্নেশ্বরবাটী (১৫৩) : হটনাগর শিবের বৃহৎ দেউল (১৪৮)—'টেরা-কোটা' ও 'স্টাকো' অল্প আছে। একটি 'মিথুন'-দৃশ্য। এই মন্দিরটির সামনে জনৈক পীরের গম্বুজাকৃতি একটি দেউল আছে। ইহা ছাড়া ধর্মের ও শীতলার দুইটি 'চাঁদনী' আছে। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে কাশীশ্বর ও কুশেশ্বর শিবের দুটি ক্ষুদ্র 'আটচালা' আছে।



রসিকনাগরের 'চারচালা'
জয়ন্তীপুর (চন্দ্রকোণা)



রসিকরায়জীউর নহবৎখানা,
জিরাট-মুণ্ডমালা (চন্দ্রকোণা)



সিংহবাহিনী-মন্দিরের প্রবেশদ্বার (সিংহদ্বার),
কোন্নগর, ঘাটাল



কাটানের (ঘাটাল) প্রামাণিকদের দ্বিতল
'চাঁদনী' মন্দির



গোপীনাথজীউর পরিত্যক্ত 'পঞ্চরত্ন',
রাধানগর (ঘাটাল)



গোপীনাথের 'একরত্ন', রাধাকান্তপুর (দাসপুর)



গোপীনাথের 'একরত্ন', দাসপুর



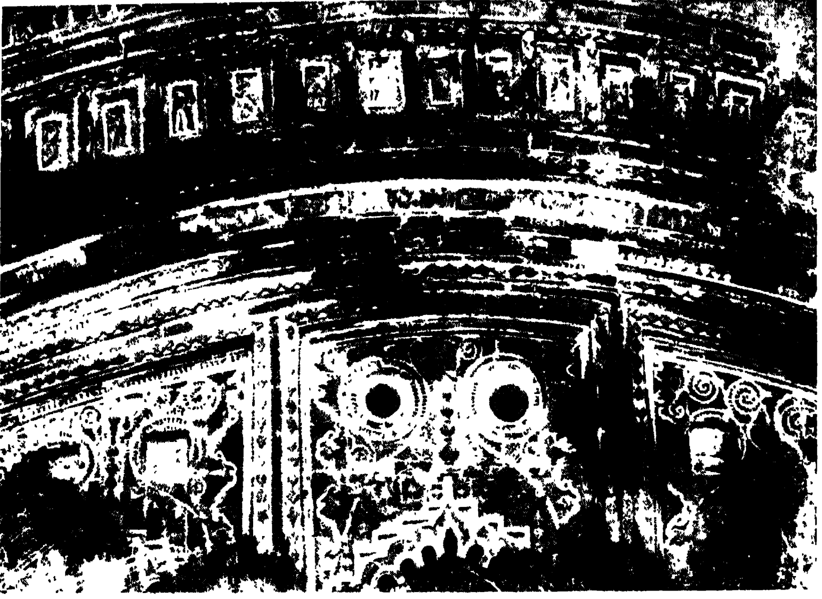
মন্দিরগাত্রে প্রাচীন উদ্ধারকার্য



মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির মূর্তিফলক,
ব্রজরাজকিশোরজীউর একরত্ন,
পুরুষোত্তমপুর (দাসপুর)



লঙ্কাগড়ের 'জলহরি'



রঘুনাথজীউর মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ, বৈকুণ্ঠপুর নিম্বার্ক মঠ, দাসপুর



রাধাকান্তপুর দাসেদের মন্দিরে পোড়ামাটির মূর্তি

লছিপুর (৯৬) : শ্রীধরজীউর নবরত্ন (১২১) কয়েকটি বড় 'টেরাকোটা' আছে। শিবের দুটি দেউল (১৪৭), সতের চূড়ার রাসমঞ্চ (১৭৮)—**রাজহাটির রমানাথ মিস্ত্রীর তৈয়ারি**—পোড়ামাটির মূর্তি আছে। একটি ভগ্ন দুর্গাদালানও আছে।

শ্যামপুর (৮১) : কিশোরীমোহন ও গোপীমোহনজীউর একরত্ন (বেশ প্রাচীন)—বর্তমানে ভগ্ন ও পরিত্যক্ত। বৃন্দাবন গোস্বামী প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া জানা যায়। মন্দিরটির সামনের দিক একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। অতি উৎকৃষ্ট মানের সুন্দর সুন্দর 'টেরাকোটা' ছিল। ইট বেশ পাতলা। **কেহ কেহ বলেন শোভাসিংহের আমলে নির্মিত।**

হরিনাগেড়িয়া বা হরিনগর (৮৮) : সিংহদের শিবের দেউল, হাজারীদের রঘুনাথজীউর নবরত্ন—'টেরাকোটা' ও 'স্টাকো' দুইই আছে। সিংহদের শিবের দেউলটির শিখর উল্টানো ফুলকাটা কাপের মতো (Flower-chalice dome)। এই ধরনের একটি মন্দির দাসপুর থানার লঙ্কাগড়ে রাজা মোহনলাল খাঁনের সমাধি মন্দির। নাড়াজোল রাজাদের সমাধিমন্দিরগুলিও এই ধরনের।

পরিশেষে, ঘাটাল পুরসভার এলাকাধীন ও তৎসন্নিকটবর্তী স্থানের **পুরাকীর্তি-পরিচিতি** নিম্নে দেওয়া হইল :

ঘাটাল পুরসভা-এলাকার কয়েকটি স্থানের মন্দির ইত্যাদি :

(১) **চাউলি** (৩৩) : এই স্থানের বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে।

(২) **কোন্নগর** (১৪৭) : মহকুমা তথা সমগ্র জেলায় এইখানের **সিংহবাহিনীর চারচালা মন্দিরটি** সম্ভবত প্রাচীনতম মন্দির। ৪৮৭ বৎসর পূর্বে হরিহর কর্মকার-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার ৩০৬ বৎসর পরে জিতারাম কর্মকার মন্দিরটির সংস্কার করেন। সংস্কারকালেই পোড়ামাটির দুটি ফলকে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ও সংস্কারকাল পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ

করা হয়। দেওয়ালের গায়ে ইটের উপর ফুল-লতা-পাতার প্রাচীন নক্‌সা অঙ্কিত। পোড়ামাটির কয়েকটি ফুল, ক্ষুদ্র টালিতে অঙ্কিত কৃষ্ণের দুটি মূর্তি, পোড়ামাটির দ্বারী মন্দিরটির উল্লেখযোগ্য অলংকরণ। সিংহবাহিনীর মূল 'চারচালা' রীতির মন্দিরটির সংলগ্ন আর একটি 'চারচালা' রীতির পরিদর্শনকক্ষ বা 'জগমোহন' আছে। প্রবেশপথ দুটি খুবই সংকীর্ণ। মন্দিরটি কোন্নগর-পল্লীর 'কামারপাড়া'য় অবস্থিত। এই মন্দিরের কিছু পূর্ব-দক্ষিণে রাম-কিশোর চক্রবর্তীর শিবের 'আটচালা' মন্দির ১৫৮ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। ইহার পাশে একটি প্রাচীন ভগ্ন দুর্গাদালান আছে।

কোন্নগর 'গোসাঁইপাড়া'র **বৃন্দাবনচন্দ্রের নবরত্ন** ১৮৬ বৎসরের প্রাচীন। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে প্রচুর 'টেরাকোটা' আছে। মন্দিরটি **চৈতন্যচরণ দাস মিস্ত্রী** তৈয়ারি করেন এবং পোড়ামাটির শিল্পকর্ম সন্নিবেশ করেন **শ্যামাচরণ দাস মিস্ত্রী**। কোন্নগর 'জেলেপাড়া'য় ধর্মের একটি 'চাঁদনী'ও আছে। ইহা ছাড়া ঘাটাল বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের সম্মুখবর্তী **বর্গীর আমলের তৈয়ারি বলিয়া পরিচিত একটি 'চাঁদনী'-রীতির কালীমন্দির** আছে। আরও দুয়েকটি 'চাঁদনী'মন্দির এইপল্লীতে বর্তমান। চৌধুরীপুকুর পাড়ের শিবের দেউলটি ১৫০ বছরের প্রাচীন বলিয়া একটি লিপিতে উল্লিখিত আছে। শিলাই-তীরবর্তী হড়েদের শিবের দেউল ১৪৩ বছরের প্রাচীন। উকিল শ্রীমন্মথনাথ পাঠকের গৃহাঙ্গনে কর্মকারদের পরিত্যক্ত একটি 'আটচালা'ও ১৬৬ বছরের প্রাচীন ছিল।

(৩) **গম্ভীরনগর** (৩২): এই পল্লী শিলাইএর পশ্চিম তীরবর্তী। এখানের সুবর্ণবণিক দে-পরিবারের জনৈকা উজ্জ্বলাবালা দাসী-প্রতিষ্ঠিত **পঞ্চরত্ন তুলসীমঞ্চটি** উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির মূর্তিতে সমৃদ্ধ। এই তুলসীমঞ্চটি ১৬৫ বছরের পুরানো। পূর্ব ও উত্তর দিকের দেওয়ালে পোড়ামাটির নানা মূর্তির মধ্যে সেকালের সামাজিক দৃশ্য সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। এই পল্লীর 'কয়ালপাড়া'য় যজ্ঞেশ্বর শিবের 'আটচালা' ও 'আটচালা' রীতির একটি চতুর্দ্বারী রাসমঞ্চ এবং মণ্ডলদের লক্ষ্মীজনার্দনের দ্বিতল 'চাঁদনী' আছে।

সাতপাড়া-গম্ভীরনগরে ভূতনাথের একটি দেউল এবং **বাড়-গম্ভীরনগরে** পণ্ডিতদের ধর্মের একটি 'চাঁদনী' ও একটি ভগ্ন রাসমঞ্চ বিদ্যমান। ধর্মমন্দিরে ধর্মের একটি আসন ও কূর্মমূর্তি আছে। গম্ভীরনগর পল্লীর রথতলায় ধর্মঠাকুরের একটি ছোট্ট 'চাঁদনী' মন্দিরও আছে।

(৪) **নিশিন্দীপুর :** ময়রাদের বৃহৎ দুর্গাদালান ও সিদ্ধেশ্বরী কালীর দালান এই পল্লীর প্রসিদ্ধ মন্দির। এই দুটি মন্দিরই শিলাইয়ের উত্তর-পূর্ব তীরবর্তী। সিদ্ধেশ্বরী কালীর মন্দির ঠিক ৭১ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত।

(৩১)

(৫) **আলমগঞ্জ :** এই পল্লীর **তিনগম্বুজওয়ালা সুদৃশ্য মসজিদটি** কলিকাতা টালিগঞ্জের জুম্নী বিবির ব্যয়ে নির্মিত। ইহা মহকুমার মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট মসজিদ। ইহাতে তিনটি গম্বুজ, চারি কোণে চারটি বড় ও মধ্যে চারিটি ছোট মিনার আছে। মধ্যের গুলিতে দুইটি ও কোণের গুলিতে একটি করিয়া কলশ বর্তমান। প্রতি গম্বুজের চূড়ায় তিনটি করিয়া কলস ও চূড়াগুলির শীর্ষে সূক্ষ্মাগ্র ধাতুফলক নিবদ্ধ। নীচের ছাদ 'খিলানে' গঠিত। পূর্বে তিন ও দক্ষিণে একদ্বার। আরবী হরফে ক্ষোদিত লিপিটি নিম্নরূপ :

মসজিদ

"বিসমিল্লা হিরুরহমা
জুম্মানী লে কী হককানী
কাহা বাফা হেস্বা মসজিদ
হিন্দে কী মসজিদ
মে দেখিয়ে সানে বায়তুল্লাকে
হিজিরি ১২৭৮"

আলমগঞ্জে 'বাজারবুড়ি' শীতলামায়ের একটি বৃহৎ 'দালান' মন্দির আছে। এই পল্লীতে বাজারের সন্নিকটে একটি ইষ্টকনির্মিত প্রাচীন চিম্‌নি বর্তমান। পূর্বে এই স্থানে একটি রেশম কুঠি ছিল। কুঠির চিম্‌নিটি আজও বর্তমান। শিলাইয়ের পূর্বতীরবর্তী কুঠিয়াল সাহেবের পূর্বতন বাসগৃহ বর্তমানে মহকুমা শাসকের বাসস্থান ও কার্যালয়। শহরের দুইদিকে শিলাইয়ের উভয়কূলে অনেকগুলি প্রাচীন ঘাট দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে ঘাটাল দেওয়ানী কোর্টের সন্নিকটে কাছারীঘাটের **চাঁদনীর ওপর একটি ইংরাজি লিপি এখানে উদ্ধৃত হইল :**

"Kachary Ghat Ghantal
Patrons
Babus
H. M. Sen & R. Chatterjya
Designer
Babu S. D. Bhattacharja
1880"

এই লিপিটি হইতে বোঝা যায় আজ হইতে ঠিক ৯৭ বছর আগে বর্তমান 'ঘাটালে'র নাম 'ঘাঁটাল' বা 'ঘাণ্টাল' ছিল। হয়তো 'ঘাটাল' অপেক্ষা 'ঘাঁটাল' নামটিই বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানে মূল 'ঘাঁটাল' নামের 'ঘাটালে' পরিণতি ঘটিয়াছে।

ইহা ছাড়া ঘাটাল বিদ্যাসাগর স্কুলের পুরাতন বিল্ডিংয়ের দেওয়ালের এক স্থানের একটি ইংরাজি লিপিফলক হইতে জানা যায়, সেই সময় 'ঘাঁটাল' এই নামটি চলিত ছিল। লিপিটি যথাযথ উদ্ধার করা হইল :

COURNISH HOSTEL
For
GHANTAL H. C. E. SCHOOL STUDENTS
Established By
MOULVI BUZUL KARIM
1885

চন্দ্রকোণা থানা :

কঙ্কাবতী (১৮৯) : রাজা কনক সিংহের ইষ্ট দেবী কনকেশ্বরীর নামে কঙ্কাবতী নাম হইয়াছে। এইস্থানে কয়েকটি 'আটচালা' রীতির মন্দির আছে। পূর্বে রাজার গড়ের কিছু কিছু চিহ্ন ছিল।

ক্ষীরপাই (২১৪) : সেকালে রেশম ও তাঁত-শিল্পের কল্যাণে ক্ষীরপাই একটি জমজমাট শহর ছিল। সেইসময় এখানকার বেশির ভাগ মন্দিরগুলিই তন্তুবায়-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ক্ষীরপাই-গঙ্গাদাসপুর-পথের মোড়ে **খড়কেশ্বর শিবের একটি 'আটচালা'** ১১৬ বছরের পুরানো। **প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাধর দত্ত।** মন্দিরমধ্যে কাঠের কৃষ্ণ ও পাথরের দেবীমূর্তিও আছে। দয়ালবাজার

(ফরাসডাঙ্গা) এলাকার পাকারাস্তার ধারে **কৃষ্ণদামোদর ও শীতলামাতার পঞ্চরত্ন** (১৬০) —মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির সুন্দর কারুকার্য। ক্ষীরপাইয়ের অন্যান্য মন্দিরগুলি : রঘুনাথজীউর 'চাঁদনী' (১০৪)—**শিববাজার,** শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' (১৩৮)—**হাটতলা,** এইখানে হালদারদের আর একটি প্রাচীন পঞ্চরত্ন মন্দির ছিল (আঃ ১৮শতকের), মন্দিরতলায় শিবের তিনটি 'আটচালা', পাহাড়ীপাড়ায় শিবের দুটি 'আটচালা' ও একটি প্রাচীন 'চাঁদনী', **হালদারদের রাধা-দামোদরজীউর দ্বিতল চাঁদনী,** উত্তম আশ্রমের একরত্ন (পরবর্তীকালে সংস্কারিত পঞ্চরত্ন)।

গঙ্গাদাসপুর (২২১) : **উমাপতি শিবের 'আটচালা'**—অল্প 'টেরাকোটা' আছে (আঃ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত)। এই গ্রামে অনেকগুলি প্রাচীন পুকুর বিদ্যমান। **শরাক-দালালদের রাধাকৃষ্ণের 'দালান'** মন্দির ও **একটি 'নবরত্ন' রাসমঞ্চ।**

জয়ন্তীপুর (১০৯) : শ্যামচাঁদের পঞ্চরত্ন (১৩২)— প্রতিষ্ঠাতা রাধামোহন চৌধুরী—মন্দিরগাত্রে অনেকগুলি 'টেরাকোটা' আছে। গঙ্গাধর শিবের একটি বৃহৎ 'আটচালা'। রামগঞ্জে বুড়োশিবের 'আটচালা'; গোঁসাইপাড়ায় রসিকনাগরজীউর 'চারচালা'।

জিরাট মুণ্ডমালা (১০৫) : এই মৌজার 'লালবাজার' নামক স্থানে রসিক রায়, রঘুনাথ ও গোপালজীউর একটি সুদৃশ্য নবরত্ন মন্দির আছে। তবে মন্দিরটির দ্বিতলের প্রতিটি দেওয়ালে 'রিলিফ্' পদ্ধতিতে চারটি করিয়া 'রত্ন' অঙ্কিত। অতএব সমগ্র মন্দিরটিকে পঁচিশচূড়া মনে হয়। কিছু 'টেরাকোটা' আছে। আঃ ১৮ শতকের শেষ অথবা ১৯ শতকের গোড়ার দিকে তৈয়ারি। মন্দিরটি জীর্ণ ও সম্মুখভাগ ভূপতিত।

জাড়া (১৫২) : জাড়ার রায়বংশের কয়েকটি 'চাঁদনী' ও একটি 'আটচালা' মন্দির আছে—'টেরাকোটা' নাই। রামেশ্বরের 'চাঁদনী' (১৮০)—প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর

রায়। কামেশ্বর, ভুবনেশ্বর ও শীতলার 'চাঁদনী'। গঙ্গাধর শিবের 'আটচালা' (১৬৩), পার্বতীনাথ ও কাশীনাথের 'চাঁদনী' (১১১), উমাপতি শিবের 'চাঁদনী'(১১১), বাঁকারায় শিবের'আটচালা'(১৫৩), অন্যান্য আরও কয়েকটি মন্দির আছে। তবে বেশির ভাগই 'চাঁদনী'। মন্দিরসমূহের কয়েকটিতে সংস্কৃতভাষায় রচিত লিপি আছে।

তাতারপুর (১৬১) : এইখানে বিশালাক্ষীর 'চাঁদনী' মন্দির আছে (৭৫)। দেবীর চাঁচরে স্থানীয় 'বান্দার'গণের প্রস্তুত কয়েক সহস্র টাকার আতসবাজির প্রতিযোগিতা হয়। মুখুজ্যেদের একটি দেউলও (৮৩) এখানে আছে।

দেপুর (২৬) : রামজীবনপুর-পুরসভার অন্তর্ভুক্ত এইখানে একটি ঘাট ৯৭ বছর আগে তৈয়ারি। সংস্কৃতে রচিত একটি লিপিও এই ঘাটে আছে। প্রতিষ্ঠাতা প্রসন্ন কুমার রায়। একটি নবরত্ন রাসমঞ্চ ('বেহারীরত্নে'-চূড়াযুক্ত)।

নীলপাট (১৮৮) : এইখানে শালবান শিবের একটি 'আটচালা'-রীতির মন্দির আছে।

বাঁকা সুলতানপুর (১৫০) : শীতলানন্দ শিবের একটি 'আটচালা'—কতকটা 'বিষ্ণুপুরী' রীতিতে তৈয়ারি।

রামজীবনপুর (১৬) : এইখানে মন্দির বহু আছে। 'নূতন হাটে'র বুড়ো শিবের 'আটচালা', পুরাতন হাটে পার্বতীনাথের 'আটচালা' (১৭৫)। এই দুই শিবের খুব জোর গাজন উৎসব হয়। বুড়োরায় ধর্মের দুটি দেউল, বাঁকা রায়ের 'আটচালা' (১৫৭), স্কুলের সন্নিহিত একটি পরিত্যক্ত ঠাকুরবাড়ি পঞ্চরত্ন (১৪০)—বেশ কিছু 'টেরাকোটা' আছে। গাঙ্গুলীপাড়ার গাঙ্গুলীদের পরিত্যক্ত দুর্গামণ্ডপ ও একটি পঞ্চরত্ন (১৮১) আঢ্যদের একটি সুন্দর নবরত্ন(১৫২), সুন্দর সুন্দর 'টেরাকোটা' আছে। এখানে 'আটচালা',

পঞ্চরত্ন, 'চাঁদনী' এবং নবরত্নরীতির কয়েকটি মন্দির আছে—মন্দিরগাত্রে 'টেরাকোটা' আছে পিরিপাড়ার সন্নিকটে তাম্বুলিবণিক গোসাঁই দাসদত্তের একটি পঞ্চরত্ন।

হেমতপুর (২০৯) : একটি বড় 'চাঁদনী' মন্দির।

বেলাদণ্ড (২০৬) : ঘোষেদের দুইটি বিষ্ণুমন্দির—একটি **শ্রীধর** ও অন্যটি **দামোদর**। নূতন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। **বুড়োশিবের** মন্দিরটি **পুরাতন**।

চন্দ্রকোণা ও চন্দ্রকোণা-পুরসভা এলাকার মন্দিরাদি

(১) **অযোধ্যা** (৮৮) : লালজীউর পাথরের বিশাল 'আটচালা'—কয়েকটি ভাস্কর্য আছে ; লালজীউর 'চারচালা' ভোগশালা, রঘুনাথজীউর দেউল ও জগমোহন, 'চারচালা' তোষাখানা, 'চারচালা' পুষ্যাভিষেক মঞ্চ, পঞ্চাননের পঞ্চরত্ন (২১২)—অল্প 'টেরাকোটা', পঞ্চরত্ন রাসমঞ্চ—উক্ত মন্দিরগুলি 'রঘুনাথ-বাড়ি'তে অবস্থিত। বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র ১৪৬ বছর আগে মন্দিরগুলি সংস্কার করেন। রঘুনাথবাড়ির প্রাঙ্গণে একটি কামানে ফারসী অক্ষরে রাজা মিত্রসেনের নাম ক্ষোদিত আছে মনে হয়। 'রঘুনাথবাড়ি'র কাছাকাছি রঘুনাথপুরে বর্ধনদের একটি বিধ্বস্ত পঞ্চরত্ন (?) আছে।

(২) **গোঁসাইবাজার** : শান্তিনাথ শিবের 'আটচালা', প্রেমসখী গোস্বামীর ভগ্ন সমাধি, স্বর্ণ-বণিক 'দে'-দের প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্দর 'চাঁদনী'—পোড়ামাটির সুন্দর কাজ। প্রেমসখী গোস্বামীর সমাধির কাছাকাছি মুগ্নীপাথরে খোদিত একটি প্রাচীন মন্দিরের শিলালেখ গত ১৩৮১ সালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুগ্নীপাথরের এই লেখটির পশ্চাতে একটি ভগ্ন বিষ্ণু মূর্তির মস্তক লক্ষ্য করা যায়। দেবনাগরী অক্ষরে রচিত শিলালেখের পাঠ বাংলায় উদ্ধার করা হইল :

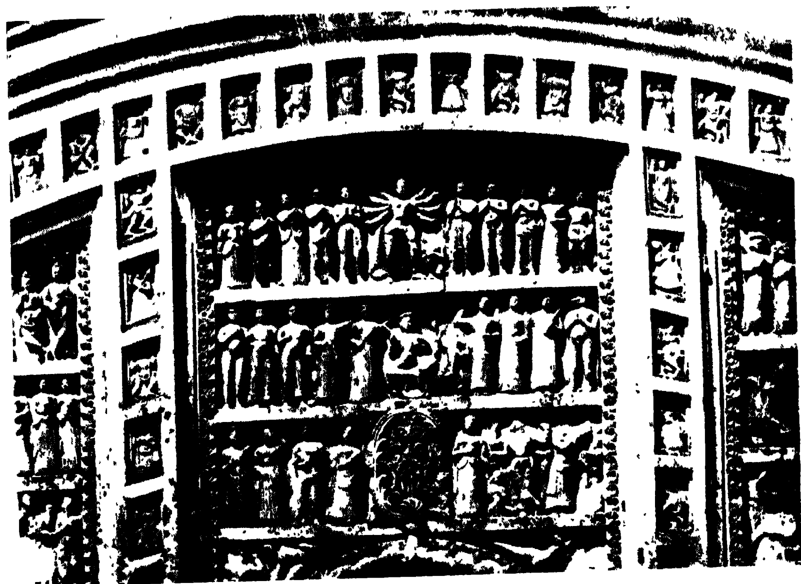
"শাকে খ বাণবাণ শশধ
র সহিতে মাসি বাসাঢ়সংঘে
শ্রীমত্শ্যামপদারবিন্দযু
গলস্যাশাং গৃহীত্বা মুদা
তৎপ্রীত্যৈব দলদ্বিবেদতন
য়েনাকারিতন্মংদিরং শ্রীম
ত্ শ্রীমধুসূদনেন কৃতিনা
দামোদরো যত্নতঃ ॥ ১৫৫০
সং ১৬৮৫"।

(৩) **গোবিন্দপুর** : ময়রাদের প্রতিষ্ঠিত দধিবামনের 'চাঁদনী'—বেশ কিছু 'টেরাকোটা' আছে। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত আর একটি 'পঞ্চরত্ন' আছে। তাম্বুলিদের খলসা শিবের 'আটচালা' (১০২) ও একটি বিশেষ ধরনের নহবৎখানা।

(৪) **গাছশীতলাতলা** : শিবের 'আটচালা'—দেওয়ালে অনেকগুলি 'টেরাকোটা' আছে। মন্দিরটি পুরানো, তবে পরবর্তীকালে সংস্কার করা হইয়াছে।

(৫) **ইলামবাজার** : শান্তিনাথ শিবের পঞ্চরত্ন এবং করেদের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার 'চাঁদনী', চাবড়ীদের রাধা-গোবিন্দের পঞ্চরত্ন (১০৭)।

(৬) **মল্লেশ্বরপুর** মল্লেশ্বর-ঠাকুরবাড়িতে মল্লেশ্বর শিবের 'পঞ্চরত্ন'টি মাকড়া পাথরে নির্মিত (আঃ ১৮ শতকে তৈয়ারি) —দেওয়ালের গায়ে কিছু কিছু 'স্টাকো'র কাজ আছে। বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র ১৪৬ বৎসর আগে এই ঠাকুরবাড়ি ও মন্দির সংস্কার করেন। ঠাকুরবাড়ীতে 'সিদ্ধিপুষ্করিণী'নামে ঠাকুরের ঘাট, 'জপস্থান' নামে ক্ষুদ্র 'আটচালা', 'চারচালা' বৃষভ-মন্দির ও 'আটচালা' মনসা মন্দির আছে। **দক্ষিণ বাজারে চন্দ্রকোণার বিখ্যাত জোড় বাংলাটি অবস্থিত।** মন্দিরটির অবস্থা খুবই শোচনীয় ও ভগ্ন। মাকড়া পাথরের এই



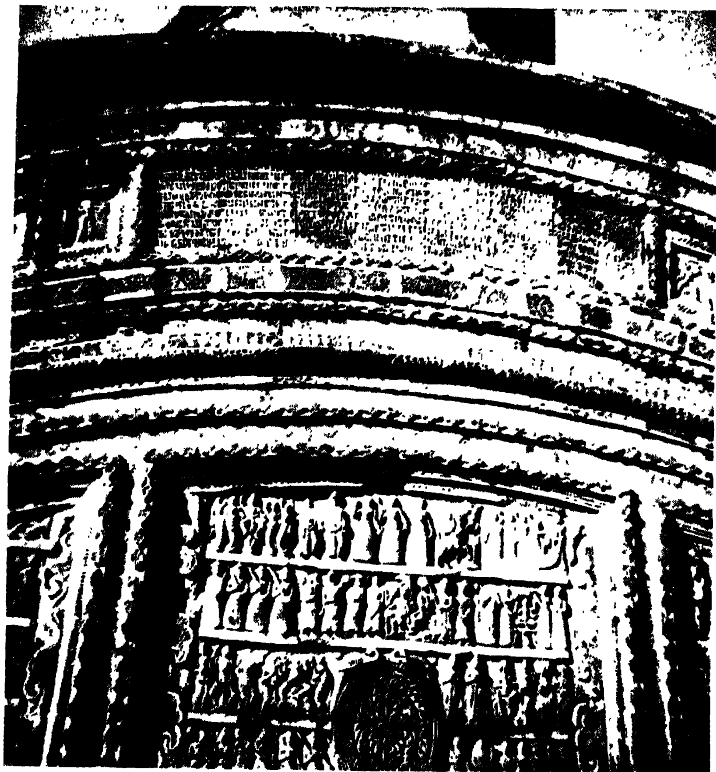
সুরৎপুরের (দাসপুর) শীতলামন্দিরে মূর্তি-অলংকরণ



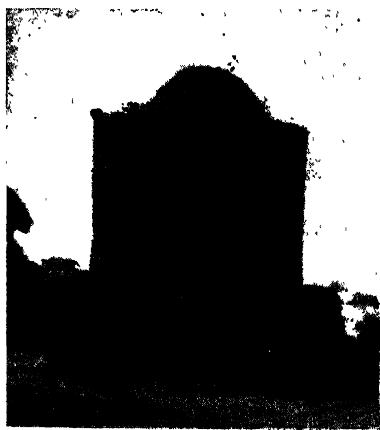
পোড়ামাটির অলংকরণে চড়কদৃশ্য



বৃক্ষসমাকীর্ণ একটি ভগ্ন দেবালয়



দাস-পরিবারের মন্দিরগাত্রে (গোপীনাথের 'একরত্ন') পোড়ামাটির দীর্ঘলিপি ও মূর্তি, রাধাকান্তপুর



চেতুয়া-বাসুদেবপুরের পটীদারপাড়ার মসজিদ



আলামগঞ্জের মসজিদ, ঘাটাল

মন্দিরটির গায়ে 'স্টাকো'র কাজ আছে। বর্তমানে এইটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের পর্যবেক্ষণাধীন। উত্তর দিক ভূপতিত। ইহা ছাড়া'বুড়োশিবে'র নবরত্ন ও লক্ষ্মী-জনার্দনের 'আটচালা' (১০৬) আছে।

(৭) **মিত্রসেনপুর :** শান্তিনাথ শিবের নবরত্ন (১৪৯)—বহু 'টেরাকোটা' আছে। এই শিবের খুব গাজন হয়। ইহা 'বারপটীর গাজন' নামে প্রসিদ্ধ। নিমাইচরণ দাসদত্ত-প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভের পরিত্যক্ত 'চাঁদনী' (১৯৭)– কিছু কিছু ভাস্কর্য আছে। শান্তিনাথ শিবের মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের পর্যবেক্ষণাধীন। একটি পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন (৮৭) ও ধর্মের ছোট্ট আটচালা।

(৮) **শ্যামসুন্দরপুর :** ভূরিশ্রেষ্ঠদের 'চাঁদনী'—মাকৃড়া পাথরে তৈয়ারি, রাধাকৃষ্ণের পঞ্চরত্ন—ইঁটের তৈরি এবং রাধাবল্লভজীর 'চারচালা'—মাকৃড়া পাথরে তৈয়ারি।

(৯) **পুরুষোত্তমপুর :** শান্তিনাথ শিবের 'ত্রয়োদশরত্ন'—৮টি রত্ন 'রিলিফ' পদ্ধতিতে যুক্ত—'স্টাকো'র কাজ।

(১০) **রঘুনাথপুর :** পার্বতীনাথ শিবের 'সপ্তদশরত্ন'—'টেরাকোটা' ও 'স্টাকো'র কাজ (নিমতলার গোস্বামীদের) রাধাবল্লভের 'চারচালা'।

চন্দ্রকোণা থানায় আরও বহু মৌজা ও গ্রামে অনেক মন্দির আছে। এখানে মাত্র উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। **নিম্নে মহকুমার দুটি মন্দিরের লিপি উদ্ধার করা হইল।** ইহা হইতে প্রাচীন ইতিহাসের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং পরিশেষে দুয়েকটি মঠ বা অস্থলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া যাইতেছে :

চন্দ্রকোণা শহরের পশ্চিমে লালগড়ের বিলুপ্ত নবরত্ন মন্দিরের শিলালিপি :

০'৬১ মিঃ × ০'৪৮ মিঃ পাথরের এই লিপিটি পূর্বকথিত রঘুনাথবাড়ির লালজীউমন্দিরে রক্ষিত আছে।

"শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৭৭। শাকেহশ্বমুনিবাণেন্দৌ
বৈশাখে শুক্লপক্ষকে। তৃতীয়ায়াং ভৃগুদিনে
আরম্ভোস্য বভূহ হ॥ হরিনারায়ণভূপস্য পত্নী
শ্রীলক্ষ্মণাবতী। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীত্যৈ নবরত্নমি
দং দদৌ। রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দরসিকা শ্রীবীরভানে র্বধূখ্যা
ত শ্রীহরিভূপতেশ্চ বনিতা শ্রীহোলরায়াত্মজা। মাতা
শ্রীযুতমিত্রসেননৃপতে র্বিখ্যাতকীর্তেঃ ক্ষিতৌ
শ্রীনারায়ণমল্লভূপভগিনী রম্যং দদৌ
মংদিরং॥ গিরিধারিপদাম্ভোজে নবরত্নমি
দং শুভং। নির্মায় বহুযত্নেন সমর্পিতবতী মুদা॥
পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী শ্রীগোকুল দাস"

শিলাফলকে যেমন যেমন সারি আছে তেমনি উদ্ধার করা হইল। ইহা হইতে জানা যায়—চন্দ্রকোণার ভানবংশীয় বীরভানির পুত্রবধূ, হরিনারায়ণের পত্নী, হোলরায়ের কন্যা, নারায়ণমল্লরাজের ভগিনী এবং রাজা মিত্রসেনের মাতা লক্ষ্মণাবতী ১৫৭৭ শকাব্দ (বা ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) গিরিধারীলালের একটি সুদৃশ্য নবরত্ন মন্দির বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় দান করিয়াছিলেন। এই শিলালিপির রচয়িতা ছিলেন পৌরাণিক মোহন চক্রবর্তী এবং স্থপতি বা লিপি-খোদাইকার ছিলেন গোকুল দাস। মন্দিরটি লালগড়ে অবস্থিত ছিল মনে হয়।

দাসপুর থানার রাধাকান্তপুর মৌজায় (৬৭) দাসেদের গোপীনাথের মন্দিরটির বাং ১২৫১ সালে সংস্কারের সময় পোড়ামাটির অক্ষরে বাংলাপদ্যে (রচিত) একটি দীর্ঘ লিপি মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। লিপিটি নিম্নে উদ্ধার করা হইল:

রাধাকান্তপুরে বাস নাম জনানন্দ দাস
স্বর্গে বাস এই সে কারণে:
মহা মহা পুণ্যবলে সপ্ত পুত্র ক্ষিতিতলে
জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামদাস নামে:
যিনি দাতা পুণ্যোদয় প্রকাশিত মহাশয়
মধ্যম তৃতীয় সহোদরে:
বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া গোপীনাথে আনাইয়া
স্থাপন করিলা এই ঘরে:
নবাব পৃথিবী পতি তায় ভয়ে ব্যস্ত অতি
সীমানা ঘেরিয়া খুলিলা গড়:

দামামা দরজা পরে জয়চণ্ডীর কৃপাবরে
পুষ্করিণী খুলিলা তারপর ঃ
সন্ধান পাইল যদি সভাসিংহ নরপতি
এই হেতু কড়া না আইসে ঃ
কম্পবান ক্রোধভরে আজ্ঞা দিল অনুচরে
হান শির পদাতিক রোষে ঃ
বিপক্ষ হইল কাল কাল হইল পরকাল
কিছু না জানিল মহাশয় ঃ
তাহাতে ছেদিল মুণ্ড দুর্গা দুর্গা ডাকে তুণ্ড
শুনি রাজা মানিল বিস্ময় ঃ
কবিতা করিতে তার এইস্থানে আঁটা ভার
হইল দুই শতেক বৎসর ঃ
আপদ হইল ইথে বৃক্ষ হইল মন্দিরেতে
সারাইতে সাধ্য নাহি কার ঃ
নারান দাসের বংশে মধ্যম বাড়ীর অংশে
যজ্ঞেশ্বর জন্মেছিল সার ঃ
সন ১২৫১ সালে গোষ্ঠীর সহিত মিলে
নানা যুক্তি করে জনে জনে ঃ
কেহ বলে নয়া কর কেহ বলে একেই সার
যজ্ঞেশ্বরের কিছুই না লয় মনে ঃ
পিতৃকীর্ত্তি ডুবাইয়া কেমনে করিব ইহা
সারাইব যা থাকে ভাগ্যেতে
ভদ্রলোক ডাকাইয়া হীরু মিস্ত্রী আনাইয়া
উদ্যোগ করিল সারাইতে ঃ
সন ১২৫১ সালে গোপীনাথের কৃপাবলে
মন্দির করিল মেরামতি ঃ
হিসাব করহ সবে ইহাতে নিকাশ পাবে
কবিতা সমাপ্ত হইল ইতি ঃ

কয়েকটি মঠ ও ঠাকুরবাড়ী ঃ

(১) রামানুজ 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বড় অস্থল, চন্দ্রকোণা ঃ

চন্দ্রকোণার নয়াগঞ্জ পল্লীর বড় অস্থল রামানুজাচার্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান। ইহা 'শ্রী' সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। অ-বর্ণের অর্থ বিষ্ণু। ইহার স্থানই 'অস্থল'। স্বরূপানন্দ রামানুজদাস আচারি এই অস্থলের প্রথম মোহান্ত। কোন্ সময় ইনি অস্থল প্রতিষ্ঠা করেন তাহা জানা যায় না। স্বরূপানন্দের পরবর্তী মোহান্তগণ যথাক্রমে জানকী, জয়রাম, হরিহর, গোপাল, লছমন, ভরত, বড়গোবিন্দ ও রামচরণ। নামের শেষে 'রামানুজদাস আচারি' এই অংশ থাকে। বর্তমান মোহান্ত শ্রীরামদাস রামানুজদাস আচারি। রঘুনাথজীউ এখানকার প্রধান দেবতা। গোপীনাথজীউ, শ্যামসুন্দরজীউ প্রভৃতি বিগ্রহ ও সহস্রাধিক শালগ্রামও এখানে আছেন। অস্থলের প্রথমে প্রধান ফটক পার হইয়া সপ্তনিবাস, পরে দেবালয় মহল। এখানে প্রধান মন্দিরের সম্মুখে নাট্যমন্দির। প্রধান মন্দিরের থামগুলি দেওয়ানীখাসের থামের অনুরূপ। বাহিরে দক্ষিণে ও পূর্বে মোহান্তগণের সমাধি আছে। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি নবনির্মিত।

ঝুলন এখানের প্রধান উৎসব। অন্নকুটে ছাপ্পান্ন রকমের ভোগ হয়। দোল প্রভৃতি উৎসবেও সমারোহ হয়। নিত্যভোগ হয়। বেসন, আটা, সুজি মেওয়া, চিনি ও ঘৃত-সংযোগে প্রস্তুত 'মগধ নাড়ু' একটি বিশেষ উপচার। বর্তমান মোহান্ত চন্দ্রকোণা পুরসভার পৌরপতি রামদাস রামানুজদাস মোহান্ত-মহারাজ ইহার পূর্বগৌরব রক্ষায় যত্নবান্। এই অস্থলে রামকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড নামক জলাশয় আছে।

(২) রামানন্দী সম্প্রদায়ের অস্থল, নরহরিপুর, চন্দ্রকোণা ঃ

চন্দ্রকোণা শহরের নরহরিপুর গ্রামের রামানন্দী-সম্প্রদায়ের এই অস্থলটি বহু পূর্বে এই সম্প্রদায়ের হাবড়াদাসকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তীর্থযাত্রা উপলক্ষে হাবড়াদাস লক্ষ্মীজনার্দন শিলাসহ এইখানে আসিয়া নিজের অলৌকিক প্রভাবে চন্দ্রকোণার তদানীন্তন রাজাকে মুগ্ধ করিয়া অস্থল প্রতিষ্ঠার জন্য বহু ভূসম্পত্তি লাভ করেন। অস্থলের পুরানো 'চারচালা' মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্ন। পশ্চিমে প্রধান ফটক, ইহার উপর মেটে দোতলা ঘর। নীচে গোশালা। ইহার দক্ষিণে প্রধান 'চাঁদনী' দেবালয় মধ্যে প্রায় ২৫০টি শিলা ও পঞ্চাশটি ছোটবড় বিগ্রহ আছে। প্রধান বিগ্রহ পাথরের চতুর্ভুজ লক্ষ্মীনারায়ণ। হাবড়াদাসের পর তুলসীরামদাস, রঘুবর দাস, শ্যামদাস, সিয়ারাম দাস, মঙ্গলদাস, মধুসূদন দাস,

রামরসী দাস প্রভৃতি অনেকে মোহান্ত হন। পূর্বে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে আধমণ হইতে পঁচিশ সের পর্যন্ত নিত্যভোগ ও রাত্রে লুচিভোগ হইত। ঝুলন, চাঁচর, দোল প্রভৃতি উৎসবে সমারোহ হইত। বর্তমান মোহন্ত শ্রীসুরজ মিশ্র।

(৩) নানক অস্থল, রামগড় (চন্দ্রকোণা) :

এইটি চন্দ্রকোণার 'নানক'পন্থী অস্থল। গুরু নানকের জন্মতিথি উপলক্ষে এইখানে উৎসব হয়। এই অস্থলের প্রতিষ্ঠাতা বৈশাখী দাস বাবাজীর একটি 'আটচালা' সমাধিমন্দির এইখানে আছে। সমাধিমন্দিরটির ঠিক পিছনে একটি নির্জনস্থানে অস্থলের অন্যান্য বাবাজীদের সমাধিমন্দির বিদ্যমান। সন্তদাস বাবাজীর সমাধিমন্দিরটির গায়ে সন ১২৭৯ সাল একটি মর্মর ফলকে ক্ষোদিত আছে। এই অস্থলের 'পঞ্চবটী'টি দর্শনীয়। অস্থলের পূর্ব দিক দিয়া 'সরযূ' নামে একটি ছোট্ট নদী প্রবাহিত।

(৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ের অস্থল, নিমতলা, ঘাটাল :

ঘাটাল থানার নিমতলা গ্রামে (প্রাচীন নাম হেমন্তনগর) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ের অস্থলটি পরশুরাম ব্রজবাসী নামক এক সাধুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। চেতুয়া-বরদার তদানীন্তন জমিদার শোভাসিংহ এই অস্থলের সেবাপূজার জন্য হেমন্তনগর প্রভৃতি চৌদ্দটি মৌজায় বেশ কিছু জমি দান করিয়াছিলেন। ইঁহার পরবর্তী মোহান্তগণ লালবিহারী, দুলালদাস, নরহরি, সেবাদাস, রূপচাঁদ, অভয়াচরণ, সুরেশচন্দ্র ও শ্রীগোরাচাঁদ গোস্বামী। এখানকার মন্দিরটি অভয়াচরণের স্থাপিত। ইহাতে রাধাগোবিন্দ, গোপাল, গৌর-নিতাই, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস প্রভৃতির মূর্তি আছে। রাস এখানকার প্রধান উৎসব। অস্থলের বাহিরে উত্তরাংশে মোহান্তদের আটটি 'চালা'রীতির সমাধি-মন্দির আছে। বাহিরে একটি নবরত্ন রাসমঞ্চ ১৫৪ বছরের পুরানো। বর্তমান মোহান্ত শ্রীগোরাচাঁদ গোস্বামী।

(৫) চেতুয়া-বৈকুণ্ঠপুর নিম্বার্ক মঠ, (থানা দাসপুর) :

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের একচল্লিশতম গুরু নরহরি দেবাচার্য বর্ধমান রাজগঞ্জ-অস্থলের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার শিষ্য শুকদেবাচার্য প্রায় তিনশত বৎসর আগে চেতুয়া-বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে অস্থল স্থাপন করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাসুদেবপুর হাটের নিকট 'নাগার ডাঙ্গা'য় এই অস্থলের আদিস্থান ছিল। বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র শুকদেবকে সেই সময় নানা মৌজায় বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। শুকদেবাচার্য বটফলের ন্যায় ক্ষুদ্র শ্রীধরশিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া এই দেবভূমির পত্তন করেন। পরে বিহারীলাল, মদনমোহনপ্রভু বিগ্রহ ও শিলা এখানে রক্ষিত

হইয়াছিলেন। শুকদেবের পরবর্তী মোহান্তগণ গোপালদেব, মোহনদেব, চতুরদাস শরণদেবাচার্য, চৈতন্যদাস, জানকীরাম দাস, মাধবদাস, কৃষ্ণদাস ও শুকদেব দাস। ইহার পর মধুসূদনশরণ দেবাচার্য, বলদেবশরণ দেবাচার্য এবং তাঁহার শিষ্য হলধরশরণ দেবাচার্য মোহান্ত হন। দেবসেবার সহিত গোপালন, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি এই অস্থলের পূর্বে নিত্যকর্ম ছিল। দুপুরে প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচসের আতপ চাউলের অন্নভোগ এবং রাত্রে লুচি ও মাখন ভোগ হইত। ঝুলন এখানকার প্রধান উৎসব। শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ঝুলন উৎসব হয়। ইহা ছাড়া রথ, জন্মাষ্টমী, উত্থানযাত্রা, রাস, দোল প্রভৃতি উৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্বে বালাজী, মদনমোহনজী ও রামচন্দ্রের পৃথক অস্থল ছিল। ঐগুলি এখন লুপ্ত।

উল্লিখিত এই ঠাকুরবাড়ী ও অস্থলগুলি ছাড়া মহকুমার বহু স্থানে নানা সম্প্রদায়ের বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ মঠবাড়ী ও অস্থল আছে। শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের অধীন দুটি শাখা অস্থলও এই দেশে আছে, একটি নাড়াজোলের মদনমোহনজীউর অস্থল ও অপরটি আজুড়িয়ায় অবস্থিত। এই দুইটিই দাসপুর থানায় বর্তমান। ইহা ছাড়া নিমতলায় (ঘাটাল) একটি 'গাণপত্য' মঠ ছিল। উহার শেষ মোহান্ত ছিলেন ভৈরবেন্দ্র পুরী। গণপতির মন্দিরটি অদ্ভুত স্থাপত্যরীতির পরিচায়ক।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ পীরস্থান :

ঈদের সময় যেখানে নমাজ পড়া হয়, তাহা **ঈদ্‌গা** নামে কথিত। ক্ষীরপাইয়ের ঈদ্‌গা বেশ বড়। সাহ্‌বাজার, ভরতপুর, জয়কৃষ্ণপুর (দাসপুর) প্রভৃতি স্থানেও ঈদ্‌গা আছে। ডিহিচেতুয়ায় (দাসপুর) চাঁদখাঁ পীরস্থানের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। চাঁদখাঁ পীর গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহের সময়ে এদেশে আসেন। হোসেন শাহ তাঁহার সন্ধানে একে একে নিজের সাতজন ভাগিনেয়কে পাঠান, কিন্তু সকলেই পীরসাহেবের প্রভাবে প্রাণ হারান। এই সাত ভাগিনেয়ের সমাধিও চাঁদখাঁ পীর সাহেবের আস্তানায় পথের বিপরীত দিকে ছিল। ঐখানে এখন একটি জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসস্তূপ আছে। বহু প্রাচীন ইঁট ও পাথর মাটির নীচে বর্তমান। এই স্থানটির ঠিক পিছনে উত্তর দিকে একটি প্রাচীন খাল 'কাণানদী' নামে পরিচিত। সম্ভবত পূর্বে ইহা একটি নদী ছিল। ইহা ছাড়া দাসপুরে আল্লাপীর, নিমতলায় বুড়োপীর এবং গোয়ালসিনি (চন্দ্রকোণা) গ্রামে বসাক পুকুরপাড়ে মাদারি পীরসাহেবগণ আছেন। চন্দ্রকোণায় গাংলস্কর পীর ও দড়বড়ি পীর, বরদায় উঃমুলুক নাস্তাহপীর, পান্নায় গঞ্জলস্করপীর প্রভৃতি পীরসাহেবদের আস্তানা আছে।

নবম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

ঐতিহাসিক নথিপত্র, প্রাচীনপুথি প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃতি।

এই প্রস্তুত গ্রন্থের বর্তমান পরিশিষ্টে ঘাটাল মহকুমার নানা স্থান হইতে যে সব মূল্যবান প্রাচীন নথিপত্র, পুথি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের কয়েকটির যথার্থ অনুলিপি দেওয়া হইল। এইগুলি হইতে সেকালে এই অঞ্চলের সামাজিক ইতিহাসের বহু তথ্য অনুসন্ধান করা যায়—এই দিক হইতে ইহাদের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চুয়াড় বিদ্রোহের নেতা **গোবর্ধন দিকপতির স্বাক্ষরিত একটি পাট্টা** ও বিদ্রোহী নেতা শোভাসিংহের ভ্রাতা **হিম্মৎ সিংহের একটি ভূমিদান সনন্দ** নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের কয়েকটির আলোকচিত্র গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। **মূল নথিপত্রের বানান ও ভাষা অনুলিপিসমূহে অবিকৃত রাখা হইয়াছে।**

(১)

হীমৎ সিংহের স্বাক্ষরিত সন ১১৩৭ বঙ্গাব্দের একটি ভূমিদান-সনন্দ ঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।

ইয়াদিকীর্দ শ্রীজুত ষুকদেব মোহন্ত ষুচরিতেষু সন ১১৩৭ এগার সর্ত্ত সাইতিষ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চা আগে মৌজে দাউদপুরদিগর পরগণে চেতুয়া গ্রাম হাএ বঞ্জয় পতিত ৪৬/০ ছচল্লীষ বিঘা জমি তোমার শ্রীশ্রী৺ শেবার খরচ কারন দেবোর্ত্তর দিলাঙ জমি জায় মাফিক চিহ্নিত করিয়া লইয়া ৺ সেবা ও সাধু সেবা করিয়া শীস্থানুশীস্থক্রমে ভোগ করহ রাজর্স্বয় সহিত দায় নাই ইতি সন সদর।

তারিখ—২২ অগ্রহান।

জায় জমি

পং চেতুয়া

দাউদপুর—৯৮৩

ঝুমঝুমি—২১॥০

উকুব পুর—৪/২

মণ্ডমালা—১০॥০

৪৬/০

ছচল্লীষ বিঘা ইতি

শ্রীহিমত সিংহ
(দেবনাগরি স্বাক্ষর)

(২)

সন ১১৬২ বঙ্গাব্দে 'চূয়াড়নায়ক' গোবর্ধন দিক্‌পতির স্বাক্ষরিত একটি ভূমিদান-পাট্টা ঃ

মনবরসমহক (?) দিলাঙ
সন প্রাতায় তহাতে মোহা (?) কসর
পৌঁত তাঃ ৬ আসাড়
সন ১১৬২ সাল

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।
জয়চণ্ডিজী ঃ
মহারাজ ঃ

৮ বিঘা দিলাঙ
৮
স্বাঃ শ্রীগোবর্দ্ধন দীগপতিস্য

৭ পাট্টা কবুকরবি দাদে কবুলাতে প্রাঃ ব্রাহ্মণভূমী সরকার গোয়ালপাডা নানকার পছিমতরফ মোজ্জাতঃ (মৌজেতেঃ ?) পিধা (?) ডিহির সঙ্গে মোজে ঝাটাডা খাল সঙ্গে জল সাল জমী পতিত হাসিল ৮ আট বিঘা শ্রীশ্রী৺ জঃ জীঃকে সেবার কারন শ্রীজুত ভগিরথ মল্লিকঠাকুরকে দেবত্তর পাটা দিলাঙ শ্রীজুতরাজা জজীঃকে এবং আমাদিকে আসির্ব্বাদ করিআ আমা দত্ত বলুদ (?) করিআ পরম পরম য়ুকে পুত্রপৌত্র সেবা করিআ পরমকে সেবা করহ অপর দাআ নাস্তি।"

(৩)

বর্ধমানরাজ তিলোকচাঁদকর্তৃক দেবোত্তর ও বৈষ্ণবোত্তরজমির ফসলছাড়পত্র ঃ

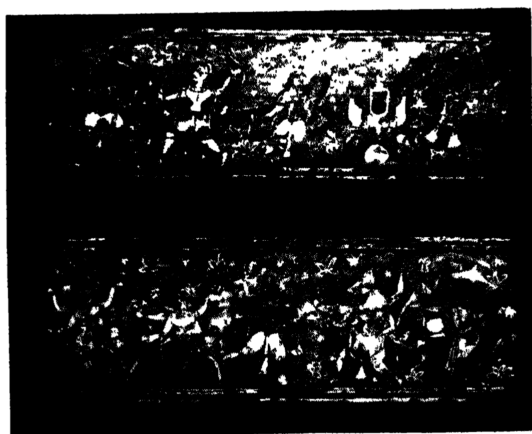
(ফারসী মোহর)

বৃন্দাবনচন্দ্র ও মুরলিমনোহর

শ্রীরাজা তিলোক চন্দ্র
(মোহর — শ্রীরাজা তিলোকচন্দ্র)

পরগণে চেতুয়া ও বরদা ও মণ্ডলঘাট ও জাহানাবাদ ও ভুরসিট্ট পরগণা হায়ের মৌজে হায়ের মোকর্দ্দম ও কর্মচারি য়ুচরিতেষু লিখনং কার্যঞ্চা আগে জোত মনিরাম গ্রামের ৺ গোকুল বৃন্দাবন অধিকারির পুত্র শ্রীরাধাচরণ অধিকারি ঠাকুর পরনা (?) ইহার শ্রীশ্রী৺ জীউদিগের সেবার দেবোত্তর ও বৈষ্ণবত্তর পরগণা হায়ের মৌজে হায়ে ১২০/০৪ এক সর্ত্ত কুড়ি বিঘা চারি কাঠা জমি আছে তাহার দরখাস্ত দাখিল হইল সন ১১৪৮ সালের পূর্ব্বাবধি ছাডি চিটীমাফিক ভোগ তজবিজ করিয়া জমি বতজন্দ (?) করা পেস (?) দরখাস্তীর নকল ৭৯২ নম্বরে দাখিল

চেঁচুয়াগোবিন্দনগরে গোবিন্দজীউর প্রাচীন ভোগশালা



প্রাচীন ভাগবতপুথির পাটাচিত্র



চেতুয়া-বৈকুণ্ঠপুর নিম্বার্কমঠ—বিহারীলালজীউর 'দালান'



নিম্বার্কমঠের বহির্ভাগ

হইল অতযেব ভোগ প্রমান জমির ফসল ছাড়িয়া দিবে—ইতি সন ১১৭১ সাল তাং ২১ চৈত্র (?)

জায় জমী	১২০/৪
দেবোত্তর	
পঃ চেতুযা	
জোতমনিরাম	১/০
?	২০।২
সাহাপুর	২/২
রামকৃষ্ণপুর	৯/০
খানখানাচক	১০॥০
খুদিচক	১।২
সাগরপুর	৮॥২
খাটবাডই	১।০
বিষ্ণুপুর	৩।২
কৈঃ গাড্যা	॥০
দরি অজোধ্যা	৬/০
কেসবচক	১॥০
রামনগর	১/১
ইকুবপুর	১/৩
গুমোনি (?)	১/০
পঃ মণ্ডলঘাট	
চাক্রিপাট	।০
হাকইখাজামাল	৫/৩
ভূতা	৪৸৪
	৭৮/১
পঃ বরদা	
জয়রান (?)	৩॥১
বাচাকানা (?)	২/০
মাধবচক	২/২

ফতেপুর	১৸৪
সন্তোষচক	৪৸৩
শ্রীরামপুর	১/০
রাধাচক	৪৸১
চাঁদপুর	২/০
পার্ব্বতীচক	১/১
পঃ জাহানাবাদ	
মনোহরপুর	২/০
জগতপুর	২/০
পঃ ভূরসিষ্ট	
ডিহি ভূরসিষ্ট	২/০
	১০৭।৩
বৈষ্ণবত্তর	
পঃ চেতুয়া	
রামকৃষ্ণপুর	৩৸২
সাগরপুর	১।১
ইশ্বরপুর	৩॥৩
রামনগর	২/৪
	১১/০
পঃ মণ্ডলঘাট	
চাক্রিপাট	১।১
ভূতা	॥০
	১২৸১
জের	১০৭।৩
	১২০/৪

এক সর্ত্ত কুড়ি বিঘা চারি কাঠা মাত্র।

(৪)

সন ১১৭৮ বঙ্গাব্দে বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের দেবনাগরি হরফে স্বাক্ষরিত একটি ফসলছাড়পত্র ঃ

শ্রীশ্রীরাম ১০৮০ নম্বর

সন ১১৭৮

(ফারসীমোহর)

22 march 1772
জনৈক সাহেবের স্বাক্ষর

পরগণে চেতুয়া ওগয়রহ মৌজে বাশুদেবপুর ওগয়রহর মোকর্দ্দম ও কর্ম্মচারি সুচরিতেষু লিখনং কার্যঞ্চ। আগে গ্রাম মজকুরের ধরনী ভট্টাচার্য্যদিগরের ব্রহ্মোত্তর জমী জে আছে সন ১১৪৮ সালের পূর্ব্বাবধী ভোগপ্রমাণ মৌজে হায় আর লাগাএদ সন ১১৬৭ সাল দস্তখতে খাষ ও দস্তখতে দেওয়াল ও সদর জমাবন্দী বহাল এবং মপতুশন হস্তবুদে জমাজমী জে হইয়া থাকে এশকল জমীর ভোগ প্রমাণ ফষল ছাডিয়া দিবে ইতি—সন ১১৭৮ সাল তাং ১৫ চৈত্র।

শ্রীমহারাজাধিরাজ রাজা
তেজশ্চন্দ্র বহাদুর

(শ্রীমহারাজাধিরাজ রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর)

জায় মৌজে

পঃ চেতুয়া

বাসুদেবপুর—১	জের —১৫	জের —২৩	শ্যাম মুখোপাধ্যায়
বৈকুণ্ঠপুর— ১	ভগবানপুর—১ পঃ	পঃ ভুরশীট	দীগরকে দত্ত
অটলগঞ্জ— ১	শ্রীধরপুর—১	কেশবপুর—১	দফে। —
শ্যামপুর— ১	ধান্যখাল—১	পঃ জাহানাবাদ	পঃ চেতুয়া
রামচন্দ্রপুর—১	জগন্নাথপুর—১ পঃ	নন্দনপুর—১	শোল্যান—১
গঙ্গাপ্রসাদ—১	পঃ মণ্ডলঘাট	সয়লা—১	হরিদ্রাপাট—১
সাহালামপুর—১	১৯	শ্রীপুর—১	চ বোয়ালা
কালসাপা— ১	ভুতা—১	মাধবকুণ্ডু—১	চঃ শীমানা—১
বালিডাঙ্গরি—১	কাল্যাগোদা—১	৪	৩
কুচ্যামারি— ১	২	পঃ চন্দ্রকোণা	৩৩
চঃ মুলতান—১	তপেবরদা	রশীকানন্দপুর—১	৩৬
কৈগেড্যা— ১	সঙ্করপুর—১	হিজুলী—১	ছত্রিশ মৌজে
নং গুপীনাথপুর—১	পাটগাঁ—১	দেওয়ানচক—১	ইতি—
খাটবাড়ই— ১	শ্যামসুন্দরপুরপঃ—১	কোঙরপুর—১	
বানেশ্বরপুর—১	৩	নলগড্যা—১	
১৫	* ২৩	৫	
		৩৩	

* মূলে যোগে ভুল আছে।

(৫)

সন ১০২২ বঙ্গাব্দের (হং ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ) একটি ফসলছাড়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

পঃ চৌধুরী মকর্দ্দম ও পরনাজায় (?) জীঃ কেষু সমাদ্ধেষং
সাং বাসুদেবপুর
শ্রীমনিরাম চক্রবর্ত্তীর সাবেক ধান্য ছাড়িও ভোগ প্রমাণ
ব্রহ্মোত্তর জমী

এঃ সরেস জায়	৪৸০	মনোহরপুর	৸০
শুলতাননগর	৸১	মামুদপুর	।৪
			১৴৪
হবিবপুর	৪৴৩	পহলানপুর	২৸২
গোপালপুর	৩।৪	অজোধ্যাপুর	১৴৩
বাসুদেবপুর	।।৩		
	১৩৸১		১৩৸১
			১৯৴০

এই ১৯ উনেষ বিঘার ফসল ছাড়িয়া দিহ
পঞ্চজকেও লয় (?) ইতি ১০২২ ১৪ ফাল্গুন"

(৬)

নিম্নে অজ্ঞাত কবি দ্বিজ বাঞ্ছারামরচিত গোপীনাথ-কীর্তনের এক প্রাচীন পুথির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। উক্ত পুথিতে হুগলি জেলার কৃষ্ণনগর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে :

শ্রীরামঃ শরণং মমঃ ॥
বৃন্দাবনচন্দ্রপদে প্রণিপাত হই।
অভিরাম গোপালের গুণকথা কই ॥
গুপ্তরূপে গোবর্ধন গিরির গহ্বরে।
অভিরাম অনাহারে স্মরেন প্রভুরে ॥
অনুক্ষণ রাখি মন কৃষ্ণের চরণে।
বস্ত্রহরণ বিগ্রহ বাসনা হল্য মনে ॥
ভক্তভাব ভগবান জানিঞা অন্তরে।
সর্ব্বরিতে সামচাঁদ স্বপ্নে কন তাঁরে ॥

কৃষ্ণনগর পূর্ব্বদেসে পুস্কর্ণি কাটিবে।
তথ্য বলি তুমি আমা তাহাতে পাইবে॥
মনোরমা মালিনী অপ্‌ছরা সাথে লবে।
পূজা আযোজন পাক প্রভৃতি করিবে॥
প্রভু প্রত্যাদেশ পাইয়া চলিলা তথায়।
পথে কত প্রণামে বিগ্রহ ফাট্যা যায়॥
বিষ্ণুপুরে ঘাড়বঙ্ক মদনমোহন।
কত সত হল্যা হত বিগ্রহস্থাপন॥
প্রাদুর্ভাব পূর্ণ জার তিহোঁ রক্ষা পায়।
লিলা তিন প্রণাম বগড়ির কৃষ্ণরায়॥
প্রভু পূর্ণ পরাৎপর ঘর্ম্মকণ্ঠাদেশে।
হরি ২ বোল বল্যা চলিলা হরসে॥
বিজন কোনা পুস্কর্ণির পাড়ে সবে বলে।
সে স্থানে মালিনী রাখ্যা জাত্রা লিলাচলে
তস্য পরে মালিনীরে লয্যা খোনকার।
অন্নাদি জে কিছু তাহা দিলেন আহার॥
ভক্ষন করিয়া ত্যাগ পুতিলেন তায়।
এইরূপে অনেক দিবস দিন জায়॥
জুগহাতে জগন্নাথে করি প্রণিপাত।
প্রত্যাগম চৌষট্টি মোহন্ত লয্যা সাত॥
কৃষ্ণনগর আস্যা এক রজনি ভিতর।
রামকুণ্ড খন্তিয়ে খোলন তরা পর॥
ঝুলিতে মৃত্তিকা পুর্‌্যা চৌষট্টি মোহন্ত।
বাঁধিলা পুস্কর্ণিপাড় জত তেজবন্ত॥
সেই পুস্কর্ণিতে প্রাতে গোপীনাথে পায়্যা।
গোস্বামী আনিলা নানা বাদ্য সঙ্গে লয়্যা॥
মহোচ্ছব দ্বাদশ আরব্ধ সেইকালে।
চৌষট্টী মোহন্ত লয্যা দ্বাদশ গোপালে॥
চক্রবর্ত্তী ছয়জন কবিরাজ অদ্ভুত।
অপর পার্শ্বদগণ দেখ্যা হল্যা হৃষ্ট॥
মনোহরা মালিনীরে পড্যা গেল মনে।

মোহন্তে পাঠাল্যা আন মালিনী এখানে ॥
আজ্ঞা পায্যা গেলা ধায্যা জথা খোনকার।
একে ২ গোশাঞ্রের কহে সমাচার ॥
খোনকার ছাড্যা নাঞি দিলেক মালিনী।
পোষণ কর্য্যাছি আমাদের হল্যা ইনি ॥
এই তত্ত মোহন্ত গোশাঞ্রে কহে আসি।
সকল সহিত স্বামী বিজনকোনা পসি ॥
খোনকারে কন ধিরে মালিনী না ছাড।
বিশেষ বচন বিবরিয়া বল দ্রঢ় ॥
জবনের আন্নাদি খায়্যাছে তব প্রিয়া।
হয্যাছেন আমাদের না দিব ছাড়িয়া ॥
মালিনীযে গোশ্বামী জিজ্ঞাসা পুনঃ ২।
নতি হয্যা কই নাথ নিবেদন শুন ॥
কৃষ্ণগুণ গান কর্য্যা নিবারণ ক্ষুধা।
কদাচিত কান্ত কিছু না ভাবিহ দ্বিধা ॥
জেদিন জে খাদ্যদ্রব্য দিযাছিলা মোরে।
সমস্ত প্রস্তুত আছে মৃত্তিকা ভিতরে ॥
তুলিযা ঐমনি অন্ন উষ্ণ পুর্জ্জশিত।
দেখ্যা খোনকার সর্ব্ব হল্য ভয়ে ভিত ॥
গোশ্বামীচরণে ধর্য্যা কহে দেহ ক্ষমা।
ঠাকুরাণী লয্যা জাও রক্ষা কর্য্যা আমা ॥
মালিনী লইয়া কৃষ্ণনগর গমন।
বাঞ্ছারাম রচে গোপীনাথের কীর্ত্তন ॥
মহামহোৎসব আরব্ধ স্বামি।
মালিনীযে কন রাঁধগা তুমি ॥
ধনী ধন্যা শুন্যা ধবের বাক।
পদ্মিনী প্রচুর আরম্ভে পাক ॥
সাকশূপ চতুর্বিধাদি কর্য্যা।
পায়শপিষ্টক সত্বর সার্য্যা ॥
ভামিনী ভর্ত্তায কহেন হাস্যা।
গোপীনাথে অন্ন দেহনা আস্যা ॥

ধনী ধ্বানে গিয়া দিলেন অন্ন ।
ভোজনে সকলে ডাকিলা তুর্ণ ॥
কিন্তু হয়্যা কেহ কহিতে নারে ।
মালিনী ছিলেন জবনপুরে ॥
কেমন করিয়া অসন হয় ।
সর্ব্বে স্বামী ভএ কেহ না কয ॥
সেকালে সকলে দিলেন পত্র ।
পরিবেসনে সে মালিনী মাত্র ॥
বাতাস বিসম ব্যাপিল আস্যা ।
মস্তক বসন পড়িল খস্যা ॥
পুনরায় দ্বয় হইল হস্ত ।
তাহে ধর্‌য়া মাথে দিলেন বস্ত্র ॥
সকলে আশ্চর্য্য মানিল মনে ।
আনন্দভোজন সাধব ভনে ।
মহোৎসব হল্য সেদিন সাঙ্গ ।
শুন তারপর অপর রঙ্গ ।
দৈবে নদী দারিকেশ্বর জলে ।
এক নিম্বকাষ্‌ত ভাসিয়া চলে ॥
গোশ্বামীকে গিয়া কহিল লোকে ।
আজ্ঞা হল্য পাড়ে তুলিতে তাকে ॥
সত্বর সেখানে গেলেন চল্যা ।
সোল শাঁগ্যের কাষ্‌ত হস্তে সে তুল্যা ॥
মুরুলীর বাদ্য অধরে হয় ।
আহা কি আশ্চর্য্য সকলে কয় ॥
জাবন্ত মোহান্ত কহিলা তবে ।
ধর ২ ধর এ কাষ্‌ত সবে ॥
ধরিতে কাহার নহিল সাদ্ধ্য ।
কর্‌য়াছিলা জায় মুরুলী বাদ্য ॥
মালিনীকে মৃদু কহেন হাস্যা ।
আমার মুরুলী ধরগো আস্যা ॥

স্বামীবাক্যে শীঘ্র সুন্দরী গেলা।
অবহেলে আস্থা আঁচলে নিলা॥
করগা রোপণ কামিনী খিপ্র।
বাঞ্ছারাম রস রচিল বিপ্র॥

রোপণ করিয়া কায্‌ত কহিলেন বামা।
বকুলের বৃক্ষ হও বাক্য শুন্যা আমা॥
শুখে বসিবেন তোমায় প্রভু গোপীনাথ।
ক্রিডা করিবেন কত ভক্তবৃন্দ সাত॥
অব্যর্থ অবলাবাক্য অন্যমত নয়।
সাখা মঞ্জুরিয়া সেই দিব্য বৃক্ষ হয়॥
সে বৃক্ষে অদ্যাপী গোপীনাথ অধিষ্ঠান।
ব্রজবাসি তার তলে তত্ত্ব গুণগান॥"

[উদ্ধৃত এই অংশটি পুথির একটি পাতার দুই পৃষ্ঠায় লিখিত। পত্রটি তুলট কাগজের। আয়তন ০·১১ মিঃ (৪$\frac{১}{২}$")×০·৩৪ মিঃ (১১$\frac{১}{২}$")। ইহা আনুমানিক একশ বছরের কিছু বেশি পুরাতন।]

(৭)

সেকালের বিচারসংক্রান্ত সালিশপ্রার্থনা ও শাস্ত্রীয় মতে বিচারের রায়ঃ

শ্রীশ্রীসীতারামঃ

শরণং

মহামহিম শ্রীযুৎ ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গ মহাশয়

সন্নিধানেষু

লিখিতং শ্রীউদয়চন্দ্র দেবশর্ম্মণো ভাষাপত্রমিদং নিবেদন আমার ৺পিতৃব্য-মহাশয় প্রপৌত্রপর্য্যন্ত রহিত হইয়া লোকান্ত হয়েন তাহার স্থাবরাদি জাবতদ্বস্ত তাহার পত্নিসংক্রান্ত হইয়াছে এক্ষেনে উক্তস্থাবরাদিবস্ত বিক্রয়াদি করিতে তিনি উতসাহ করিতেছেন উক্ত বস্ত তিনি বিক্রয়াদি করিলে সির্দ্ধ হইবেক কিনা মহাশয়রা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারি তাহা ব্যেবস্তা দিতে আজ্ঞা হইবেক ইতি সোন বারসত্ত ৫৮ সাল তারিখ ১১ কার্তিক।

(সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিচারের রায়)

অত্র বিষযে প্রপৌত্রপর্য্যন্তবিরতাপেতপ্রাণপত্নীসংক্রান্ত তত্ স্থাবরাদি ধনে তস্যাদানবিক্রযানধিকারিত্বং কৃতশ্চেদসিদ্ধ্যমিতি সতাম্মতম।

শ্রীরামঃ শরণং

শ্রীকালীদাস দেবশর্ম্মণাম
শ্রীকালাচাঁদ দেবশর্ম্মণাম
শ্রীগোবিন্দ দেবশর্ম্মণাম
শ্রীরামকুমার দেবশর্ম্মণাম "
শ্রীহরদাস দেবশর্ম্মণাম
শ্রীহরচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম
শ্রীতারক দেবশর্ম্মণাম

[**টিপ্পনী ঃ** শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিতদের উক্ত আবেদনসংক্রান্ত বিচারের রায় সংস্কৃত ভাষায় দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ—'সাধুব্যক্তিগণ মনে করেন, যে ব্যক্তির প্রপৌত্রপর্যন্ত কোন বংশধর না থাকিয়া মৃত্যু হয় তাঁহার স্থাবরাদিধন পত্নী প্রাপ্ত হইলে যদি সেই পত্নীকে স্থাবরাদিধনের দানবিক্রয়ের অধিকার দেওয়া না হয় তাহা হইলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইবে।']

(৮)

অপর আর একটি আবেদনপত্রে সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের নিকট শাস্ত্রীয়মতে বিচারপ্রার্থনা ও সংস্কৃতভাষায় বিচারের রায় ঃ

৭শ্রীশ্রীরাম

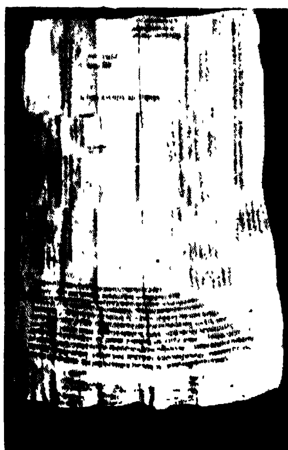
সন ১২৩৮

মহামহিম শ্রীভট্টাচার্য মহাশয়রা বরাবরেষু—

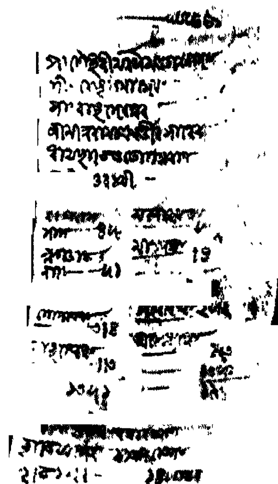
লিখিতং শ্রীরাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং বাসুদেবপুর পরগণে চেতুয়া ভাসপত্রমিদং কার্যঞ্চ আগে আমার পীতা ৺বাঞ্ছারাম চক্রবর্ত্তী ও তাহার জেষ্ট সহোদর ৺কেবলরাম চক্রবর্ত্তী দুই সহোদর এক অন্নে থাকীয়া পৈত্রীক বিত্রাদী সব্বসাধারনে ভোগ করিয়া কেবলরাম চক্রবর্ত্তীর ৺প্রাপ্তী হয় তাহার পুত্র ৺বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী আমার পীতার সহীত কিছুকাল এক অন্নে থাকীয়া তাহার পর যে কিছু পৈত্রীক সাম্গ্রি বিভাগ করিয়া লএন তাহার পর কিছুদিন বাদ তাহার ৺প্রাপ্তী হয় তিহ নিঃসন্তান তাহার এক অবিরা স্ত্রী আছেন তাহার স্বামির অংসের জে কিছু সামীগ্র ভোগ দখল করিতেছেন এক্ষেণে ঐ অবিরা শ্রী দুষ্টলোকের মন্ত্রণায় পৈত্রীক ক্রীয়া ৺সেবাদী না হয় এ কারন জমি ও বিক্ষাদী দানবিক্রয় করিতে উর্দ্ধত একারণ নিবেদন অবিরাশ্রী স্বামির পীতৃব্য সন্তান থাকীতে দান কিম্বা বিক্রয় করিতে পারেন কিনা ইহার শাস্ত্রানুশার বেবস্থা



সেকালের একটি আবেদনপত্র ও বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের স্বাক্ষর



একটি প্রাচীন গ্রাম্যসালিশীপত্র



১০২২ বঙ্গাব্দের একটি ফসলছাড়

আজ্ঞা হইবেক ইহা নিবেদন করিলাম ইতি সন ১২৩৮ বার শর্ত্ত আটত্রীষ শাল তারিখ—

শ্রীরাজারাম চক্রবর্ত্তী
সাং বাসুদেবপুর

ইসাদ
শ্রীরামেস্বর মুখোপাধ্যায়
সাং বাসুদেবপুর
প্রভৃতি

(সংস্কৃতে এই আবেদনের রায়)

(১) অত্র বিষয়েঽবীরযা স্বীয়ভরণার্থবিক্রয়াদিকং পতিস্বর্গার্থকিঞ্চিদ্দানাদিকঞ্চ বিনা উত্তরাধিকার্য্যনুমতিং বিনা স্বসংক্রান্তপতিস্থাবরাদে র্দানাদিকং ন কর্ত্তব্যমিতি সতাং মতম্।

(২) এতন্নিপ্যর্থানুসারেণ অবীরা উত্তরাধিকার্য্যনুমতিং বিনা ভরণাত্ত্যতিরিক্তং স্বামিসংক্রান্তস্থাবরাদিধনং দাতুং নার্হতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ—

(৩) অত্র বিষয়েঽবীরা স্ত্রী স্বীয়ভরণপোষণাত্ত্যতিরিক্তার্থস্বামিসংক্রান্তস্থাবরাদি-বিক্রয়াদিকং কর্ত্তুং নার্হতীতি সতাম্মতম্।

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** এই আবেদনপত্রের রায়ে সেকালের বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে।)

(৯)

সন ১১৭৮ বঙ্গাব্দে বর্ধমানাধিপ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের নিকট এক বিধবা ব্রাহ্মণীর আবেদন ও বর্ধমানাধিপের রায় ঃ

শ্রীশ্রীহরি

সন ১১৭৮

পরগণে চেতুয়া মৌজে বাসুদেবপুর গ্রামের শ্রীমতি কাত্যায়নি ব্রাহ্মণির আরজ—নিবেদন আমাদির্গের পৈত্রিক ব্রহ্মত্তর বিস্তীবিধান জে ছিল তাহা আমার শ্বামি বর্ত্তমানে ভায়াদ দির্গের সহিত ক্রতাংস করিয়া লইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে ভোগ করিয়াছেন এখন তাহার অবর্ত্তমানে আমার কন্যা পত্রি ও দহুত্রসকল বর্ত্তমান এবং আমার দুইটী কন্যা অবিবাহিতা আছে এখন আমার ভাষুরের পুত্র শ্রীদিবাকর ভট্টাচার্য্য কহেন ভূমের ফষলের ভাগ লহ জমির কিতা ভাগ করিয়া চিহ্নিত করিয়া দিব নাই পূর্ব্ব ক্রাতাংসর ধানি জমি নিকটের ভাগ হইয়াছে এবং কথক কথক জমি কীতা ভাগ হইয়া চিহ্নিত হইয়াছে কথক ২ দুরদরাজের জমি কীতা ভাগ না হইয়া ফষল ভাগ হইত

শেকারণ জমি কীতাভাগ করিযা দিতে চাহেন নাই আমি বেতুয়া লোক অব্বিবাহিতা দুইটী কন্যা আছে কুলিন ব্রাহ্মণে দিতে হইবেক তাহাদির্গে কথক ২ জমি দিতে হইবেক আমার জমি ব্যতিত আর বেহবুদ কীছু নাই অতএব নিবেদন মোকর্দ্দমের নামে হুকুম হয পূর্ব্ব জে অংসের কীশা (?) মাফিক জে জে জমি কিতা ভাগ হয় নাই তাহা কিতা ভাগ করিয়া দেন তবে আমি কন্যাভারে খালাষ হই শ্রীজুতসাহেব ধর্ম্মঅবতার আমি গরিব বেতুয়া আমার ভাগ্যে জেমত হুকুম হয় ইহা আরজ নিবেদন ইতি সন ১১৭৮ সাল তারিখ—

হুকুম

মোকর্দ্দম কর্ম্মচারি

ইহাদের ব্রহ্মোত্তর জমি অংশ জে হইয়াছে তাহা চিহ্নিত করিয়া দেয তকীযদ করিয়া দিবে ইতি ২৪ মাঘ।

(ফারসীমোহর)

(দেবনাগরি হরফে স্বাক্ষর) **श्रीमहाराजाधिराज राजा तेजचन्द्र बहादुर**

(শ্রীমহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর)

(১০)

সেকালের একটি 'পার্টিশান' দলিল (ফারখতিপত্র ১২০৯ সাল) :

শ্রীলম্বোদর মুখোপাধ্যায়
সাং বাগাড়া
মৌং বেলোয়া

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শরণং

পূজনীয় শ্রীমতি দয়ামই দেবি

বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীলম্বোদর মুখপাধ্যায় কস্য ফারখতিপত্রমিদং কায্যঞ্চ আগে পরগণে চেতুয়া মৌজে বাসুদেবপুর গ্রামের আমার অপুত্রা মাতামহি ৺কাত্যায়নি দেবির পরলোকপ্রাপ্তি হইলে পর তাহার বির্ত্তাদির দাওা করিয়া জেলা মেদনিপুরের দেওয়ানি আদালতে ১০৭৩৩ নম্বরে নালিষ করিয়া তোমার নামে পেয়াদা আনিয়াছিলাম ইহাতে গ্রামস্থ পঞ্চজনা ভাল মনস্থ থাকিয়া জমি ১৯৮২ উনিষ বিঘা সতর কাটা ও জলদান ও বিক্ষাদী তপসিল মাফীক পাইয়া তোমাকে খালাষ দিলাম এহা সেত্তায় বাস্ত ও জমি ও জলদান ও বিক্ষাদী ও বিবাহের কৌড়ি ও বেবস্থাদিকার ও ভূরভূয্য ও সিস্য ও জজমান বির্ত্তাদী ওগয়রহ জে কীছু তোমার সমস্ত রহিল তুমি পৈত্রীক বির্ত্তাদী জে কিছু করিবে

তাহাতে আমার সহিত এলাথা নাই আমি মাফীক তপসিল জমি ও জলদান ও বিক্ষাদী জে পাইলাম ইহা সেত্তায় জমি ও জলদান ও বিক্ষাদী ও বাস্তু ওগয়রহ জে কীছু তোমার রহিল তাহাতে আমার দাওা নাই কালকালাঙ কথন কোন দফাতে দাওা করি সে বাতিল এতদার্থে আপন খুসিতে ফারখতি পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২০৯ শাল তারিখ—৭ সাতঞী জ্যৈষ্টী।

জায় মৌজে জমী

পঃ চেতুয়া

বাসুদেবপুর

দক্ষিণকৃষ্ণ ১ ॥২ জেঃ গোবিন্দ মাসান্ত

গোপীনাথপুর—১	১/০	
খাটবাড়ই—১	৸১	
চকসুলতান—১	১/০	
১॥২ বন্দে		
গঙ্গাপ্রসাদ—১	।৪	
কুচ্যামারি—১	১/০	
৬	৪৸২	

পঃ মণ্ডলঘাট

ভুতা—১	১/০
২ বিঘা বন্দে	
কেল্যাগোদা—১	১/০
পঃ বরদা	
পাটগ্রাম—১	॥০
কোঙরপুর—১	১।০
সঙ্করপুর—১	৬।০
পঃ জাহানাবাদ	
নন্দনপুর—১	৫/০
৬	১৫/০
১২	১৯৸২

উনিষ বিঘা সাতর কাটা ইতি

১৯৸২

জায়জলদান মৌজে

পঃ বরদা

সিংহডাঙ্গা—১

রানিবাজার—১

হরিদাষপুর—১

জয়নগর—১

গণেষবাজার—১

নবগ্রাম—১

৬

শ্রীরাজচন্দ্র রায়

সাং নেবুক

পঃ মণ্ডলঘাট

ছয় মৌজে ইতি

তালিক বৃক্ষ—

বাস্তুদীগরে

বাতাবিতলার

নারিকেল গাছ	১ একটা
ফুলবাগানের	
দুইটা গাছের কাত	
দক্ষিণের বড় আম্রগাছ	১ একটা
পুস্কর্ণির পশ্চীম পাহাডে	
তেতুল গাছ	২ দুইটা
পুস্কর্ণির পশ্চিম কোনের	
নিচে ভেলকী বাষ	১ ঝাড়
তাল গাছ	
রাডা	১ এক
ফলা	১ এক
	৭ সাত ইতি

শ্রীকালীসঙ্কর মুখোপাধ্যায়
সাং বাসুদেবপুর
শ্রীভবানন্দ দেবশর্ম্মা
সাং বাসুদেবপুর
শ্রীমোহনচন্দ্র দত্ত
সাং বাসুদেবপুর

শ্রীকুঞ্জবেহারি সরকার
শ্রীশ্যামচরণ দেবশর্ম্মন
সাং বাসুদেবপুর
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবশর্মা
সাং বাসুদেবপুর

[**টিপ্পনী :** এই 'ফারখতিপত্র'টি সেকালের 'খজানা আমরা'র (Treasury) 'কাগজ সরই' (Stamp office) হইতে ১৲ টাকা মূল্যে ক্রীত। ইহাতে ঐ দুইটির জলছাপ আছে।]

(১১)

**** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহবিষয়ক গ্রন্থের ভ্রমনিরাসক ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন-বিরচিত একটি উত্তর :**

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহবিশয়ক ভ্রমনিরাসক শ্রীঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত উত্তর—

শ্রীশ্রীরামঃ॥ কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরহিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য এই চরম-সিদ্ধান্তানুকূল পত্রাবালী লিপির আদিমধ্যাবসান সমুদায়াবলোকন করিয়া সংক্ষেপে যে উত্তর লিখিতেছি এতৎপ্রতিপাদক নিস্থর্থ (?) সমুদায়াবগম করিয়া বিজ্ঞতম মহাশয়রা বিবেচনা করিবেন শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিচক্ষণোত্তম মহাশয় নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে এই পরাশরসংহিতার বচনের সদর্থ না জানীয়া অসদর্থজ্ঞানপ্রযুক্ত যে বহুবিধ পল্লবিত বাক্যাবলীদ্বারা কলিযুগে লোকদিগের যৎকিঞ্চিদবশিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানোচ্চাটনপূর্ব্বক সংপূর্ণ অধর্ম্মে প্রবৃত্তি করাইতেছেন সে কেবল বাচনতা প্রকাশমাত্র এবং অন্তে সোপি বিনক্ষতি এই কলিযুগের পাদমাত্রাবশিষ্ট ধর্ম্মনাশপ্রতিপাদক শাস্ত্রকে অধুনাই ফলবৎ করিতে উদ্যত হইয়াছেন আঃ কি আশ্চর্য, বিধবাবিবাহসম্পাদক বিদ্যাসাগর পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাশয় শাস্ত্রমহার্ণব হইতে সদ্ব্যবস্থাস্বরূপ অমৃতোদ্ধারে সুমুৎসুকতাপ্রযুক্ত এক দুঃসাহস পোতাবলম্বন করিয়া প্রবৃত্তিরজ্জুবদ্ধ স্বমনীষোমাত্র মন্দরাদ্রিকে শাস্ত্রমহার্ণবে মগ্ন করিয়া বহুধাযাসপূর্ব্বক বিবিধ বিলোভন দ্বারা প্রথমতই এক কুব্যবস্থা কালকূট উদ্ধার করিয়া তাহাতেই ভ্রান্তিপ্রযুক্ত সদ্ব্যবস্থামতে বোধ করিয়া স্বাভিলাষিত সম্পাদনে

কৃতকার্য্য হইয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিয়াছেন কিন্তু ভাগ্যবশত এ কালকূট অধুনাও আস্বাদন করে নাই আস্বাদন করিলেই অকালে জগতের ধর্ম্ম প্রলয় হইবে কেননা অমৃত বোধ করিয়া বিষ পান করিলে কখন অমর হয় না কিন্তু বিষজন্য যাতনাই পায় যেহেতুক বস্তু শক্তিজ্ঞানকে অপেক্ষা করে না সংপ্রতি কলিযুগের লোকদিগের পাদাবশিষ্ট ধর্ম্ম যে এক্ষেণেও আছে সেই পুণ্যবলত ঐ কুব্যবস্থা কালকূট কালকূটসংহারকারি শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরনগরী বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কালকূটবিষাদি প্রশাদতঃ সংহৃত হইল তৎসংহার প্রকার এই যে—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজীতে ইত্যাদি পরাসরসংহিতাব বচন কলিতরপর তথাচ চতুর্ব্বেদভাষ্যাধিকরণমালাদি নানা গ্রন্থাবলীরচনাক্রমহামহোপাধ্যায় ভগবন্মা-ধবাচার্য্য স্বকৃত পরাশরভাষ্যে উক্তবচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ইত্যাদি নষ্ট দেশান্তরগমনে নাপরিজ্ঞাতবৃত্তান্তঃ অয়ঞ্চ পুনরুদ্বাহো যুগান্তরবিষয় তথাচাদিপুরাণং উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহী জ্যেষ্ঠাংশংগোবধং তথা। কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুমিতি এবং ঐ পরাশরভাষ্যে প্রথম অধ্যায় টীকাতে তথান্যেপি ধর্ম্মজ্ঞসময় প্রমাপকাঃ সন্তি এই কথা লিখিয়া অনেক নিসেধক বচন লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ লিখি।

বিধবায়াং প্রজোৎপত্তৌ দেবরস্য নিযোজনং। বালিকা ক্ষতযোন্যাশ্চ বরেণান্যেন সংস্কৃতি। কন্যানামশবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজন্মন। আততায়ি দ্বিজাগ্রাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংশনং। দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নির্যাণমিত্যাদি এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবির্ত্তি তানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ। এই বচন দ্বারা অক্ষতযোনি বালিকাবিবাহ নিষেধ সুস্পষ্ট আছে তথা ঐ পরাশরভাষ্যের প্রথম অধ্যায় টীকাতে ক্রতুমুনির বচনং যথা দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তি র্দত্তা কন্যা ন দীয়তে ন বা চ ?) গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ ন চ কমণ্ডলুরিতি আর ঐ পরাশরভাষ্যে পুরাণেপি বলিয়া আদি পুরাণবচন সমানার্থক বচন লিখিয়াছেন যথা উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহো জ্যেষ্ঠাংশো গোবধস্তথা। কলৌ পঞ্চ নিবর্ত্তেরন্ ভ্রাতৃ-জায়া কমণ্ডলুঃ ইতি এবং মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে শকৃদংশো নিপততি সকৃৎ-কন্যা প্রদীয়তে। সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ। তথা নান্যেস্মিন বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ। অন্যস্মিন হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনং তথা নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কৃর্ত্যতে ক্বচিৎ ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ। অত্র কুল্লুক ভট্টঃ ন চ বিবাহবিধায়কশাস্ত্র অন্যেন পুরুষেণ সহ পুনর্ব্বিবাহ উক্ত॥

এই সকলের উপসংহারে কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন যে অয়ঞ্চ স্বোক্তনিষেধঃ কলিযুগবিশয়ঃ অর্থাৎ এই সকল পুনর্ব্বার বিবাহাদি নিষেধ সে কলিযুগেই তথা চ বৃহস্পতিঃ উক্তনিযোগ মনুনা নিসিদ্ধঃ স্বয়মেব তু। যুগক্রমসো দশক্যোয়ং কর্ত্তুমন্যে বিধানতঃ। তপোজ্ঞানসমাযুক্তাঃ কৃতে ত্রেতাযুগে নরাঃ দ্বাপরে চ কলৌ নৃণাং শক্তিহানি হিঁ জায়তে ইতি এই সকল পরাশরভাষ্যের ব্যাখ্যা ও পরাশরভাষ্য-লিখিতবচন ও মনুপ্রণীত বচনসকল ও তদ্ব্যাখ্যা অনবলোকন করিয়া কেবল পরাশরসংহিতার মূলমাত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া যে ধর্ম্ম নির্মূলন ব্যবস্থা লিখিয়াছেন সে কোন মতে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

আর কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ। দ্বাপরে শাঙ্খলিখিত কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ। এই বচনের অভিপ্রায় এই যে পরাশরোক্ত প্রচুর ধর্ম্ম কলিযুগো গ্রাহ্য অন্যথা মন্বাদিপ্রণীত সকল ধর্ম্ম যদি সত্যাদিযুগে গ্রাহ্য হইত তবে দেবরাদিদারা পুত্রোৎপত্তি সত্যযুগেও হইতে পারিত না অতএব শাস্ত্রান্তরের অবিরুদ্ধ সত্যাদিযুগের ধর্ম্ম মন্বাদিপ্রণীত শাস্ত্রে যে যে লিখিয়াছেন সেই ধর্ম্মই গ্রাহ্য। এবং অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে ইত্যাদি পরাশরসংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের যে প্রতিজ্ঞা সেও কলিযুগের ধর্ম্মবাহুল্য কথনাভিপ্রায়ে করিয়াছেন অন্যথা তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে জজ্ঞমেবাহু র্দানমেব কলৌ যুগে। এই পরাশরসংহিতার বচন যদি প্রাধান্যপর না হয় তবে এবকার-ব্যবচ্ছেদ্য বেদানাতিরিক্ত ধর্ম্মান্তর সে পরাশরবিরুদ্ধ বলিয়া কলিযুগে আচরণীয় হইতে পারে না এই অর্থ পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন—

যথা তর্হি ত্রেতাদিষু তপো নাদ্রিয়েৎ কৃতে চ জ্ঞানযজ্ঞদানানি নাদ্রিয়েরন্নিতি চেন্ন ইতরব্যাবৃত্তিরূপায়াঃ পরিসংখ্যায়া অত্র বিবক্ষিতত্বাদিতি এবং তপঃ পরং কৃতযুগে ইত্যুপক্রম্য বৃহৎপরাশরীয় সংহিতাতে চতুর্যুগের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম অনেক কহিয়াছেন অতএব পরাশরসংহিতাতে কলিধর্ম্মমাত্রকথন এমৎ নয় এবং শাস্ত্রান্তরবিরুদ্ধধর্ম্ম পরাশরোক্ত বলিয়া কলিতে ব্যবহার করিতেই হইবে এমতও নয় কেবল পরাশরসংহিতাতে কলিধর্ম্মের বাহুল্যরূপেও প্রাধান্যরূপে নির্ণয় করিয়াছেন এই স্থির সিদ্ধান্ত। আর শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতি র্বরা এই ব্যাশসংহিতার বচনাধীন স্মৃতিপুরাণবিরোধে স্মৃতিবলত্ব যথার্থ বটে কিন্তু বেদার্থোপনিবদ্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং মন্বর্থবিপরীতায়া সা স্মৃতি র্ন প্রপশ্যতে। এই বচনাধীন মনুস্মৃতি যে সর্বস্মৃত্যপেক্ষায় বলবতী তাহা কি বিধবাবিবাহসম্পাদক মহাশয় দেখে নাই যেহেতুক ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ এই মনুবচন কলিতে

সুস্পষ্ট বিধবাবিবাহ নিষেধ দেখিতেছি অতএব মনুবচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া পরাশরীয় বচনকে কলীতরপর অবশ্যই বলিতে হইবে

এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় যে লিখিয়াছেন কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধ-বাদীরা কোন শাস্ত্র অনুশারে এরূপ কহিয়া থাকেন তাহা তাঁহারাই জানেন এই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবচনদ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে অতএব বোধ হইল যে পরাশরভাষ্যাদি গ্রন্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া পান নাই সুতরাং দেখেনও নাই উক্ত মহাশয়ের যদি পরাশরভাষ্যাদি শাস্ত্রে দৃষ্টিপাত থাকিত তবে এতাদৃশ কুমার্গে প্রবৃত্তি হইত না।

যদ্যপি বিধবাবিবাহসম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বোক্ত পরাশরভাষ্যাদিসম্মত ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিধবাবিবাহের নিষিদ্ধতা বিশয়ে বিবাদ করেন অর্থাৎ নষ্টে মৃতে প্রব্রজীতে ইত্যাদি পরাশরসংহিতার বচনকেই বিধবাবিবাহেব বিধায়ক বলিয়া অগ্রহ প্রদর্শণ করেন তথাপি পতিমরণাদি হইলে পরাশর কলিযুগের বিধবাস্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিবাহের স্পষ্ট বিধি দিতেছেন এইরূপ পরাশরভাষ্যাদি সর্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ অর্থ কোনমতে গ্রাহ্য হইতে পারে না কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যে এরূপ সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থ কল্পনা করিয়াছেন সে কেবল ধবঃপ্রিয়পতির্ভর্ত্তেত্যেতাবন্মাত্র অমরসিংহের পাঠাঙ্কনাবলোকন দ্বারা যদি স্বামীত্বীশ্বরঃ পতিরীশিতে-ত্যেতদঞ্চলে দৃষ্টিপাত করিতেন তবে এতাদৃশ ধর্ম্মবিলোপক ব্যাখ্যা করিতেন নাই তস্মাৎ নষ্টে মৃতে প্রব্রজীতে ইত্যাদি পরাশর সংহিতার বচনের কলিযুগের ধর্ম্মাভিধায়কতা হইলেও সর্ব্বশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ সুসঙ্গত সদ্ব্যাখ্যা এই যে যথা প্রজাপতি নরপতি সেনাপতি ইত্যাদি স্থলে ঈশ্বরঃ পতিরীশিতেত্যমরসিংহপ্রমাণকপ্রভুবাচক পতিশব্দ প্রসিদ্ধ প্রচলিত আছে তথা পতিরণ্যো বিধীয়তে এই প্রভুবাচক পতিশব্দাবয়বক পরাশরবচনদ্বারা স্ত্রীলোকদিগের ভর্ত্তৃমরণাদি দশাতে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে এই মনূক্ত ভর্ত্তৃকর্ত্তৃক রক্ষণের বাধ হইলে মৃতে ভর্ত্তর্য্যপুত্রায়াঃ পতিপক্ষঃ প্রভুস্ত্রিয়া ইত্যুপক্রম্য পরিক্ষীণে পতিকুলে নির্ম্মনুষ্যে নিরাশ্রয়ে। তৎসপিণ্ডেষু চাসৎস্থ পিতৃপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ ইতি জীমূতবাহনলিখিতবচনানু*সারেণ পতিপক্ষস্তদভাবে পিতৃপক্ষঃ প্রভুর্বিধীয়তে এই প্রভুত্ববিধানান্তর মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ। তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী জানি লোমানি মানবে। তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি এই বচনদ্বয় দ্বারা বিধবাদিগের শক্ত্যনুশারে সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য এই দুই ধর্ম্ম পরাশর কহিয়াছেন।

অতএব কলিযুগে বিধবা (বিবাহ) কোনমতে শাস্ত্রসিদ্ধ হয় না। যদি যথাশ্রুত অর্থ করিয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বলেন তবে ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ এই পরাশরোক্ত যথাশ্রুত চতুর্বিধ পুত্র কলিযুগে আছে ইহা স্বীকার না করিয়া দত্তক মীমাংসাকারের মতাবলম্বী হইয়া ক্ষেত্রজপদের ব্যর্থ ঔরস বিশেষণতা স্বীকার করিয়া কলিযুগে ঔরসদত্তককৃত্রিম এই তিন প্রকার পুত্র কি প্রকারে স্বীকার করিয়াছেন।

আর ঐ পরাশরসংহিতার একাদশাধ্যায়ে লিখিত দাসনাপিতগোপালকুল-মিত্রার্দ্ধ (?) শীরিণ্য। এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ। শূদ্রকন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণে ন তু সংস্কৃতঃ। সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ। ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু য সুতঃ স গোপাল ইতি জ্ঞেয়োঃ ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন শংশয়ঃ। বৈশ্যকন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণে ন তু সংস্কৃতঃ। অর্দ্ধিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈ র্ন সংশয়ঃ।

এই সকল কলিযুগের বিরুদ্ধধর্ম্মবিধায়ক বচনাক স্মার্ত্তলিখিত আদিত্যপুরাণ ও পূর্বলিখিত কিয়দংশ পরাশরভাষ্যধৃতবচন সকলের সহিত একবাক্যতা করিয়া কলীতর পর অবশ্যই বলিতে হইবে অন্যথা যথাশ্রুত বাক্যার্থ দ্বারা পরাশরোক্ত কলিযুগের ধর্ম্ম বলিয়া অধুনা ব্রাহ্মণের শূদ্রের সহিত ভোজ্যান্নতা ব্যবহার করিলে মহাবিপ্লবাপত্তি হয় বোধ করিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশরসংহিতার একাদশাধ্যায় দেখিলে দাশনাপিত গোপালাদির সহিত ভোজ্যান্নতা ব্যবহারের ব্যবস্থাদি যে কলিযুগে চাতুর্বণ্যবিভাগ আর রাখিবে না আর এইরূপ কলিযুগের বিরুদ্ধধর্ম্ম-প্রতিপাদকবচন বৃহৎপরাশরসংহিতাতে এবং স্বল্প পরাশরসংহিতাতে অনেক আছে সে কলযুগান্তরবিশয় সেকলবচনবাহুল্যভয়ে লিখিলাম না। এবং পৌনর্ভবপুত্রে যে ঔরসপুত্রের লক্ষণ সংপূর্ণরূপে ঘটিতেছে লিখিয়াছেন সেও অত্যন্ত অসঙ্গতঃ যেহেতুক স্বেক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধিয়ং (?) তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতং এই মনুবচনে সংস্কৃতাপদোপাদানহেতুক স্বকর্ত্তৃক বিবাহজন্য সংস্কারান্বিত স্ত্রীতে স্বয়ংমুৎপাদিত পুত্রই ঔরস পুত্র অন্যথা সংস্কৃতায়াং এই পদের বৈযর্থ হয়।

দেখুন বিধবাস্ত্রী পূর্ব বিবাহ সেই (?) সংস্কৃতা হইয়াছে তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ হইলে যে পুত্র জন্মিবে তাহাকে পৌনর্ভব ভিন্ন ঔরস কোন মতেই বলা যায় না। এবং আদিত্যপুরাণাদি দ্বারা বিধবার দীর্ঘকাল (?) ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে এই জে আপত্তি দিয়াছেন সেও অসঙ্গত কেননা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যনিষেধক সাস্ত্র বিধবাতিরিক্তবিশয়ে যেহেতুক মৃতে ভর্ত্তরি

ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহনং বা এই বিষ্ণুসূত্রে ও আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী ইত্যাদি মনুবচনে বিধবার জাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য বিধান হইয়াছে অন্যথা পরাশরোক্ত বিধবার ব্রহ্মচর্য্যকল্প বিধবাবিবাহসম্পাদক মহাশয় কিরুপে স্বীকার করিয়াছেন অতএব বিধবার দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নিসিদ্ধ নয় যেমন অষ্টাব্দাদধিকো মর্ত্ত্যোহপূর্ণাশীতিবৎসর ইত্যাদি পরিচ্ছিন্নকালে একাদশীর নিত্যতাবোধকশাস্ত্র বিধবাতিরিক্তে পর্য্যবসিত বিধবার সর্ব্বকাল একাদশীর উপবাস নিত্য এইপ্রকার বচনসকলের মিমাংসা করিলেই সর্ব্বশাস্ত্রের অবাধে উপপত্তি হয় তবে যে চিরকাল প্রচলিত অনাদিধর্ম্মের বিরোধি ব্যাখ্যা করিয়া নানাশাস্ত্রের বচনসকলের বাধককল্পনা করেন সে অন্যায্যেত্যলমতি বিস্তরেন বিজ্ঞতমেম্বিতি মৈথিলদ্রাবিড়মহারাষ্ট্রবঙ্গদেশীয়ানাং সর্ব্বেষাং কাশী-বাসিনাং ধর্ম্মশাস্ত্রবিদাং সম্মতা ব্যবস্থা ন্যায়পঞ্চাননোপাধিকানাং শ্রীঠাকুর দাসদেব-শর্ম্মণাম্—

[**টিপ্পনী :** বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব' নামক দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থদুইটি প্রচারিত হইবামাত্র সারাদেশে ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। উদ্ধৃত এই দীর্ঘ উত্তরটি এদেশীয় এক পণ্ডিতকর্ত্তৃক বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে রচিত হইয়াছিল। ইহা আজও অপ্রকাশিত। মূলে অনুচ্ছেদ আকারে ভাগ করা নাই। পাঠকের সুবিধার্থে অনুচ্ছেদ আকারে এইরূপ ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।]

•এই উত্তরটি সেকালের কাগজের (২৭½ সেঃ মিঃ × ৪২ সেঃ মিঃ) ১'৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিত।

(১২)

দেবোত্তর ও মহত্রাণ জমির ভোগদখলসংক্রান্ত সেকালের একটি দলিল (বরগি হাঙ্গামাতে কাগজপত্র খোয়া যাওয়ার উল্লেখ):

শ্রীজগত রায় শ্রীপঞ্চানন বকসি ও
শ্রীসেবকরাম বকসি সাং নবগ্রাম পঃ বরদা

৭শ্রীশ্রীদুর্গা

৩৫৮২৪ নং হকিকত লাখেরাজ বাজে জমী জেলা বর্দ্ধমান সন ১২০৯ সাল—

জমির নাম	জে ব্যেক্তী দেয় তাহার নাম	জে ব্যেক্তী পায় তাহার নাম	হালদখলকারের নাম	কিষুবাদে পাইয়াছে	সনন্দের সন তারিখ	মৌজার নাম	জমির তায়দাদ	পরগণার নাম	হকিকত সনন্দের নকল
দেবোর্ত্তর	০	০	শ্রীশ্রী৺দামোদব জীউ পঃ জগত রায় ও পঞ্চানন বকসি ও সেবক রাম বকসী	শ্রীশ্রীজীউর সেবার নিমিত্তে	০	কিসমৎ সামনগর	২॥১	বরদা	দলিল দস্তবিজ
				পৌত্রিক		নবগ্রাম	/১	ঐ	
							২॥২		
হত্রাণ	০	০	জগত রায় ও পঞ্চানন বকসী ও সেবক রাম বকসি	পৌত্রিক ঘরভিটা ও ডাঙ্গাবেড়	০	নবগ্রাম	২॥	বরদা	
ঐ	০	০	জগত রায় পঞ্চানন বকসী ও সেবক রাম বকসি	ঐ	০	খিরপাই মাণিকপুর	১॥	চন্দ্রকোণা	
							৪/		
							৬॥২		

এসকল জমির সনন্দ বরগি হঙ্গামাতে ঘরদাহনা হইয়াছিলো তাহা খোওা গিয়াছে পুরুসপুরুসাহুক্রমে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি—

(১৩)

(ক) সেকালের ঋণগ্রহণ পত্র (খতপত্র)

শ্রীদুর্গা

মহামহিম শ্রীযুৎ রামতারক মুখোপাধ্যায়

বরাবরেষু

শ্রীউৎসবানন্দ দেবশর্ম্মা
সাং বিরসিংহা

লিখিতং শ্রীউৎসবানন্দ দেবশর্ম্মা কস্য বাড়িধান্য পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চ আগে মৌজে বিরসিংহা আপনকার স্থানে ॥০ আটকুড়ি ধান্য লইলাম একুনে মাহ পৌষে ৸০ বারকুড়ি ধান্য দিব এতদর্থে খত লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩১ সাল তাং ১৫ আষাড়—

ইসাদ
শ্রীরামানন্দ দেবশর্ম্মা
সাং আমদান

(খ) শ্রীশ্রীহরিজী

সন ১২৩১ সাল

মহামহিম শ্রীযুৎকৃষ্ণদেব চক্রবর্ত্তি
মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীচৈতন্য দাষ (?) কস্য ধান্যবাড়ি পত্রং মিদং কার্য্যনঞ্চ আগে মহাশয়ের স্থানে ধান্যবাড়িহ ৸ বারকুড়ি লইলম ইহার মুনাফা ।৵০ ছয়কুড়ি একুনে আঠারকুড়ি মাহা পৌউষে পরিসোদ করিব এই করারে নগদ ধান্য লইয়া খতপত্র লিখিয়া দিল্যাম ইতি সন ১২৩১ তাং ২২ শ্রাবন।

ইসাদ শ্রীচৈতন্য দাষ
কাঁগালি ঘোষ
দোলগোবিন্দ সেকরা
মথুরনা

[টিপ্পনী : সেকালে গ্রামাঞ্চলে ধান্যবাড়ি লইয়া দরিদ্রব্যক্তিকে কত চড়া সুদ দিতে হইত এই দুটি খতপত্রই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ !]

(১৪)

সেকালে বিবাহের খরচের এক হিসাব :

শ্রীরাম

বিবাহের

খঃ

পণ—১২	মুদি—১
দক্ষিণা—১	ঘাঁটাল—৷৷০
বন্দ্যোপাধ্যায়—২	ঘৃত—৷০
কুলাচার্য্য—১	গৌরী চক্রবর্ত্তি—১
সেকরা—৪	মৎস—১
বস্ত্রহাট খঃ—২৷৷০	তণ্ডুল অন্ন—১
লবণ—৷৷০	মুড়িচালু—১
কাষ্ঠ খঃ—১	অন্নচালু—৩
বালু—১	অন্নচালু—১
তেলি—১	

[**বিঃ দ্রঃ**—উক্ত হিসাবে সংখ্যাগুলি সম্ভবত টাকার অঙ্কে লিখিত। হিসাব তালিকায় কোন সন তারিখ দেওয়া নাই। দেড়শত বৎসর পূর্বের হইবে।]

(১৫)

সেকালের একটি চিঠি—পুত্রকর্তৃক পিতাকে লিখিত :

শ্রীরামঃ

শরণম

সপৌরুষযশোজনঃ সকলকর্ম্মহীনো মুদাভবৎপদমনা যদি প্রতিপমো ধিয়া গীর্পতেঃ। মনোরথরথে (?) ক্ষরিতরেণুসংগৃহ্যতে ত্রিপিষ্‌তপপতির্যথা ত্রিভুবনে তথা পূজ্যা॥ এবং ভবদঙ্ঘ্রিসরোজরজোগ্রহণভ্রমরীভূতৈকমনস্ক শ্রীরামচন্দ্র-দেবশর্ম্মণঃ প্রণতীনামানন্দবিজ্ঞপ্তিপত্রীয়ং ভবন্তকুমনবরতশ্রোতু মীহমানস্থ মমাপি সাময়িকং তৎ বিশেষঃ—সেথানেকার মঙ্গলাদি সমাচার না পাইয়া বড়ই ভাবিৎ আছি তাহা লিখিবেন ঔষধ ধারণ করিয়া কেমন আছেন তাহা লিখিবেন এবং মহাশয় কেমন আছেন। আমী বাটী হইতে আসিবার কালে বিস্ফোটক হইয়া মহা ব্যামোহ পাইয়াছি দুই চারি দিবস অজোধ্যাগ্রামে স্থিতি করিয়া কিছু ষাস্থ্য হইয়া এথান পর্য্যন্ত পহুঁছিয়াছি শারীরিক আছি ভাল। পরে

পূর্ব্বের ভট্টাচার্য্যের আগমনের বিলম্ব দেখিয়া আমী খড়দগ্রামে শ্রীযুত ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যে পড়িতেছি অনরত পাঠ হইতেছে এহা জানিবেন সংবাদ চতুর্দ্ধুরীদের দ্বারায় পাঠাইবেন কিমধিকমিতি লিপিচাপল্যং ননেতব্যমিতি—তারিখ ৩০ জৈষ্ঠস্য।

নিরন্তর পূজনীয় শ্রীরামকৃষ্ণ
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়
পিতৃচরণৈঃ
পত্র দেনা রাধানগর সান্নিকা গ্রামে

[**উল্লেখ্য ঃ** এই ক্ষুদ্র পত্রে সালের কোন উল্লেখ নাই। তবে হস্তাক্ষর দেখিয়া মনে হয় ইহা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লিখিত। পত্রটি কাহারও হস্তে প্রেরিত হইয়া থাকিবে।]

(১৬)

সেকালের শ্রাদ্ধের দুটি নিমন্ত্রণ পত্র (সংস্কৃত পদ্যে রচিত)

(ক) শ্রীশ্রীরামঃ। ভৃত্যঃ শ্রীরামগোপালতোষ দাশস্য
সাময়িকং নিবেদয়তি

ধটগেবৌ (?) পিতুঃ শ্রাদ্ধং থাগ্নিভাগে গুরৌ দিনে।
অত্রত্য কৃপয়া ধীরৈঃ সাধ্যতাং মন্নিমন্ত্রিতৈঃ।

শ্রী৬ অশেষগুণালঙ্কিত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীনাথভট্টাচার্যমহাশয়ৈঃ
সুরগুরুতুল্যোঃ

* চঃ সিংহডাঙ্গাখ্যগ্রামাৎ
* দেঃ ঘাটালাখ্যগ্রামে

[* চঃ—'চলিতঃ' অর্থাৎ সিংহডাঙ্গা গ্রাম হইতে নিমণন্ত্রপত্র প্রেরিত
* দেঃ—'দেয়ং' অর্থাৎ ঘাটালগ্রামে পত্র দিতে হইবে। এই নিমন্ত্রণপত্রটি বাহকসাহায্যে প্রেরিত হইয়াছিল।]

(খ) অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয় দেবাচার্য্যতুল্যোঃ
ওঁ দুর্গা শ্রীসুরনাথ দেবশর্ম্মা নিবেদয়তীদং।
ওঁ কালীতি জপংস্তাতঃ থর্ষাতো রসপক্ষমে।
সংসাধ্যং ওমুখং শ্রাদ্ধং সতাত্রৈত্য রবৌ মধৌ॥
বাসুদেবপুরাৎ দেয়া ভূতাখ্যগ্রাম

[দাসপুর থানার চেতুয়া বাসুদেবপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র।]

(১৭)

কবি চণ্ডীদাসের প্রাচীন পদ :

(ক) কামের স্বোরূপ : কামিনি বলএ : সাধক বুঝ একে :।
সোখির স্বোরূপে : স্বোরূপ হইয়া : একান্ত পাইল সে :॥
রাগমালা গলে : সয়ন সপনে : একথা কহিব কায় :।
সোখির স্বোরূপ : একান্তে দেখিনু : বুঝিতে বিসম দায় :॥
জার জেই ভাব : তার সেই লাভ : শ্রীরূপমোঞ্জরি স্থানে :।
চোণ্ডিদাসে কয় : রজক য়াশ্রয় : কেহো ২ ইহা জানে :॥

(খ) প্রেমরপরস : আছএে তাহাতে : বাছি নিতে জোদি পায় :
মনখিন দোন্য : জেজন ডুবএ : সেই কিছু ২ খায় :॥
তবে সিদ্ধ কোরি : সাধক বুঝহ : সেই সে সরি কযুর :।
পরসের জ্যোতি : সেই সে পেয়্যাছে : তাহার অন্তর পুর :॥
প্রেমের সোহত্র (?) : আছ এ তাহাতে : উজ্জল সোহত্র রয়: :।
তার এক কন : সাধকে পাইলে : জরা মিত্যু দুরে রয় :॥
সিদ্ধ অঙ্গ তার : সিদ্ধের স্বোরূপে : রাধার স্বোরূপ পায় :।
কহে চণ্ডিদাসে : মন প্রেমে ভাসে : রজক আশ্রয় তায় :॥

(১৮)

বরদা পরগণার আঠার শতকের কবি অকিঞ্চন চক্রবর্ত্তীর কয়েকটি ভক্তিগীতি :

কবি অকিঞ্চন ইহা ছাড়া চণ্ডীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল নামে কাব্যগুলিও রচনা করিয়াছিলেন। কবি সম্ভবত ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন।

(ক) মন কবে হবে রে শ্রীরামচরণ অভিলাসী
সদা বল সিতারাম পূর্ণ কর মনস্কাম
আনন্দে হইবে গোলকবাসি।
যেখানে রামের কথা সর্ব্ব-তীর্থ স্থান তথা
গয়া গঙ্গা সাগর বারাণসী।

রাম নামে বাজায় ডঙ্কা ঘুচায় পাতক সঙ্কা
না পরিবে সমন দমন ফাঁসি।
রাম নামে বাঁধ তরি তরিবে দুপার বারি
নাম খড়্গে কাট পাপরাশি।
কবীন্দ্রাকিঞ্চন কন সিতারাম বল মন
কর দেহ পুর্ন্নিমার সসি॥ ১॥

(খ) নয়ান কনে বালক পানে বারেক হের
যুন্যাছি পুরানে চাহিয়া নয়ানে চতুর্ব্বর্গ দিতে পার॥
তোমার বালকে ধিক বলে লোকে মা হইয়া সজ্য কর।
আমি মনে জানি জননী ভবানী কেমন পরান তোর
পাসানের মায়্যা পাসান সে হিয়্যা পুত্রে পাস্থরিতে পার।
থাকিতে জননী হইল এমনি স্মরণ লইব কার॥
বেদে যুন্যা কোই দুর্গা দয়ামোই তরঙ্গে তারিণী তার।
কবীন্দ্রের কথা যুন গিরিজাতা অধম তারিতে পার॥

(গ) গো জননী স্বকৃতি তরে আপন গুণে।
অকৃতি জনেতে পার মা তারিতে তারিণী নামটি লোকে মানে॥
ঋষির বচন যুধার সমান সকল দেবতা কর্ণে যুনে।
বোবার বাণী বিনে জননী অন্যের মাতা নাক্রি জানে
দুর্গা নাম্নি মোক্ষধাম্নি ক্রিয়া সমস্তা বেদে ভনে।
তায় গুরুর কথা নগের যুতা সার কর্য্যাছি প্রাণপণে॥
দিজ অকিঞ্চন করে নিবেদন দুর্গাদেবীর শ্রীচরণে।
তোমার চরন পতিত পাবন স্মরণ দিয়্য অন্তদিনে॥

(১৯)

বর্ধমানরাজার সভাকবি চন্দ্রকোণা 'ভেয়েরবাজার' নিবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত "মূলসঙ্গীতাদর্শ" গ্রন্থের দুটি সঙ্গীত ঃ

(বিধবাবিবাহ বিষয়ক)

(ক) বিভাস—তাল আড় খেমটা।

যে তরঙ্গ উঠেছে বিদ্যাসাগরে।
কত রঙ্গ হবে নগরে॥

আদৌ প্রেমামৃত, বদন চন্দ্রামৃত, লাবণ্যলক্ষ্মীযুত ;
হবে উদ্ভব কুচ ঐরাবত বিধবারূপরত্নাকরে ॥১
এ তরঙ্গ প্রকাণ্ড, ব্যাপ্ত কোরে ব্রহ্মাণ্ড, ইহার বেগ গেল ইংলণ্ড ;
যে এ পক্ষেতে রত পায় অমৃত, বিষ হতেছে পক্ষান্তরে ॥২
শুনিতেছি অদ্যাবধি, মন্থনবারিধি, সে দেবাসুরের বিধি ;
এতে দেববিরোধী নিরবধি, কেবল যা করিবেন ঈশ্বরে ॥৩

ঈশ্বর যাতে অনুকূল, দেব্ তাতেই প্রতিকূল,
এ বিবাহের এই মূল ; কোরে গুণবিধান
দিতেছে টান বিধি মন্থর পরাশরে ॥৪

দেখচি করে পরীক্ষে, এ বিবাহের পক্ষে,
সাপক্ষ আছেন অনেকে ; বিধবা সহাস্যে
আছে বসে, হাত দিয়ে কর্জ্জলাধারে।
দেখে ভাসে রঃ পঃ বঃ, কথা কেমনে কব, এ
সম্ভব কি অসম্ভব ; বিচারানুসারে বলে কারে,
আগে দেখিব পরে পরে। [মূলসঙ্গীতাদর্শ, পৃঃ ৯৬—৯৭]

(বাষ্পীয় শকট বিষয়ক)

(খ) বিভাস—তাল আড়া খেমটা
কলের গাড়ি কর্য়ো কল্লে চমৎকার।
এ কলের সন্দি বুঝে সাধ্য কার ॥
কে শুনেছে কোন যুগে, বায়ু থাকে এর বেগে,
গাড়ির পশ্চাৎ ভাগে ; যাতায়াতে সস্তা সুব্যবস্থা
ইহার রাস্তা সুতার সঞ্চার ॥১

শুনা আছে পুরাণে, দ্রুত যেতো বিমানে,
পক্ষরাজের গুণে ; এতে নাই সে পক্ষ কল্লেম
লক্ষ্য কেবল জল অনল এর সহকার ॥২

এ গাড়ি আরোহণে, সন্দেহ হয় মনে, দেখেছি
চক্ষে কি স্বপনে : এমনি দ্রুত চলে দণ্ড পলে
এক দিনের পথ করে বিহার ॥৩

কি সুগম কি সুবিধান, যাহার যেমন সম্মান,
সে তেমনি প্রাপ্ত হয়েন স্থান, ফাষ্ট্ সেকেণ্ড
থার্ড ক্লাব ইহার ধাম হয়েছে তিন প্রকার ॥৪
হৈথতে ক্ষুদ্র আকৃতি, বলে মহাপ্রকৃতি,
তেমনি তার গতি বেগবতী ; পাছায় যুথে যুথে
গাড়ি যুতে ঐ কল আপনি চলে অগ্রসার ॥৫
ইষ্টেষেণ দুয়ারে, এক মাভৈ রব করে,
করীরবের আকারে ; অন্তরীক্ষেতে দেখতে দেখতে
পলকেতে হয় অন্ধকার ॥৬
এর সঙ্গে তুলনা, তার কথা তুলো না
এই গাড়ি হয় তুলনা ; যেমন রামরাবণের যুদ্ধোপমা
রাম রাবণ তুলনা তার ॥৭
ভণয়ে রমাপতি, চন্দ্রকোণা বসতী, বর্দ্ধমানে সম্প্রতি
বর্দ্ধমানের অধিপতি চন্দ্র স্বহায় হলেন যায় ॥৮

[মূলসঙ্গীতাদর্শ : পৃঃ ৯৩—৯৪)

(২০)

ঘাটাল অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি তুষুগান :

(ক) আম খেতে সাধ গেল লালুবাবুর বাগানে
আম খেয়ে ফেললাম আঁঠি বড় নদীর মাঝখানে
বড় নদীর হুড়হুড়ানী ছোট নদীর ফেনা গো
ফেনা ছেঁকে করবো মিঠাই রাজার ব্যাটার জন্যে গো
রাজার ব্যাটা রাজসন্ন্যাসী সজ্‌নেতলায় যেও না।
সজ্‌নেতলায় কুটিল আছে পান দিলে খেও না।

(খ) বিষ্টুপুরে গেছলেন তুষু কি কি শাড়ী উঠেছে
এল্‌পার আর নাইলেক্স্ শাড়ী তুষুর মনে লেগেছে
রাধানগর যে গেছলো তুষু অনেক কষ্ট পেয়েছে
আঁকা বাঁকা জিলিপি ছাঁকা (তবু) তুষুর মনে লেগেছে
তুষুর ছিল দশটি টাকা জিলিপি কিনে এনেছে
তুষুর মায়ের ছেলেমেয়ে মজা করে খেয়েছে।

(গ) একটা মন্দির দুটি মন্দির মাঝের মন্দির করা গো
ডুরে মন্দির গড়ে দেব যমুনা মায়ের ধ্বজাকে
ধ্বজায় উঠলাম দেখতে পেলাম বর্ধমানের রাজাকে
রাজার গলার গড়া মালা রানীর গলায় বেলকুঁড়ি
এই বেলকুঁড়িটি কে গাঁথিল বামুনদের বউ রজনী।

* * এই তুষুগানগুলি ঘাটাল থানার রাধানগর ও তার আসপাশের অঞ্চলে বেশ প্রচলিত আছে। গানগুলি ঐ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

(২১)

স্বর্গত **পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ**-রচিত কয়েকটি গান। তাঁহার রচিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বহু গান আছে। গানসমূহের বেশ কয়েকটি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে কয়েকটি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গান উদ্ধৃত হইল :

(ক) তব মন্দিরতলে চলে বন্দনাগান
তবু আতুর অধীর কেন আকুল পরাণ
সীমাহীন অম্বরে কারা-বন্ধন
আনন্দকন্দরে ঘন ক্রন্দন
জাগ্রত তুমি, তবে ভুবনে স্বপন কেন ?
আঁধারে আলোর অভিযান।

না চাহিয়া পায় কেহ, না পায় চাহি'
ভীরুতায় জয় কভু সাহসে নাহি
অভেদে ভেদের গীতি নীরবে গাহি
রহ, সম্মুখে গোপন মহীয়ান্।

কুহেলীলীলায় মোরা আপনহারা
ছলনায় দূরে যেন আনে কাহারা
সহসা লুকায় শশী তপন তারা
কর, অপরূপ রচনা বিধান ॥

(খ) **ভজে ভারতীম্**

ভজে ভারতীম্ ভজে ভারতীম্
মানবমণ্ডলমেলনমন্দিরবিশ্বজনৈকগতিম্।
চিত্রলভূতলরূপপ্রতিচ্ছবি সিন্ধুমহাদ্রিমতীম্॥
কাননকুন্তল শৈলজশৃঙ্খল রুদ্রমরুচ্ছদধূসর নির্জল
শ্যামল কোমল শক্তিদশাদ্বল সাগরসৈকততুঙ্গহিমাচল
চন্দনবাসসমীরসুশীতল চামরবীজন জহ্নুসুতাজল
সর্বমনোরথপূরকপ্রোজ্জ্বল শান্তিসুখাদিমতীম্ (শান্তিসুখং দদতীম্)
ন্যায়সুমোদিতনায়কশাসন শিল্পকলাকুলভূমিবিমোহন
জ্ঞানপয়োনিধিমন্থনকারণ তাপসসংঘনিকেততপোবন
শর্মবিধানকবোধনঘোষণ কর্মসুধর্মসুরাসুরতোষণ
জাল্মজনার্জিততামসরোধন জাগ্রতমুক্তিপথাশ্রিতশোভন
সেবকসজ্জরতিম্।
বঙ্গবিহারকলিঙ্গককোশল গুর্জরমদ্রসুরাষ্ট্রককেরল
কাশ্মীরকান্ধ্রকপঞ্চনদোৎকল উত্তরদেশআসামনেফাঞ্চল
রত্নদদেশবতীম্॥
কৃষ্টিবিভিন্নমহৈক্যবিধায়ক ধর্মবিভেদসুকর্মবিধায়ক
জাতিসমূহনিবাসসুদায়ক হূণশকাদিকভীতিনিবারক
নেতৃদলপ্রগতিম্।
শত্রুনিষূদনমন্ত্রনিহিংসন সত্যসহায়ক সৈনিকসজ্জন
সাধনশোষণবন্ধনমোচন প্রেমপুরঃসর বাঞ্ছিতকার্জুন
দুর্জনতাবিরতিম্।
ভারতভারত দীপ্তি শুভাগত মৌনপুরাতননূতনসংগত
শাশ্বতপৌরসুগৌরবকার্জিত সর্বগণেপ্সিত মার্গসুবিস্তৃত
স্বাগতমুক্তিমতীম্।

ভজে ভারতীম্॥ *

(গ) কীর্তনে আর বাউল গানে বাংলা মা তুই গলাস প্রাণ
মায়ের নামে মাতায় ভুবন রামপ্রসাদীর মধুর তান।
মৃদঙ্গ তোর মন্দ্রমুখর একতারাতে হরষ নিঝর
মন্দিরা তোর মন্ত্রে মাতায় আনিয়ে আবেগ ভাবের বাণ
শিল্পীরা তোর দেউল রচে পুত্তলিকায় পুলক খচে
তায় জনতার তন্ত্রী নাচে তাতেই বাঁচে বেদপুরাণ।

লাঙল করে মাথায় টোকা ফলায় চাষী সোনার থোকা
পল্লীনগর তাই অলকা, তারাই রাখে জীবন মান।
ন্যায়স্মৃতি আর তন্ত্ররসে, বাংলা মায়ের বদন রসে
কৃত্তিবাসের কীর্তিবশে, গায় রামায়ণ জাতির গান।
সিং শশাঙ্ক পাল-আমলে বীর বাঙালীর মল্লদলে
গড়ল বিশাল বাংলা বলে ভারতভরা তার প্রমাণ।
সাগরপারের সুদূর দেশে, চালিয়ে তরী হাওয়ার রেশে
আনতো বণিক সওদা শেষে, কতই রতন করতে দান।
নতুন যুগের দামাল ছেলে, সেই অতীতে দিস না ফেলে
কালের কলুষ ফেলিস ঠেলে আবার তোরা হোস মহান্।

(ঘ) বেদনার গান

রাগ : দেশ তাল : একতাল

(আমার) বেদনভরা আঁখির কোণে অশ্রু যদিই ঝরে,
(তখন) তুমিই এসে মুছিয়ে দেবে তোমার আপন করে।
আসবে পথে শতেক বাধা কাঁপবে হিয়া গুরু
তাই বলে কি যাত্রা আমার আজ হবে না সুরু ?
পথের সাথী হারিয়ে যাবে হয়তো আমায় কাঁদতে হবে
ভরসা দিতে কেউ না রবে বিজন বনের ধারে
(তখন) তুমিই আমার সঙ্গে যাবে সুগম সুপথ ধরে।
ক্লান্তি এসে অলস বেশে হরবে আমার মন,
হয়তো ভীতি করবে আমায় পথেই অচেতন।
তাই বলে কি অবশ প্রাণে রইব বসে আপন মনে ?
পারবো না তা ছুটবো আমি আকুল আবেগ ভরে—
দেখবো তুমি দাও কি না দাও আসতে তোমার ঘরে ॥**

সংকেত :

* এই গানটি অধুনালুপ্ত "শ্রীভারতী" পত্রিকায় ১৩৫৪ আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

** এই গানটি "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র ১৩৩৩ সালের (ইং ১৯২৬) ভাদ্র সংখ্যার ১২৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

দাসপুর অঞ্চলের প্রাচীন কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রচিত 'শীতলামঙ্গল' পালা গানের অংশ বিশেষ :—

(ক)

আড়েদিকে পঞ্চাশকোটি জোড় জমি থান।
তার নাভিস্থল স্থকোমল বর্দ্ধমান॥
রাজ কীর্ত্তিচন্দ্র মিত্রিসেন সহদর।
কীর্ত্তিচন্দ্র পুত্র চিত্রসেন ধমুর্দ্ধর॥
ব্রাহ্মণ্য পরগণা সবাহান্ন লক্ষ জমিদার।
সালির লবাব পশ্চাৎ পুরস্কার॥
মিত্রিসেন পুত্র তিলকচন্দ্র মহাশয়।
তেজচিত্র বাহাদুর জাহার তনয়॥
রাজাধিরাজেন্দ্ররাজা রাজ রাজেশ্বর।

সাকিম খেপুত পরগনে মানকুর।
রাইনৌজে খেপুত তরফ দাসপুর॥
বর্দ্ধমানে বীরসিংহ সাধু ধুসদত্ত॥
খেপুতে খেপাইচণ্ডী করিল প্রবর্ত্ত॥
খেপুতে খেপাই আগে ফিঙ্গারাজার পারে।
বড়খান গাজীসাহেব বিক্ষ্যাৎ তদন্তরে॥
বিস্তর ব্রাহ্মণগণ খেপতের মতি।
বির্দ্ধ বিগ্যান্ত জেমন বিদ্যাপাতি॥
সর্বেশর্বগুনান্বিত...............।
দেবরিসি ব্রহ্মরিসি রাজঋষি বাস॥
রামগোপাল ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।
পরম পণ্ডিত পূজা সর্বরাজ্য রাজ্য॥
সার্থকরাম তর্কভূষন মহাশয়।
জাহা [র] অগ্রে সারদা সদা ভূবন বিজয়॥
কাঅস্ত কৈবর্ত্ত নাগ মাইতি দুইঘর।
পূর্ব তালুকদারগণ খেপুতে ঈশ্বর॥
নাগস্থমতিরাম রামনাগ আদি।
পুত্রস্নেহে আমারে পালিল নিরবধি॥

রাধাবল্লভ মাইতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার।
মোর পিতামহে পূর্বে সঁপিল ভাণ্ডার॥
খনিমধ্যে খেপতে খেপাই অবগাহন।
প্রধান পূজারী আজ্ঞা গোপাল পঞ্চানন
সর্বময় মহাশয় শুকদেব রায়।
জমিদার·········গুপ্তি ব্রত্তিপ্রায়॥
বেদে ব্রহ্মা বিধানে যেমন বৃহস্পতি।
কবিশক্তি জেমন সাক্ষাৎ সারস্বতী॥
রূপাইতন্ত গুণে সিন্ধু তেজে দিবাকর।
··························॥
কৃষ্ণ জার ব্যাস দাস আদি নল নির্বন্ধে।
ভনে কৃষ্ণকিঙ্কর তব পদমারবন্দে॥

(খ)

কিঙ্করের "শীতলার জন্মপালা" পুথির অংশ বিশেষ:

"মণ্ডলঘাট পরগণে মানকুরু অনুবন্দ।
বর্দ্ধমান চাকলা নরেন্দ্র তিলকচন্দ॥
খেপুতি ভাটডা তড়া গপালনগর।
বন্দস্থল শ্রীবরা সমাঝ মনহর॥
সেই পঞ্চপাটে পঞ্চ ভট্টাচার্য্য বন্দি।
তবে ত করিল কবি কবিত্তের সন্দি॥
রুক্তিকান্ত ভট্টাচাজ্য ভাটরা বসতি।
বেদেব্রহ্মা বিধানে জেমন বৃহস্পতি॥
তার আজ্ঞা রঙ্গে ভাঙ্গ্যা সার্ব্বভোউম···।
রামাঅন রচি পুরি দাহ সপুস্তকে॥
গঙ্গেশ্বর ভট্টাচাজ্য গপালনগর বাসি।
সর্ব্বসাস্ত্র জোগে জেন স্তক্রাচাজ্য রিসি॥
কৃপা করি তিনি মোরে দিল দির্ব্বজ্ঞান।
তার আসির্ব্বাদে বাতে আমার কল্যাণ॥
রামকৃষ্ট ভলানাথ ভট্ট্যাচাজ্য স্তাম।
সির্দ্ধবির্দ্ধ বিদ্যা বেদ্যান্ত শ্রীবরা মাঝে ধাম॥

প্রথম কবিত্বভাগে মোরে শুভ পিত।
সত দ্বিজে আসির্ব্বাদ সগোষ্ঠি সহিত ॥
বাঞ্ছারাম বিদ্যাবাগিস স্বিয় ভাটড়া।
বিধি বেবস্তাঅ বুধ নাঞিজ্জার বাড়া ॥
লিলকণ্ঠ নন্দন আদি পরম পণ্ডিত।
পিতাপুত্রে শিখাইল নানাশাস্ত্র নিত ॥
রামগপাল ন্যাঅ পঞ্চানন ভট্টাচাজ্য।
ক্ষেপতি কিষ্টবাটি বাটি পূজ্জ রাজ্য ॥
অেকি গ্রামে বাসবাস অস্বব চৌড়পাতি।
নানা সন্ত্র তত্র নিত্যে য়াসি খিপতি ॥
সার্থকরাম তর্কভুসন ভট্টাচাজ্য।
সর্ব্ব সাস্ত্রে সুবিদিত সর্বস্থানে পূজিত ॥
সুকুদেব রাঅ মহাসঅ মাহাসঅ সুপণ্ডিত।
জার মুখে সুধা কিষ্টকিংঙ্কর কবিত্ত ॥”

(২৪)

চন্দ্রকোণার কয়েকজন গীতিকার ও তাঁহাদের রচিত অপ্রকাশিত কয়েকটি গান :

শিবু দে

(ক) **পূর্বরাগ**

[কৃষ্ণের উক্তি]
বলরে সুবল এ ধনী এ কার কুলকামিনী ?
দুকূল আড়ে ঝলকে যেন জলদে স্থির সৌদামিনী
দ্বিরদপতি জিনিয়ে গতি ভাবিনীকে ভামিনী
লখিতে নারী এ কুমারী হবে কি রাজনন্দিনী ?
ব্রহ্মাণী না ইন্দ্রাণী ললনা কে নিতম্বিনী
তুলনা দিতে ভুবনে নাহি অসীমরূপধারিণী
স্বর্ণ জিনি বর্ণ ধ্বনির কর্ণ জিনি গৃধিনীকে
সুপর্ণ নাসিকা জিনি সুবদনীর নাসিকে
নাসার তলে বেসর দোলে হীরকমণি কণিকে
ধনীকে হেরে লজ্জা পেয়ে মদন লুটায় ধরণী

আমারে হেরে মদনমোহ হইয়ে পড়ে ভূতলে
আমারে মোহ করিতে কেহ না দেখি মহীমণ্ডলে
নয়ন মন প্রাণ মম এরূপে সব ভুলালে
গোলোক ত্যজি এলেন বুঝি ব্রজে শ্রীরাধা বিনোদিনী
শারদ শশীর দিব কি ইহার শ্রীমুখ শশীর তুলনা,
দিবসে তিনি মলিন থাকেন তুলনা দেওয়া হল না।
সরসীরুহ উপমা দিলে প্রকাশ নাহি নিশাকালে
শিবু দে বলে পদকমলে সকল উপমা নিছনি।

(খ) [সুবলের উক্তি]
চেন না সখা এ ধনী
এ যে বৃকভানুর নন্দিনী!
গোলোক ত্যজি বিরাজে ব্রজে সহিত ব্রজরসনা
হারায়ে নীলকান্তমণি মণিহারান যেন ফণী
সৌদামিনী যেন বিহরে ছাড়া হয়ে কাদম্বিনী
গোলোকে গোলোকপতি বামে স্থিতি ইঁহার নিত্যধামে
গোলোকপতি অন্বেষণে এসেছেন ধনী বৃন্দাবনে
গোলোকপতি মিলনে মধুররস আস্বাদনে
ভক্তে ভক্তি বিতরণে ব্রজে শ্রীরাধানাম ধারিণী
এ নারী লীলা প্রকাশিবে রাসাদি মহামহোৎসবে
শ্রবণে গানে ভক্তগণে প্রেমানন্দে উথলিবে
পুরাণে ব্যাস লিখে নিবে যাবৎ মেদিনী থাকিবে
গোলোক সদৃশ হবে এ বৃন্দাবন ধরণী
ভক্তিময়ী মূর্ত্তি দেবী মহাভাবস্বরূপিণী
জন্ম কর্মলীলা ইঁহার প্রেমভক্তিপ্রদায়িনী
ভক্তজনে ভক্তি দিতে এসেছেন ধনী গোলোক হতে
শিবু দে বলে পারবে চিনতে পূজিলে চরণ দুখানি॥

কবিপরিচিতি ঃ শিবু দে (শিবপ্রসাদ দে) চন্দ্রকোণার ইলামবাজারের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সুন্দর সুন্দর শ্যামসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। গানগুলি আজও অপ্রকাশিত। কবি প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তিনি ভাগবতের পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

(২৫)

অখিলচন্দ্র দাঁ

চন্দ্রকোণা গাজিপুর নিবাসী অখিলচন্দ্র দাঁ শরাকতাঁতিজাতীয় ছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ ও দুর্গা বিষয়ক অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। গানগুলি আজও অপ্রকাশিত।

(ক) শ্রীমতীর মান

(ভক্ত বলিতেছেন) সাজে না সাজে না অভিমান
ইন্দুনিভাননে মদনমোহনে বিন্দুবরিষণে কর করুণাপ্রদান
নীলনলিনখঞ্জনগঞ্জনঅঞ্জননয়ন অনুরাগে রঞ্জন
রঞ্জকঞ্জবরসম গুঞ্জহারমঞ্জু আজি কুঞ্জে হয় ম্লান
অনঙ্গ এ অঙ্গ দোহিছে আতঙ্কে মুখমধু দানে
ধনি, ভীতজনে কর ত্রাণ।
কদম্বকোরকসম পয়োধর চঞ্চলকরযুগ স্ফুরিতবিম্বাধর
সুধাপানআশে অধীর নয়ন মনচকোর
মুখ অরবিন্দ প্রতি মনোভৃঙ্গ ধায় মধুস্বরে গায়
রাখ রাঙ্গা পায় নিরুপায় ধরি ও যুগল পায়
কিশোরী করুণা করি অভিমান পরিহর পড়ি পদতলে
কাঁদে রাধা বলে আকুল অখিল প্রাণ ॥

(খ) শ্রীমতীর অভিসার (রাগ বেহাগ কয়ালী)

মুখশশী মধুর হাসি রূপসী রাধা মোহনবেশী
পরি' নীল অম্বর মতিগুঞ্জহার মঞ্জির রুণু রুণু,
শব্দ প্রকাশি' গোকুলচন্দ্র গোবিন্দমনোহারিণী
মোহিতে মদনমোহনে চলিল বিনোদিনী ;
ঢল ঢল প্রেমতরঙ্গে ভাসি
কিবা গজেন্দ্রগতি গমনে মাতি আনন্দে কুঞ্জবনে,
ত্রিভঙ্গ দরশনে অগুরুচন্দনে করবী কাঞ্চনে—
মালতীরঙ্গণে নানা ফুল গ্রন্থনে,
চঞ্চলচপলা মম অঞ্চলেতে বন্ধনে,
হেরিতে অখিলবন্ধু চলে ধনী কাননে রূপেতে তিমির নাশি' ॥

(গ) **আগমনী** (সুর : সুরাটমল্লার ঝাঁপতাল)

(মেনকার উক্তি) বল কেমনে হরভবনে হরমনমোহিনী ছিলে
হর মম দুখহর শুনি বারতা শ্রুতিমূলে
শুনি মা জামাতা হর পরিধান বাঘাম্বর
ভস্ম মাখা কলেবর শোভিত ধুতুরাফুলে
অন্ন তার নাহি ঘরে সতত শ্মশানে ফিরে
বৃষভবাহনে চরে বিষাণডমরু ধরে
অসম্ভব কথা শুনি অন্য জায়া সুরধুনী
ভালবাসেন ত্রিশূলপাণি তাই রেখেছেন শিরে তুলে
নরকঙ্কালমালা গলে অঙ্গে ভুজঙ্গ দুলে
রঙ্গে ভূত সঙ্গে চলে আতঙ্কে আকুল প্রাণী
নাহি কিছু বৈভব সদা ভিক্ষা করে শিব
শুনি বারতা ঐসব অখিল দহে দুখানলে।

(ঘ) **বোধন** (রাগ সিন্ধুড়া তাল একতালা)

মা তব বোধন এ বোধ কেমন
অবোধ জীবে ডাকে জাগো মা জননী
কে তোরে জাগাবে জগদ্বাসী জীবে
তুমি যে মা যোগনিদ্রাস্বরূপিনী
মহী গন্ধ শিলা ধান্য দূর্বাদল
অখণ্ডকদলী পুষ্প গঙ্গাজল
সিন্দুর কজ্জল শঙ্খ নিরমল অলক্ত চন্দন রজত রজনী
লৌহ চামরদীপ আরতি দর্পণ দধিঘৃতসূত্রহরিদ্রারঞ্জন
ইথে কি মা তোর হয় গো বোধন
না জানি কেমন শিব সিমন্তিনী
তুমি মূলাধারে সুষুম্নার দ্বারে
রেখেছ জননী আচ্ছাদন করে
ভক্তিহীন নরে কেমনে মা তরে
জাগাইবে বল বিনে তত্ত্বজ্ঞানী।
জাগো জগদম্বে, আদি অবিলম্বে
অখিলের প্রতি কৃপা অবলম্বে
জাগো মা মঙ্গলে আজি বিল্বমূলে
মূলাধারের মূল কুলকুণ্ডলিনী

(২৬)

নদের চাঁদ বারিক

চন্দ্রকোণার রঘুনাথপুরে শরাকতাঁতিবংশীয় নদের চাঁদ বারিক একজন প্রসিদ্ধ গীতিকার ছিলেন। জন্ম ১২৬৭ সাল, মৃত্যু ১৩৩২ সাল।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বর্ণনা : রচনাকাল—আনুমানিক ১৩২০ সাল

কনকরুচি বরণ শুচি শ্রীশচীনন্দন গোরা
নব উদিত অরুণ জিনি অম্বর অন্তর হরা॥
পদকমল জিনি কমল কত ভকত মধুকর।
মধুপান আশে সবে বসিতেছে নিরন্তর॥
রুণু রুণু রবে মধুর বাজিছে স্বর্ণ নূপুর।
নখর হেরে নিশাকর লাজে হৈল জ্যোতিহারা॥
আন্দোলিত মালতীমালে পরি সব হৃদি সরোজে
বাজুবন্ধ তাড়বালা আজানুলম্বিত ভুজে॥
কামিনীকুল আকুল মন মধুর হাসি মুখাম্বুজে।
তিলক হেরি' ত্রিলোক মাঝে যুগ্মভুরু মনোহর
কনককুণ্ডল কর্ণে কিবা শোভা বলিহারি!
চাঁচর চিকুরে চূড়া মল্লিকা শোভা তার উপরি॥
চিতচোর চূড়ামণি চূড়ান্তরূপ মাধুরী।
চরণ আশে চিরদিন নদী চিন্তে হল সারা॥

(২৭)

প্রবোধচন্দ্র সরকার

চন্দ্রকোণা-নিবাসী 'শালফুল' উপন্যাস-রচয়িতা প্রবোধচন্দ্র সরকার '**বিবিধ সঙ্গীত**' নামে একটি সঙ্গীতগ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থে প্রকাশকালের কোন উল্লেখ না থাকিলেও ইহা 'শালফুল' উপন্যাসের পূর্বে রচিত হইয়াছিল মনে হয়। প্রবোধচন্দ্রের ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র সরকারকর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত "দেওয়ানী আদালতের পদাতিক কার্যবিধি" নামক একটি গ্রন্থও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঐ গ্রন্থটি ১৩০২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। নীচে "বিবিধসঙ্গীত" গ্রন্থ হইতে কয়েকটি গান উদ্ধার করা হইল :

(ক) **আধ্যাত্মিক সঙ্গীত**

সুর—কানেড়া আড়া

ভ্রান্ত পথিক মোরা, ভ্রমিছি ভব প্রান্তরে।
বারি আশে ধাইতেছি মায়া মরীচিকা হেরে ॥
নাহি পাই বারি লেশ, সহি যাতনা অশেষ,
মায়াবিনীর মায়াপাশ, তবু নারি ছিঁড়িবারে ॥
পাইবে শান্তি সলিল, পাবে ছায়া সুশীতল,
সুপথে মন যদি চল, মহামায়ার পদ ধরে ॥

(খ) **সুর : মূলতান আড়া**

নিদয়া হইয়ে তারা যন্ত্রণা আর দিবে কত।
পড়িয়ে কুমতির করে কাঁদিতেছি অবিরত ॥
বিবেক আলোক ছিল, যৌবন ঝড়ে নিভিল,
জ্ঞান বুদ্ধি আঁখি দুটী হয়েছে বিকল,
ভীষণ আঁধার ঘোরে, দিবানিশি মরি ঘুরে
দিশাহারা হয়ে তারা, ভ্রমিতেছি ভ্রমপথ ॥

(গ) **সুর : আলাইয়া ঝাঁপতাল**

সেই ত যমুনাকূল, সেই ত শোভে গোকুল,
সেই বিনোদিনীকুল, এখনও ত বিহরে।
সেই ত কানন মাঝে, কুসুম রয়েছে সেজে,
সেই পিক মনসিজে, এখনও ত ডাকেরে।
তবে মনে হয় কেন, কি নাই কি নাই যেন,
কোথা সে গোকুলধন, গোপিনীমোহন রে।
গোকুলের সে আকাশে, সে শশী না পরকাশে
ঢেকেছে তমসাপাশে পূরব মাধুরী রে ॥

(ঘ) **আগমনী**

তাল (পোস্তা)

আসবে না আর আমার উমা, আরোহিয়ে ইষ্টিমারে,
ঝড় তুফানে অনেক বিপদ জলপথেতে ঘটতে পারে।
লাট সাহেবের হুকুম নিয়ে, রেল ফেলে পথ বেঁধে দিয়ে
ট্রেনে করে আপনি গিয়ে, আমার উমায় আনব ঘরে ॥

বায়না দিব হেমিল্টনে[১] গড়বে গয়না নিউ ফেশনে,
সেজে উমা ঘড়ির চেনে ঘুরবে কত আসর মেরে।
দেশী শাড়ীর নাইক শুমার, পরবে না তা উমা আমার,
গাউন পরে দিবে বাহার, পায়না[২] ধরবে কমলকরে।
ধূপধুনার ধূম লাগলে গায়ে, উমা যাবেন কালো হয়ে,
লেভেণ্ডারের[৩] শিশি নিয়ে, ঢালবে উমা যত পারে।
উমা নয় গরীবের মেয়ে, খাবে না সে সিদ্ধিগুলে,
আনি দিব ব্রাণ্ডি ঢেলে, আমার উমার বদন ভরে॥

[টিপ্পনী : এই গানটি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সেকালের "বঙ্গবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তদানীন্তন কিছু কিছু ঘটনার ইঙ্গিত আছে মনে হয়। ঐ সময় জোর গুজব চলিতেছিল যে মেদিনীপুর হইতে চন্দ্রকোণার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দিয়া রেল লাইন পাতা হইবে এবং নিরাপদে অল্প সময়ের মধ্যে রেলে কলিকাতা পৌঁছান সম্ভব হইবে। সেই সময়ে খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মধর্মাবলম্বিনী হিন্দু রমণীদের প্রতিও ইহাতে ব্যঙ্গোক্তি করা হইয়াছে।]

১ সে যুগে ইংরেজ জুয়েলার কোম্পানি

২ 'পায়না' কি বস্তু বোঝা যায় না (শব্দটি সম্ভবত 'আয়না)

৩ পারফিউমারী

(২৮)

যজ্ঞেশ্বর সিংহ

চন্দ্রকোণার গোঁসাইবাজার-মহল্লা নিবাসী ইনি একজন স্বভাবকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত কয়েকটি গীত :

(ক) শ্যাম-শ্যামাসমন্বয় বিষয়ক

দানব নাশিতে শ্যাম তুমি শ্যামা হয়েছ,
কমলাসেবিত পদ হরহৃদে দিয়েছ।
পীতাম্বর পরিহরি হরি হলে দিগম্বরী,
বনমালা বিনিময়ে মুণ্ডমালা পরেছ।
রাধা রাধা নাম ছাড়ি বদনে হুঙ্কার করি
করের বাঁশী তেয়াগিয়ে, কৃপাণ করে ধরেছ
ভণয়ে যজ্ঞেশ্বর, ওহে প্রভু গদাধর,
অসি ত্যজি বাঁশী ধর, পূর্ব্বে যেমন ধরেছ॥

(খ) জাননা রে মন পরম কারণ
শ্যাম কভু শ্যামা হয়।
কভু ধরে বাঁশী কভু ধরে অসি,
চাঁচর চিকুর সমরে এলায়।
চন্দন ত্যজিয়ে, রুধির মাখিয়ে,
দানবচয়ে দেখান ভয়,
আবার ত্যজে অসি, বাজায় বাঁশী,
শ্রীরাধার মন হরিয়ে লয়.
যে রূপের যে জনা, করে আরাধনা,
সেইরূপে তারে তাঁর কৃপা হয়
যজ্ঞেশ্বর ভণে, ও চরণ বিনে
দিবাকরসুত ভয় নাহি যায়।

(গ) তুমি কত রঙ্গ জান হরি,
তোমার ভাব দেখে যে ভেবে মরি।
কভু তুমি ধর চক্র হে,
আবার তুমি যে অসিধারী।
অযোধ্যাতে রামরূপে, দশস্কন্ধ
বিনাশকারী,
আবার শ্যামরূপে বৃন্দাবনে,
হও যে প্রভু বংশীধারী।
আবার দণ্ডকমণ্ডলু ধরে,
নদীয়ায় হলে অবতারি।
দ্বাপর লীলার সঙ্গিনী সব
অসংখ্য আহিরী নারী,
এখন গোস্বামী মোহান্তরূপে
তারা সবাই হল সহচারী।
(এখন) নাচে সবে হরিবোলে
বাহু তুলে, নয়ন বেয়ে পড়ছে বারি।
অন্তিমকালে পায় যেন হে
যজ্ঞেশ্বর ওই চরণতরী॥

স্বাধীনতাসংগ্রামে ঘাটাল মহকুমার উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১৮৮৫ বোম্বাই এ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। মেদিনীপুর জেলার প্রতিনিধি জাড়ার যোগেন্দ্রনাথ রায় ও কেঁচ্‌কাপুরের বিহারীলাল সিংহ। কংগ্রেসের জেলা সংগঠনে ঘাটালবাসীদের যোগদান ও প্রাধান্য।

১৮৯৯ ঘাটালে প্রথম প্লেগের উপদ্রব। গড়প্রতাপনগরে প্লেগ হাসপাতাল ও প্লেগের মামলা।

১৯০১ মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রতিনিধিপ্রেরণ।

১৯০৫ নানাস্থানে স্বদেশী আন্দোলনের সমিতি গঠন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান ও বিভিন্ন স্থানে কর্মতৎপরতা।

১৯০৬ মেদিনীপুরে আয়োজিত কৃষিশিল্পপ্রদর্শনীতে স্বেচ্ছাসেবকদলের অধিনায়ক সাতকড়িপতি রায়। রামজীবনপুরের হরিদাস দের পুলিশী অত্যাচারে মৃত্যু। জেলাসহরে প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রতিনিধি-প্রেরণ। বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে ঘাটালের প্রতিনিধি যতীশ ঘোষ ও আরও একজন পুলিশের লাঠিতে আহত।

১৯০৭ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের চেষ্টায় ঘাটাল অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে কংগ্রেস সংগঠনের বিস্তৃতি। নানাস্থানে অনুশীলন-সমিতি ও অন্যান্য বৈপ্লবিক সংস্থার গুপ্ত কেন্দ্র স্থাপন। সরকারবিরোধীসভা-নিবারণ আইন চালু।

১৯০৮ ১১ই আগস্ট শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসীর দিন হইতে ঘাটালে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রকাশ। ঘাটাল স্কুলের জনপ্রিয় প্রধান শিক্ষক পার্বতীচরণ ঘোষের নির্দেশে ছাত্র ও শিক্ষকগণ খালি পায়ে ও কাপড় গায়ে স্কুলে আসে। ১ম ঘণ্টার পর স্কুল ছুটি হইয়া যায়। এই সময় ঢাকা অনুশীলন-সমিতির একজন কর্মী ঘাটালের বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা দিতেন। রামজীবনপুরের তাঁতিরা বোমার গান উৎকীর্ণ করিয়া রাজরোষে পড়েন।

১৯১৩ ২রা নভেম্বর গোকুলনগরে শহীদ প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্যের জন্ম।

১৯১৪ বাঘাযতীন ইত্যাদির নেতৃত্বে বৈদেশিক সাহায্য আনয়নের জন্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের (মানবেন্দ্রনাথ রায়) বিদেশ গমন।

১৯২০ অসহযোগআন্দোলনে মহকুমাবাসীর যোগদান। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ও কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা।

১৯২১ হাইকোর্টের ওকালতি ছাড়িয়া সাতকড়িপতি রায়ের কংগ্রেসে যোগদান। দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন-পরিচালনা ও প্রদেশ কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদক পদ গ্রহণ।

১৯২২ কিশোরীপতি রায়ের কারাবরণ। মেদিনীপুর সহরে ইহার বাড়ীতেই কংগ্রেস অফিস ছিল। জেলা কংগ্রেসের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন।

১৯২৩ এতদঞ্চলে অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের কাজ আরম্ভ। কিশোরীপতি রায় কারামুক্ত ও বিভিন্নস্থানে অভিনন্দন-লাভ। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টির উদ্ভব ও এই অঞ্চলেও তাহার সংগঠনের সূচনা।

১৯২৪-২৬ বেঙ্গল ভল্যাণ্টিয়ার্স বা বি, ভি দলের সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও মহকুমার কর্মীদের যোগদান। সর্বস্তরেই সাংগঠনিক অগ্রগতি। মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে দেবেন্দ্রলাল খাঁন নির্বাচিত। বেঙ্গল কাউন্সিল নির্বাচনেও দেবেন্দ্রলাল নির্বাচিত, কিন্তু কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদত্যাগ। নিউ ভায়োলেন্স পার্টির গোপন সংগঠন আরম্ভ।

১৯২৭-২৮ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রাপালা 'মাতৃপূজা' ও 'ভ্রাতৃমিলন' অভিনীত। ব্যবত্তার হাট (তমলুক) হইতে জিতেন চক্রবর্তী ও ধীরেন বেরা আসিয়া বিভিন্ন স্থানে স্বদেশী যাত্রা করেন। গড়বেতার রাঘব সরকারের দলের যাত্রাপালা 'জগদ্ধাত্রী' ও 'জাহ্নবী' বিভিন্ন স্থানে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইহারা স্বদেশী প্রচার ও কেহ কেহ স্বদেশী ডাকাতিও করিতেন। সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে মহকুমার বিভিন্নস্থানে হরতালপালন। কিশোরীপতি রায় জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে কৃষক আন্দোলন।

১৯২৯ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে মেদিনীপুরের নবগঠিত যুবসংঘের স্বেচ্ছাসেবকদলে তরুণদের যোগদান। মহকুমান্তরে যুবসংঘের সংগঠন আরম্ভ।

১৯৩০ নাড়াজোলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতাদিবসপালন। শ্যামগঞ্জে লবণআইন-অমান্য আন্দোলন। চেঁচুয়াহাটে দারোগা ভোলানাথ ঘোষ ও তাঁহার সহকারী অনিরুদ্ধ সামন্ত নিহত।

ইহার ফলে বর্বর পুলিশী অত্যাচার। মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট্ এর চেঁচুয়াহাটে আগমন ও গুলীতে ১৪ জন শহীদ হন। ক্ষীরপাই এর বিপ্লবী বিভূতি ঘোষের কারাবরণ। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবকগণের ঘাটালে আগমন (পুষ্প চ্যাটার্জী —মাদারিপুর) ও সংগঠনে সাহায্য। ঘাটালের কতিপয় ব্যক্তিকে বিশেষ কনেষ্টবল পদে নিয়োগ। এবং তাহাদিগকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখার চেষ্টা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য কেঁচকাপুর, বালা ও ঝাকরায় পুলিশী অত্যাচার। সোনামুখীতে আইনঅমান্য আন্দোলন ও কয়েকটি জনসভা।

১৯৩১ গান্ধী-আরউইন চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি। কিন্তু মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের ৩৮ জনকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই।

১৯৩২ ঘাটাল মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় সান্ধ্য আইন জারী। এই আইন প্রায় সাড়ে তিন বছর বলবৎ ছিল। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে জেলা শাসক ডগলাসের দরবার। কেঁচকাপুরের অমলেশ্বর সিংহের পুলিশী নির্যাতনে মৃত্যু। করবন্ধ আন্দোলনের তীব্রতা এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষণা।

১৯৩৩ বিভিন্ন স্থানে পুলিশের রুট্‌মার্চ। কলিকাতা কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ গ্রেপ্তার। কয়েকটি স্থানে জেলাশাসক বার্জের দরবার। প্রদ্যোত ভট্টাচার্যের ১২ই জানুয়ারী ফাঁসী।

১৯৩৪ সমগ্র মহকুমায় প্রচণ্ড পুলিশী অত্যাচার। গ্রামে গ্রামে নানাপ্রকার সংঘর্ষ। বার্জহত্যা-মামলায় কিশোরীপতি রায়ের পুত্র সনাতন রায়ের দ্বীপান্তর।

১৯৩৫-৩৬ সমগ্র মহকুমায় প্রচণ্ড খরা, অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ। মুসলিম লীগের সংগঠন সুরু।

১৯৩৭ খাজনাবৃদ্ধি ও তার প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ। অ্যাসেম্বলিতে কিশোরীপতি রায় নির্বাচিত। সেখ সিরাজউদ্দিন (কৃষ্ণপুর) মুসলিম লীগের প্রতিনিধি নির্বাচিত।

১৯৩৮ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘাটাল মহকুমা ভ্রমণ। কালিকাপুর, ক্ষীরপাই ও ঘাটালে জনসভা। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেন নরেশ শূর।

১৯৩৯ ঘাটালে প্রবল বন্যা। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফরোয়ার্ড ব্লকের সংগঠন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামীদের দ্বারা র‍্যাডিকেল হিউম্যানিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা ও নির্বাচনে দুইজন প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

১৯৪০ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঘাটাল ভ্রমণ ও হিন্দুমহাসভার সংগঠন আরম্ভ। বি, ভি দলের সবাই ডি. আই রুলে গ্রেপ্তার। গান্ধীজীর নির্দেশে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ।

১৯৪১ ঘাটাল মহকুমা কংগ্রেসকর্মী-সম্মেলন। বিভিন্ন স্থানে ধর্মান্তরিতদের জন্য শুদ্ধি অনুষ্ঠান।

১৯৪২ আগস্ট আন্দোলনে যোগদান। ঘাটাল থানায় ডাক বাংলো পোড়ানো হয়।

১৯৪৬ ক্ষীরপাইয়ের অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত। যতীশ ঘোষের কংগ্রেস ত্যাগ ও এতদঞ্চলে কমিউনিস্ট সংগঠন আরম্ভ।

১৯৪৭ স্বাধীনতা লাভ।

মহকুমার স্বাধীনতাসংগ্রামীদের তালিকা

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে ঘাটাল মহকুমার যে সব দেশপ্রেমিক অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নামের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। নানা সূত্র হইতে তালিকাটি বিশেষ প্রযত্নে প্রস্তুত করা হইলেও স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকলের নাম বর্তমানে সংগ্রহ করা খুবই দুরুহ ও দুঃসাধ্য। এই তালিকাবহির্ভূত আরও অনেক সংগ্রামীর নাম উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই। উল্লিখিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত কয়েকজনের নাম সুপরিচিত হইলেও অনেকের যথার্থ আবাসস্থান নির্ণয় করা যায় নাই। তবে ইহারা সকলেই যে ঘাটাল মহকুমার অধিবাসী তাহাতে সন্দেহ নাই। তালিকায় মোট ২৩৮ জন সংগ্রামীর নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। চেঁচুয়ার শহীদদের নাম গ্রন্থমধ্যে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় তাঁহাদের নাম এখানে অনুল্লিখিত রহিয়াছে।

অচলানন্দ রায়
অজিত চ্যাটার্জি
অতুলচন্দ্র ঘোষ
অতুলচন্দ্র বারিক
অনন্ত হাজরা
অনিল মুখার্জি
অনিল সামন্ত
অবিনাশ দিণ্ডা
অভিরাম সাঁতরা
অমলেশ্বর সিংহ
অমূল্য ডাল
অরবিন্দ মাইতি
অসিধারী হাজরা
অষ্টম হাজরা
আদিপ্রসাদ নায়ক
আবদার রহিম
আমির আলি
আশুতোষ দোলই

আশুতোষ পাল
আশুতোষ হাজরা
উপেন্দ্রনাথ করণ
করুণা কর
কাজী শাসমল
কানন গোস্বামী
কানাইলাল নায়েক
কালাচাঁদ ঘাঁটি
কালাচাঁদ নন্দী
কালীপদ নেমু
কালীপদ সামন্ত
কিশোরী মাল
কিশোরীপতি রায়
কিশোরী সরকার
ক্ষিতীশ মণ্ডল
ক্ষুদিরাম কারক
ক্ষুদিরাম নায়ক
ক্ষুদিরাম রায়

ক্ষুদিরাম লাহা
কৃষ্ণদাস ঘোষ
কেদারচন্দ্র ঘোষ
কেরামত উল্লা
গোপাল রায়
গোলক দত্ত
গোষ্ঠ গায়েন
গোষ্ঠ পাত্র
গোষ্ঠবিহারী রাণা
গৌরচন্দ্র পাল
গৌরচন্দ্র বারিক
গৌরমোহন ঘোষ
গৌরমোহন সেন
গৌরহরি বিশ্বাস
গৌরহরি মণ্ডল
চণ্ডীচরণ চৌধুরী
চন্দ্রকান্ত পান
চন্দ্রকান্ত মান্না
চিত্তরঞ্জন খাঁন
চিত্তরঞ্জন মণ্ডল
জগদীশচন্দ্র সেন চৌধুরী
জলধর চ্যাটার্জী
জলধর মণ্ডল
জহরলাল বক্সী
জানকীরঞ্জন রাজপণ্ডিত
জীবনকৃষ্ণ মাইতি
জীবনধর পতি
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মুখার্জি
তপস্বীচরণ মণ্ডল
তারাপদ চক্রবর্তী
তারাপদ ভট্টাচার্য
দিবাকর পাল
দেবেশ চক্রবর্তী
ধর্মদাস হড়
ধূর্জটি মুখার্জি
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল
নরেন ভট্টাচার্য
নরেন্দ্রনাথ ভুঞা
নরেশ শূর
নলিনী চক্রবর্তী
নলিনী মুখার্জি
নাগেশ্বর সিংহ
নারায়ণ ঘোড়ই
নারায়ণ চক্রবর্তী
নারায়ণ চৌধুরী
নিত্যরঞ্জন খাঁন
নিদর্শন চ্যাটার্জী
নিধিরাম রায়
নিমাই সিংহ
নীরদকুমারী দাসী
পশুপতি দোলই
প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য
প্রবোধ ব্যানার্জি
প্রবোধ মণ্ডল
প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল
প্রভাকর রায়
প্রভাংশু পাল
প্রশিতোষ রায়
প্রহ্লাদ সেন
পার্বতী ঘোষ
পার্বতীচরণ ঘোষ

পার্বতী দিগুা
পার্বতীচরণ দুলে
প্রাণকৃষ্ণ গুছাইত
পাঁচকড়ি বটব্যাল
প্রিয়নাথ দণ্ডপাট
পুলিন ঘোষ
পুলিন দুয়ারী
পূর্ণচন্দ্র সেন
বঙ্কিম চক্রবর্তী
বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী
বঙ্কিম মিত্তা
বনবিহারী দাঁ
বনবিহারী সিংহ
বলাইচরণ দে
ব্রজ চক্রবর্তী
ব্রজকিশোর ভুঞা
ব্রজনাথ ভঞ্জ
বংশী দোলই
বিনোদ কারক
বিনোদ বাগ
বিনোদ বেরা
বিনোদ বিহারী দত্ত
বিনোদ সামন্ত
বিপিন ভূঁইয়া
বিপিন সামন্ত
বিভূতি ঘোষ
বিভূতি পাত্র
বিভুতি ব্যানার্জী
বিশ্বনাথ কবিরাজ
বিশ্বনাথ রায়
বিহারীলাল সিংহ

বীণা বানিয়ান
বেণী মাল
বৈদ্যনাথ পাল
ভরত রামানুজ দাস মহন্ত
ভাস্কর মুখার্জি
ভূতনাথ মান্না
ভূপতিচরণ মাঝি
ভূষণ জানা
ভোলানাথ রায়
মণীন্দ্র চক্রবর্তী
মদনমোহন দে
মনতোষণ রায়
মন্মথ মুখার্জী
মহেন্দ্র রায়
মহেশ ব্যানার্জী
মাণিক চাঁদ ঘোষ
মানবেন্দ্রনাথ রায়
মিহির নেমু
মিহিরচন্দ্র পান
মুক্তারাম মণ্ডল
মৃগেন ভট্টাচার্য
মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী
মোহিনীমোহন দাস
মোহিনীমোহন মণ্ডল
মোহিনীমোহন রায়
যতীন্দ্রনাথ আদক
যতীন্দ্রনাথ ঘোষ
যতীশচন্দ্র ঘোষ
যুগলচন্দ্র ঘোষ
যুগল মাল
যুগলচন্দ্র সাঁতরা

যোগেন্দ্রনাথ রায়
যোগেন্দ্র হাজরা
রজনী পাঁজা
রতিকান্ত মল্লিক
রসময় ঘোষ
রাইচরণ মাল
রাখাল চ্যাটার্জি
রাজেন ভট্টাচার্য
রাধাকৃষ্ণ দাস
রাধানাথ পণ্ডিত
রাধানাথ সিংহ
রাধারমণ গোস্বামী
রাধারমণ সিংহ
রাধিকারঞ্জন ঘোষ
রামকৃষ্ণ পান
রামগতি পণ্ডিত
রামগতি হাজরা
রামচন্দ্র দাস
রামচন্দ্র সরকার
রামচরণ দাস
রামতোষণ বানিয়ান
রামপদ ঘোষ
রাম পাড়ুই
রামমনোহর সিংহ
রামশরণ রায়
রাসবিহারী চক্রবর্তী
রেবতী রাজপণ্ডিত
লক্ষ্মণচন্দ্র অধিকারী
লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার
লক্ষ্মণ মণ্ডল
লছমন সিংহ
লালমোহন গিরী
শচীনন্দন মুখার্জী
শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শম্ভুচন্দ্র রায়
শম্ভু পাঞ্জা
শর্বরী ভট্টাচার্য
শশীপদ দাস
শীতল ভট্টাচার্য
শ্রীকান্ত সরকার
শ্রীচরণ ঘোষ
সতীশ কুশারী
সতীশচন্দ্র সিংহ
সতীশ চ্যাটার্জী
সতীশচন্দ্র রায়
সত্যকিঙ্কর চক্রবর্তী
সত্যবান দোলই
সনাতন বেরা
সনাতন রায়
সন্তোষ বারিক
সমাজপতি চক্রবর্তী
স্বদেশরঞ্জন দাস
সাতকড়িপতি রায়
সাধন বাউরি
সিদ্ধেশ্বর সরকার
সীতাংশুশেখর পাল
সুবলচন্দ্র মেড়ো
সুবোধ গিরী
সুরেন বাগ
সুরেন্দ্র মণ্ডল
সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
সোনাউল্লা
হরমোহন হালদার
হরিদাস দে
হরিদাস মণ্ডল
হরিপদ অধিকারী
হরিপদ পড়িয়া
হরিপদ ভট্টাচার্য
হরিপদ মণ্ডল
হরিপদ মল্লিক
হরিপদ মাঝি
হরিসাধন পাইন
হরিসাধন মাইতি
হরিহর হালদার
হরেরাম কারক
হৃষীকেশ পাইন
হৃষীকেশ ভট্টাচার্য
হেমচন্দ্র ফৌজদার

নির্ঘণ্ট

অ

খ

জ

INDEX

অশুদ্ধি-সংশোধন

পৃষ্ঠাঙ্ক	সারি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	উপর হইতে ৯ম	আড়গডা	আড়গড়া
৭	নিম্ন হইতে ১৩শ	দামোদর	আমোদর
	" " ৮ম	পূবে	পূর্বে
১৬	উপর হইতে ১০ম	চতুর্ধুরি	চতুর্ধুরি
	নিম্ন হইতে ৮ম	অতএর	অতএব
১৭	উপর হইতে ৯ম	absorved	absorbed
১৮	উপর হইতে ২য়	অন্তর্ভূক্ত	অন্তর্ভুক্ত
২৭	নিম্ন হইতে ১৫শ	১০৭৬	১০৯৬
২৮	উপরের ১ম	হইযার	হইবার
৩০	উপর হইতে ১৫শ	ছিল	ছিলেন
	নিম্ন হইতে ২য়	উত্তর	উত্তর
৩৩	উপর হইতে ১৫শ	সরকারও	সরকার ও
	নিম্ন হইতে ৪র্থ	পরিমাণ ফল	পরিমাণফল
৩৭	নিম্ন হইতে ১০ম	পৈত্রিক	পৈতৃক
৪২	নিম্ন হইতে ৪র্থ	ফাঁসী ২১শে জুলাই, ১৯০৮	ফাঁসী ১১ই আগষ্ট, ১৯০৮
৪৪	নিম্ন হইতে ৬ষ্ঠ	*"গ্রন্থকারের পিতা"	*ইহার পরিবর্তে হইবে "দাসপুর থানার বাসু-দেবপুরগ্রামের স্বর্গত"
৫৬	নিম্ন হইতে ৫ম	১৮৮০	১৮৮১
৭১	উপর হইতে ১৪শ	কার্যালয়	কার্যালয়
৭৫	নিম্ন হইতে ১৪শ	পুরুযোত্তমপুর	পুরুষোত্তমপুর
৭৬	উপর হইতে ১১শ	বৈকুন্ঠপুর	বৈকুণ্ঠপুর
	নিম্নহইতে ৮ম	পালযুগের	পালযুগের
৭৭	উপর হইতে ৬ষ্ঠ	ভাগীরথী	ভাগীরথী
৭৮	নিম্ন হইতে ১৪শ	রঘুমাথপুর	রঘুনাথপুর
৭৯	নিম্ন হইতে ৩য়	শাখানদীসমুহ	শাখানদীসমূহ
৯৪	উপর হইতে ১৫শ	৮৮৮	১৮৮৮
৯৯	উপর হইতে ৮ম	নিদিষ্ট	নির্দিষ্ট
১০৫	উপর হইতে ১৫শ	A report	A Report

পৃষ্ঠাঙ্ক	সারি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৭	উপর হইতে ১৩শ	সন্নিবি	সন্নিবিষ্ট
১২৫	নিম্ন হইতে ১০ম	(৯৭১)	(১৯৭১)
১৩৩	উপর হইতে ২য়	সম্পাকত	সম্পর্কিত
	উপর হইতে ৬ষ্ঠ	উচ্চ মাধমিক	উচ্চ মাধ্যমিক
১৩৮	উপর হইতে ১২শ	উইটিবিতে	উইটিবিতে
১৫৪	নিম্ন হইতে ২য়	উমাচরণ রক্ষিত	উর্মাচরণ রক্ষিত
১৫৬	উপর হইতে ৩য়	পুরাণো	পুরানো
১৬১	নিম্ন হইতে ২য়	উপরিউক্ত	উপরিউক্ত
১৬৭	উপর হইতে ১ম	গ্রাম্যদেবী	গ্রামদেবী
১৬৯	নিম্ন হইতে ১২শ	কব্জা	কর্ঙা
১৭১	উপর হইতে ১৪শ	শিরোক্ষ	শিরো দক্ষ
১৭৩		*(পৃষ্ঠা সংখ্যা) ৭৩	*১৭৩ হইবে
১৭৬	শেষ সারি	"বাংলাদেশে এই পূজার প্রবর্তন করেন"	"বাংলাদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তন করেন"
১৭৯	নিম্ন হইতে ৭ম	চক্ষুরোগ	চক্ষুরোগ
১৮০	উপর হইতে ১১শ	গ্রাম্য দেবতা	গ্রাম দেবতা
১৮১	নিম্ন হইতে ১০ম	চাষী	চাষা
১৮৫	উপর হইতে ৯ম-১০ম	"সাতদিন ধরিয়া সরস্বতী পূজারমেলা"	"সাতদিন ধরিয়া মেলা"
	নিম্ন হইতে ৮ম	"সরস্বতীর মেলায়"	"পঞ্চমীর মেলায়"
১৮৯	নিম্ন হইতে ৫ম	"আটক দশটিডাল"	"আট দশটি ডাল
২১১	নিম্ন হইতে ১০ম	১৯৬৬	১৯৭৬
২২০	নিম্ন হইতে ১৪শ	মুর্তি	মূর্তি
২৩৬	নিম্ন হইতে ১০ম	সুত্রধর গোষ্ঠী	সূত্রধর গোষ্ঠী
২৪৯	নিম্ন হইতে ১১শ	'স্টাকো'র কাজ	'স্টাকো'র কাজ,
২৭২	উপর হইতে ১০ম	ক্ষত্রিয়াচ্ছদ্রকন্যায়াং	ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং